বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ

জুলফিকার আহমদ কিসমতী

প্রগতি প্রকাশনী

islamirenesaandolon.blogspot.com

প্রকাশকের কথা

অতীতের ইতিহাস বর্তমানের পথ চলার দিকদর্শন। অন্যান্য দেশের ওলামা-এ-কেরামের অবদানসমূহকে কেন্দ্র করে লিখিত বহু জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ আমরা পড়ে থাকি। কিন্তু এ অঞ্চল তথা বাংলাদেশের ওলামা-এ-কেরাম ও পীর-মাশায়েখ যারা দেশ ও জাতি-ধর্মের উন্নতি-অগ্রগতির লক্ষ্যে সমাজে সৎ নাগরিক সৃষ্টি, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকল সময় বিরাট অবদান রেখে আসছেন, তাঁদের সম্পর্কে জানার মতো ইতিহাস গ্রন্থ নেই বললেই চলে। বিশেষ করে যারা আজীবন জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখে এসেছেন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় করে গেছেন নিঃস্বার্থ সংগ্রাম, তাঁদের কর্মময় সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে জানা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের বিশেষ প্রয়োজন। সমাজে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্বসূরী মহৎ ব্যক্তিদের সফলতা-ব্যর্থতার নিরিখেই এদেশের ইসলামী আন্দোলনের উত্তরসূরীদের কর্মসূচী নিতে হবে—এগিয়ে যেতে হবে। এদিক থেকে এধরনের একখানা বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি মওলানা জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী লিখিত এ বইখানা সেই প্রয়োজন বহুলাংশে পূরণ করবে আশায় আমরা বইখানা প্রকাশ করেছি।

বইটি আমাদের বর্তমান যুবসমাজের সামনে যেমন এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবদানসমূহকে তুলে ধরবে, তেমনি দেশের লাখ লাখ মাদ্রাসা ছাত্রকে তাদের অগ্রপথিকদের পদাংক অনুসরণের দ্বারা দেশকে ইসলামী হুকুমতে পরিণত করার কাজে অনুপ্রাণিত করবে। কম্যুনিষ্ট ও ধর্মনিরপক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরা যেমন মসজিদ-মাদ্রাসা ছাড়া জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কর্মাঙ্গণে আলেমদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে চায়না তেমনি কোনো কোনো ইসলামী ভাবধারার লোকও ওলামা-নেতৃত্বকে পসন্দ করতে চায় না অথচ ইসলামী হুকুমতের জন্যে ওলামা-নেতৃত্ব অপরিহার্য। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্র হলো আল্লাহ্‌র ওহীভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা আর ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী হচ্ছেন আলেমগণ, সেক্ষেত্রে ওহীর জ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ও সুস্পষ্ট ধারণা যাদের থাকবেনা, তারা কি করে ইসলামী রাষ্ট্র চালাতে সক্ষম হবেন? ধর্মীয় এবং বৈষয়িক উভয় দিকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও আমল বিশিষ্ট নেতৃত্বের অভাবই আমাদের দুর্গতির কারণ।

উল্লেখ্য, ইসলামের স্বর্ণযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রে ওলামা-এ-কেরাম যে ভূমিকা পালন করতেন, বর্তমানে আমাদের দেশের ওলামা-এ-কেরাম সত্যিকার অর্থে সে ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, বর্তমানেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন, পাকিস্তান, ইরান, লেবানন, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশের ওলামা-এ-কেরাম সমাজ ও রাষ্ট্রে যে ভূমিকা পালন করছেন, আমাদের দেশের ওলামা-এ-কেরাম ততটা পারছেন না। তাই ইসলামী হুকুমত তথা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের ওলামা-এ কেরামের মধ্যে তাদের যথাযথ ভূমিকা ও নেতৃত্বের সৃষ্টিও অপরিহার্য। 'আমাদের একান্ত বিশ্বাস, এ বইখানা কাংখিত ওলামা নেতৃত্ব গড়ে উঠতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাবে। মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি
চেয়ারম্যান,
ইসলামী দাওয়াত সংস্থা, ঢাকা

অভিমত

বিশিষ্ট লেখক আলেম মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাহেবের লেখা "বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ" বইটি সময়ের দাবী বলে আমার ধারণা। আমার নিজের ধারণা মতে, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন হয়েছে খোদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবৎকালেই। কিন্তু ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দশকে এখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আগ পর্যন্ত প্রায় ছয় শো বছরের ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে সব আলেম ও শায়েখ এদেশে জন্ম নিয়েছেন বা বহির্দেশ থেকে এসে ইসলাম ও মুসলিম জনগণের সেবা করেছেন, তাদের ঈমান-আকীদা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলায় বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁদের কথা এখন আর আমরা স্মরণ করতে পারছিনা। এটা যে কতবড় দুর্ভাগ্যের কথা, তা ব্যক্ত করার মত ভাষা আমার জানা নাই।

নিকট অতীতেও এদেশের উপর দিয়ে চলে গেছে অনেক রক্তঝরা সংগ্রামের ঘটনা। সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর মুজাহেদ আন্দোলনে এদেশের আলেম ও শায়েখদের ভূমিকা ছিল নেতৃত্বের। তৎপরবর্তী কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনেও এদেশের আলেম ও মাশায়েখগণ অকল্পনীয় ত্যাগ-তিতীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মুদ্রিত বা লিখিত পঠন সামগ্রীর মধ্যে সেসব গৌরবজনক ইতিহাসের সামান্য অংশও বিধৃত হয়নি।

মওলানা জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতী সমসাময়িক কয়েকজন আলেম ও পীরের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন। এর আগে অবশ্য ইনি ১৯৬৯ সালে "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা" নামক আর একখানা বই লিখে এ প্রচেষ্টার সূচনা করে ছিলেন। ফলে এটা প্রথম প্রয়াস যদিও নয় তবুও বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমই বলতে হবে।

প্রথম প্রয়াস রূপে তাঁর এ লেখা ত্রুটিমুক্ত হয়েছে একথা বলতে চাই না। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এ প্রয়াস প্রশংসনীয় ও সময়ের একটা তীব্র দাবী পূরণের প্রথম সফল প্রচেষ্টা। আমি প্রাজ্ঞ লেখকের এ কোশেশকে মোবারকবাদ জানাই। বইটি মকবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করি।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

তাং—২৩শে শাওয়াল
১৪০৮ হিঃ

প্রসঙ্গ কথা

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ১২০১ খৃঃ মোতাবেক হিজরী ছয় শতকের শেষভাগে ইখতেয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে এ ভূখণ্ডে মুসলমান ও তাদের ধর্মের আগমন ঘটে। আসলে কিন্তু তা নয় বরং বাংলাদেশে ইসলামের আগমন শুরু হয় এরও বহু আগে। ইসলামপূর্ব যুগ হতে আরববণিকরা সামুদ্রিক পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা-সুমাত্রা যাবার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেন এবং পণ্য বিনিময় করতেন। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খৃষ্টীয় ৮ম শতকে এবং হিজরী প্রথম শতকে আরবের মুসলিম বণিক ও ধর্মপ্রচারক মুবাল্লিগদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। এদেশে প্রথম চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সন্দীপ এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরে সিলেটে ইসলামের দাওয়াত পৌছে। মুসলিম শাসকের সিলেট বিজয়ের পূর্বে রাজা গৌড় গুবিন্দের রাজ্যে বুরহানুদ্দীন নামক যে মুসলমান বাস করতো, অগ্রযাত্রী মুসলিম মোবাল্লেগদের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিল। বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে এভাবে বেসরকারী পর্যায়েই ওলামা-মাশায়েখ, পীর-আওলিয়া দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। রাজা-বাদশাহ্‌রা এসেছেন পরে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিবেশিত এক তথ্যে দেখা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে কয়েক জন ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আগমন করেন। এদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহায়মিন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের তাবলীগ করতে আসেন হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত হোসেন উদ্দীন, হযরত মুর্তাযা, হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আবুতালিব। এরকম পাঁচটি দল পরপর বাংলাদেশে আসে। তাদের সাথে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরাঞ্জাম থাকতোনা। তারা এদেশের প্রচলিত ভাষায় ইসলাম প্রচার করতেন। সত্যিকার মুসলমান তৈরি করার লক্ষ্যে তারা কাজ করতেন। তারপর আরও ৫টি দল মিসর ও ইরান থেকে বাংলাদেশে আসে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত মোহর থেকে বুঝা যায়, ৮১০ শতাব্দীতেও এ অঞ্চলে বহু মুসলিম প্রচারক ও বণিকের সমাগম হয়। ১০৪৭ খৃঃ সুলতান মাহমূদ মাহী সাওয়ার মহাস্থানগড় এলাকায় ইসলাম প্রচার কার্য চালান। তাঁকে শাহসুলতান বলখী বলে অনেকে ধারণা করেন। এভাবে পরবর্তী পর্যায়ে

ময়মনসিংহে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, ১১৫৮—৮৯ খৃঃ বল্লাল সেনের রাজত্ব-কালে হযরত বাবা আদম শহীদ, রাজশাহীতে শাহ্ মাখদুম রূপোশ (১১৮৪ খৃঃ) বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী ১৫জন সঙ্গী সহ ইসলাম প্রচার করেন। ১২০১ খৃঃ ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের পূর্বযুগে এদেশে ইসলাম প্রচারক পীর-আওলিয়াদের মধ্যে আরও যারা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তারা হলেন : শায়েখ আব্বাস বিন হামজা নিশাপুরী। তিনি ৯০০ খৃঃ (২৮৮ হিঃ) ঢাকায় ইনতে-কাল করেন। খিলজীর বাংলাদেশ বিজয়ের তিনশত বছর আগেই তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এছাড়া রয়েছেন শাহ্ সুলতান বলখী, মাহি সওয়ার, শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকন প্রমুখ, যারা খিলজীর বাংলাদেশ আগমনের পূর্বে এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন।

পরিতাপের বিষয় যে, তাদেরজীবন বৃত্তান্ত সামগ্রিক ও যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত না থাকায় এসব মহৎপ্রাণ ত্যাগী ইসলাম প্রচারকদের জীবনী সম্পর্কে যেমন আমরা খুব কমই অবগত, ঠিক একই কারণে ঐ পীর-আওলিয়া ও ইসলাম প্রচারকদের এযুগীয় উত্তরসুরী ওলামা পীর-মাশায়েখদের জীবনবৃত্তান্তও আমাদের থেকে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারও জীবনইতিহাসকে ধরে রাখার জন্যে আধুনিক যুগের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও এমন একটি অবস্থা সত্যিই লজ্জাকর। আমাদের দেশের বহু ওলামা পীর-মাশায়েখ ইসলামের সেবায় বিরাট অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু তাদের সেই সব অবদান ও জীবনকাহিনী সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হচ্ছেনা।

ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আলেম সমাজই আন্দোলন ও জেহাদ শুরু করেন, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোজাহিদ-এ-আজম সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভী। তিনি ১৮৩১ খৃঃ বালাকোটের জেহাদে শাহাদত বরণ করেন। সেই জেহাদের মোজাহিদদের তালিকায় বাংলা-দেশের বহু মোজাহিদ এবং সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের সূফী নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী, নোয়াখালীর মওলানা ইমামুদ্দীন, (মুনশী মুহাম্মদী আনসারী) মুর্শিদাবাদী, চট্টগ্রামের চুনতীর মৌলভী আবদুল হাকীম মোমেনশাহীর মৌলভী ইবরাহীম, কুমিল্লার মওলভী হাবীবুল্লাহ প্রমুখের পরিচয় ও

অবদান সম্পর্কে আমরা কি জানি ? তার আগে অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বে বাংলাদেশের যেসব মহৎপ্রাণ বুযর্গ মোগল যুগেও শির্ক-বেদআত, কুফর ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামের প্রাণসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং ইসলামের নির্মল জ্যোতিতে বাংলা ভাষাভাষীদের অন্তরকে আলোকিত করার জন্যে অপরিসীম নিষ্ঠা, সাধনা ও ত্যাগের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাদের সংখ্যাও কম ছিলনা। সেসব মহাত্মার বিস্তারিত জীবনকাহিনী আমাদের সামনে নেই। ঐসময়কারই ইসলামের বাংলাভাষী ত্যাগী পুরুষ ছিলেন শায়েখ হামীদ বাঙ্গালী। বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ইতিহাস যেসব সাধক-বুযর্গের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৬ শতকে যখন উপমহাদেশের মুসলিম রাজশক্তির মধ্যে ব্যাপকভাবে অমুসলিম প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং মুসলিম সমাজ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তখন বিপ্লবী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মোজাদ্দিদে আলফেসানীর আবির্ভাব ঘটে। মুসলিম বাংলার গৌরব শায়েখ হামীদ বাঙ্গালী যে মোজাদ্দিদে আলফেসানীর অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন, সে কথা আমরা অনেকেই জানিনা। বর্ধমানের মঙ্গলকোটে এ মহান বুযর্গ ও ইসলামের খাদেমকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমসাময়িক অনেকের পরিচয়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

একটি প্রকাণ্ড সৌধ নির্মিত হবার পর তার সত্তা, আয়তন, কারুকার্য-মণ্ডিত শোভা, এর চত্বরে অবস্থিত রং-বেরংয়ের ফুল-গুল্ম ইত্যাদির চিত্তাকর্ষক দৃশ্য যে-কোনো দর্শককেই বিমোহিত করে। সকল দর্শকের কাছেই সম্মুখের পুষ্পোদ্যান শোভিত ইমারতটি প্রশংসিত হয়। কিন্তু একতলা বা বহুতল বিশিষ্ট এই সৌধটি মাটির নিচের যেসব অমসৃণ ইট-সুরকী, রড ইত্যাদির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, ঐগুলোর প্রতি সচরাচর কারুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। অথচ সৌধটির ভিত্তিমূলে মাটির নিচে আত্মগোপনকারী ইট-সুরকী ও রডগুলোর যদি লোক চক্ষুর অন্তরালে ত্যাগ না থাকত, তাহলে সকলের অতিপ্রশংসিত এবং কারুকার্য খচিত ও অপূর্ব শোভা মণ্ডিত ইমারতটির কোন অস্তিত্বই টিকে থাকতে পারতো না। ঠিক একই ভাবে কোন জাতিসত্তারূপ সৌধের ভিত্তিমূলেও এমন কিছুলোকের রক্ত, ত্যাগ তিতীক্ষা ও শ্রম-সাধনা বিদ্যমান থাকে, যা না হলে সে জাতি তার অস্তিত্ব

লাভ ও তা বজায় রাখতে পারেনা এবং পারে না পরাধীনতার অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হতে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট জাতির স্বাধীনতাকে সুসংহতকরণ, তার উন্নতি-অগ্রগতি বিধান, সার্বিক শ্রীবৃদ্ধিকরণ, এর স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যেও এ শ্রেণীর ত্যাগী-ব্যক্তিদের প্রয়োজন সর্বাধিক। অন্যথায় বহু রক্ত ও ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করলেও তার সুফল পাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। নিকট অতীতের বহু ঘটনা এর সাক্ষী।

আমাদের এই উপমহাদেশকে ঔপনিবেশিক শাসনের দাসত্বনিগড় থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে, এদেশ ও সমাজকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করণে, সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এমন অসংখ্য ওলামা এবং পীর-মাশায়েখ অবদান রেখে আসছেন, আমরা তাদের অনেকেরই কোনো অবদানকে ধরে রাখিনি। অথচ তাদের সেই অমর কীর্তিসমূহে রয়েছে আমাদের অগ্রযাত্রার যথেষ্ট প্রেরণা। ঐ ত্যাগী সংগ্রামীদের মধ্যে কারও কারও নাম ইতিহাসের পাতায় শোভা পেলেও অনেকেই ইতিহাস থেকে অনুপস্থিত। নানান কারণে বহু মহৎ জীবনের তেমন চর্চা হয়নি।—তারা বহুতল বিশিষ্ট দালানের ভিত্তিমূলে লুক্কায়িত সেই ইট-সুরকী ও রড-সিমেণ্টের মতো 'গুমনাম'ই রয়ে গেছেন। ইমারতের ভিত্তিমূলের উপায়-উপকরণ ইমারতটির অস্তিত্বকে ধরে রাখাতে দর্শকবৃন্দ যেমন দালানের বাহ্যিক অবয়বেরই প্রশংসা করে থাকেন এবং ঐগুলোর কথা আদৌ ভাবেননা, তেমনি আমাদের জাতি সত্তারূপ ইমারতটি সকলের কাছে পরিদৃশ্যমান হলেও এর স্বাধীনতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, এবং জীবনী শক্তি স্থায়ী থাকার উপকরণাদি যেই মহান ওলামা পীর-মাশায়েখ কালাকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা টিকিয়ে রেখেছেন, তাদের কোনো মূল্যায়ন এদেশের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়না, অথচ আমাদের জাতীয় তহবিলের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যে মানের শিক্ষিত বের করা হয়, সে তুলনায় ওলামা সমাজ তেমন কিছু না পেয়েও অনেক সৎ-সাধু ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরি করে আসছেন, যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে এমনকি বিদেশেও বিরাট অবদান রেখে চলেছেন। ঐসব ওলামা, পীর-মাশায়েখের অধিকাংশ দ্বীনী শিক্ষার আলো বিস্তারের মধ্যদিয়েই জাতির সেবা করেছেন বেশি। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের আরও যেসব অবদানের জন্যে কোনো ব্যক্তিত্ব জাতীয় ইতিহাসে স্থান পায়,

সেধরনের অবদানের অধিকারী আলেমের সংখ্যাও দেশে কম নয়, যারা জাতির মঙ্গলচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ যুগে অবদান রেখেছেন। কি স্বাধীনতা আন্দোলনে, কি তাকে সংহত করণে বা দেশকে শান্তি-নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার সমৃদ্ধজনকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টায়, কারুর চাইতে তারা অবদান কম রাখেননি। বরং দেখা যায়, অন্যেরা যেখানে জাতির সেবার চাইতে এসব কাজের দ্বারা আত্মসেবাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় কাজে দেশের ওলামা সমাজ আত্মস্বার্থবিস্মৃত হয়ে একমাত্র জাতির কল্যাণ-চিন্তাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয় যে, তারপরও আলেমদের সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় কোনো পর্যায়ের অবদানকেই পরবর্তী বংশধরদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের অবদান সমূহকে আমাদের যুবকিশোরদের নজর থেকে আড়াল করে রাখারই যেন একটি প্রয়াস সক্রিয়। অবশ্য আজকাল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এব্যাপারে কিছু কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। এই উপমহাদেশের উর্দু ভাষাভাষী এলাকার বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং ওলামা-মাশায়েখের জাতীয় পর্যায়ের অবদানসমূহ নিয়ে বহু ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী এলাকার আলেমদের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অবদান নিয়ে কোনো গ্রন্থই লেখা হয়নি বল্লে চলে। অতীতে যেসব পীর-আওলিয়া, বীর আওলিয়া এদেশে ইসলামের আলো বিস্তার করেছেন, ইসলামী তাহজীব, তামাদ্দুন ও শাসন ব্যবস্থাকে সংহত করণে উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন, পাকিস্তান আমলে তাঁদের ব্যাপারে সরকারী প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে সীমিত পর্যায়ের কিছু কাজ হলেও পরবর্তী ওলামা-মাশায়েখের পরিচিতি ও সেবাকর্মকে ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি। অথচ তারা নানানভাবে জাতির সেবা করে গেছেন, জাতিসত্তা ও এর শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিদেশী আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই উপেক্ষার ফলে জাতিগঠনে ঐ সব ব্যক্তিত্বের অবদানসমূহ থেকে পরবর্তী বংশধরদের প্রেরণা নেয়ার পথ এক রকম রুদ্ধই হয়ে আছে। অথচ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এমন সব ব্যক্তিকেও নানানভাবে জাতীয় বীর রূপে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, যারা হয় যদ্দুর প্রশংসিত, তদ্দুর নয় অথবা সার্বিক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের দিক থেকে বিতর্কিত। তাই বাংলাদেশের ঐসকল সংগ্রামী ওলামা-পীর-

মাশায়েখের কর্মময় জীবনালেখ্য সম্বলিত একখানা বই লেখার কথা অনেক দিন থেকেই চিন্তা করে আসছিলাম। ১৯৮০ সালে এজন্যে কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং কিছুটা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনাব বদরে আলম সাহেবের পরামর্শে সংক্ষিপ্তাকারে দেশের খ্যাতনামা কয়েকজন আলেমের জীবনী সম্বলিত একখানা পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। একটি প্রতিষ্ঠান পাণ্ডুলিপি খানা প্রকাশ করার জন্যে আমার থেকে নিয়েও গিয়েছিল। এমনকি তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় দুই দুই বার এর আসন্ন প্রকাশের কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বড় ধরনের কি কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার বইটি ছাপা বিলম্বিত দেখে ৭ বছর পর আমি তা ফিরিয়ে নিয়ে আসি। পরে আমার অতীব শুভাকাংখী প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় মওলানা মুহীউদ্দীন খান সাহেবের পরামর্শে এর পরিধি আরও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও মাসিক ইসলামিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক আলহাজ্জ মুহাম্মদ মঈনুল ইসলামের সাথে আলাপ করায় তিনি তা প্রকাশে আগ্রহ দেখান। অধম নিজের বহু কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়ে যদ্দুর এবং যেকয়জনের জীবন বৃত্তান্ত নানানভাবে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি, সে চেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ পাঠক-পাঠিকা সমীপে 'বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ' বই খানা উপস্থাপন করেছি। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তাতে কোনো জীবনকাহিনীর কোথাও তথ্যগত ভ্রান্তি কিংবা বিন্যাসে বা মুদ্রণে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এব্যাপারে কোনো সহৃদয় পাঠক আমাকে অবহিত করলে অত্যন্ত স্বানন্দ চিত্তে সেটা গ্রহণ করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এমন ওলামা ও পীর-মাশায়েখের সংখ্যা কম নয়, যাদের বিভিন্ন অবদানের প্রতি উপরে ইঙ্গিত করেছি। তবে সময়াভাবে এবং কিছুটা বইটির কলেবরবৃদ্ধি পেয়ে প্রকাশে জটিলতা দেখা দেয়ার আশংকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জীবনালেখ্যও বইয়ের এঅংশে যোগ করা সম্ভব হয়নি। বইয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড এ পর্বে প্রকাশ করা হলো। দেশের অন্যান্য সংগ্রামী ওলামা, পীর-মাশায়েখের জীবনবৃত্তান্ত পরবর্তী খণ্ডে তুলে ধরার ইচ্ছা রইল। আল্লাহ্ সেই আশা পূর্ণকারী।

'বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ' বইখানা প্রকাশে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। মহান আল্লাহ্‌র অগণিত প্রশংসা, শেষপর্যন্ত তিনি তা প্রকাশে মদদ করেছেন। ইংরেজী মাসিক The Islamic Times-এর সম্পাদক এবং বাংলাদেশ লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম সাহেব বইখানা প্রকাশে এগিয়ে আসেন। এদেশের আলেম ও পীর-মাশায়েখের জাতীয় পর্যায়ের অবদানসমূহ আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে তুলে ধরার কাজে তার এই নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতার জন্যে তাঁকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। মূলত: তাঁর সহায়তা ও আগ্রহেই বইখানার আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি, তথ্যাবলী সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে আমার স্নেহের ছেলেমেয়ে ও অন্য যেসব বন্ধুবান্ধব আমাকে সহযোগীতা দান করেছে, তাদের প্রতি থাকলো আমার আন্তরিক দোয়া ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশে ইসলামী ন্যায়বিধান প্রতিষ্ঠায় বড়দের সাথে মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজের তরুণ যেসব ভাইবোন শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেসব সংগ্রামী বীর-মোজাহিদকে বইটি বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আশা রাখি। বইখানা সকল মহলে সামাদৃত হলেই এসংক্রান্ত কষ্টপরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ্ একে কবুল করুন, আমীন!

প্রথমে নিচের শব্দ কয়টি সংশোধন করে নিন

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৩	কোনো তাদের	কোনোকিছু তাদের
১৪	২০	অদর্শের	আদর্শের

২য় খণ্ড

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১০	২	জন্ম ১৯০০ খৃঃ	জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ
২০৭	২	৮ ই ডিসেম্বর	২৭শে অক্টোবর
২২৬	১০	আমলে	আলেম
৩০১	২৪	সংগ্রামী	এ সংগ্রামী নেতা
৩০৩	১৩	লুটের	লুটে
৩১১	১৬	ব্যক্তি দ্বারা	ব্যক্তিদের দ্বীন

সূচী-পত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (রহ)

(জঃ ১৭৮০ খৃঃ—মৃঃ ১৮৩৯ খৃঃ)

বালক শরীয়তুল্লাহ্ আপন কনিষ্ঠ চাচা মওলানা মুফতী মুহাম্মদ আশেক ও চাচী আম্মার সাথে মুরশিদাবাদ থেকে নৌকা যোগে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নৌকা গঙ্গানদীর বুক চিরে সামনে অগ্রসরমান। এদিকে উন্মত্ত বৈশাখী ঝড় তোলপাড় করে নদীর পানিশুদ্ধ শূণ্যে উড়িয়ে নিতে চায়। নদীর উত্তাল তরঙ্গ যাত্রীবাহী নৌকাটিকে একবার পানির উপরে

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র বংশধারা

পিতা : আবদুল জলীল তালুকদার (গ্রাম - শামাইল, বাহাদুরপুর, ফরিদপুর)

শরীয়তুল্লাহ্ (এক কন্যা)

মওলানা মুহশিনুদ্দীন আহমদ দুদু মিঞা

(১) সাঈদুদ্দীন আহ্‌মদ খানবাহাদুর (২) আবদুল গাফ্‌ফার (৩) গেয়াসুদ্দীন হায়দর

(১) বাদশাহ্ মিঞা (২) আবদুল কুদ্দুস (৩) রাজিউদ্দীন

(১) মুহ্‌সিনুদ্দীন আহ্‌মদ (দুদু মিঞা) (২) মুহিউদ্দীন আহমদ (দাদন মিঞা) (বর্তমান পীর)

তুলছে আরেকবার নৌকাটিকে নদীর গভীর পানিতে দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নৌকার আরোহীদের সলীল সমাধি ঘটার ব্যাপারটি মুহূর্তকাল সময়ের প্রশ্নমাত্র। যা আশঙ্কা করা হচ্ছিল,

শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ নবাব বাহাদুরের দরবারের মুফতী মুহাম্মদ আশেক এবং তাঁর স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ শরীয়তুল্লাহ্কে নিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাকবলিত নৌকাখানা প্রমত্তা গঙ্গা বক্ষে নিমজ্জিত হলো। মুফতী মুহাম্মদ আশেক ও তাঁর পত্নী গঙ্গাবক্ষে প্রাণ হারালেন। কিন্তু আল্লাহ্র একি অপার অনুগ্রহ। মুফতী আশেকের ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শরীয়-তুল্লাহ্কে মহাপ্রভু যেন তাঁর বিশের রহমতের হাতছানি দ্বারা নিঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন

বস্তুত এ বালকই সেই জগত কাঁপানো শরীয়তুল্লাহ্ উত্তরকালে যিনি হাজী শরীয়তুল্লাহ্ নামে এক দিকে বাংলার তৌহিদী জনতাকে যাবতীয় কুসংস্কার ও শিরক বিদাতের হাত থেকে রক্ষার প্রচণ্ড আন্দোলন করে ছিলেন, অপর-দিকে ইংরেজ শাসক ও তাদের জুলুম ও শোষণের সহযোগীদের জন্যে ছিলেন এক মস্তবড় ত্রাস। ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি নির্মাতা অকুতভয় সংগ্রামী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্র ফরায়েজী আন্দোলন এই উপমহাদেশের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর কর্ম-ময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁকে ঝঞ্ঝাকবলিত সেই ডুবন্ত নৌকারযাত্রীর মতোই জীবন অতিবাহিত করতে হবে তাঁর জীবন শুরুর উক্ত ঘটনাটি যেন সেই ইঙ্গিতই ছিল। বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত শিবচর থানার বাহাদুর পুরের সন্নিকট শামাইল নামক গ্রামে আব-দুল জলিল তালুকদার নামে এক সম্মানিত প্রতাপশালী ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন সৎ সাধু ও অমায়িক ব্যক্তি। সাধারণ অত্যাচারী জমিদার তালুকদারদের ন্যায় তিনি প্রজাদের উপর জুলুম অত্যাচার করতেন না। তাঁর সদ্ব্যবহারে প্রজারা ছিল তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ। তার সদা-চারণ ও সদ্ব্যবহারে সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং তাঁকে সকলে সম্মানের সাথে দেখতো। এই মহৎপ্রাণ আবদুল জলিল তালুকদারের ঘরেই ১৭৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন উপমহাদেশের খ্যাতিমান সংগ্রামী মোজাহিদ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (রহঃ)। আবদুল জলিল তালুকদার পুত্র শরীয়ত ল্লাহ্ এবং এক কণ্যা সন্তান রেখে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মুহাম্মদ আজীম এবং মুহাম্মদ আশিক নামক আবদুল জলিলের দুই ভ্রাতা ছিল। মুহাম্মদ আজীম সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ছোট ভাই

মুহাম্মদ আশিক ছিলেন একজন দক্ষ আলেম। তিনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ নবাব বাহাদুরের দরবারে মুফতী ছিলেন এবং সপরিবারে মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করতেন

আবদুল জলীল তালুকদারের ইনতেকালের পর পুত্র শরীয়তুল্লাহ্ এবং কন্যা তাঁর ভ্রাতা মুহাম্মদ আজীম তালুকদারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। মুহাম্মদ আজীমের কোনো সন্তানাদি ছিল না। এতীম সন্তান দুটিকে তিনি এবং তার স্ত্রী অতি আদর যত্ন সহকারেই লালন পালন করতেন।

বালক শরীয়তুল্লাহ্ বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর চাচা-চাচীর নিকট থেকে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে যান এবং সেখানকার তৎকালীন বুজর্গ আলেম মওলানা বশারত আলীর স্নেহযত্নে থেকে ইসলামী শিক্ষা লাভে মনোনিবেশ করেন। মওলানা বশারত আলী শরীয়তুল্লাহ্র লেখাপড়ার প্রতি গভীর মনোযোগ ও তার চরিত্র-বৈশিষ্ট লক্ষ্য করে নিজেই তার পড়াশোনার ব্যয় ভার বহন করতেন। শরীয়তুল্লাহ্ লেখাপড়ার ফাঁকে মাঝে মধ্যে কলকাতা থেকে চাচা মুফতী মুহাম্মদ আশিকের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে মুর্শিদাবাদ যেতেন। একবার মুফতী আশিক ও তার পত্নীর সাথে নৌকাযোগে ফরিদপুরস্থ নিজ বাড়ীতে যাবার সময়ই পূর্বোল্লেখিত নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে গঙ্গাবক্ষে মুফতী আশিক ও তাঁর পত্নীর সলীল সমাধি ঘটে।

এ দুর্ঘটনায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার পর বালক শরীয়তুল্লাহ্ মনের দুঃখে আর স্বদেশে না গিয়ে পুনরায় কলকাতা চলে যান এবং আপন উস্তাদের কাছে সকল দুঃখের কাহিনী খুলে বলেন। দয়ালু ওস্তাদ পুনরায় তাঁকে আশ্রয় দেন এবং ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করার নির্দেশ দেন।

কিছুদিন পর বালক শরীয়তুল্লাহ্ উস্তাদ মওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কা গমন করেন। উল্লেখ্য যে, মওলানা বশারত আলী নানা কারণে মক্কায় হিজরত করার মনস্থ করেছিলেন। মক্কায় ২০ বছর অবস্থান করেন এবং এ দীর্ঘ সময় বালক শরীয়তুল্লাহ্ বিভিন্ন আলেমের কাছে উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন সুদক্ষ আলেম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন

এবং সেখানেই দ্বীনী শিক্ষাদানের কাজে ব্রতী হন। তখন ছোট আবুহানীফা নামে মক্কায় মওলানা তাহের চোম্বল নামক এক প্রসিদ্ধ বুজর্গ থাকতেন। মওলানা শরীয়তুল্লাহ্ উক্ত মোর্শেদে কামেল মওলানা তাহের চোম্বলের নিকট বাইয়াত হন।

মওলানা শরীয়তুল্লাহ্ আপন মোর্শেদ তাহের চোম্বলের দরবারে আত্মশুদ্ধির অনুশীলনে উচ্চতর যোগ্যতা লাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাঁর চাচা মুহাম্মদ আজীম তালুকদার জীবন সায়াহ্নে উপনীত।

ইংরেজ শাসিত এদেশের মুসলমান সমাজের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে তাদের অবস্থা যেমন ছিল অবর্ণনীয় তেমনি ধর্মীয় দিক থেকেও মুসলমানরা ছিল নানা প্রকার বেদাত শির্ক ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মানুষের ধর্মবিমুখতা, চরিত্রহীনতা এবং ধর্মের প্রতি অনাগ্রহ ও বিভিন্ন কুসংস্কার লক্ষ্য করে মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করলেন। তিনি মানুষকে দ্বীনের পথে টানার জন্যে বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুসলমানদের অনাগ্রহ এবং নিজ ধর্ম ইসলামের ব্যাপারে তাদের ঔদাসিন্য হাজী শরীয়তুল্লাকে অধিক বিচলিত করে তোলে। তিনি পুনরায় পবিত্র মক্কা মদীনা সফরের মনস্থ করেন। এবার তিনি পদব্রজে যাত্রা শুরু করেন এবং প্রথমে বাগদাদে গিয়ে ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ত্যাগী বীর পুরুষদের পবিত্র স্মৃতিসমূহ জেয়ারত করেন। তিনি দ্বীনের জন্যে আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত কারবালা ময়দানে ইমামের শাহাদৎগাহ, তাঁর মাজার এবং হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ)-এর মাজার জিয়ারত করেন। বায়তুল মোকাদ্দাস ও মিসর ইত্যাদি স্থানসমূহ সফর করে সে সব স্থানের বরকত হাসিল করেন। আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের সাথে সাক্ষাত করেন বা যারা ইনতেকাল করেছেন, তাদের মাজার জিয়ারত করেন। এভাবে তিনি পায়ে হেটে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। হজ্জব্রত পালনের পর আপন মোর্শেদের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর থেকে দোয়া নিয়ে পবিত্র মদীনায় উপস্থিত হন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ দু'বছর মদিনায় অবস্থানকালে এবাদত রেয়াজত, মোশাহাদায় রত থাকেন। তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর রওজা পাকের

নিকট অধিক সময় কাটাতেন। কথিত আছে যে, একবার তিনি উপর্যুপরি তিনবার রসূল (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। রসূল (সাঃ) নাকি তাঁকে দেশে এসে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কা শরীফে এসে তাঁর মোর্শেদের নিকট স্বপ্নের বিবরণ খুলে বলেন। তাতে মোর্শেদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন ও স্বদেশে গিয়ে নির্ভীক-ভাবে ইসলামের প্রচার কাজে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেন।

পীর মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ স্বদেশে এসে ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করে দেন। ১২২৭ খৃঃ তাঁর ইসলামী দাওয়াতী কাজের বিরাট সাড়া পড়ে যায়। তিনি যাবতীয় কুসংস্কার বর্জিত নির্ভেজাল পন্থায় ইস-লামের মূল প্রাণসত্তাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর ইসলামী দাওয়াতের কাজ ফরায়েজী আন্দোলন রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলো। আসাম ও তৎকালীন সারা বাংলায় তাঁর এ আন্দোলন বিরাট সাড়া জাগালো। মুসলমান দলে দলে তাঁর ফরায়েজী আন্দোলনে যোগ দিয়ে শির্ক, বেদাত বর্জন করতে লাগলো। যেসকল বিষয় ইসলামের মূল প্রাণসত্তাকে দুর্বল করে রেখেছিল, সেসকল আবিলতা মুক্ত হওয়ায় বাংলা আসামে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম এক বিপ্লবী চেতনা লাভ করলো। এতে স্বভাবতঃই ইস-লামের প্রাধান্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের পথে পরাধীনতার যে মস্তবড় প্রাচীর দণ্ডায়-মান রয়েছে, তার প্রতি জনগণের দৃষ্টি পড়লো। মুসলিম জনগণ এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, ইংরেজ প্রভুত্ব এবং তাদের দোসরদের আধিপত্য ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি মস্তবড় চ্যালেঞ্জ। ফরায়েজী আন্দোলনের এটাই বড় সফলতা যে, এ আন্দোলন এদেশের ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানদের ইলামী চেতনাকে প্রজ্জ্বলিত করেছিল এবং আল্লাহ্ ছাড়া অপর যেকোনো শক্তিকে হেয় জ্ঞান করার শিক্ষা দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতি দাঁড়ালো এই যে, মুসলমানদের উপর ইংরেজ সরকার এবং তাদের বসংবদ হিন্দু জমিদার তালুকদাররা যেসব জুলুম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই জুলুম নিপী-ড়নের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ালো।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সমাজ সম্পর্কিত বিবরণী গ্রন্থে ডক্টর ওয়াইজ বলেছেন :

"আঠার বছর বয়সে তিনি (হাজী শরীয়তুল্লাহ্) মক্কায় হজ্জ করতে যান। স্বাভাবিকভাবে তাঁর ফিরে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু তিনি হজ্জের পরও পবিত্র নগরীর তৎকালীন ওহাবী শাসকদের শিষ্য হিসাবে সেখানেই থেকে যান। বিশ বছর কাল সেখানে অবস্থান করে আনুমানিক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন সুকৌশলী তার্কিক বক্তা ও আরবী ভাষায় পণ্ডিত হয়ে ভারতের (অবিভক্ত) দিকে আসেন।"

ডক্টর হেদায়েত হোসেন ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত "ফরায়েজী আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন :

"আঠারো বছর বয়সে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ মক্কায় হজ্জ করতে গমন করেন এবং হজ্জের পর স্বাভাবিকভাবে ফিরে না এসে সেখানকার শাফেয়ী মাযহাবের তৎকালীন প্রধান শেখ তাহের চোম্বল মক্কীরশিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেখানেই থেকে যান। বিশ বছর পর একজন সুবিজ্ঞ তার্কিক বক্তা হয়ে ও আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্ব অর্জন করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।" উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকেই তার বিদ্যাবত্তার উৎস সম্পর্কে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

শরীয়তুল্লাহ্-র ফরায়েজী আন্দোলন ও দারুল হরব

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরই তার সংস্কার আন্দোলনের কাজের সূচনা করেন। তিনি দিল্লীর শাহ্ আবদুল আজিজ কর্তৃক তার কিছুকাল পূর্বে ঘোষিত ফতোয়ারই প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন যে, বিদেশী ফিরিঙ্গী সরকারের শাসনাধীন থাকায় এদেশ "দারুল হরব" —তথা বিধর্মী শাসিত দেশ। এ কারণে বর্তমানে এখানে ইসলামী অনুশাসন সামগ্রিকভাবে পালিত হতে পারছে না। কাজেই জুমা ও ঈদের নামাজের জন্যে দারুল ইসলামের যেই পরিবেশ প্রয়োজন ইংরেজ শাসনাধীনে তা নেই বিধায় এখানে জুমা ও ঈদের নামাজ হতে পারে না।

তাঁর এই উক্তির মধ্য দিয়ে আসলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্বেষ, কটাক্ষ ও ঘৃণারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। যার নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায়, যতদিন পর্যন্ত ইংরেজরা দেশের শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী থাকবে, ততদিন এখানে সুষ্ঠুভাবে ইসলামী বিধানসমূহ পালন করা সম্ভব নয়, তাই দারুল

ইসলামের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সকল মুসলমানকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে থেকে তারই বিরুদ্ধে এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ তৎকালীন বৃটিশ ভারতে অতীব এক কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ইসলাম ও মুসলিম কল্যাণ সাধনে ব্রতী ছিলেন। তিনি যেকোনো বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে প্রস্তুত ছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ জাতিকে উদ্ধারকল্পে যে মূলমন্ত্র গ্রহণ করেন, তা সঠিক ছিল বিধায় তার আন্দোলন দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে জনগণের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, এর জন্যে দায়ী প্রধান শক্তি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা না বলে এবং তাদের এক নম্বর শত্রুরূপে চিহ্নিত না করে মুসলমানদের সঠিক পথনির্দেশ দান সম্ভব ছিল না। যারা ভারতকে দারুলহরব রূপে ঘোষণায় দ্বিধান্বিত ছিলেন, তাদের ঐ ভূমিকায় সন্তুষ্ট থাকা হলে মুসলমান জাতির অন্তরে স্বাধীনতার ভাব জাগ্রত করে তোলা কঠিন হতো বৈ কি। কারণ, এমনিতেই এক শ্রেণীর লোক যেকোনো সুযোগ-সুবিধা পেলে তার বিনিময়ে সত্যকে জলাঞ্জলী দিতে তৈরি থাকে। পরন্তু একে দারুল হরব ঘোষণা না করে নির্লিপ্ত বসে থাকলে মুসলমান জাতি পরাধীনতার অক্টোপাশে আবদ্ধ থেকে থেকে নিজেদের মধ্যকার শক্তি সাহস সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে যেতো। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র পথনির্দেশনায় হতোদ্যম মুসলমান সমাজ পথের দিশা পেলো। তারা হাজারে হাজারে এসে তাঁর ফরায়েজী আন্দোলনে যোগ দিতে থাকলো।

সমাজ সংস্কারে হাজী শরীয়তুল্লাহ্

প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সাথে দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলে এবং নিজেদের মধ্যে যথার্থ ধর্মীয় বোধ না থাকায় মুসলিম সমাজে অনেক হিন্দুয়ানী রীতিনীতি ও ধ্যান ধারণা অনুপ্রবেশ করেছিল, যা ছিল ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ খেলাফ। শির্ক, বেদাত, পীর-ফকীরের মাজারে সিজদা, মান্নৎ ও সিন্নি দেয়, মহরম মাসে তাজিয়া বের করা হিন্দুদের পুজা পার্বণের উৎসবে গানবাজনায় যোগদান প্রভৃতি কাজকে তিনি ইসলামের প্রাণসত্তা বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। তিনি সকল মুসলমানকে এসব কাজ থেকে

বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। তিনিই এদেশে সর্বপ্রথম শরীয়ত, তরীকতের পথপ্রদর্শক পীরদের মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা করলেন যে, তারা উস্তাদ বা শিক্ষকের চাইতে বেশী কিছু নন। অথচ এখানে এ ধারণা বিরাজমান ছিল যে, পীরেরা মুরীদানকে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবে। ফলে অনেক মুরীদ পাপাচারে লিপ্ত থাকতো এবং যথাযথভাবে আমল করতো না। কারণ তাদের ধারণা যে, আমলে আখলাকে কিছুটা কমতি থাকলেও পীর কেবলা সেটা সারিয়ে নেবেন। বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবাদিতে অযথা অপব্যয় করার তিনি বিরোধিতা করতেন। মুসলমান সমাজের আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কাউকে ভয় করবেনা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ফরজ কর্তব্য সম্পাদনেই তাদের অধিক মনযোগী হতে হবে। প্রথমে ফরজ কর্তব্যসমূহের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপের কারণে তাঁর সংস্কার আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আন্দোলন রাজ্যহারা, সম্পদহারা মুসলিম জাতির অন্তরে আশার সঞ্চার করে। ফরায়েজী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার মুসলমান যেন এহেন একটি সংগঠনেরই প্রতীক্ষায় ছিল যা তাদের নেতৃত্ব দেবে। এভাবে বঞ্চিত শোষিত মজলুম মুসলমান যারা দেশের নতুন শাসক ও তাদের মদদ-পুষ্ট নতুন গজানো জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, তারা ফরায়েজী আন্দোলন কেন্দ্রিক এক উল্লেখযোগ্য শক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র সংস্কার প্রচেষ্টা এক অভাবনীয় সাফল্যের সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ তাঁর মোহামেডানস অব ইষ্টার্ন বেঙ্গল গ্রন্থে লিখেন :

"হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদনীতির সাথে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ফলে মুসল-মানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিলো, তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসাবে তাঁর (হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌) আবির্ভাব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশী চমকপ্রদ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একজন অকপট ও সহানুভূতিসম্পন্ন

প্রচারকেরই প্রয়োজন ছিল আর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিকতর ক্ষমতা শরীয়তুল্লাহ্‌র চেয়ে অপর কারুর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।"

তাঁর উন্নত চরিত্র সম্পর্কে ভূয়সী প্রসংশা করে ডক্টর ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থের আরেক জায়গায় মন্তব্য করেন, "তার নির্দেশ ও আদর্শ চরিত্র দেশবাসীদের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দুর্যোগের দিনে সৎপরামর্শ ও ব্যথা-বেদনার সান্ত্বনা প্রদানকারী পিতার মতোই দেশের জনগণ তাঁকে ভালোবাসতো।

প্রতিকূলতা

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দু জমিদার মহাজনদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিল। মুসলিম চাষীকুলের উপর জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে তারা এ যাবত যেই অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে, শরীয়তুল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ধাক্কায় তা ধসে পড়তে পারে—এটাই ছিল তাদের উদ্বেগের কারণ। তারা সুপরিকল্পিতভাবে হাজী শরীয়-তুল্লাহ্ এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করেছিল। কালে খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে ২২শে এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত এক বেনামী চিঠির ভাষা দেখলেই বুঝা যাবে যে, হিন্দুরা তাঁর বিরুদ্ধে কিভাবে কুৎসায় অবতীর্ণ হয়েছিল। "ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃগত শিবার থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে শরিয়তুল্লা নামক এক জবন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২,০০০ জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারি করিয়া তদচতুর্দিকস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও করিয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকায় অন্তঃপতি মুলফতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে। আমি বোধ করি শরীয়তুল্লা জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর প্রবল হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেন।" এ অভিযোগ পত্র থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহ্, তাঁর আন্দোলন এবং অনুসারীদের ব্যাপারে হিন্দুজমিদারদের ষড়যন্ত্রের মাত্রা সহজেই আঁচ করা চলে। এ সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জাগরণ বিরোধী এ অভিযানে খৃষ্টান অনুসারীরা কিভাবে হিন্দুদের সাথে এক যোগে কাজ করেছে।

শুধু তাই নয় সংস্কারবিরোধীরা অনেক মিথ্যা মামলা মোকাদ্দমাও হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কোর্টে দায়ের করে-ছিল এবং নানাভাবে তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল। ১৮৩১ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এরূপ একটি মামলা উত্থাপন করা হয়। হাজী সাহেব তখন ঢাকার নয়াবাড়ী নামক স্থানে দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত। এ মামলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনো বাস্তব প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অহেতুক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁকে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করে মুক্তি প্রদান করেন। এসব বাধা এবং অন্যান্য অসুবিধাহেতু তিনি সাময়িকভাবে নয়াবাড়ীর কেন্দ্র পরিহার করে ফরিদপুরে স্বগ্রামে ফিরে যান এবং সেখান থেকেই আন্দোলনের কাজ চালান। এমনিভাবে সর্বপ্রথম ফরিদপুর এবং পরে ঢাকা, ত্রিপুরা (কুমিল্লা) বাকেরগঞ্জ, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে যে ফরায়েজী আন্দোলনের কাজ চলে, পরে তা আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী লাখো অনুসারীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ইনতেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহ্‌মদ দুদু মিয়া পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাধাকল্পে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব পদে সমাসীন হন।

———

পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিঞা

[জ: মৃ: ১৮৪১ খৃ: ১৬ই জানু:]

বাংলায় ঐতিহাসিক ফরায়েজী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ইনতেকালের (১৮৩৯/৪০ খৃ:) পর এ আন্দোলনের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র মওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া)। তাঁর বিচক্ষণতা অস্বাভাবিক বীরত্ব ও অপরিসীম সাহসের দরুনই ফরায়েজী আন্দোলন অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠে। তিনি কঠোর হস্তে মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ উৎখাতের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে তখন নীল চাষ করা হতো। নীল কুঠিতে দেশের বহু মুসলমান নিম্ন পর্যায়ের চাকরি করতো। ইংরেজ ও হিন্দু কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতো। পীর মুহসিনুদ্দীন আহমদ দুদু মিঞা তাদেরকে আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্ত করেন। ইংরেজদের দাসত্বনিগড় থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার জন্যে তিনি ফরায়েজী সম্প্রদায়কে যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে বিরাট বাহিনী গঠন করেন। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় ইংরেজের বিরুদ্ধে নির্ভীক কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন। এতে ইংরেজ সরকার বিব্রত হয়ে পড়ে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৪ বছর কারাগারে আবদ্ধ রাখে। পীর মুহসিনুদ্দীন দুদু মিয়াকে শুধু কারাগারেই নিক্ষেপ করা হয়নি, তাঁর তালুকদারীও ইংরেজরা কেড়ে নেয়। ঐসময় তাঁর ফরায়েজী আন্দোলন বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মওলানা পীর মুহসিনুদ্দীন আহমদ দুদুমিয়া ইংরেজ অধিকৃত দেশকে দারুল হরব ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণার ফলে মুসলিম সমাজে ইংরেজ বিরোধী উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। ইংরেজরা এটা দেখে অধিক বিরক্ত বোধ করে।

ভাড়াটিয়ে আলেমদল সৃষ্টি

ইংরেজ সরকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কয়েক জন আলেমকে বিরাট স্বার্থ দিয়ে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর কলকাতা মুহামডান লিটারেচার সোসাইটীতে ইংরেজ অধিকৃত ভারত বর্ষকে তাঁদের দ্বারা 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করায়। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সংগ্রাম করতে বজ্রকণ্ঠে নিষেধ করেন সেই ভাড়াটিয়ে আলেম-

দের ঘোষণার ফলে অসংখ্য মুসলমান ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকে। মুসলিম সমাজে দ্বিধাবিভক্তি ঘটে। ফরায়েজী জামায়াতের ভেতরও ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে মওলানা পীর মহসিনুদ্দীন দুদুমিঞা ইহধাম থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। মাত্র ৪২ বৎসর বছর বয়সে তাঁর ওফাত ঘটে। মওলানা মহসিনুউদ্দীন দুদুমিঞা ইনতেকালের সময় অল্প বয়সের তিনটি পুত্র সন্তান রেখে যান। (১) গেয়াসুদ্দীন হায়দার (২) আবদুল গাফ্‌ফার (৩) সাঈদ-উদ্দীন আহমদ। পীর দুদুমিয়ার এ তিন পুত্র সন্তান মোরব্বীশূন্য অবস্থায় অতি-কষ্টে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করে আপন পিতা ও পিতামহের ন্যায় ইসলামের খেদমত করেন। দেশে জাতি ধর্মের কল্যাণ ও উন্নতি করে কিছুকাল কাজ করার পরই প্রথমোক্ত দুই ছেলে এ জগত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁদের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাদের মেয়েদের বংশধারা রয়েছে।

মওলানা সাঈদ উদ্দীন আহমদ

মওলানা পীর মুহসিনউদ্দীন দুদুমিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র মওলানা সাঈদ উদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন সুযোগ্য আলেম, ন্যায়বিচারক, গভীর জ্ঞানী ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনের তৃতীয় নেতৃপদে আসীন থেকে পিতা ও পিতামহের অনুরূপ এ আন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি খেলাফে শরা 'পীর-ফকীরদের জন্যে ছিলেন আতংক। তাঁর শিষ্য শাগরেদ গণ ইংরেজ সরকারের কোর্টে বিচার প্রার্থী হওয়াকে ঘৃণা করতেন। তাঁর অনুসারীদের পারস্পরিক মত পার্থক্য তিনিই নিষ্পত্তি করে দিতেন। মওলানা সাঈদ উদ্দীন আহমদ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তেমন সুযোগ পাননি। সমাজ সংস্কারের কাজেই তাঁর সময় অধিক ব্যয়িত হয়েছে। তিনি উদরপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বিহার প্রদেশের মধুপুরে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র পুত্র পীর মওলানা মুহসেন উদ্দীন আহমদ দুদুমিঞার ইনতেকালের পর 'ফরায়েজী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তদীয় পুত্র মওলানা সাঈদ উদ্দীন আহমদ। অতঃপর মওলানা সাঈয়েদ উদ্দীনের ইনতেকাল ঘটলে তাঁরই সুযোগ্য সন্তান হযরত মওলানা পীর বাদশাহ্ মিঞা ফরায়েজী আন্দোলনের ৪র্থ গদিনসীন নেতা রূপে দায়িত্ব পালন করেন। আবদুল কুদ্দুস (দরবেশ মিঞা) ও রাজউদ্দীন আহমদ (নওয়াব মিঞা) নামক তার দুই ভ্রাতা ছিলেন।

— —

পীর বাদশাহ্ মিঞা

[জ: ১৮৮৪ খৃ: — মৃ: ১৯৫৯ খৃ: ১৫ই ডি:]

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র বংশের গৌরব আগা খালেদ রশিদ উদ্দীন আহমদ বাদশাহ মিঞা ১৮৮৪ খৃ: ২২শে মে বৃহস্পতিবার সাবেক ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমায় বাহাদুর পুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পীর বাদশাহ মিঞার মাতৃকুলও অতি সম্ভ্রান্ত। ঢাকা নগরীর জিন্দাবাহারের প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী গোলাম কুদছী (দাদন মিঞা)-এর স্নেহময়ী কন্যা ছিলেন পীর বাদশা মিঞার মাতা। তাঁর মাতামহ একজন ধর্মপ্রাণ জমিদার ছিলেন। তাঁর মাতামহ দরিদ্র জনগণকে মুক্ত হস্তে দান করতেন।

আজাদী আন্দোলনের অন্যতম বীরসেনানী, শরীয়তের নিশানবরদার ফরিদপুরের পীর বাদশাহ মিঞার দান মুসলিম বাংলার আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসেই কেবল নয়, এখানকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। জাতির এ মহান নেতার অপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা, আধ্যাত্মিক শক্তি-সাহসের ফলে এ দেশের মুসলিম সমাজ থেকে শির্ক, বেদায়াত ও যাবতীয় অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুপ্রথা দূরীভূত হয় এবং ইসলামের বৈপ্লবিক শক্তিবলে পরাধীনতার জিঞ্জিরমুক্ত হয়ে দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজদের হাত থেকে আজাদী হাসিলের স্পৃহা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়। এ মহান নেতার সংগ্রামী জীবনের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও তাঁর কর্মবহুল জীবনের কয়েকটিদিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পীর বাদশাহ্ মিঞার অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী পীর বাদশাহ মিঞা তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করে গেছেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনের বংশানুক্রমিকভাবে

তিনি উত্তরাধিকারী হওয়াতে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাংলার আনাচে-কানাচে ঝটিকা সফর করে তিনি তাঁর লাখ লাখ মুরীদ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে। ১৯২১ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে জড়িত হন এবং ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে। দীর্ঘ ২ বৎসর তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেন। এই নির্ভীক মোজাহিদ কারা-নির্যাতনে এতটুকু দমেননি। বরং ইংরেজ সরকারের কবল থেকে বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহাদেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য তিনি জনগণকে আজাদী আন্দোলনে উত্তেজিত করে তোলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দেশের নিঃস্বার্থ সেবা দেখে অবিভক্ত ভারতে হিন্দু মুসলিম সকলেই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। পীর বাদশাহ মিঞা ইচ্ছা করলে সহজেই প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য বা মন্ত্রী হতে পারতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতায় না গিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে বশ করার জন্য বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তিনি ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। ১৩২৮ বাংলায় মাদারীপুর মহকুমার প্রধান প্রশাসক কতিপয় ইংরেজ তাঁবেদার নিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। অন্য পীরদের মতো রাজনীতি বাদ দিয়ে শুধু ওয়াজ-নছীহত করতে পরামর্শ দিয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ জালেম সরকারকে বিতাড়িত করা এবং দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তাঁর একটি ধর্মীয় পবিত্র কর্তব্য। মহকুমা এস, ডি, ও, তাঁকে বশে না আনতে পেরে আর একটি বিরাট টোপ দেখায়: ইংরেজ সরকারের খাস মহল বিভাগ থেকে তাঁকে আট হাজার বিঘা লাখেরাজ ভূমি ও তাঁকে একজন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হবে। তাঁর বাহাদুরপুর বাসভবন প্রাঙ্গণে ফৌজদারী ও আদালতী বিচার কোর্ট এবং তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠতম তমগা দেয়ার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ত্যাগী সংগ্রামী নেতা পীর বাদশাহ মিঞা তখন ঘৃণাভরে এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাগতস্বরে বলেছিলেন, "ধন-সম্পদ ও পার্থিব সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশমন জালেম প্রভুদের সুযোগ নেওয়া কাপুরুষের কাজ। আমি কাপুরুষ নই।

কাপুরুষের বংশে জন্ম নেইনি। আমার পূর্বপুরুষগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের কারাগারে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আমি সেই জালেমশাহী খতম করতে জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার কিছুতেই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

চট্টগ্রামের মওলানা কাসেম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহানগরী কলকাতায় খেলাফত কমিটির অধিবেশন থেকে এসে পীর বাদশাহ্ মিঞা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগ্রামী হয়ে উঠেন। সে অধিবেশনে তিনি সি, আর, দাসের সঙ্গেও আজাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। দেশে প্রত্যাগমন করে তিনি বাংলার গ্রাম-গঞ্জ, শহর বন্দরে বিরাট বিরাট সভা করে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রথমে তিনি মাদারীপুরে ১৯২১ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট বিরাট সভা করেন। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর বরিশাল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। এতে খেলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা অবিভক্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা নির্ভীক সেনানী মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা আজাদ সোবহানী, কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী, শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পীর বাদশাহ্ মিঞা ঐ সালেই ৭ই সেপ্টেম্বর ১০৮ ধারা আইনে গ্রেফতার হন। তাঁকে গ্রেফতার করে নেয়ার সময় মাদারীপুর এস, ডি, ও'র বাসায় বসানো হয়। এখানেও রাজনৈতিক আন্দোলন হতে বিরত থাকার জন্য তাঁকে বুঝান হয় এবং একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ জানান হয়। তাঁকে এস ডি ও রাত্রে তাঁর বাসভবনে আহার করতে অনুরোধ জানালে তিনি জবাব দেন: আমি আপনার অতিথি নই। কাজেই আপনার খাদ্য খাব কেন? জেলখানার খাদ্যই আমার যথেষ্ট। পরদিন পুলিশ অফিসার তাঁকে জেল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নতি স্বীকার করতে বল্লে তিনি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। মাদারীপুর কারাগার থেকে তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে নেয়ার পথে জনতা রাস্তায় রাস্তায় ভিড় জমায় এবং ইংরেজ-বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। তিনি নির্ভীকভাবে অপেক্ষমান সারিবদ্ধ জনতাকে আন্দোলন জোরদার করার আদেশ দেন এবং ভগ্নোৎসাহ হতে নিষেধ করেন। তিনি মওলানা মুহম্মদ আলীর অমরবাণী —

'কতলে হোসাইন আছল মে মুরগে ইয়াযীদ হ্যায়, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বাদ' – এই বলে অনুপ্রাণিত করেন। অবশেষে তাঁকে আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়া হয়। তার অল্পদিন পরে অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত সংগ্রামী দেশপ্রেমিক আলেম মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, সি, আর, দাস, জে, এম, সেন চৌধুরী, নোয়াখালীর আবদুর রশীদ খান, মৌঃ শামসুদ্দীন আহমদ, মওলানা আজাদ, করটিয়ার জমিদার চান্দ মিঞা প্রমুখ হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী করে আনা হয়। এতে নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যত কর্মসূচীর উপযুক্ত পরামর্শ কেন্দ্র মিলে।

পীর বাদশাহ মিঞাকে এত নির্যাতন ও লোভ-প্রলোভ দিয়েও তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত না করতে পারার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তিনি মনে করতেন—রাজনীতির সঙ্গে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বরং এটা ইসলামের একটি শক্তিশালী অঙ্গ। ঈমান-আকীদা, এবাদাত, রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির সমষ্টির নাম ইসলামী রাজনীতি।

পীর বাদশাহ মিয়া তাঁর সমসাময়িক প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে শেরেবাংলার কৃষক প্রজাপার্টিরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক পাকিস্তানের প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হবার পর একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি জমিয়তে ওলামা-এ ইসলাম (ও নেযামে ইসলাম পার্টির) নেতৃত্বে থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগ ইসলামের ব্যাপারে ওয়াদা খেলাফী করলে তিনি লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের সপক্ষে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে অন্যতম অঙ্গদল নেযামে ইসলামের পক্ষ হয়ে মুসলিম লীগকে তার ওয়াদা খেলাফীর পরিণতি দেখিয়ে দেন। কেননা, ঐ নির্বাচনেই মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটেছিল। যা হোক, অতঃপর এই মহান সংগ্রামী নেতা ইসলামী রাষ্ট্রের আকুল আগ্রহ বুকে নিয়ে ১৯৫৯ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর মাসে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট

পীর আবা খালেদ রশীদুদ্দীন আহমদ বাদশাহ মিঞা শৈশব হতেই শান্ত সংযত ও মিষ্টভাষী ছিলেন। পিতামাতার তত্ত্বাবধান তাঁকে দুষ্ট স্বভাবের ছেলেদের সংসর্গ থেকে দূরে রাখে। তিনি শৈশবেই চারিত্রিক প্রশিক্ষণ পান। বাল্যকালেই তিনি টুপী, লুঙ্গী, লম্বা জামা ও পায়জামা পরিধান পসন্দ করতেন। তাঁর সুন্দর চেহারা, মধুর ব্যবহার জীবন শুরুর প্রথম দিন-গুলোতেই তাঁকে জনচিত্তে বসিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন সকলের স্নেহের পাত্র। বাদশাহ্ মিঞা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন আপন বাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত কোরআনিয়া মাদ্রাসায়। ঢাকা নগরীর কারী পীর মুহাম্মদ সাহেব ঐ মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। বাদশাহ্ মিঞা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। বালক বাদশা মিঞার পিতা জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তিকে দিয়ে ছেলেকে ইংরেজী বা বাংলা বাড়ীতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারতেন। মাদ্রাসা লাইনে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। ছেলের সুষ্ঠু পড়াশোনার লক্ষ্যে তাঁর পিতা ঢাকার বাজার দেউরি মহল্লার একটি বাসা ভাড়া করে মাদ্রাসার একজন শিক্ষককে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দেন।

১৮৯৮ খৃঃ বালক বাদশাহ্ মিঞা ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় জামায়াতে হাশতমে ভর্তি হন। তিনি বলতেন, কোনো পড়া শিখতে আমার ৩/৪ বারের বেশী পড়তে হয় না। মাদ্রাসার প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে পাশ করতেন। পীর বাদশাহ মিঞা ছাত্র জীবনে কখনো অযথা সময় নষ্ট করতেন না। এমনকি মাদ্রাসা ছুটির পর জিন্দাবাহারস্থ নিজ মামার বাড়ীতেও যেতেন না। অযথা গল্প গুজবে সময় নষ্ট করা তিনি পসন্দ করতেন না। বরং তিনি বাবার ধর্মীয় মাদ্রাসার মহফিলগুলোতে উপস্থিত থাকতেন মাদ্রাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। পাঠ্য জীবনে ঢাকায় অধ্যয়ন কালে তিনি মাহুতটুলী মহল্লায় তাঁর দাদা মওলানা মুহসিনুদ্দীন আহমদ (দুদু মিঞা) সাহেবের কবর জেয়ারত করতেন। পীর বাদশাহ মিঞা ছাত্রাবস্থায় উস্তাদদের অতি ভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, মাতাপিতা ও উস্তাদদের দোয়াই মানব জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি-অগ্রগতির চাবিকাঠি। পীর বাদশাহ মিঞা সদাস

একটি বুযর্গ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছাত্র জীবনে উস্তাদদের সাথে বিনয় আচরণ করতেন। কখনও গোস্তাখী, অহঙ্কার বা অভিমান মূলক কোনো আচরণ করতেন না। উস্তাদদের অযু-গোসলের পানি তিনি নিজ হাতে তুলে দিতেন। এ ভাবে উস্তাদদের খেদমত করাকে তিনি নেককাজ মনে করতেন। তিনি উস্তাদদের কাপড় ধৌত করে দিতেন। তাঁকে যেসব উস্তাদ বাসায় থেকে পড়াতেন, তিনি তাঁদের আহার না করিয়ে নিজে খেতেন না। উস্তাদের নির্দেশ মোতাবেক তিনি কাজ করতেন। কর্ম জীবনে পীর বাদশাহ মিঞা লাখ লাখ মানুষের পীর হয়েও উস্তাদগণের কথা স্মরণ করতেন। তিনি প্রত্যেক মুনাজাতে নিজ উস্তাদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করতেন। পীর বাদশাহ মিঞা ছাত্র জীবনেই তাঁর পিতা দাফেউল বেদাআত, ওলিয়ে কামেল হযরত মওলানা সাঈদুদ্দীন আহমদ সাহেবের কাছে মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ও মাদ্রাসার পড়ার কাজ সমভাবে চালিয়েছেন। ছাত্র জীবনেই তিনি যিকির-আযকার, ওযীফা পাঠ করতেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি তাহাজ্জুদ পড়তেন। স্বল্প বয়সেই ধর্মানুরাগী হওয়াতে মহান আল্লাহ তাকে তাঁর খাস বান্দায় পরিণত করেছিলেন। তাঁর জাহেরী ও আত্মিক পরিশুদ্ধির এ জ্ঞানস্পৃহাই তাঁকে আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ ওলীর মর্যাদায় সমাসীন করেন। তাঁর জমাতে উলার বৎসরই (১২১৩ বাং) পিতা পীর হযরত মওলানা সাঈদুদ্দীন আহমদের ইন্তেকাল হলে তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে বাধ্য হন।

মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার চিন্তা

বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা দীর্ঘ দিনের শাসান ক্ষমতা হারিয়ে সর্বহারা জাতিতে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল দিক থেকেই তারা হয় বঞ্চনার শিকার। সেই দুঃখ ও ক্ষোভ তারা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছেনা। তাই ইংরেজদের তারা ঘৃণার চোখেই দেখত। ইংরেজরাও বুঝতো মুসলমানরা সুযোগ পেলেই পুনঃরায় তাদের হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে। তাই রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে মুসলমানদের দূরে রাখাই তাদের অনুসৃত নীতি হয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংরেজের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রেখে ক্রমে উন্নতি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ইংরেজরা মুসলিম

ধর্ম ও এর আবেদনকে খর্ব করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে। যেসব মাদ্রাসা, মকতব, মসজিদ সরকারী ব্যয়ে চলতো, তারা সেগুলো বন্ধ করে দেয়। অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি একটি আইন বলে বেদখল হয়ে যায়। এভাবে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিলীন এবং তাদেরকে ইংরেজ ও তাদের দোসরদের চির গোলাম করে রাখার পাঁয়তারা চলে। ঠিক ঐ দুঃসময় মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায় নিয়ে এ জাতির সচেতন দরদী ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন। স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের নতুন যাত্রার পথ রচনা করে।

১৯০৬ খৃঃ ২৬শে ডিসেম্বর বুধবার তৎকালীন ভারতের সুবিখ্যাত নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর, বগুড়ার নবাব নওয়াব আলী বাহাদুর প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে আজকের রাজধানী ঢাকার শাহবাগে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। পীর বাদশাহ মিঞা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হিসাবে এ কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কর্ম তৎপরতার দ্বারা জাতিকে সামনে চলার পথনির্দেশনা দানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। জানা যায়, ঐ কনফারেন্সে আগত মেহমানদের স্থান সংকুলান না হওয়াতে অনেকে অসুবিধা ভোগ করছিলেন এবং কেউ সঙ্কোচ বশতঃ একথা অভ্যর্থনা কমিটির কাছে বলতে পারছিলেন না। পীর সাহেব বিষয়টি স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের গোচরিভূত করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে পীর সাহেবকে ধন্যবাদ জানান। নবাব বাহাদুর তখন তাঁকে বললেন, আপনি প্রশংসার যোগ্য কাজ করেছেন। অন্যেরাও পীর সাহেবের সাহসিকতা, কর্ম-তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে তাঁর প্রশংসা করেন। ঐ কনফারেন্সে ভারতীয় মুসলমানদের সকল প্রকার সুব্যবস্থা, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিশেষ করে একমাত্র মুসলিম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড়ের উন্নতি বিধানের জন্য দাবী করা হয়।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও পীর সাহেব

কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দকে যখন দেখা গেল, তাঁরা কৌশলে ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন মুসলিম

নেতারা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, মুসলমানদের ন্যায্য দাবী ও স্বার্থ আদায় করতে হলে তাদের জন্যে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্টান গঠন করা আবশ্যক। তাই নবাব সলিমুল্লাহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা কনফারেন্স করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। নবাব সলিমুল্লাহ তখন চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জাতির কল্যাণকামী ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্যে পীর বাদশাহ্ মিঞার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। মোটকথা, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় পীর বাদশাহ্ মিঞা বিরাট অবদান রাখেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার এক বছর পর ঢাকা জেলার রেকাবী বাজার বন্দরে ১৯০৭ খৃঃ পীর সাহেবের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে এক বিরাট কনফারেন্স হয়। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন ঐ কনফারেন্সের সভাপতি। সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪৭ খৃঃ ১৪ই আগষ্ট স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ নেতারা দেশ পরিচালনা করেন। কিন্তু প্রথম দিকের স্বার্থত্যাগী বড় বড় নেতৃবৃন্দের ইনতেকাল হওয়ায় পরে স্বার্থান্বেষী ও অনেকটা ধর্ম-উদাসীন ব্যক্তিরা এ প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ে। তারা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের লক্ষ্য ভুলে যাওয়ায় পীর সাহেব মুসলিম লীগ থেকে ক্রমে বের হয়ে আসেন এবং জমিয়তে ওলামা এ-ইসলামের নেতা হিসাবে বিশ্বাসভঙ্গকারী লীগ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

দাম্পত্য জীবন

ঢাকা নগরীর ইসলামপুরের প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী আলহাজ্জ তমিযুদ্দীন পীর সাহেবের বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রস্তাবে ঢাকার নবাব কুঠির সুপ্রসিদ্ধ মৌলভী খাজা বাচ্চুল বখশ-এর ৩য় কন্যা মোসাম্মাত ছালেহা বেগমের সাথে পীর বাদশাহ মিঞার সুপরিণয় সম্পন্ন হয়। নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা কনফারেন্সে পীর সাহেবের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ধর্মনিষ্ঠা, অপরিসীম সাহস ও কর্মদক্ষতা স্বচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। তিনি খাজা বাচ্চুল বখশকে পীর সাহেবের কাছে কন্যা বিবাহ দিতে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯০৭ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ৪৫

মিনিটের সময় ঢাকার আহসান মনযিলে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের ওকালতিতে বিবাহ পড়ানো হয়। নবাব সাহেব পীর সাহেবকে জামাতা হিসাবে বিশেষ স্নেহ ও আদর আপ্যায়ন করতেন। পীর বাদশাহ মিঞা তাঁর জীবনে অপর কোনো বিবাহ করেন নি।

পীর বাদশাহ মিঞাকে মানুষ এতই বুযর্গ জ্ঞান করত যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে তাঁর কাছে এসে তারা পানি পড়া ও তাবিজ নিত। তিনি এসবের বিনিময়ে কোনো অর্থ নিতেন না। তাঁর পানি পড়া ও তাবিজের দ্বারা মানুষের রোগমুক্তি ঘটতো বলে মানুষ এজন্যে তাঁর দরবারে এসে ভিড় করতো।

একদিকে ধর্মগুরু এবং অপর দিকে দেশের অন্যতম সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সেবক হিসাবে পীর বাদশাহ মিঞা খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে দেশবাসীকে ইংরেজের শাসন মুক্ত করার জন্যে তিনি যে কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন, তাঁর এ নিঃস্বার্থ সেবায় ভারতের হিন্দু, মুসলিম সকলে তাঁকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতো। তিনি ক্ষমতা লাভের রাজনীতি করতেন না। বহু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে নিজের দুর্বলতার প্রমাণ দেন নি।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কলকাতা মহানগরীতে খেলাফত কমিটির কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছুলে মাদারীপুর মহকুমার স্বেচ্ছা-সেবকের উদ্যোগে বিপুল জনতা তাঁকে শোভাযাত্রা সহকারে গগণবিদারী শ্লোগান দিয়ে খেলাফত অফিসে নিয়ে যায়। পরদিন তিনি ভারতের অন্যতম নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে কনফারেন্সের বিষয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন। পীর সাহেব এ কনফারেন্সে যোগদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সিপাহ্সালার রূপে ভূমিকা পালন করেন। তিনি দেশময় স্বাধীনতার সপক্ষে বড় বড় কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইংরেজ কারাগারে পীর বাদশাহ মিঞা

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর পীর বাদশাহ্ মিঞা বরিশাল সভা করে নাগের পাড়ার এক মুরীদের বাড়ী গিয়েছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে

নৌকায় এসে জোহরের নামাজ পড়ার মনস্থ করেন। হঠাৎ মাদারীপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের লঞ্চ এসে তাঁর নৌকার সাথে লাগলো। ইংরেজ শাসনতন্ত্রের ১০৮ ধারা অনুযায়ী তাঁকে রাজবিদ্রোহী আসামী হিসাবে তাঁর হাতে গ্রেফতারী পরোয়ানা দিলেন। পীর সাহেব সহাস্য বদনে তা পাঠ করে পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'নামাজ আদায় করে আহার সেরে যাবো।' তাঁর গ্রেফতারীতে সকলে দুঃখিত হলেও এই ইমানদীপ্ত মোজাহিদ ছিলেন নির্বিকার ও ব্যাকুলতা মুক্ত। উপস্থিত ভক্তদের বল্লেন, 'তোমরা নিঃশ্চিন্ত থেকো —ধৈর্য ধারণ করো।' বেলা ৫টায় পুলিশ বাহিনী পীর সাহেবকে নিয়ে থানায় পৌঁছুলে খেলাফত ও কংগ্রেস কমিটির হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কর্মী ও জনতা সম্মিলিত ভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। কোনো অবস্থাতেই উত্তেজিত জনতাকে থামানো সম্ভব না হওয়ায় পীর সাহেব দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত হতে বললেন। পরে রাতের ১টায় জাহাজে করে এ মহান ব্যক্তিকে ফরিদপুর নেয়ার পথে পুলিশ অফিসার তাঁকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নতি স্বীকারের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জাহাজ ফরিদপুর পৌঁছুলে পুলিশক্যাম্প হতে একদল পুলিশ এসে তাঁকে কারাগারে নিয়ে যায়। রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ জনতাকে আন্দোলন জোরদার করার জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালাকে বাদ" বহু চেষ্টা করেও ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে পীর সাহেবকে বারণ করতে অপারাগ হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। বাংলার কৃতি সন্তান, লাখো জনতার পথের দিশারী, দেশ ও জাতি-ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক পীর বাদশাহ মিঞা ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে হাতকড়া ও কারা-জীবনকে এজন্যেই বরণ করে নিয়ে ছিলেন, যাতে ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ সাধিত হয়। আজ সে ধরনের স্পষ্টভাষী আল্লাহ্‌র দ্বীনের মোজাহিদ অতি বিরল। একারণেই সেসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তির ত্যাগের শক্তির সামনে বিদেশী পরাক্রমশালী শক্তি যেখানে দাঁড়াতে পারেনি, সেক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায় ও সত্যের পথে আজকাল দেশীয় খেকশিয়ালও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। পীর বাদশাহ মিঞার কারাবাস এবং তাঁকে বশে আনার জন্যে এর পূর্বেকার সকল প্রকার লোভ-লালসা ও হুমকির সামনে তাঁর মাথা নত না করা একথারই প্রমাণ

যে, তাঁর রাজনীতি ও আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। কোনো মন্ত্রীত্ব বা সম্পদ-সম্পত্তির লোভ ও পার্থিব জগতের কোনো মর্যাদার প্রত্যাশা তাঁর সংগ্রাম-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। বার বার পর কারাগারের নির্যাতন হতে অব্যাহতি পাবার জন্যেও তিনি কোনো তদবীর করেন নি। ইসলামের এসব ত্যাগী বীরপুরুষ অত্যাচারী জালিমশাহীর বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্য কথা বলার এবং তাদের জুলুম অত্যাচার ও কারা-যন্ত্রণা ভোগের এমনকি জীবন উৎসর্গ করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, এসব দৃষ্টান্ত আজকের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের জন্যে বিরাট অনুপ্রেরণা যোগাবে তাতে সন্দেহ নেই।

কারামুক্তি

অন্যায়, অসত্য ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন, ইসলাম, মুসলমান এবং দেশবাসীর নিঃস্বার্থ সেবা যাদের জীবনাদর্শ, কারানির্যাতন বা অপর কোনো নির্যাতনই তাদের মনোবলকে দমাতে পারে না। তেমনি যে জন্যে তাঁদের প্রতি এ নির্যাতন, হুমকি সে ব্যাপারেও কোনো তাঁদের আগ্রহ নষ্ট করতে পারে না। পীর বাদশাহ মিঞার জীবনে এ দৃষ্টান্ত পুরো পুরি লক্ষ্য করা গেছে। কারাবাস যেন তাঁর ত্যাগী মনোভাবকে আরও অধিক তেজদীপ্ত করে তুলেছে। একারণেই দেখা যায়, ১৫ই আগষ্ট ১৯২২ খৃ: মঙ্গলবার দিবাগত রাত নটা ৪০ মিনিটের সময় তিনি যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান, তখন তিনি নিজ পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করার স্বাভাবিক ব্যাকুলতার বদলে সোজা কলকাতা খেলাফত অফিসে চলে যান। মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, তাঁর ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং খেলাফত কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়। সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনার। তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে স্বগৃহে রওনা না হয়ে সেখানেই রাত্রি যাপন করেন এবং কারা-জীবনের অবস্থা বর্ণনা করেন। পরদিন দেশপ্রেমিক হিন্দু-মুসলিম জনতা এসে তাঁর সাথে খেলাফত অফিসে সাক্ষাত করেন। কারামুক্তির পর তিনি বাড়ী যেতে পারলেন না। নেতৃবৃন্দ এবং খেলাফত কর্মীগণের অনুরোধে কয়েকদিন কলকাতায় অবস্থান করেন। তিনি তাঁর আম্মা ও দেশবাসীকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে

নিজের মুক্তির খবর জানিয়ে দেন। খেলাফত কমিটির উদ্যোগে ৫ই আগষ্ট ১৯২২ খৃঃ শুক্রবার পীর বাদশাহ মিঞার মুক্তি উৎসব পালিত হয়। কলকাতার প্রসিদ্ধ হলিডে পার্কে এ মুক্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় বাবু শতীশ চন্দ্র রায়, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও পি সি রায় প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর অদম্য সাহসের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা তাঁকে দেশের মুক্তি সংগ্রামের বীরসেনানী বলে আখ্যায়িত করেন। মুক্তি-উৎসবের দিন কলকাতা শহরের বিপুল জনতার এক বিরাট শোভাযাত্রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে শহরের বড় বড় সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে ঐতিহাসিক নাখোদা মসজিদ চত্বরে এসে সমবেত হয়। পীর সাহেবকে নিয়ে মিছিল হলিডে পার্কে পৌছার সময় রাস্তার দুপাশে জনতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং দালানের ছাদের উপর থেকে অগণিত লোক তাঁর প্রতি স্বাগত বাণী উচ্চারণ করে। তিনি মুক্তি-উৎসবের এ বিশাল জনসভায় ভাষণ দান কালে সমবেত জনতাকে ইংরেজ রাজত্ব খতম করার উদাত্ত আহবান জানান। শ্রোতারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে পূর্বাপেক্ষা আন্দোলনকে অধিক জোরদার করার জন্যে নিজের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। কলকাতা থেকে তিনি ফরিদপুরের নিজ বাড়ী পৌছার উদ্দেশে শিয়ালদহ রেলষ্টেশন এবং কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে পৌছুলে সংগ্রামী নেতাকে এক নজর দেখার জন্যে বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। তিনি সেসব জনসভায় সংগ্রামী বক্তৃতা প্রদান করেন। রাস্তায় যেখানেই গাড়ী থেমেছে অগণিত সংগ্রামী জনতা তাঁর প্রতি জানিয়েছে হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা এবং তিনিও তাদের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেছেন। এভাবে ফরিদপুর ও বাড়ী পর্যন্ত পৌছা পর্যন্ত তাঁকে অনেক জায়গায় সম্বর্ধনা-সমাবেশে ভাষণ দিতে হয়। কারামুক্তির পর পীর বাদশাহ মিঞা সারা বাংলার জেলায় জেলায় সভাসমিতি করে খেলাফত ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে আরও জোরদার করেন।

১৯২৪ খৃঃ ১৩ই মে শুক্রবার তিনি হজ্জের উদ্দেশে বাড়ী হতে রওনা দেন। তাঁর সাথে ১২শ' হজ্জযাত্রী ছিল। পীর সাহেব বোম্বাই মোসাফির খানায় অবস্থানকালে তথায় তাঁর সাথে মহাত্মাগান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা

আজাদ সোবহানী এবং আরও বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি সাক্ষাত করেন। বোম্বাই কেন্দ্রীয় খেলাফত অফিসে গিয়ে তিনি মুসলিম জননেতা মওলানা শওকত আলীর সাথে খেলাফত আন্দোলন সম্পর্কে জরুরী কথাবার্তা বলেন। জাহাজে থাকাবস্থায় হজ্জযাত্রীদেরকে তিনি ও তাঁর লোকজন প্রয়োজনীয় দ্বীনী মসলা মাসায়েল এবং হজ্জের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেন। জাহাজ জিদ্দা বন্দরে ভিড়ার সাথে সাথে সৌদী আরবের উচ্চ সরকারী কর্মচারীরা পীর সাহেবকে সৌদী বাদশাহ্‌র জিদ্দাস্থ কায়েমোকাম অফিসে নিয়ে যান। অতঃপর বাদশাহ্‌র দূত টেলিফোনে পীর সাহেবের আগমনবার্তা জানালে বাদশাহ্ তাঁকে ফোনে 'আহ্‌লান সাহ্‌লান' বলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বাদশাহ জানালেন —আপনি বুজর্গ খান্দানের এক অসাধারণ মোজাহিদ ওলী এবং রাজনৈতিক নেতা। আপনার ইস্তেকবালের উদ্দেশ্যে আমার মটর গাড়ী সহ কর্মচারী পাঠাচ্ছি। আপনি সে গাড়ীতে সরাসরি আমার বাসভবনে তশরীফ আনুন। বাদশাহর সাথেই তাঁর পানাহার হয়। বাদশাহ পীর সাহেবকে শাহী মহল থেকে গিয়ে হজ্জ পালন করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি নিজ কাফেলার লোকদের অন্যত্র রেখে শাহী মহলে থাকা পসন্দ করলেন না। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করেন। বাদশাহ্‌র আমন্ত্রণে তিনি মক্কার দুর্গে সৈনাদের প্যারেট দেখেন। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাদশাহকে এদেশের মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা, তাহজিব, তামাদ্দুন সম্পর্কে অবহিত করেন। আরবের তৎকালীন অবস্থা জানতে চাইলে বাদশাহ জানান, আরবদেশ মাঝখানে তুর্কীদের অধীনে থাকার ফলে আরববাসী তুর্কীদের অনেক রীতিনিয়ম অনুসরণ করছে, সেগুলো ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। ঐগুলো শীঘ্রই দূর করার চেষ্টা করবো। ১৯২৪ খৃঃ ১১ই জুলাই শুক্রবার হজ্জ পালন করে পীর সাহেব অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন, যারা ঐ সময় মক্কায় ছিলেন। জিদ্দার মাদ্রাসার পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছিলেন পৃথিবীর বহুদেশের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি। হজ্জ শেষে দেশে ফেরার সময় বিদায় সাক্ষাতের পর সৌদী বাদশাহ্ পীর সাহেবকে তাঁর গাড়ীতে করে জিদ্দায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন।

বাহাদুরপুর শরীয়তীয়া আলিয়া মাদ্রাসা পীর বাদশাহ মিঞার একটি অমর কীর্তি। ১৩৩৭ সালের ১লা ভাদ্র তাঁর বাসভবনে ফরায়েজী আন্দোলনের

মেম্বার নামানুসারে উচ্চ কওমী মাদ্রাসা হিসাবেই এটি স্থাপিত হয়। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে এবং পরিচালকদের অযত্নে এটি অবনতির দিকে চলে যেতে দেখে ১৯৪৫ খৃঃ বাহাদুরপুর ফরায়েজী আস্তানা প্রাঙ্গনে মাদ্রাসাটির কাজ পুনঃরারম্ভ করা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসা হতে প্রতি বছর বহু আলেম বের হয়ে দেশবিদেশে ইসলামের খেদমত করছেন।

কৃষক প্রজাপার্টি

১৯৩৬ খৃঃ শেরে বাংলা মৌলভী আবুল কাসেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজাপার্টি গঠিত হলে পীর সাহেবকে তার পৃষ্ঠপোষক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কৃষক প্রজাপার্টি যুক্ত বাংলার একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বাংলার নির্যাতিত কৃষককুল দলে দলে এ পার্টিতে যোগ দেয়। অতঃপর শেরে বাংলার নেতৃত্বে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয় এবং মজলুম কৃষকজন তালুকদার ও জমিদারদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পায়। এ ব্যাপারে কৃষক প্রজাপার্টির ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে

পীর সাহেব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে গুরুতর অন্যায় কাজ বলে মনে করতেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে কঠোর পরিশ্রম করতেন। পীর বাদশাহ্ মিঞা তৎকালীন সময় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির বিরুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সাধ্যানুযায়ী মজলুম জনগণের সাহায্যার্থে তাঁর হস্ত সর্বদা খোলা থাকতো। দুঃস্থ মানবতার সেবা ও তাদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। ভারতের ইংরেজ শাসনের শেষভাগে কলকাতা, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল, তা ছিল দুঃখজনক ও প্রতিশোধমূলক। ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে বিহারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা অন্যান্য সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। তথায় প্রথম তিন দিনের দাঙ্গায় ২৫-৩০ হাজার মুসলমান শিশু ও নর-নারীর প্রাণহানি ঘটে। এমন বহু গ্রাম আছে যেস্থানে একটি মুসলমানও আজ আর জীবিত নেই।" এটি এক ঐতিহাসিক হত্যা যজ্ঞ। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম),

বিহারে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হাজার হাজার মুসলমানকে হিন্দু ও শিখদের অমানুষিক আক্রমণের শিকার হতে হয়। বিপুল মুসলমান নর-নারী তাদের নিজস্ব আবাস সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়। আবার বহু মুসলমান তাদের প্রাণরক্ষার্থে জন্মভূমি হতে হিজরত করে এদেশ ও অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। মরহুম পীর সাহেব সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই পৈশাচিক হামলার তীব্র নিন্দা করে দুর্গত মুসলমানদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিভিন্ন জেলায় বহু সভা-সমিতি করে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেন ও মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে প্রেরণ করেন।

শান্তি স্থাপনের প্রয়াস

উভয় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর তদানীন্তন সমগ্র ভারতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দেশের হিন্দু-মুসলমান নিরীহ জনসাধারণ আতঙ্ক ও ত্রাসের মধ্য দিয়া চলতে থাকে। ইংরেজ সরকার দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সমন্বয়ে প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে শান্তি কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দেয়। কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংঘর্ষ যাতেনা হতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই ছিল শান্তি কমিটির কাজ।

পীর সাহেব মাদারীপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান আইনজীবি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে ফরিদপুর জিলার পালং নড়িয়া, বুড়িরহাট, টেকের হাট, শিবচর বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিরাট সভা করে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। পীর দুদু মিঞা ধর্মীয় সভায় তাঁর ভাষণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গোলযোগ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন, "সাম্প্রদায়িক বিবাদ করা হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান সকল জাতির ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী। একের হত্যার অপরাধে অপর জনকে হত্যা করা মহা পাপ।" ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে পীর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত রেকাবী বাজার হতে রামেরগাঁও নামক স্থানের সভায় যাওয়ার সময় ফেরেঙ্গী বাজারের জনৈক হিন্দু যুবক তাঁকে অনেক তিরস্কার করে। উত্তেজিত অবস্থায় মুসলমানরা আল্লাহু-আকবার

ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে ফেরেজী বাজারের দিকে অগ্রসর হলে পীরসাহেব হিন্দু-মুসলমান সকলকে শান্ত করেন। রেকাবী বাজার সংলগ্ন মাঠে এসে তিনি বক্তৃতা দান করেন এবং হিন্দু যুবকের তিরস্কারের প্রতিশোধ নেয়ার ক্রোধ সংবরণ করতে সকল মুসলমানকে নির্দেশ দেন। ফেরেজী বাজারের হিন্দুগণ সমবেত মুসলমানদের কাছে যুবকের তিরস্কারের অপরাধ ক্ষমা চাইলে পীর সাহেব সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দিতে আদেশ দেন। পীর সাহেবের আদেশ অনুযায়ী মুসলমানরা যুবকটিকে ক্ষমা করে দেয়। হিন্দুগণ তাঁর উদারতা দেখে মুগ্ধ হয়। এর পর থেকে ফেরেজী বাজারের হিন্দু সম্প্রদায় তাঁকে মহান ক্ষমাশীল মহাপুরুষ হিসাবে মান্য করতো এবং তাঁকে অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। পীর বাদশাহ মিঞা আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাতে না হয় এ ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

কায়েদে-এ-আজমের সাথে সাক্ষাতকার

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ রোববার পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নগরীর রমনা পার্কে প্রায় তিন লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন সাহেব এবং সভার অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যবৃন্দ পাক-বাংলার প্রধান ধর্মীয় নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ পীর বাদশাহ্ মিঞাকে সভা মঞ্চে কায়েদে আজমের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন দানের সুব্যবস্থা করেন। ২৩শে মার্চ গভর্ণর হাউজে টি পার্টির সভায় পীর সাহেব আমন্ত্রিত হয়ে তথায় যোগদান করেন এবং কায়দে আজমের সাথে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। ২৮শে মার্চ পূর্বপাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারীর বাস ভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কায়েদে আজমের আমন্ত্রণে পীর সাহেব তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তথায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং জাতির পিতাকে মুসলমানদের জীবন বিধানগ্রন্থ পবিত্র কুরআন উপহার দেন। কায়েদে আজম পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা করেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে কায়েদে আজমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তদোত্তরে তিনি

বলেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা:) রেখে গেছেন। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করা হবে। কুরআন-সুন্নাহ্‌ই বিশ্ব-মুসলিমের রক্ষাকবচ। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহ্‌ই আমাদের দেশের শাসন তন্ত্রের জন্য যথেষ্ট।

এর পর পীর সাহেব পাকিস্তান হতে বেশ্যাবৃত্তি, মদ, সুদ ও ঘুষ প্রভৃতি জঘন্য হারাম কার্য উৎখাত করতে কায়েদে আজমের নিকট জোর আবেদন জানান। কায়েদে আজম পীর সাহেবের নিকট ঐ সকল ইসলামবিরোধী জঘন্য কাজ যথা সম্ভব অতি সত্তর বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কায়েদে আজম পাকিস্তানের কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে পীরসাহেবকে দোয়ার অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য এর কয়েক মাস পরই কায়েদে আজম ইন্তিকাল করেন।

পতিতা উচ্ছেদ আন্দোলন

৪৭-এর স্বাধীনতার পর পীর বাদশাহ মিঞা কয়েকবার বিবৃতির মাধ্যমে এবং ধর্মীয় বিরাট বিরাট সমাবেশে প্রস্তাব পাশ করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে আইন প্রণয়নের দ্বারা পতিতালয় উচ্ছেদের আবেদন জানান। বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও সরকার পতিতাবৃত্তি বন্ধ করতে কার্যকরি ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় এবং পুনর্বাসনের অজুহাতে তা বহাল রাখায় সরকারের এই গড়িমসির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর নিজ থানার প্রসিদ্ধ বরহামগঞ্জ বন্দর হতে বেশ্যা উঠিয়ে দিতে বাহাদুরপুর মাদ্রাসার ছাত্রগণকে নির্দেশ দান করেন। তাঁর নির্দেশক্রমে সেখান থেকে পতিতালয় তুলে দেয়া হয়।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে চাঁদপুর শরীয়তিয়া মোমেন কমিটির সভ্যবৃন্দের আহ্বানে পীর সাহেব চাঁদপুর পুরানা বাজারে মিলাদুন্নবীর সম্মেলনে যোগদান করেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে কয়েকজন মহিলা লিখিত ভাবে চাঁদপুরের পতিতালয় তুলে দেয়ার জন্যে পীর সাহেবকে অনুরোধ জানান। অন্যান্য মহিলাও তাদের স্বামীরা পতিতালয়ে চরিত্র নষ্ট করছে বলে পীর সাহেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। মহিলাদের এই অভিযোগে তিনি বিস্মিত

হন। এর পর পীর সাহেব চাঁদপুর পুরান বাজার জামে মসজিদে জুম্‌য়ার নামাজান্তে চাঁদপুর হতে পতিতালয় তুলে দিতে সকল মুসল্লীগণকে নির্দেশ দেন। তিনি জানালেন, বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ না করলে এ দেশের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নাযিল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, চাঁদপুরের পতিতা নারীদেরকে তাড়িয়ে না দিলে তিনি চাঁদপুরের কোন লোকের খাদ্য-দ্রব্য ও হাদিয়া গ্রহণ করবেন না। অতঃপর চাঁদপুরের কয়েক শত দ্বীনদরদী মুসলমান পতিতালয়ে প্রবেশ করে শান্তিপূর্ণভাবে সেখান থেকে ৭৫০ জন পতিতা ও যুবতি নারীকে উচ্ছেদ করে। অনেক পতিতা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একদল পতিতা এস, ডি, ও বাহাদুরের সাহায্য কামনা করে এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার ও মন্ত্রীদের কাছে টেলিগ্রাফ করে সাহায্য চায়।

হাদীস ইনকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী হতে প্রকাশিত টাওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ আহ্‌মদ জাফরী তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুন্নাহ্‌র উপর জঘন্যতম আক্রমণ করে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ জাফরীর সেই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানান।—(১৯৫৫ ইং) দু'বছর পর (১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ ৩রা এপ্রিল) নেজামে ইসলাম পার্টির উদ্যোগে ঢাকা পল্টন ময়দানে সুন্নাহ্‌বিরোধী এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক বিরাট কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। পীর সাহেব উক্ত কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। জননেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেব এই কন্‌ফারেন্স উদ্বোধন করেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও হাজার হাজার মুসলমান সেই ঐতিহাসিক কন্‌ফারেন্সে যোগদান করে একে সাফল্য মণ্ডিত করেন। মওলানা আতহার আলী, মওলানা ছিদ্দিক আহ্‌মদ, মওলানা সাইয়েদ মুসলেহ্ উদ্দীন, প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী আশরাফ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী, প্রফেসার সুলতানুল আলম, মওলানা আশরাফ আলী প্রমুখ প্রসিদ্ধ বক্তাগণ হযরত রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্‌র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ফরিদ জাফরীর প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করে এর নিন্দা করেন। জনাব আশরাফ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর পীর

সাহেব তাঁর সভাপতির আসন হতে দণ্ডায়মান হয়ে সমবেত জনতার সম্মুখে ফরিদ জাফরী ও তার অনুগামীগণকে সতর্ক করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যদিও আমি ৭৩ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ, কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্র মর্যাদা রক্ষার্থে আমি একজন তরুন নওজোয়ান। সুন্নাহ্র সম্মান বজায় রাখতে আমি আমার জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।" পীর সাহেবের মনোবল দেখে ফরিদ জাফরীর সুন্নাহ্ বিরোধী জঘন্য উক্তির প্রতিবাদে কন্‌ফান্সের সমবেত লক্ষাধিক জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর পর চাঁদপুর আজিজ আহমদ ময়দান ও নারায়ণগঞ্জ টাউন সহ দেশের সর্বত্র সুন্নাহ্‌বিরোধী উক্তির প্রতিবাদে পীর সাহেবের সভাপতিত্বে বহু কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল কন্‌ফারেন্সে পাক সরকার সমীপে পাকিস্তান রাষ্ট্রে নেজামে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সুন্নাহ্‌বিরোধী উক্তিকারীকে কঠোর শাস্তিদানের দাবী জানানো হয়। দেশের সর্বত্র এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সুন্নাহ বিরোধী ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়।

দ্বীনের প্রত্যক্ষ খেদমত

পীর বাদশাহ মিঞার সকল কাজ-কর্ম, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ছিল নবী জীবনের আদর্শ ভিত্তিক। পাঠ্যকালেই তিনি দ্বীনের প্রসার দানে ছিলেন অতি আগ্রহী। মাদ্রাসা ছুটির কালে তিনি মাঝে মাঝে তাবলীগ ও এশায়াতে দ্বীনের কাজে বের হতেন। তিনি মুসলিম সমাজ থেকে শির্‌ক ও বেদয়াত প্রভৃতি ইসলাম পরিপন্থী কাজ বন্ধ করার জন্যে দেশ-বিদেশে ওয়াজ-নসীহত করতেন। তাঁর ওয়াজ-নসীহত সর্ব-সাধারণের বোধগম্য ছিল।

তিনি ৭/৮ মাইল পথ পায়ে হেটে অতিক্রম করে সভায় যোগদান করতেন। একাধারে তিন, চার ঘণ্টা যাবত তিনি ওয়াজ-নসীহত করতে পারতেন। শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর ওয়াজে কান্নাকাটির রোল পড়ে যেতো। কেউ কেউ ওয়াজের সময় পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি পর্যন্ত করত। একবার বাহাদুরপুর মাদ্রাসার বার্ষিক সভার মাঠে একজন আলেম পীর সাহেবের ওয়াজের তাসীরে চেতনাশূন্য হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। পীর সাহেবের দোয়ার পরে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে।

তাঁর পবিত্র মুখের ওয়াজ-নসীহতে বহু শরাবী, জেনাকার, সূদখোর এসব গর্হিত কাজ বর্জন করে হেদায়াতের সরল পথ পেয়েছে। তিনি কুরআন-

সুন্নাহ্‌র আদর্শে মানুষকে মিষ্টি ভাষায় হেদায়াতের পথে ডাকতেন। তিনি সাধারণ মুসলমানদের জরুরী বিষয় নিয়ে বেশী ওয়াজ-নসীহত করতেন। তাঁর ওয়াজে অনেক অমুসিলমও মুসলমান হয়েছে।

(১) মুসলমান সমাজকে তিনি বেশরা, বেদয়াতী পীর-ফকীরের ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তিনি বেশরা' ফকীরদের শাসন করে পাপের কাজ হতে ফিরাতেন। বেদয়াতী পীর-ফকীররা তাঁর নামে কেঁপে উঠত। শরীয়তের নীতির গণ্ডির মধ্যে থেকে পীর-মাশায়েখকে ভক্তি জানাতে তিনি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতেন। পীর-মাশায়েখকে সেজদাহ্ করা এবং মুরীদের পত্নীর দ্বারা পীরদের খেদমত নেয়া হারাম—এসব কথা তিনি ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজে প্রচার করতেন।

কঠোর এবাদত ও রেয়াজতের মধ্যদিয়ে তিনি জীবন পরিচালনা করে গেছেন। ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত তিনি যথারীতি পালন করতেন, এমনকি মুস্তাহাব এবাদতও আদায় করতেন। আউয়াল ওয়াক্ত নামাজ পড়া তাঁর অভ্যাস ছিল। নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি নামাজের জন্যে প্রস্তুত হতেন। নামাজ আদায় কালে পীর সাহেব দুনিয়ার সকল চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করে অখণ্ড মনযোগ সহকারে আরকান-আহকাম পালন করতেন। প্রভুর প্রেমে তিনি সম্পূর্ণ নিমগ্ন—এমন একটি দৃশ্যই তাঁর নামাজে ফুটে উঠত। ফুরফুরার পীর সাহেবের এক বিশিষ্ট খলীফা একবার বলেছিলেন যে, "হযরত পীর বাদশাহ্ মিঞা সাহেবের নামাজ আদায় করার ন্যায় যথারীতি নামাজ আদায় করার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তিনি সুন্দর ভাবে নামাজ আদায় করতেন।" এশরাক, চাশত, যোহা যাওয়াল, ছালাতুত্তাছবিহ্ ও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া পীর সাহেবের অভ্যাস ছিল। তিনি মাগরিবের নামাজান্তে ৮০ রাকয়াত নফল নামাজ পড়তেন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মাহফিলের সময় তিনি মাগরিবের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করে ভিন্নস্থানে গিয়ে নফল নামাজ ও অযীফা আদায় করে আবার সভায় ফিরে আসতেন। রাত ৩টার সময় নিদ্রা হতে জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া তাঁর নির্ধারিত নিয়ম ছিল। তিনি বলতেন, "রাত ৩টায় আমার নিদ্রা ভেঙ্গে যায়" তাহাজ্জুদ আদায়ের পর তিনি যিক্‌র ও মোরাকাবা ইত্যাদিতে ফজরের পর্ব

পর্যন্ত লিপ্ত থাকতেন। একদা শবেবরাতের সময় তিনি তাঁর নৌকায় অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি অতিশয় কাতর হয়ে পড়'লন। রাতে এবাদত করতে না পারায় আবেগের সাথে তিনি বললেন, —আফসোস! আজ ৪৮ বছর পর্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হাওয়া ছাড়া এক রাতেও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া বাদ দেইনি, আজ এই পবিত্র রাতে এবাদত করতে পারব না।" তাহাজ্জুদের সময় হতে এশ্‌রাক নামাজ আদায় না করে তিনি কারও সাথে কোনো কথা বলতেন না। কুরআন তেলাওয়াত, মোনাজাতে মাকবুল ও খতমে খাজেগান পাঠ করা তাঁর দৈনিক এবাদতের রুটিন ছিল। পাঞ্জেগানা নামাজান্তে তাঁর লিখিত 'আওরাদে' মোর্শেদের অযীফা-সমূহ তিনি যথারীতি আদায় করতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রায়ই তাসবীহ হাতে নিয়ে বিভিন্ন দোয়া-দরূদ পাঠ করতেন। তিনি সকল প্রকার বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও যথারীতি এবাদত করে যেতেন। সামান্য অজুহাতে নফল এবাদত ছাড়তেন না।

ওয়াছিয়াত নামা—।

আল্লাহ্‌র পথের মোজাহিদ পীর বাদশাহ মিঞা জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে যে মূল্যবান ওয়াছিয়াত করে গিয়েছেন, তাতে অনেক কিছুই শিক্ষনীয় রয়েছে :

(১) আল্লাহ তা'লার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন। ভাল, মন্দ, সুখ ও দুঃখ সবই আল্লাহ তা'লার তরফ হতে আসে। তাতে বিচলিত না হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ তা'লার নিকট আত্ম সমর্পণ করবেন এবং তাঁর উপর ভরসা রাখবেন।

২) সর্বদা পাক-ছাফ থাকবেন এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা কলব ও জবানকে তাজা রাখবেন। পাঞ্জেগানা নামাজ ওয়াক্ত মত আদায় করবেন।

৩) প্রত্যেক কাজে নিয়ত খালেস রাখবেন। যা করবেন আল্লাহ্ তা'লার জন্যে করবেন।

৪) লোভ-লালসাকে প্রদমন করবেন। যে অবস্থায় থাকেন আল্লাহ তা'লার শুকরগুজারী করবেন।

৫) দীন-দুনিয়ার কাজ ও আমল-এবাদত শুদ্ধরূপে করবার মত ইলম শিখবেন ও শিখাবেন।

৬) নারী জাতি আপনার অধীন, তাদেরকে পর্দা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও সৎ উপদেশ দ্বারা সৎপথে রাখবেন।

৭) প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন ও তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হবেন।

আমরা বড়ই ফেৎনা-ফাসাদের জমানায় জন্মেছি। রাসুল করিম (সাঃ) এই সম্বন্ধে উম্মতকে খুবই সতর্ক ও সাবধান করেছেন। এ সময় একটি সুন্নতের পায়বন্দীতে একশ শহীদের সওয়াব হয়।

হুশিয়ার! শয়তান যেন আপনাদের মুরব্বী না হয়। রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পথ ধরে চলবেন। দু'টি ফেৎনা মানুষকে বিপথে নেয়—একটি নারী, দ্বিতীয় ধন। সাবধান! উভয় হতে প্রয়োজন অতিরিক্ত ও হালাল ব্যতীত অন্য সব রকম হতে বেঁচে থাকবেন। মনে রাখবেন, আপনার জান-মাল ও ইজ্জত আপনার নিকট যেমন প্রিয়, ঠিক তদ্রূপ অপরের জান-মাল ও ইজ্জত তার নিকট প্রিয়। অতএব নাহক কারও জান-মাল ও ইজ্জত নষ্ট করবেন না।

এতীম, বিধবা, গরীব ও বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করবেন। অন্তত: বাক্য দ্বারা তাদেরকে সান্তনা দেবেন। কোন মানুষের মনে কষ্ট দেবেন না।

দু'টি আকাঙ্খা এখনও মনে পুষছি—একটি আপনাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বাহাদুরপুর মাদ্রাসার দালান দেখে যাওয়া, দ্বিতীয়টি শুক্রবার দিন যেন আল্লাহ তা'লা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার তাওফীক দেন। আমার শেষ অনুরোধ, আপনারা সাধ্যমতো সাহায্য করে দালানের কাজ পূর্ণ করতে চেষ্টা করবেন। খোদানাখাস্তা যদি আমি মাদ্রাসার দালান দেখে যেতে না পারি, তবুও এ কাজ আপনারা সম্পূর্ণ করলে আমার রুহ শান্তি পাবে। দ্বিতীয়টির জন্য দোয়া করবেন।

আমার দুই ছেলে ইসলামের খেদমতের জন্যে রইল। মানুষ দোষ ত্রুটির উর্ধে নয়। তারা যদি ভুল পথে যায়, তবে তা সংশোধন করে লইবেন

এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করবেন। আমার কাছে যদি কেউ কিছু পাবার থাকেন, তা আমার নিকট হতে আদায় করে দেনা মুক্ত করবেন অথবা আমার ছেলেদের নিকট হতে আদায় করে নিবেন। যদি আমার ব্যবহারে, বাক্যে বা কাজে কেউ মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেয়ে থাকে, তার বদলা আমার জীবদ্দশায় আমার নিকট হতে আদায় করে নিবেন। যদি আমার জীবদ্দশায় তারা আমার নিকট পৌছুতে না পারেন তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মা'ফ করে দেবেন।

আল্লাহ তা'লা সকলকে শান্তিতে রাখুন, ঈমান ও আমলে কায়েম রাখুন, মুসলমানদের উপর আল্লাহ রহম করুন। ঈমানের সাথে যেন দুনিয়া হতে যেতে পারি এবং কাল হাশরে প্রিয় নবী (সাঃ)-উম্মতের কাতারে স্থান পাই ও তাঁর শাফায়াত পাই, এই দোয়া সকলের নিকট কামনা করি।

ইতি—

খোদা হাফেজ
ফকির বাদশাহ্ মিঞা
২।৮।৬৬ বাংলা

২।৮।৬৬ বাংলা।
প্রকাশক— নূর উদ্দীন আহমদ
বাহাদুরপুর, ফরিদপুর

মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী

জ: ২২-৮-১৮৭৫ খৃ:—মৃ: ২৪-১০-১৯৫০ খৃ:]

মওলানা মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী ছিলেন দেশ ও জাতি-ধর্মের দরদী এই উপমহাদেশের খ্যাতনামা. এক নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আজাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, দূরদর্শী রাজনীতিক, শ্রেষ্ঠ আলেম, বাংলা সাংবাদিকতার অন্যতম দিশারী, গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার, বাগ্মী, সমাজসেবক ও বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ। ১৮৭৫ খৃ: ২২শে আগষ্ট চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মুতিউল্লাহ্ পণ্ডিত। মওলানা ইসলামাবাদীর সাথে সাক্ষাতকারী এবং তাঁর পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারীদের সূত্রে জানা যায়, তাঁর পিতামহ খান মুহাম্মদের পিতার নাম ছিল খোশাল মুহাম্মদ, তদীয়পিতা আখীল মুহাম্মদ এবং তদীয়পিতা মুহাম্মদ ফতেশাহ, যার আদি বাড়ী ছিল হাটহাজারী থানার ফতেহাবাদে। মুহাম্মদ ফতেহ শাহ ছিলেন বাদশাহ নুসরত শাহের বংশধর। ফতেহ শাহের পাণ্ডিত্বে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ নুসরতশাহ জ্ঞানের আলো বিস্তারের জন্যে তাঁকে আড়ালিয়া পুকুরিয়া ও চরতি গ্রামের জায়গীর প্রদান করেন। জায়গীর প্রাপ্তিতে তাঁর পূর্ব পুরুষদের অহংকার ছিলনা। তাঁরা পুঁথিপত্র ব্যাখ্যা ও অন্যান্য জ্ঞান চর্চা নিয়ে থাকতেন। তাঁর বংশের শেষ পণ্ডিতের নাম ছিল পণ্ডিত আকাম উদ্দীন। স্থানীয় চরতি গ্রামের জনৈক মৌলভী সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি পিতা-মাতার আগ্রহে কলকাতা যান এবং হুগলীর সিনিয়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৮৮৮ খৃঃ তিনি সেখান থেকে এফ এম তথা "ফাইন্যাল মাদ্রাসা" পরীক্ষা পাস করেন। মওলানা ইসলামাবাদী ১৯ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক লেখা পড়া শেষ করেন। তিনি ফারসী, আরবী ও উর্দূ বাংলায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি নিজ প্রচেষ্টায়ই বাংলা-ইংরেজী শিখেন।

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির সাথে সাথে তিনি হুগলী সরকারী মাদ্রাসায় একটি চাকুরীর প্রস্তাব পান কিন্তু সরকারী চাকুরীর প্রতি ইসলামাবাদী আগ্রহী ছিলেন না। তিনি এ চাকুরী গ্রহণ করলেন না। বরং রংপুরের বেসরকারী দুটি মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করতেন। একটি তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার সুপারেণ্টেনডেন্ট হিসাবেও কাজ করেন।

তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি ও গভীর অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে নিজ যথার্থ কর্তব্য না করা পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকতে পারে না। মওলানা ইসলাবাবাদীকে আল্লাহ্ তায়ালা এই উপমহাদেশের জনগণের প্রয়োজনে হাজারো শিক্ষকের শিক্ষক রূপে পাঠিয়েছেন, হাজারো সাহিত্যিক, সাংবাদিক রাজনীতিক ও সমাজ সেবকের আদর্শ পথিকৃৎ বানিয়েছেন, কাজেই বিশেষ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি নিছক একজন শিক্ষক রূপে কাজ করবেন, তা কি করে হয়? মওলানা ইসলামাবাদী এই উপমহাদেশের যেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে লেখাপড়া করেছেন এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর কর্মজীবনে পদার্পণ করেন, সেসময় তাঁর মত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন নিষ্ঠাবান সমাজ সচেতন ব্যক্তির পক্ষে শুধু শিক্ষকতার মধ্যে নিজের কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই এই উপমহাদেশের মুসলমানদের দুরাবস্থা লক্ষ্য করে এসেছেন। এছাড়া তাঁর পূর্বে হাজী শরীয়তুল্লাহ্র "দারুল ইসলাম" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "দারুল হরব" উচ্ছেদের আন্দোলন, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোট যুদ্ধ ও মোজাহিদে আজম সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর সহকর্মী দুই বিরাট নেতা ও বহু মোজাহিদের শাহাদাতের ঘটনা, ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের পর দারুল উলুম দেওবন্দ ভিত্তিক আন্দোলনের পরবর্তী ধারা, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যভিত্তিক চেতনা সৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশ থেকে মুসলমানদের মুক্তির এসব পথনির্দেশ ছাত্রজীবন থেকেই মওলানা ইসলামাবাদী লক্ষ্য করে থাকবেন। সুতরাং সেই মহৎ লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্যে শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনেই তিনি সাহিত্য

ও সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ অনুশীলনে লিপ্ত হন। তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। মাদ্রাসায় থাকাকালীন সময়েই তিনি মিসরের 'অলমানার' 'আলআহ্রাম' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় আরবী প্রবন্ধ লিখতেন। অন্যদিকে দিল্লী ও লখনৌর পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁর অনেক মূল্যবান উর্দু প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। যেহেতু মাদ্রাসায় তখন আদৌ বাংলা পড়ানো হতোনা, তাই মওলানা ইসলামাবাদী দ্রুত বাংলা চর্চা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লেখার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সংবাদপত্র হচ্ছে এ যুগের বড় প্রচার মাধ্যম, এজন্যে তিনি দেশবাসীর মধ্যে আগে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদ-পত্র প্রকাশের সংকল্প মাদ্রাসায় বসেই গ্রহণ করেন। তাই দেখা যায়, তিনি মাদ্রাসা ছেড়ে সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণের জন্যে কলকাতা চলে যান এবং মীর্জা ইউসুফ আলী প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ছোলতান' (১৯০১ খৃঃ)-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর যথাযোগ্য সম্পাদনায় পত্রিকাটি বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ১৯০৩ সাল থেকে তিনি বাংলার প্রায় সকল বড় বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে অন্যান্য জাতীয় নেতার মতই তখন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসে জড়িত ছিলেন। মওলানা ইসলামাবাদী প্যান ইসলামী আন্দোলনের ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১২ খৃঃ) সারা বাংলা ব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছেন মওলানা ইস-লামাবাদী। তুরস্কের খেলাফত ব্যবস্থাকে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক মনে করা হতো। তাই খেলাফতের ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তুরস্কের সুল-তানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯১০ সালে সাপ্তা-হিক ছোলতান বন্ধ হয়ে গেলে তিনি মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ, দেশের আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে মিশে 'আঞ্জুমানে ওলামা-এ-বাঙ্গালা,' 'ইসলাম মিশন,' 'খাদেমুল ইসলাম সমিতি'-এর ন্যায় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। আঞ্জুমানে ওলামা-এ-

বাঙ্গালা ১৯১৩ খৃ: বগুড়ার বানিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। এ সংগঠন অপর যাদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল তারা হলেন, মওলানা আকরম খাঁ, ড: শহীদুল্লাহ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ। মওলানা ইসলামাবাদী "বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি (১৯০৩ খৃ:) এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিরও (১৯১১ খৃ:) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও উভয়ের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।

সাপ্তাহিক 'ছোলতান' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আঞ্জুমানের একটি মুখপত্রের বিরাট প্রয়োজন ছিল, তাই ১৯১৪ সালে কলকাতা থেকে মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় আল-ইসলাম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাঁচ বছর কাল এ পত্রিকা স্থায়ী থাকে। ঐ সময়টি ছিল মুসলিম সাহিত্যের বিরাট দুর্ভিক্ষ। মূলত: যে দুর্ভিক্ষ দূর করার উদ্দেশ্যে মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যে অস্থির ছিলেন, এসময়টিতে সেই দুর্ভিক্ষ অনেকটা হ্রাস পায়। মুসলমান লেখক ও সাংবাদিক সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাঁর সম্পাদনার যুগে অনেক খ্যাতিমান মুসলিম লেখক তৈরী হয়, যারা ইসলামী সাহিত্য সৃজনে বিরাট সহায়তা প্রদান করেন। মওলানা ইসলামাবাদী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদে যোগ দিয়ে মওলানা সাহেবের সাথে সহযোগীতা করেন।

মওলানা ইসলামাবাদী ১৯২৬ খৃ: কলকাতা অবস্থানকারী চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের সহযোগীতায় দৈনিক 'ছোলতান' পুন: প্রকাশ করেন এবং তিনি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাথে মনোমালিন্যের জের হিসাবে তিনি দৈনিক 'ছোলতান' ত্যাগ করেন এবং 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করেন। অবশ্য অর্থাভাবে এ পত্রিকাটি দীর্ঘ দিন স্থায়ী হতে পারেনি। মওলানা ইসলামাবাদী কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসী পত্রিকা "হাবলুল মতীন"-এর (১৯১২ ইং) বাংলা সংস্করণেরও সম্পাদক ছিলেন। সাপ্তাহিক "ইসলামাবাদ" নামক একটি পত্রিকাও চট্টগ্রাম থেকে তাঁর পরিচালনধীন প্রকাশিত হতো বলে জানা যায়।

রাজনীতি

বিংশ শতকের আগেই মওলানা ইসলামাবাদী রাজনীতে অবতীর্ণ হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক, কংগ্রেস খেলাফত কমিটি এবং নিখিল বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি এবং জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দের বাংলা আসাম শাখার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। মওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় নেতা। তিনি ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম কদম মোবারক এতীমখানা স্থাপন করেন এবং ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রামের সদর দক্ষিণ মহকুমা থেকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষেদর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম টাউন ব্যাংকে প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান এবং 'আজাদ হিন্দ' কার্যক্রমের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন। এ উদ্দেশ্যে তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। এজন্যে ইংরেজ সরকার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে মওলানা ইসলামাবাদীকে দিল্লীর লালকিল্লায় বন্দী করে রাখেন। অতঃপর তাঁকে পাঞ্জাবে মিয়াওয়ালীর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। তখন বার্মার মোহাজেরদের সাহায্যার্থে কাজ করেন। [৪৭-এর স্বাধীনতার পরও তিনি প্রায় দু'বছর কলকাতা থাকেন এবং সেখানে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম আসেন এবং ৭৫ বছর বয়সে ১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। তাঁকে কদম মোবারক নওয়াব ইয়াসিন খাঁর মসজিদের সামনে দাফন করা হয়]

মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনা বৃদ্ধি, তাদের মধ্যে ইমানী দৃঢ়তা সৃষ্টি এবং নিজেদের মধ্যে বৈষয়িক উন্নতি ও স্বাবলম্বীতার ভাবকে জাগ্রত করার জন্যে মওলানা ইসলামাবাদীর চেষ্টার অন্ত ছিলনা। খৃষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে মুসলমানদের ইমান রক্ষা করা এবং দু:স্থ মানুষের সেবা করা, বেদাত শির্ক ও কুসংস্কারমুক্ত খাটি ইসলাম জনগণের সামনে তুলে ধরা ইত্যাদি লক্ষ্যে তিনি বহু বই পুস্তক রচনা করেন। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ইসলাম মিশন প্রতিষ্ঠানের বিরাট অবদান রয়েছে। চট্টগ্রাম এতীমখানাটি মিশনের প্রচেষ্টারই ফল। মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ

আলেমদের ঐক্যবদ্ধ এবং কর্মঠ ও আজাদী সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। মাদ্রাসা ও প্রচলিত আধুনিক শিক্ষার কোনোটাই যে মুসলিম ও ইসলামী সমাজের যথার্থ উপযোগী নয়, তিনি এটা বুঝতে পেরেই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি পটিয়া থানার দেয়াং-এর পাহাড়ে ৬ শত বিঘা জমির উপর মওলানা শওকত আলী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে যান।

গ্রন্থাবলী

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে : ১। জীবন চরিত্র ২। ইসলামের প্রচার নীতি ৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানের অংশ ৪। ভারতের সাথে আরবগণের প্রাচীন সম্পর্ক। ৫। ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ। ৬। তুরস্কের ইতিহাস ৭। হজরতের জীবনী ৮। রোজ নামচা ৯। পৌরাণিক ও বৈদিক যুগ ১০। আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট ১১। একটি ইংরেজী প্রবন্ধ ১২। উর্দূ বাংলা প্রবন্ধ ১৩। ইসলাম ও রাজনীতি ১৪। তাপসকাহিনী।

মওলানা ইসলামাবাদী সম্পর্কে তাঁর ইন্তেকালের পর তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী মরহুম হাবীবুল্লাহ্ বাহার ঢাকা রেডিওতে যে কথিকাটি পাঠ করেন, তার মধ্য দিয়ে মওলানা মরহুমের ঘটনাবহুল কর্মময় জীবনের একটি ছবি ও তাঁর কার্যাবলীর যথার্থ মূল্যায়ন স্পষ্ট হয়ে উঠে।

রেডিও কথিকাটি এখানে হুবহু তুলে দেয়া হলো :

"মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আর নেই। বহুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেছেন। অন্যান্য দশ খবরের মত এ খবরটিও ঢাকার দৈনিক কাগজগুলোতে ছাপা হয়েছে। কোন কোন পাঠক খবরটি লক্ষ্য করেছেন। অনেকের দৃষ্টি কিন্তু এখবরটি আকর্ষণ করতে পারেনি।

অর্ধ শতাব্দী ধরে যিনি ছিলেন আমাদের চিন্তানায়ক—সাহিত্য, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যিনি আমাদের হাত ধরে নিয়ে গেছেন, তাঁকে এত সহজে ভুলে যাওয়া নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। এক কথায় বলতে গেলে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন একা

একটি যুগ। কাজেই তাঁকে ভুলে যাওয়া মানে ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে ভুলে যাওয়া।

সিপাহী যুদ্ধ ও ওহাবী যুদ্ধের ব্যর্থতার পর ভারতের মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। সে আঁধারে শিক্ষার আলো নিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ। স্যার সৈয়দের আন্দোলন উত্তর ভারতে আশার সঞ্চার করলেও বাংলায় খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

উত্তর ভারতের একদিকে যেমন স্যার সৈয়দের আন্দোলনের ফলে গড়ে উঠেছে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, উর্দু, সাহিত্য, শিক্ষা সমিতি, জন্ম হয়েছে মোহাম্মদ আলীর, আল্লামা ইকবালের, তেমনি পাশাপাশি দেখতে পাই দেওবন্দকে কেন্দ্র করে আলেমদের নেতৃত্বে পুষ্ট হয়েছে আজাদীর আন্দোলন। বাংলাদেশে যে জাগরণ আসেনি, তা নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে জাগরণ সীমাবদ্ধ ছিল অমুসলমানদের মধ্যে, মুসলিম জনসাধারণের সংগে তার ছিলনা নাড়ীর সম্পর্ক। রামমোহন, বঙ্কিম চন্দ্র, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এঁদের আবির্ভাবে বাংলায় যখন জেগেছিল যৌবনের জলতরঙ্গ, সে সময় বাংলার মুসলমান ছিল স্তব্ধ।

এর কারণও ছিল অবশ্যি। শুরুতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন নানা কারণে প্রবল হয়ে উঠেছিল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে। ফলে এরা ইংরেজদের সভ্যতা, ইংরেজদের অনুগ্রহ প্রভৃতি থেকে ছিল বহুদিন একেবারে মুখ ফিরিয়ে।

পলাশী যুদ্ধের সময় যারা ছিল শৌর্যবীর্যে, শাসন-ক্ষমতায় বাংলার উন্নততর জাতি, একশত বছরের মধ্যে অস্তিত্বই তাদের লোপ পেতে বসল। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তন, লা-খেরাজ বাজেয়াপ্তি, শাসনকার্য থেকে বহিষ্কার —আঘাতের পর আঘাত বাংলার মুসলিম জীবনকে করে ফেলল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

উত্তর ভারতের মুসলমানরা নিজেদের বাস্তবতাবোধের ফলে ইংরেজদের সংগে হাত মিলিয়ে সমাজের গতিকে রোধ করতে পেরেছিলেন অনেকখানি, কিন্তু বাংলায় তা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। প্রথমতঃ বাংলায় ছিল ইংরেজ

বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত বেশী। দ্বিতীয়তঃ—সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ বাংগালী মুসলিম নেতাদের ছিলনা জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ। স্যার সৈয়দ যখন গড়ে তুলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়, ভিত পত্তন করেছিলেন উর্দু সাহিত্যের, উর্দু গদ্যের, উর্দু সংবাদপত্রের —এক কথায় উত্তর ভারতীয় মুসলিম মানস ও মননের সে মুহূর্তে বাংগালী মুসলিম নেতারা সন্তুষ্ট ছিলেন নিজেদেরকে সংকীর্ণ শরাফতের আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ রেখে। সমাজের আম দরবারে প্রবেশের কোন আয়োজনই ছিলনা এখানে।

তৃতীয়তঃ প্রতিবেশী সমাজের জাগরণ থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়া সম্ভব ছিল না বাংলার মুসলমানদের। কারণ, এ জাগরণের গোড়ায় শুভবুদ্ধি ছিলনা ততটুকু, যতটুকু ছিল সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি। ফলে, আঁধার ঘনিয়ে এল বাংলার মুসলমানের জাতীয় জীবনে। এই আঁধার যুগে যারা কুড়েল হাতে পথ কাটবার চেষ্টা করেছেন—ঝড় বাদলের অন্ধকারে যারা চেষ্টা করেছেন, জাতিকে পথ দেখাবার জন্যে তাদের মধ্যে মওলানা ইসলামাবাদী একজন।

জামালুদ্দিন আফগানী, মুফতী আবদুহু, স্যার সৈয়দ, শিবলী নোমানী, দেওবন্দের মওলানা মাহমুদুল হাসান—এঁদের আদর্শ-প্রদীপে নিজের মনকে আলোকিত করে তিনি চেয়েছিলেন সেই আলো বাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে। তাই দেখতে পাই, মাদ্রাসা পাশ করা মৌলভী কখনও সাহিত্য ইতিহাস চর্চা করেছেন, কখনও রাজনীতির আসরে নামছেন, কখনও চালাচ্ছেন খবরের কাগজ, কখনও গড়ছেন আঞ্জুমানে ওলামা, ইসলাম মিশন, খাদেমুল ইসলাম। কখনও বা খেলাফত ষ্টোর কায়েম করে ছেলেদের ডাকছেন শিল্প-বাণিজ্যের দিকে, কখনও বা স্বপ্ন দেখছেন আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের।

স্যার সৈয়দের জীবনের একটি ঘটনা। মহসিন-উল-মুলকের সংগে এক ঘরে একবার রাত্রি কাটাচ্ছিলেন। শেষ রাত্রি মহসিন-উল-মুলক ঘুম থেকে জেগে দেখেন, স্যার সৈয়দ বিছানায় নেই। ঘরের বারান্দায় টহল দিচ্ছেন আর কাঁদছেন। মুহসিন-উল-মুলক জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে, আপনি কাঁদছেন? খারাপ খবর কিছু আসেনিতো? খারাপ খবর নেই কি? মুসলমানরা ইংরেজী পড়ার দিকে এগিয়ে আসছেন না, এর চেয়ে খারাপ খবর আর কি হতে পারে?

মওলানা ইসলামাবাদী জীবন ভরে কেঁদেছেন পাগলের মত কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ। মুসলমান লেখাপড়া শিখছে না, ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে না, খবরের কাগজ পড়ছে না—আসছে না রাজ-নীতি চর্চায়। উত্তর ভারতে যেমন স্যার সৈয়দ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, তেমনি বাংলায়ও কাজ করেছেন মওলানা ইসলামা-বাদী। অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য হয়ত আসেনি নানা কারণে, কিন্তু তিলে তিলে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেকে।

মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে তিনি প্রবেশ করেন কর্মক্ষেত্রে। বাংলার মুসলমান এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। ডেকে বলতে হবে—ওগো ওপথ মৃত্যুর পথ, জাগো উঠো—এগিয়ে চল জীবনের রাস্তায়।

সুতরাং খবরের কাগজের দরকার। বার করলেন সাপ্তাহিক ছোলতান। 'সৌভাগ্য স্পর্শ মনির' লেখক মীর্জা ইউসুফ আলী হলেন সহায়ক। কিছুদিন পর ছোলতান বন্ধ হয়ে গেল। আবার বের করলেন নবপর্যায়ে ছোলতান, কয়েক বৎসর পরে দৈনিক ছোলতান।

আলেমরা সমাজের নেতা। এদের সংঘবদ্ধ না করতে পারলে জাতিকে জাগানো যাবে না। সুতরাং আঞ্জুমানে ওলামার দরকার। সংগে সংগে প্রয়োজন ইসলাম মিশনের। তাঁর বন্ধু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সহযোগিতায় শুরু হল বিরাট আয়োজন।

অতীত ইতিহাসের ছায়াছবি জাতির সামনে তুলে না ধরতে পারলে জাতি বাঁচে না। সুতরাং তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ইতিহাস চর্চায়। লেখা হল 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' 'আওরঙ্গজেব' 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান' খগোল শাস্ত্রে মুসলমান। উত্তর ভারতে শিবলী নোমানী যা করেছিলেন—তা বাংলায় শুরু করতে চাইলেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

দেশে শিক্ষার আলো জ্বালতে হবে, তবে সে শিক্ষা ইংরেজ প্রভাবিত শিক্ষা হবে না। ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের। তার জন্য চাই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। পরিকল্পনা তৈরী হলো। চাঁটগার দেয়াঙের পাহাড়ে সমুদ্রের ধারে জায়গা নির্বাচন করা হল। উত্তর ভারত যখন উর্দূ সাহিত্যকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলছে তখনও বাংলার

শরাফতপন্থীরী ভাবছেন বাঙ্গালীর মাতৃভাষা উর্দু 'না বাংলা। এরা না পারল উর্দুকে প্রসার করতে, না পারল বাংলাকে গ্রহণ করতে। না ঘরকা না ঘটকা' অবস্থায় যখন এদের, মাদ্রাসায় পড়া ইসলামাবাদী তখন বাংলা চর্চা শুরু করলেন। যোগ দিলেন বংগীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায়। চালাতে লাগলেন মাসিক আল-ইসলাম।

মীর কাশিম, মীর মদনের বাংলা, তীতুমীরের বাংলা ভুলে যাচ্ছিল আজাদীর স্বপ্ন। ইসলামাবাদী দিনের পর দিন ঘুম ভাংগাবার চেষ্টা করেছেন বাংগালীর। চারণের মত, নকীবের মত, ঘুরে ঘুরে শুনিয়েছেন জাগরণী গান।

১৯১৮ সনে চাঁটগায়ে ডেকেছেন তিনি যুক্ত মুসলিম সম্মেলন। একই সংগে আঞ্জুমানে ওলামা, সাহিত্য সম্মেলন, শিক্ষা সম্মেলন, যুব সম্মেলন। লক্ষীর মওলানা আবদুল বারী, মওলানা আজাদ সোবহানি, মিঃ আমিনুর রহমান, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, আবদুল আজিজ, বি এ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এরা ছিলেন এসব সম্মেলনের সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই শ্রেণীর সম্মেলন এই দেশে এই প্রথম। সে যুগে মুসলিম জেগে উঠেছিল এ সব সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। মুসলিম বাংলার তামাদ্দুনিক জীবন দানা বেঁধেছিল এখানেই। একথা অস্বীকার করবেনা কেউ, ইসলামাবাদীই ছিলেন এসবের গোড়ায়।

এভাবে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর শুরু করা সংগঠনগুলো সব আজ বেঁচে নেই; কিন্তু তা হলেও যে-সব ক্ষেত্রে কাজের সূত্রপাত করেছেন তিনি, তাঁর সহযোগিরা, তাঁর অনুগামীরা এগিয়ে গিয়েছেন সাফল্যের পথে, তাঁরই পরাজয়, তাঁরই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আজ নেই, কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সাংবাদিকতায়, আমাদের স্বদেশ প্রেমে, আমাদের জাতীয় জীবনে।

আজাদ পাকিস্তানের নাগরিকদের হাতের পতাকা অবনমিত হোক তাদের এ অগ্রপথিকের উদ্দেশে।

(ঢাকা বেতারের সৌজন্যে)

মওলানা সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীর

[জ: ১৭৮২খৃ: - মৃ: ১৮৩১ খৃ:]

বাংলার যেসব বীরসেনানী ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই করে এই উপমহা-দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শাহাদাত বরণ করে জেহাদীনীরত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, মওলানা সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীর তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সংগ্রামী মোজাহিদ সাইয়েদ তিতুমীর নেছার আলী ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম এবং একজন পাহলোয়ান। তিনি ১৮২২ খৃ: মক্কায় গিয়ে উপমহাদেশের আজাদী সংগ্রামের মোজাহিদ-এ-আজম মওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে দেশে ফিরে মোরশেদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ব্রেলভীর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় বাংলাভাষী মুসলমানদের তিনি উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি বলতেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর চরিত্রে বৈপরীত্যের লালন সম্পূর্ণ অন্যায়। মুসল-মানদেরকে ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে কথায় কাজে ও আচার-আচরণে পুরো-পুরি মুসলমান হতে হবে এবং কোনো সবল কর্তৃক দুর্বল মুসলমান অত্যা-চারিত হতে থাকলে সেই মজলুম মুসলমানের সাহায্য করা অপর মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। স্থানীয় হিন্দু জমিদার কৃষ্ণরায় মুসলমানদের দাড়ি, গোঁফ, মুসলমানী নাম ও মসজিদের উপর মোটা কর ধার্য করায় শত প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর ইমানী আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। ফলে কৃষ্ণরায় ও তার সহচরদের সাথে মওলানা হাজী সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীরের সাথে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। তিতুমীর একটি সুরক্ষিত শিবিরে আশ্রয় নিয়ে শত্রু পক্ষকে বিতাড়িত করেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা প্রথম ৪/৫ হাজারে উঠে। সমগ্র ২৪ পরগণা, নদীয়া, ও ফরিদপুর জিলা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করে তিনি মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলে জিলা কর্তৃপক্ষ ও কলিকাতার ইংরেজ সেনাদলে সাথে তাঁদ সংঘর্ষ হয়। তারা তাঁর হাতে পুন: পুন: নাজেহাল হয়। শেষে লর্ডবেন্টিঙ্ক তাঁর বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত

সিপাহী দল ও গোলন্দাজ বাহিনী পাঠালে তারা তিতুমীরের কিল্লা কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ অনুচরসহ মওলানা হাজী সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীর যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর ৩৫০ জন সৈন্য ধরা পড়ে। (১৮৩১ খৃ:); তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড ও তিতুমীরের সহকারী গোলাম মাসুদের প্রাণদণ্ড হয়।

ইসলামী জোশ সত্বেও তুলনা মূলকভাবে নিজের ও ইংরেজ কোম্পানির শক্তি অনুধাবনে অক্ষমতার দরুন তাঁর পতন ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে তিতুমীরের পরাজয়ের কারণ হিসাবে তাঁর নিজের ও ইংরেজ শক্তি সম্পর্কে অনুধাবনের ব্যর্থতার যুক্তিটি দেখানো উচিত নয়। এতে তিতুমীরের ত্যাগ ও সদিচ্ছাকেই খাটো করে দেখানো হয়। এ যুক্তি মেনে নেয়া হলে পৃথিবীর কোনো মজলুম পরাধীন জাতি স্বাধীন হতে পারলেন। তিতুমীরের ধর্মীয় চিন্তার এবং ধর্মীয় গুরুর যেই পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁর এই বীরত্ব পূর্ণ মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর পূর্ব পুরুষ কারবালার ময়দানে যেভাবে শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যকে তোয়াক্কা না করে ন্যায় ও সত্যের পতাকাকে উড্ডীন করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। যা অনাগত দিনে ইসলামের বীর মোজাহিদদের জন্যে সত্যের সপক্ষ্যে জীবন ত্যাগে অনুপ্রাণিত করবে।

তিতুমীরের পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবিদা রুকাইয়া খাতুন। কথিত আছে যে, তিক্ত ঔষধের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল বলে তাঁকে তিতামিঞা ডাকা হতো। এই তিতামিঞাই পরবর্তীকালে বাংলার গৌরব তিতুমীর নামে পরিচিত হন (সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃ ১৫)।

তিতুমীর-এর পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন হযরত 'আলী (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'আরবদেশ হতে বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন। বঙ্গদেশে আগত তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন সাইয়েদ শাহাদাত আলী। তাঁর পুত্র সাইয়েদ আবদুল্লাহ দিল্লীর শাহী দরবার কর্তৃক জাফরপুরের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে মীর ইনসাফ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সেই সময় হতে শাহাদাত আলীর বংশধরেরা মীর ও সাইয়েদ উভয় উপাধিই ব্যবহার করতেন।

নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর মওলানা হাজী সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীর স্থানীয় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তিতুমীর তাঁর (মাদ্রাসার) শিক্ষা জীবনে একজন 'আলিম ও হাফিজ' উস্তাদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিতুমীর তাঁর নিকট কুরআন শরীফ হিফ্জ, করেন এবং শারী'আত ও তরিকাত-এর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আঠার বছর বয়সে তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। 'আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। এই তিনটি ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। (পূ গ্র. পৃ ১৪)। তা ছাড়াও তিনি ফারসী সাহিত্য, ফারায়েজ, ইসলামী দর্শন, তাসাওউফ, মানতিক এবং আরবী ও ফারসী কাব্যশাস্ত্রের অনেক পুস্তক পাঠ করেছিলেন (পূ. গ্র,)।

হাজী সাইয়েদ নেছার আলী তিতুমীর একজন খ্যাতনামা বীর পাহ্লোয়ান ও ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সাথে তিনি উস্তাদ সাইয়েদ নিয়মাতুল্লাহ্র উৎসাহে স্থানীয় আখড়ায় শরীর চর্চার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার সমসাময়িক কালের কয়েকজন খ্যাতনামা পাহ্লোয়ান 'আরীফ, আলী মীর লাল মুহাম্মদ প্রমুখকে পরাজিত করে একজন বিখ্যাত পাহ্লোয়ান রূপে পরিচিত হন।

১৮২২ সালে তিতুমীর হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন। তথায় মওলানা সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিতুমীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন তাঁর সান্নিধ্য লাভের পর মদীনায় রসূলুল্লাহ (সা:)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত কালে তিনি তাঁর মুরশিদের নিকট হতে খিলাফাত প্রাপ্ত হন।

মওলানা সাইয়েদ আহ্মদ ব্রেলভীর নিকট হতে শরীয়াত ও তরীকত-এর দীক্ষার সাথে সাথে মুসলিম জাতির আযাদী লাভের জিহাদী প্রেরণাও তিতুমীর লাভ করেছিলেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমান সমাজ হতে শিরক বিদ-আতের উৎখাত এবং সুন্নাহ্র পূর্ণ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়কে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধে একতাবদ্ধ হতে এবং বাংলাদেশ হতে ইংরেজদের বিতাড়নের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলতেন, মুসলমানদেরকে কথায় ও কাজে, আচার-

ব্যবহারে পুরাপুরি মুসলমান হতে হবে এবং সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করলে মাজলুমের সাহায্য করতে হবে যা ধর্মীয় কর্তব্য।

মুসলিম-বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ সাইয়েদ আহ্‌মদ ব্রেলভী ও তাঁর ভক্ত 'খলীফা'দেরকে ওয়াহহাবী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এই বর্ণনাটি ভ্রমাত্মক এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ তাঁদের এই মত সমর্থ করেন নি। কারণ, সাইয়েদ আহ্‌মদের মুরশিদ ছিলেন দিল্লীর খ্যাতনামা আলেম শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস এ-দেহলভী আর মওলানা সাইয়েদ আহ্‌মদ ছিলেন তাঁরই অতীব ভক্ত খলীফা।

ঐ সময়ই কৃষ্ণদেব জমিদার মুসলমানদের দাড়ি, গোঁফ, মসজিদ ও মুসলমানী নামের উপর কর আরোপ করলে তিতুমীর এর প্রতিবাদ করেন। একে কেন্দ্র করে তিতুমীর ও জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জমিদার তিতুমীরকে ওয়াহ্‌হাবী প্রতিপন্ন করে তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। কিন্তু মুসলমানগণ জমিদারের শঠতা বুঝতে পেরে তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে মুসলমানদের উপর জমিদারের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

তিতুমীর অতীব ধৈর্যের সাথে হিন্দু জমিদারের আক্রমণ ও প্রতিহিংসা প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় নীলকর ইংরেজদের সহায়তায় তিতুমীরের ভক্তদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালাতে থাকে। তাদের আক্রমণে তিতুমীরের কয়েকজন ভক্ত শহীদ হন। বাধ্য হয়ে মুসলিম মুজাহিদগণ তিতুমীরের ভক্ত ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধী মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলেন এবং নারকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমীর ইংরেজ রাজত্বের বিলুপ্তি এবং মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। সমগ্র চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জিলা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ৪/৫ হাজার। জমিদারের বাহিনী এবং কলকাতা হতে প্রেরিত ইংরেজ সেনাদল মুসলিম মুজাহিদদের হাতে পুনঃপুনঃ পর্যুদস্ত হয়। পরিশেষে লর্ড বেন্টিঙ্ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট-এর নেতৃত্বে একশ' ঘোড়সওয়ার, গোরা সৈন্য, তিনশ পদাতিক দেশীয় সৈন্য ও দুইটি কামানসহ তিতুমীর ও তাঁর দলকে

শায়েস্তা করবার জন্যে পাঠান। ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী মুসলিম মুজাহিদদের আক্রমণ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর মুকাবিলায় ঢাল-সড়কিধারী মুজাহিদগণ টিকতে পারলেন না। ইংরেজ বাহিনী কামানের গোলার আঘাতে তাঁদের বাঁশের কিল্লাটি ধ্বংস করে দেয়। অনেক ভক্তসহ তিতুমীর কামানের গোলাতে শহীদ হলেন (১৮৩১ খৃ)। ৩৫০ জন মুজাহিদ বন্দী হন। তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড এবং গোলাম মাসুমের মৃত্যুদণ্ড হয়। তিতুমীরের শাহাদত এখনও মুসলিম সমাজে জিহাদী প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। এটা এক আশ্চর্য ধরনের মিল যে, যেখানে তাঁর ধর্ম ও রাজনৈতিক গুরু উপমহাদেশের আজাদী সংগ্রামের অগ্রসেনা মওলানা সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ইংরেজের দালাল রণজিৎসিং ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকের হাতে শাহাদত বরণ করেন, তিতুমীরও ঠিক ইংরেজ বাহিনীর হাতে একই সালে শাহাদত বরণ করেন। বলাবাহুল্য, তিতুমীরকে আমাদের এখানকার এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী লেখক এক সময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর হিসাবে তাঁর অবদানকে ফলাও করে প্রচার করতেন, কিন্তু যখন জানা গেল যে, তিনি ছিলেন আলেম, তখন থেকে তাদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না, যেমন তারা সাইয়েদ আহমদ শহীদের ন্যায় ত্যাগী মোজাহিদের ব্যাপারেও এজন্যে উৎসাহ বোধ করেন না। কারণ তিনি ছিলেন একজন আলেম। প্রশংসা করলে না জানি ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের আন্দোলনের শক্তি বেড়ে যায়।

———

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌

[১৮৬১ খৃঃ ২৬শে ডিসেঃ—মৃঃ ১৯০৭ খৃঃ]

মওলভী নয়, মওলানা নয়, মোহাদ্দেস, মুফাস্‌সির খেতাব নেই—পদবীর মধ্যে শুধু মুনশী। হাঁ, শুধু মুনশী পদবীর অধিকারী একজন দরজির কথাই বলছি, যিনি নিজের ইমান, সৎসাহস, আল্লাহ্‌প্রেম এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতি আন্তরিক ভালবাসার কারণে জাতীয় এক দুঃসময় একাই ইসলামের এত বিরাট খেদমত করে গেছেন যে, যার তুলনা অতি বিরল। খৃষ্টান রাজত্বে খৃষ্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও মুসলমানদের ধর্মান্তকরণ রোধে, ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্মের অসারতা প্রমাণে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ত্যাগকারী পণ্ডিত বুদ্ধিজীবিদের পুনরায় ইসলামে আকৃষ্ট করণে, যাদুমন্ত্রের বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতাদের প্রভাবিত করণে, সাহিত্য ক্ষেত্রে, সাহিত্যিক তৈরিতে, উপস্থিত বুদ্ধিতে, বক্তৃতাচ্ছলে বুদ্ধিদিপ্ত গল্প বলাতে, দুঃখীর দুঃখমোচনে, সংবাদপত্রের সেবায়, সমাজ সংস্কারে, শিক্ষাবিস্তারে, উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক দৃঢ়তায় যিনি দেশ ও জাতি-ধর্মের সেবায় এদেশের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তিনি হচ্ছেন যশোরের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌। মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ বাংলাভাষী মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণে কতবড় অবদান রেখে গেছেন, তাঁরই ভাবশিষ্য ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সুবিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'অনল প্রবাহ'-এ মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে প্রকাশিত বেদনা, মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এবং কবি নজরুল প্রমুখের উক্তি থেকে তা সহজে অনুমেয়। সিরাজী তাঁর ইনতেকালে ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে লিখেছেন :

"একি অকস্মাৎ হল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি!
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকর অকালে লুকাল ছবি!
কি আর লিখিব কি আর বলিব, আঁধার যে হেরি ধরা!
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহ তারা!

কাঁপিল ভূধর কানন সাগর প্রলয়ের প্রভঞ্জনে,
বহিল তুফান ধ্বংসের বিষাণ বাজিল ভীষণ স্বনে।
ছিন্ন হ'ল বীণ কল্পনা উড়িল কবিত্ব পাখী,
মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে শুধু জলে ভাসে আঁখি।
কি লিখিব আর, শুধু হাহাকার শুধু পরিতাপ ঘোর,
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদন রহিল জীবনে মোর।
মধ্যাহ্ন তপন ছাড়িয়া গগন হায়রে খসিয়া পল,
সুধা মন্দাকিনী জীবন দায়িনী অকালে বিশুষ্ক হ'ল।
বাজিতে বাজিতে মোহিতে মোহিতে অকালে থামিল বীণ,
প্রভাত হইতে দেখিতে দেখিতে আঁধারে মিশিল দিন।
মলয় পবন সুখ পরশন থামিল বসন্ত ভোরে,
গোলাপ কুসুম চারু অনুপম প্রভাতে পড়িল ঝরে।
ভবের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য শারদের পূর্ণ শশী,
উদিতে উদিতে হাসিতে হাসিতে রাহুতে ফেলিল গ্রাসি।
জাগিতে জাগিতে উঠিতে উঠিতে নাহি হ'ল দরশন।
এ বঙ্গ-সমাজ সিন্ধুনীরে আজ হইলরে নির্গমন।
এই পতিত জাতি আঁধারেই রাতি পোহাবে চিরকাল,
হবে না উদ্ধার বুঝিলাম সার কাটিবে না মোহজাল।
সেই মহাজন করিয়া যতন অপূর্ব বাগ্মিতা বলে,
নিদ্রিত মোস্লেমে ঘুরি গ্রামে গ্রামে জাগাইলা দলে দলে।
যার সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নূতন জীবন উষা,
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা।
আজি সে তপন হইল মগন অনন্ত কালের তরে।
প্রবল আঁধার তাই একেবারে আবরিছে চরা চরে।
বক্তৃতা তরঙ্গে এ বিশাল বঙ্গ ছুটিল জীবন ধারা,
মোসলেম-বিদ্বেষী যত অবিশ্বাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারা।

হায়! হায়! হায়! হৃদি কেটে যায় অকালে সে মহাজন,
কাঁদায়ে সবারে গেল একে বারে আঁধারিয়া এ ভুবন।

কেহ না ভাবিল কেহ না বুঝিল কেমনে ডুবিল বেলা,
ভাবিনি এমন হইবে ঘটন সবাই করিনু হেলা।

শেষ হল খেলা ডুবে গেল বেলা আঁধার আইল ছুটি,
বুঝিবি এখন বঙ্গবাসিগণ কি রতন গেল উঠি।

গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন বিশ্বময় অন্ধকার।"

মুনশী মেহেরুল্লাহ্ ১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে যশোরের ঘোপ নামক
এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ দেশে ইংরেজ শাসনের তখন ১০৪
বছর। তাঁর জন্মের চার বছর আগে ১৮৫৭ সালে মুসলমানরা ইংরেজের
বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে নিজেদের হৃত আজাদী পুনঃরুদ্ধার করতে গিয়ে
হেরে যায়। ইংরেজরা তার পর থেকে মুসলমানদের উপর কেবল অধিক
জুলুম-নিপীড়নই চালায়নি, তারা এ জাতিকে সকল দিক থেকে চিরতরে
দুর্বল করার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিমবিরোধী অভিযানে প্রবৃত্ত হয়।
ইংরেজদের সাথে মুসলিম বৈরীতার কাজে পটু সহযোগীর ভূমিকা পালন
করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ। ইংরেজদের মুসলিমবিরোধী এই অভি-
যানের একটি অঙ্গ ছিল মুসলমানদেরকে খৃষ্টান মিশনারী পাদরীদের দ্বারা
ধর্মান্তরিত করণ। এ দ্বিমুখী বরং বহুমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমান-
দের অনেক দায়িত্বশীল নেতা সেসময় জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার
স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সাথে আপোষকামীতার নীতি অবলম্বনে বাধ্য হন।
এই উপমহাদেশের মুসলমানদের সেই দুর্দিনে তখন যশোরের মুনশী মুহাম্মদ
মেহেরুল্লাহ্ এগিয়ে আসেন। বৃটিশ শাসকদের অনুকূলে ও ছত্রছায়ায় খৃষ্টান
মিশনারীদের ইসলামবিরোধী অপপ্রচারে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা এবং
তাদের খৃষ্টান বানানোর দ্বারা এদেশে ইংরেজ শাসনকে পাকাপোক্ত ও
মুসলিম জাতিসত্তাকে বিলুপ্ত করাই ছিল দুশমনদের আসল লক্ষ্য। মুনশী
মেহেরুল্লাহ্ তখন ইংরেজ রাজশক্তির চোখ রাঙানি বা নির্যাতনের কোনো

পরোয়া না করে এদেশের হাটে মাঠে ঘাটে ইসলামের বিপ্লবী বাণী প্রচার করতে লাগলেন। হতোদ্দম, প্রাণস্পন্দনহীন মজলুম মুসলিম সমাজকে তিনি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। দেশের আনাচে-কানাচে সভাসমিতি করে জ্বালাময়ী ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে, গদ্যে পদ্যে অসংখ্য বই লিখে, মুসলিম জাতির মনে নতুন আশার ও আস্থার সঞ্চার করেন। মুনশী মেহেরুল্লাহ্ মুসলিম জাতীয় জাগরণ ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি এবং তাদের ইমান-আকীদায় আপতিত বিভ্রান্তির কলুষতা দূরিকরণে যেই নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন, বিংশ শতকে তার ফলশ্রুতি স্বরূপ এ জাতির মধ্যে দেখা দেয় বিরাট ইসলামী পুনঃর্জাগরণ। মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র আন্দোলনের প্রভাবে পরবর্তীকালে এদেশে তাঁর বহু ভাবশিষ্যের জন্ম হয়। বাংলার সর্বপ্রধান বাগ্মী, সমাজ সেবক, মুসলমানদের উন্নতির পথ প্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক কবি, গ্রন্থকার ও ধর্ম প্রচারক মুনশী মেহের-ল্লাহ্ জানতেন বক্তৃতার প্রভাব অস্থায়ী। সাহিত্য ও সংবাদপত্র জাতির মেরুদণ্ড তুল্য। এসবের মাধ্যমেই জাতিকে স্থায়ীভাবে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া যায়। বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করতে এবং নিজের শিক্ষা আদর্শকে সুষ্ঠুভাবে অপরের সামনে তুলে ধরতে হলে কলমের যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি সমাজে সাহিত্যিক ও সংবাদিক সৃষ্টির জন্যে ও সংবাদপত্র প্রকাশে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বহু লেখককে তিনি সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করেণ। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তী জীবনে সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আসন অধিকার করেন। 'অনল প্রবাহের' কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কাকিনার বিখ্যাত কবি শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ, যশোরের খ্যাতনামা কবি শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র নিকট হতে তাঁদের সাহিত্যিক জীবনের উষালগ্নে যে উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়েছিলেন, তা আজ এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ আলোচ্য বিষয়। মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র মতে, "সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আমাদের উচ্চতর ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ছন্দ অলংকারের। শিশু তার মায়ের সঙ্গে কি ভাষায় কথা বলে? ক্ষুধা পেলেই সে কাঁদে, আনন্দে হাসে, ইঙ্গিতে নানাভাব প্রকাশ করে। এই প্রকাশ থেকে মা যেমন শিশুর ভাষা

বুঝে তার অভিলাষ পূরণ করতে এগিয়ে যায়, তেমনি অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানগণ উচ্চতর ভাষা বা সাহিত্যতত্বে অভিজ্ঞ না হয়েও বিশ্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সে সাহিত্য সুশিক্ষিত বিদ্বজনের মনের দুয়ারে জোয়ার সৃষ্টি হয়তো না করতে পারে কিন্তু প্রাণের ভাষার প্রাণের কথাতো বলতে পারে। সন্তানের ভাষা মা জননীর মহান প্রাণের দুয়ারে আঘাত করতে পারবেনা কেন ?"

মুন্সী মেহেরল্লাহ তাঁর সাহিত্য কর্ম ও চিন্তার দ্বারা এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্য প্রমাণ করে গেছেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি মুহাম্মদ আবু তালিব আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, "সুশিক্ষিত মাতৃভাষাভিজ্ঞ সুধী মণ্ডলীর নয়—তিনি ভাষাহারা বঙ্গীয় মুসলমানদের স্নেহ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, এই তরুণ সমাজকে নিয়ে তিনি যখন দিগ্বিজয়ে বের হলেন, দেখা গেল এক এক করে বন্ধ 'সিসেম' খুলে যাচ্ছে।"

"মুন্সী সাহেব তাঁর মেহেরুল এছলাম" কাব্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, এ ভাষা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মীর মোশাররফ হোসেন ব্যবহার করতে পারেন নি। কিন্তু মুন্সী সাহেব এ ভাষা শুধু ব্যবহারই করেননি, সার্থকভাবেই তার রূপায়ন ঘটিয়েছেন। তিনি নিজে সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং ভবিষ্যতে সাহিত্য সাধনার জন্য একটি শক্তিশালী নিবেদিতচিত্ত সাহিত্য সাধক দল গঠনের কাজও আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। মুন্সী সাহেবের সেই উত্তর সুরীরা হলেন (১) ইসমাইল হোসেন সিরাজী, যার বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ হচ্ছে 'অনল প্রবাহ'। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুন্সী সাহেবকে না দেখলেও সিরাজী সাহেবের 'অনল প্রবাহ' তাঁর জীবনে যে দাহের সৃষ্টি করেছিল, তারই ফলশ্রুতি ছিল তাঁর 'অগ্নিবীণা'। (২) শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (৩) কবি মুহাম্মদ গোলাম হোসেন (৪) মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (৫) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন কাব্যবিনোদ প্রমুখ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁ লিখেছেন : তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে দেশপ্রেমের যে স্ফূরণ ঘটেছিল, তার মূল প্রেরণা এসেছিল কর্মবীর মুন্সী মেহেরল্লাহ্র কাছ থেকে। "কর্ম জীবনের প্রারম্ভে স্ব-সমাজের দৈন্য-দুর্দশায় যে তীব্র অনুভূতি আমার মন ও মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া

তুলিয়াছিল, আপনাদেরই একজন ক্ষণজন্মা মুসলমান কর্মবীরের (মুন্সী মেহেরুল্লাহ) সাধনার আদর্শ তাহার মূলে অনেকটা প্রেরণা যোগাইয়া দিয়াছিল। (নড়াইলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসের সভায় সভাপতি রূপে মওলানার প্রদত্ত ভাষণ।)

মুন্সী মেহেরুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীনের মন্তব্য হলো, "যিনি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সভাসমিতি অধিবেশনের সূত্রপাত করিয়াছেন, যিনি খৃষ্টীয় ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়া পাদ্রী ও খৃষ্টানদিগের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়াছেন, যিনি ইসলাম ধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মুসলিম কুলরত্ন, বাগ্মী কুলতিলক মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব।"

মুন্সী মেহেরুল্লাহর নিজ বাড়ী ছিল যশোর জেলার ছাতিয়ানতলার গ্রামে। স্থানটি বর্তমান যশোর ঝিনাইদা প্রাচীন রেলরাস্তার পাশে (পাঁচ ছয় মাইলের কাছে) চুড়ামনকাঠি নামক রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৯৪৭ খৃঃ পাকিস্তান আমলে ষ্টেশনটির নামকরণ করা হয় 'মেহেরুল্লাহ নগর'। মুন্শী মেহেরুল্লাহর পূর্বপুরুষরা খাঁ উপাধিধারী ছিলেন। যেমন তাঁর কুরসী বা বংশলতিকায় দেখা যায়, তাঁর পিতার নাম ওয়ারিস উদ্দীন, তদীয় পিতা নাসির মামুদ, তদীয় পিতা শাহ মামুদ খাঁ, তদীয় পিতা আকেল মামুদ খাঁ, তদীয় পিতা দুলায়েব খাঁ, তদীয় পিতা মুনায়েম খাঁ, (বা মনু খাঁ)। মুন্শী সাহেবের পিতা একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় পিতৃবিয়োগ ঘটে। ঐ বছরই তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি তৎকালীন বর্ণ পরিচয় শেষ করে ফেলেন। স্বামীর মৃত্যুতে মেহের জননী চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন। জীবনের সকল আশা-ভরসার স্থল শিশু পুত্রকে বুকে নিয়ে তিনি কষ্টে দিন যাপন করতে লাগলেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সের সময় লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি কয়ালখালি গ্রামের মওলভী মোনহাব উদ্দীন সাহেবের কাছে তিন বছর বিদ্যা শিক্ষা করেন। তারপর তিনি করচিয়ার মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কাছে আরবী, উর্দু ও ফারসী শিক্ষা

করেন। বলাবাহুল্য, জীবনের প্রথম দিকের এই ফারসী ও উর্দূ শিক্ষা তাঁর প্রচারক জীবনে বিরাট কাজে আসে। মুনশী মেহেরুল্লাহ্র জ্ঞানস্পৃহা ছিল অতি অদম। তিনি অযথা সময় নষ্ট না করে পড়াশোনায় কাটাতেন। দরজি দোকানে শিক্ষানবিসী কালেও তিনি অবসর সময় তাজ মামুদের নিকট উর্দূ পড়তেন ও উর্দূ সাহিত্যের চর্চা করতেন। সাহিত্যামোদী অনেকে দর্জি দোকানের এই সাহিত্য চর্চার আসরে উপস্থিত হতেন। ইরানের অমর কবি শেখ সাদীর গুলিস্তঁ, বুস্তাঁ কিতাবদ্বয়ের কবিতা-গুচ্ছ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কোরআন-হাদীসেও জ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর গলার স্বর ছিল মধুর। তাঁর সুললিত কণ্ঠের ফারসী বয়াত সভা-সমিতির শ্রোতাদেরকে অভিভূত করে ফেলত।

জ্ঞান আহরণের উৎসাহ-বাসনা থাকলে অর্থাভাবের মধ্য দিয়েও বহু লোকের জ্ঞানীগুণী ও বড় হবার নজির পৃথিবীতে রয়েছে। দারিদ্রের দুঃসহ বাধার প্রাচীর তাদেরকে জ্ঞানসাধনা ও জীবনে বড় হবার সংকল্প থেকে দূরে সরাতে পারে না। তেমনি দারিদ্রের অক্ষমতা ও কষাঘাত অনেক প্রতিভাধর ছাত্রছাত্রীর জীবনপুষ্পকে বিকশিত হবার আগেই এ পথ থেকে যে সরে যেতে বাধ্য করে, সে বাস্তবতাও অস্বীকার করার মতো নয়। মুন্শী মেহে-রুল্লাহ্ যৌবন-সীমায় পদার্পণ করলে তাঁর উপরও সংসারের চাপ এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, তাঁরপক্ষে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হলো না। রুজিরোজগারের অন্বেষণে তাঁকে বের হতে হলো। প্রথমে তিনি ডিস্ট্রিক বোর্ড অফিসে একটি ছোটখাটো চাকুরি নিলেন। কিন্তু চাকুরী জীবনের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে তিনি থাকতে পারলেননা। মুক্ত বিহঙ্গকে খাঁচায় রাখা যায় না। মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের উপযোগী কোনো পেশায় নিয়োজিত হবার চিন্তা করলেন। খোজার হাটে একটি দরজি দোকানে সেলাই কাজ শিখতে লাগলেন। এ সাথে তিনি পড়ার কাজও অব্যাহত রাখেন। এ সময়ই তিনি উর্দূ, ফারসী শেখেন যা পূর্বে বলা হয়েছে। এ সময় উর্দূ সাহিত্য আরবী, ফারসী বিষয়ক জ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তাহজিব, তামাদ্দুন সম্পর্কে যে নতুন জ্ঞান ও ধারণা লাভ করেন, তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবনে এটি বিরাট পাথেয় স্বরূপ কাজ

করে। দরজির কাজ আয়ত্তে এনে মুন্‌শী সাহেব যশোর শহরের দড়াটানা রোডে নিজেই একটি দোকান খুলে বসলেন। তাঁর সুমধুর ও অমায়িক ব্যবহারে শহরের অনেক বিশিষ্ট লোক এসে তাঁর কাছে বসতেন। খোদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁর দোকানের একজন খরিদ্দার ছিলেন।

ঠিক ঐ সময় খৃষ্টানরা বাংলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে খৃষ্টানধর্মের প্রচার চলিয়ে যাচ্ছে। শহর, বন্দর, গ্রাম, গঞ্জ, হাটবাজার সর্বত্রই পাদ্রীরা খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে বেড়াচ্ছিল এবং এদেশের মুসলমানদের ধর্মচ্যুত করছিল। তারা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যাপ্রচারণা চালাতো এবং সাধারণ লোকদের বিভ্রান্ত করতো। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র দোকানের সামনেও রাস্তার উপর পাদ্রীরা এভাবে বক্তৃতা দিচ্ছিল এবং ইসলামকে মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কাহিনী এবং কোরআন শরীফের অপ-ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ তাদের এ প্রেরণা দেখে এবং 'সুসমাচার' নামে একটি বই প্রচার করতে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কারণ, এ বইটি সরল প্রাণ মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করছিল। তিনি মিশনারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দানের জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং 'মনসুরে মোহাম্মদী' নামক এক খানা উর্দূ পত্রিকার গ্রাহক হলেন। এ পত্রিকা পাঠে তাঁর জ্ঞানপরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রথমে খৃষ্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের প্রচার পত্রিকা ও বাইবেলের অনুবাদগুলো মনযোগ দিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে তাঁর হাতে দুখানা বই এসে গেল। এর এক খানা হাফেজ নিযামতুল্লাহ্ রচিত 'খৃষ্টান' ধর্মের ভ্রষ্টতা' আর অপরটি পাদ্রী ইশানচন্দ্র ওরফে মুন্‌শী মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ্ রচিত "ইঞ্জিলেও হযরত মুহাম্মদের খবর আছে।" মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ পাদ্রীদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে লাগলেন। যেখানে খৃষ্টান পাদ্রীরা তাদের ধর্ম প্রচার করতেন, সেখানেই তিনি ইমানী চেতনা নিয়ে ছুটে যেতেন। জনসাধারণ হাটে-বাজারে, সভা-সমাবেশে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের সৃষ্টি করতো। খৃষ্টান পাদ্রীরা অবস্থা বেগতিক দেখে অনেক এলাকা থেকে চলে যায়। এভাবে মুন্‌শী সাহেবের নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় বক্তৃতা দানের জন্যে তাঁর কাছে দাওয়াত আসতে থাকে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এসব দাওয়াতে সাড়া দিতেন এবং জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি করতে লাগলেন।

যশোরের জেলা মেজিষ্ট্রেট দার্জিলিং বদলী হয়ে গেলে তাঁর অনুরোধে মুন্‌শী সাহেবও সেখানে গেলেন এবং একটি দর্জি দোকান খুললেন। এখানে এসেও তিনি জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত হলেন। দার্জিলিংয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। বেদ উপনিষদ, বাইবেল, ত্রিপিটক গ্রন্থ সাহেব, গীতা প্রভৃতি তিনি মনযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন, 'তোহফাতুল মো'বতাদী' নামক এক খানা উর্দু গ্রন্থ পাঠে তিনি বৈদিক ধর্মের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি অবহিত হন। তিনি মিসর থেকে সোলায়মান ওয়াসী লিখিত 'কেন আমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম' 'কেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম ?' 'প্রকৃত সত্য কোথায় ?' এ তিন খান গ্রন্থ সংগ্রহ করার পর খৃষ্টান ধর্মের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে তাঁকে আর কোনো চিন্তা করতে হলো না। এখন তিনি আর দর্জির দোকানে আবদ্ধ থাকতে চান না। জেলা মেজিষ্ট্রেটকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলে তিনি আপত্তি করলেন না। এরপর থেকে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ খৃষ্টান মিশনারীদের কাজের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মেহেরুল্লাহ এখন পুরোপুরি ইসলামের কাজে নিয়োজিত। তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজসেবকদের সাথে যোগাযোগ করলেন। কলকাতা গিয়ে 'মিহির' পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'সুধাকর' সম্পাদক মুন্‌শী আবদুর রহীম, মুনশী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রমুখের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। কলকাতা নাখোদা মসজিদে একটি সভার আয়োজন করেন। এ সভার আয়োজনে খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার, খান বাহাদুর নূর মুহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ চিন্তাবিদ সহায়তা করেছেন। সভায় "নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি" নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র উপরে। সর্বত্র তাঁর সাথে খৃষ্টান পাদ্রীদের বাহাস হতে থাকে। কিন্তু সর্বত্রই এই যুক্তিবাদী বক্তার কাছে পাদ্রীরা সম্পূর্ণ হার মানতে লাগলেন। 'খৃষ্টান বান্ধব' নামে মিশনারীদের একটি প্রচারপত্র ছিল। এতে খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ সালে "আসল কোরআন কোথায়" এ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধে বলা হয়, 'হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত কোরআনের সাথে আসল কোরআনের মিল নেই।"

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ সুধাকর পত্রিকায় তার জবাবে লেখলেন 'খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন।" জন জমিরুদ্দীন এর কোনো জবাব দিতে পারলেন না, বরং এতে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে মুন্‌শী সাহেবের কাছে ছুটে গেলেন এবং পুনঃরায় মুসলমান হয়ে গেলেন।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা বাংলা আসামের মুসলমানদের ধর্মান্তর রোধে ঝাঁপিয়ে না পড়লে এদেশে হয় তো আজ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্টতা টিকে থাকতো না। এ দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে একই ফিৎনা আবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু দেশের ওলামা-মাশায়েখের সেই তুলনায় যা করার দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। ফলে অনেকে আশঙ্কা করছেন যে, না জানি বাংলাদেশ একদিন লেবাননে পরিণত হয়। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ ১৯০৭ খৃঃ শুক্রবার ১টার সময় ৪৬ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন।

ফুরফুরার পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

(জঃ ১৮৪১—মৃঃ ১৯৩৯ খৃঃ)

যে-কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও সংগ্রাম কোনো দিন বৃথা যেতে পারে না। গৌণে হলেও তার ফলশ্রুতি দেখা দেবেই। আর তাই দেখা যায়, দিল্লীতে ১৮০৩ খৃঃ মওলানা আবদুল আজীজ দেহলভীর ইংরেজবিরোধী ফতওয়া জারির মধ্যদিয়ে, ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের যে বীজ রোপিত হয়েছিল এবং এর কর্মীদের রক্তে বালাকোটের খুনরাঙা জমিনে যে ইসলামী আন্দোলনের বৃক্ষ জন্ম নিয়েছিল, তার শাখা-প্রশাখা একদিকে যেমন ভারতের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মাটিতেও সে বৃক্ষ শিঁকড় বিস্তার করেছিল। এ জন্যেই দেখা যায়, বাংলাদেশেও হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১—১৮৪০ খৃঃ) ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে তুলেছেন। যখন ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের সংগ্রামী কাফেলা বালাকোটের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন এদিকে হাজী নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২—১৮৩১ খৃঃ) উস্তাদ সাইয়েদ আহ্মদের অনুকরণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঁশের প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। সাইয়েদ আহ্মদের শিষ্য মরহুম মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীও (১৮০০—১৮৭৩ খৃঃ) বাংলার আকাশে-বাতাসে ইসলামের সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ১৮৫৭ এর বিপ্লবে এ কাহিনীই নেপথ্যে কাজ করে।

ঠিক তেমনিভাবে বাংলায় ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবু বকর ছিদ্দীকী সাহেবও ঐ বালাকোটকেন্দ্রিক ইসলামী আন্দোলনের আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। প্রায় একই সময় মুনশী মেহেরুল্লাহর (জন্ম ১৮৬২—মৃত্যু ১৯০৭) খৃষ্টান মতবাদবিরোধী আন্দোলন, তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি বাংলার শ্যামল মাটি থেকে ঈসায়ী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে চলেছিল। তাঁর আন্দোলনকেও বালাকোট আন্দোলনের বাইরে বলা চলে না।

মওলানা আবু বকর ছিদ্দীকী ১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাইয়েদ আহ্‌মদ শহীদের বিশেষ খলীফা হাফিয জালাল উদ্দীনের নিকট হাদীস, তফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা করেন। পরে এ সিলসিলারই চট্টগ্রামের শাহ সূফী মরহুম ফতেহ আলীর নিকটও তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।

মওলানা আবুবকর ছিদ্দীকী যে সময় পরিণত বয়সে এবং যখন তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা, সে সময় বাংলাদেশসহ গোটা ভারতের মুসলমানের জীবনে চরম দুর্দিন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশ তখন ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের জীবনে চরম দুর্দিন নেমে এসেছে। মুসলমানদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। ঠিক এ সময়ই এক রাতে "স্বপ্নে আযান দেওয়ার" একটি ঘটনা তাঁকে ১৮৫৭ সালে কর্মমুখর করে তোলে। এ স্বপ্ন দেখার পর থেকে তিনি বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারে উঠেপড়ে লাগেন। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক গুণাবলী ও দার্শনিক যুক্তি মানুষকে অভিভূত করে তুললো। বহু অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। বাংলা, আসাম সহ ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে মুরীদ হন।

ফুরফুরার পীর সাহেব ও সংবাদপত্র

বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক, তাই মাতৃভাষায় সাহিত্য সাংবাদিকতার দ্বারা ইসলাম প্রচারের আধুনিক পদ্ধতির প্রতি ফুরফুরার পীর সাহেব অধিক যত্নবান ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক দ্বীনী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়েছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকের গ্রাম বাংলার স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণের অতিপ্রিয় সাময়িকী "মুসলিম হিতৈষী"র তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যথা—"মিহির ও সুধাকর", "ইসলাম প্রচারক", "নবনূর," "ইসলাম দর্শন", "হানাফী", মোহাম্মদী", "শরীয়তে ইছলাম", "ছুন্নাতুল জামায়াত", "হেদায়েত", "ছোলতান" ইত্যাদি।

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে মুসলমানদের বিশেষ করে সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বাংলা ভাষায় মুখপত্রের অভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে তিনি রোগশয্যায় শায়িত থেকেও "মোছলেম" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ পত্রিকার জন্যে পীর সাহেব নিজ তহবিল থেকে ২ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

একদিকে পত্র-পত্রিকা ও ওয়াজ-নছীহত দ্বারা নিজের শিষ্য সাগরিদদের মাধ্যমে তিনি যখন গোটা বাংলা ও আসামে ইসলামী আন্দোলন করে গেছেন, তেমনিভাবে তাঁর অবর্তমানে যাতে এ মহৎ কাজের চর্চা এখানে অব্যাহত থাকে, সে জন্যে তিনি বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে-ছেন। জনশ্রুতি আছে, একই মহফিলে প্রাপ্ত অর্থে নোয়াখালীর ইসলামিয়া মাদ্রাসা একই দিনে তিনি স্থাপন করে আসেন। 'মাদ্রাসায়ে ফাতেহিয়া ইসলামিয়া ফুরফুরা'র জন্য তিনি তাঁর বহু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে গিয়েছেন।

ফুরফুরার পীর সাহেবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি দ্বীনী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হালাল রুজী অর্জনের নিয়তে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। যেমন কোনো কোনো আলেম আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। যার ফলে আধুনিক শিক্ষা না থাকায় অনেকে নিছক দ্বীনী শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করা সত্ত্বেও একদিকে যেমন আধুনিক সমাজের কাছে দ্বীনের সত্যিকার শিক্ষা এবং আদর্শতো যথাযথরূপে তুলে ধরতে পারেনই না, অন্যদিকে অর্থকরী শিক্ষার অভাবে কর্মজীবনেও তাদেরকে নিজেদের বিবেকবিরোধী অনেক ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করতে হয়। ফুরফুরার পীর সাহেব একশ্রেণীর আলেমের ন্যায় শিক্ষার ব্যাপারে এরূপ ভূমিকার বিরোধী ছিলেন, যাতে কেউ মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের পর মাদ্রাসা বা খানকাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও ঠাঁই না পায়। বরং যাতে ছাত্রেরা দ্বীনী এলেমের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা লাভ করে হালাল রুজি উপার্জনে সক্ষম হয়, তজ্জন্যে তিনি ফুরফুরা শরীফে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সঙ্গে প্রকাণ্ড নিউ স্কীম মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মূলতঃ তাঁর এ ভূমিকার ফলেই দেখা যায়, বহু লোক ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও

তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছে এবং বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে দ্বীনী কাজ করে গেছে। তন্মধ্যে তাঁর খলীফা প্রফেসার আবদুল খালেক সাহেব এবং এশিয়া বিখ্যাত অন্যতম ভাষাবিদ মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মওলানা আবুবকর সাহেব বাংলা-আসামের মুসলমানদের মধ্যে থেকে বেদয়াত, শিরক ও যাবতীয় কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজ ও হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার হাত থেকে এ দেশের মুসলমানদের রক্ষার জন্যে রীতিমতো আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

তাঁর ইসলামী আন্দোলন ছিল সর্বমুখী। শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে, মুসলমানদের সাহিত্য-সাংবাদিকতায় উৎসাহ দানে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও আজাদী আন্দোলনে সকল দিকে তিনি এ দেশে ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টি করে গেছেন।

আজাদী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল বাংলার সকল আলেমের চাইতে অধিক। বাংলার প্রত্যেক মুসলিম নেতাকেই রাজনৈতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এমন কি হিন্দু নেতাদেরকেও তাঁর কাছে যেতে হতো। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন দূরদর্শী। একবার মিষ্টার গান্ধী, সি, আর দাস মওলানা মুহাম্মদ আলী যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, "আমি প্রথমে কোরান-হাদীসের পক্ষপাতী। কংগ্রেস এর কোনো একটির বিরুদ্ধাচরণ করলে কখনও আমার সহযোগিতা পাবে না।" তিনি আরও বলেছিলেন—"ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়, তেমনি আমি আপনাদের সঙ্গে (হিন্দুদের) সহযোগিতা করতে ভয় পাই। কেননা, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন হিন্দুগণ সমস্ত দোষ গরীব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে পলায়ন করলো তখন সে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন বহু মুসলমানের প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। সে সব কথা স্মরণ হলে আমার শরীর শিউরে উঠে। তাই হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হতে হলে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে হবে।" এ জবাবে হিন্দু নেতারা নিরাশ হলে তিনি তাদের অজ্ঞাতসারে

মওলানা মুহাম্মদ আলীকে বললেন, "আমি কংগ্রেসের প্রতি আস্থা আনতে পরি না। তাদের চেহারার হাবভাব দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আপনাকে আমি এ উপদেশ দিচ্ছি যে, যাই করুন বাবা, আগে দ্বীন পরে দেশ। দ্বীন ছেড়ে দিয়ে দেশ উদ্ধার করা আমাদের কাম্য নয়। আমার একথাটি স্মরণ রাখবেন। আমি প্রথমে মুসলমান পরে ভারতবাসী।" তিনি সব সময় বলতেন, "শরীয়ত-বিরোধী যা-ই হোক না কেন, নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করতে আমি কখনও পশ্চাদপদ হবো না। আবু বকর আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে ভয় করে না।"

বিচক্ষণ মওলানা আবু বকর সাহেব তাঁর এই দ্বিজাতিতত্ত্ববোধের কারণেই জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসকে সমর্থন করায় তা থেকে বের হয়ে আসেন এবং বাংলার আলেম সমাজকে রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসাম" গঠন করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলন-কালে বহু অর্থ চাঁদা তুলে তুর্কী মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। ফুরফুরার পীর সাহেব মুসলমানদের যাবতীয় উন্নতিকল্পে বাংলা, আসাম ও ভারতের লক্ষ লক্ষ মুরীদকে নিয়ে মুসলিম লীগ সমর্থন করতেন। বাংলার মুসলমানের ভোট পেতে হলে এ, কে, ফজলুল হক সাহেব সহ বাংলার প্রত্যেক মুসলিম নেতাকেই "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসামের" প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মওলানা আবু বকর ছিদ্দীকী সাহেবের সনদ নিতে হতো।

তিনি প্রথমে রাজনীতিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু যখন দেখলেন যে, কাউন্সিলে ইসলামের শরীয়তবিরোধী আইনসমূহ পাশ হচ্ছে, তখনই তিনি আইন সভায় ইসলামপন্থী দ্বীনদার মুসলমান ও আলেমদেরকে পাঠানোর তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এজন্যে তিনি আলেমদেরকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করতেন।

মূলতঃ বাংলা-আসামে মুসলিম লীগের যে জনপ্রিয়তা ছিল, তার অধিক কৃতিত্ব একমাত্র ফুরফুরার পীর সাহেবেরই। তিনি এ দেশের বাঙ্গালী মুসলমানের মনে পাকিস্তানের জন্যে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তা চিরদিন একদিকে যেমন ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে, তেমনি বাঙ্গলার আলেম সমাজও তার থেকে আজীবন প্রেরণা লাভ করবে। তাঁর ইন্‌তেকালের এক বছর পরই

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ফুরফুরার পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর বাংলা-আসামে তাঁর যেসব অনুসারী শিষ্য ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তারের কাজ করেন, তাদের মধ্যে শর্ষিণার পীর মওলানা সূফী নেছারুদ্দীন সাহেব, সূফী ছদরুদ্দীন সাহেব, মওলানা রুহুল আমীন সাহেব, প্রফেসার আবদুল খালেক সাহেব এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব, মওলানা মুয়েযুদ্দীন হামীদী সাহেব প্রমুখের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীর মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী তাঁর অনুগামীদের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে ফুরফুরার পীর সাহেবের এসব খলীফা ও তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদের অপরিসীম ত্যাগ রয়েছে। এমন দিনও গিয়েছে, মুসলিম লীগ ও পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থনের জন্যে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আলেমদের ফতওয়া ও অভিমত প্রকাশ না করলে এদেশের মানুষ রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো নেতাকে তেমন সমর্থন জানাতেন না। পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হলে মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী ও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন সহযোগিতার আহ্বান জানান, তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী ও তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব সহ ফুরফুরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ওলামা ও সাধারণ মুসলান এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন

অতীব নিষ্ঠাবান মওলানা আবু বকর সিদ্দীকীর বয়স যখন মাত্র নয় মাস, তখন তাঁর পিতা আবদুল মুকতাদির ইনতিকাল করেন (১২৬৬ ব.) তাঁর মাতা মাহাব্বাতুন নিসার আগ্রহে ও যত্নে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। সিতাপুর মাদ্রাসা ও পরে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় তিনি অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত মাদ্রাসা হতে তিনি কৃতিত্বের সাথে জামাআতে উলা (ফাদিল) পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা সিন্দুরিয়া পট্টীর মসজিদে হাফিজ জামালুদ্দীন-এর নিকট তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। হাফিজ সাহেব সাইয়েদ আহমদ শাহীদ ব্রেলভী

(মৃ: ১৮৩১ খৃ:)-এর খলীফা ছিলেন। কলকাতা নাখোদা মসজিদে মওলানা বিলায়েত (র:)-এর নিকট তিনি মানতিক, হিকমাহ্ (গ্রীক বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩/২৪ বছর বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অত:পর তিনি মদীনা গমন করেন। তথায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং রওযা মোবারক-এর খাদিম বিখ্যাত আলেম আদ-দালাইল আমীন রিদওয়ান-এর নিকট হতে ৪০টি হাদীস গ্রন্থের সনদ লাভ করেন (হাকীকাতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৮; বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, পৃ. ৩৬; আবু ফাতেমা ইসহাক ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮০, পৃ. ১০-১১)। এরপর দেশে প্রত্যাবর্তন করে একাধিকক্রমে ১৮ বছর তিনি ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন (ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকী, পৃ. ১১)।

পাঠ্যাবস্থাতেই ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। রাত জেগে তিনি যিকির করতেন। শরীআতের হুকুম-আহকাম সাধ্যমতো পালন করতে তিনি অতিশয় যত্নবান ছিলেন। এভাবে যখন তিনি নিরলস সাধনায় রত ছিলেন, তখন কলকাতার বিখ্যাত ওয়ালী শাহ সূফী ফতেহ আলী (র, মৃ: ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ)-এর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আবু বকর সিদ্দীকী তাঁর নিকট বায়আত হন এবং নিষ্ঠার সাথে ইলম-ই-মারিফা শিক্ষা করেন। তিনি সূফী ফতেহ আলীর একজন প্রধান খলীফা ছিলেন। ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ফিক্হী মাসআলার সঠিক উত্তর জিজ্ঞাসা মাত্রই তিনি কিতাব না দেখে বলে দিতেন। কথিত আছে, স্বপ্নে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নিকট কিছু দ্বীনী মাসআলা শিক্ষা করেছিলেন (বাংলাদেশের পীর আওলীয়গণ, পৃ. ৩৭)। তিনি দু'বার (১১১০ ও ১৩৩০ ব.) হজ্জ আদায় করেন। শেষ বারের হজ্জে তাঁর সংগে প্রায় ১০০০ জন মুরীদ ছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশের হজ্জযাত্রীদের বোম্বাই গিয়ে জাহাজে আরোহণ করতে হতো। ফলে তাঁরা বিশেষ দু:খ-কষ্টের সম্মুখীন হতেন। তাঁরই চেষ্টায় বাঙ্গালী হাজীদের জন্য কলকাতা হতেই জাহাজের ব্যবস্থা করা হয় (ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকী, পৃ ৩৬—৩৭)।

তিনি একজন কামিল পীর ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতি এলাকায় এবং বহির্বঙ্গেও তাঁর অনেক মুরীদ রয়েছেন। তাঁর মতে শরীঅত ব্যতীত মারিফাত হয় না। ইবাদাত-বন্দেগীতে, কাজকর্মে, চাল-চলনে, আচার-অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে মোটকথা সকল ব্যাপারে যিনি শরীঅতের অনুবর্তী হন, তিনিই পীর হতে পারেন। তিনি বলতেন, "কেবল পীরের বংশেই যে পীরের জন্ম হবে, এমন কথা কিতাবে নাই। যে বংশেরই হউক না কেন, যিনি শারীঅত ও মারিফাত ইত্যাদিতে কামিল হবেন, তিনি পীর হতে পারবেন" (রুহুল আমীন, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, ২৪৬-৪৭; হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৯৮-৯৯)।

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। বাংলা ও আসামের শহরে-গ্রামে তিনি বহু ধর্মসভায় ওয়া'জ-নসীহত করেছেন, বিদ্'আতপন্থী ও বে-শরআ পীর ফকীরদের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন। তৎকালে আলেমগণ সাধারণতঃ বাংলা শিখতেন না এবং বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে আগ্রহী ছিলেন না। সহজ-সরল বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে শরীঅতের বিধি-বিধান তথা ইসলামী বিষয়াদির উপর বই-পুস্তক রচনা করতে তিনি তাঁর আলেম ও ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদগণকে উৎসাহিত করেন। ফলে মওলানা রুহুল আমীন (মৃ. ১৯৪৫), মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, আবদুল হাকীম (বিখ্যাত তাফ্সীরকার), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ আরও অনেকে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অনুমোদনক্রমে অথবা তাঁর নির্দেশে লিখিত এ ধরনের কিতাব-পুস্তকের সংখ্যা হাজারের অধিক হবে। মওলানা রুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদনপ্রাপ্ত কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়, যথা আক্কায়েদ-এ-ইসলাম, এলমে তাছাওউফ, ছিরাজুস ছালেকীন, পীর মুরীদতত্ব, বাতেল দলের মতামত, নছীহত-এ-সিদ্দীকীয়া, ফাতওয়া সিদ্দীকী, তালিমে তরীকত, এরশাদ-এ-সিদ্দীকীয়া ইত্যাদি। তরীকত দর্পণ বা তাছওউফতত্ব বইটি আবু বক্‌র সিদ্দীকীর মুখনিঃসৃত বাণী সংগ্রহ (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ, ৯৬-৯৭)। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু বিবৃতি,

কিছু প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে (দ্র শরীয়তে এসলাম আল-এসলাম ও ছুন্নত অল জামাত পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাসমূহ)। তাঁর রচিত তারিখুল ইসলাম (বাংলা), কাওমু'ল-হাক (উর্দু) এবং অছীয়ৎনামা (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আল-আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া নামে আরবীতে একটি কিতাবও রচনা করেছিলেন, কিন্তু কিতাবখানা প্রকাশিত হয় নি, (দ্র. ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেব (র:) এর 'মত ও পথ' পাবনা হতে রমযান আলী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ ৬; বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ পৃ ৪১-৫১)।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকার সংস্কারের জন্যে তিনি দাবী জানান। যুগোপ-যোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন, বিশেষত: ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুসলিম বালক-বালিকাদেরকে ইব্তিদাঈ তা'লীম (প্রাথমিক শিক্ষা) ইসলামী তারীকা অনুযায়ী ইসলামী পরিবেশে দেওয়ার জন্যে তিনি জোর তাকীদ করেন। তাঁর মতে নারী-শিক্ষাও জরুরী, তবে পর্দার সাথে তাদের জন্যে বিশেষত: উচ্চশ্রেণীর বেলায় পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি উপদেশ দেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৬৬-৭৪, ১৪০; শরিয়তে এসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)। তাঁর চেষ্টায় বঙ্গদেশের নানা স্থানে ছোটবড় প্রায় ৮শ মাদ্রাসা ও ১১শ মস্জিদ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর নিজ গ্রামে তিনি একটি 'ওল্ডস্কীম' ও একটি 'নিউস্কীম' মাদ্রাসা এবং একটি ভাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (পূ. গ্র. পৃ. ৬৫—৬৬)। ১৯২৮ সালে কল-কাতা আলিয়া মাদরাসার প্রথম গভর্নিং বডী গঠিত হয়। তিনি এর সদস্য ছিলেন (তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই আলিয়া: আবদু'স সাত্তার, ঢাকা ১৯৫৯, পৃ. ৮৪—৮৫)।

সমাজ সংস্কারক হিসাবে আবু বক্র সিদ্দীকীর অবদান রয়েছে বিরাট। তিনি মুসলিম সমাজ হতে শির্ক, বিদ্'আত ও অনৈসলামী কাজকর্ম দূর করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। তাঁর পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩১৭/১৯১১ "আঞ্জু-

মানে ওয়ায়েজীন'' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ১২৫)। এর উদ্দেশ্যা-বলীর মধ্যে ছিল, মুসলিমগণকে হেদায়াত করার জন্যে ওয়া'জ-নসীহতের ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিবিধান করা ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা। এই আঞ্জুমানের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল (ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ৩২৭; মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃ. ৩২১।) মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন।

জমিয়ত-এ-ওলামা এ-হিন্দ ১৯১৯ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়। (এর একটি শাখা হলো জমিয়তে ওলামা-এ-বাঙ্গালা ও আসাম)। মওলানা সিদ্দীকী শেষোক্ত প্রতি-ষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন 'শরীয়ত, হকীকত ও মারেফাতে পূর্ণরূপে আমল করে দেশ ও কওমের খেদমতের জন্যে আলেম-দের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া আবশ্যক'' (শরিয়তে এসলাম, ১৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪২)। তিনি আরও বলেছিলেন, ''রাজনীতির ক্ষেত্র হতে আলেমদের সরিয়ে পড়বার কারণে আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কাজ হচ্ছে'' পূ. সা.)।

কলকাতায় ১৯২৬ সালে জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দের বার্ষিক সভায় অসহ-যোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি এর বিরোধিতা করেন। তিনি এ প্রসংগে বলেছিলেন, ''আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট ও মহা ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। স্ব-রাজ স্বাধীনতা সকলের কাম্য, তা লাভ করার জন্যে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন, নতুবা তার ফল হবে ভয়ংকর বিষময়। ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। তারা সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত করতে হবে, অন্যথায় মহা-সর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা

বিশেষ প্রয়োজন। (শরীয়তে এসলাম ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ১৪২-৪৩।) ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরীদান, মু'তাকিদীন ও সাধারণ মুসলিমগণকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করেছিলেন (ছুন্নত অল জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৬ : হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ২৪৬)।

জমিয়তের সভাপতি হিসাবে তিনি সা'উদী আরবের সুলতান আবদুল-আযীম ইবনে সাউদকে শরীঅত বিরোধী কার্যাদি রোধ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে ১৩৫১ হি-তে পত্র লিখেন। "এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও চেষ্টা করা হবে" বলে বাদশাহ্ তাঁর পত্রের জবাব দিয়েছিলেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ১১৫-১৭)।

তাঁর খলীফাদের সংখ্যাও অনেক। এরা তাঁর অনুসরণে কাজ করে গিয়েছেন। ফলে তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর আরব্ধ কাজে ছেদ পড়ে নি। তাঁর পাঁচ পুত্র। প্রথম পুত্র শাহ সূফী আবু নাস্‌র মুহাম্মদ আবদুল-হাই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পুত্রের সকলেই 'ইল্‌ম-ই-শারীঅতে জ্ঞানসম্পন্ন এবং তাঁর খলীফা ছিলেন।

তিনি ১৯৩৪ খৃ: হতে বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। ১৯৩৮ খৃ: তাঁর আরও কিছু রোগ দেখা দেয়। ফলে তিনি ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন তিনি চিকিৎসার জন্যে কলকাতা গমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফুরফুরায় ফিরে যান। ১৯৩৯ খৃ: মার্চ মাসের ৫, ৬ ও ৭ তারিখের ঈসালে-ই-ছাওয়াব অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্তের সাথে তিনি নিয়ম মাফিক দেখা সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদেরকে যথারীতি তালীম দেন। তিনি মাহ্‌ফিলের আখিরী মুনাজাতও পরিচালনা করেন। ১৭ই মার্চ, ১৯৩৯ খৃ: শুক্রবার প্রাতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরার মিয়াপাড়া মহল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। এখনও প্রতি বৎসর ফাল্গুনের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে সেখানে 'ঈসাল-ই-ছাওয়াবে'র মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শাহ আবু বাক্‌র সিদ্দীকী সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দানী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সেই যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ বলেও আখ্যায়িত করেছেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ: ১২৫)। তাঁর কিছু কারামাতেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (পূ: গ্র: পৃ: ১৮৫-১৯১)।

মোটকথা, হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী ও তাঁর শিষ্য খলীফাদের দ্বারা উভয় বাংলায় মুসলমান ও ইসলামের বিরাট খেদমত সাধিত হয়। বলা চলে, উভয় বাংলায় ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকে থাকা এবং এ অঞ্চলে ইসলামী জাগরণ বজায় রাখাতে ফুরফুরা দরবারের বিরাট অবদান রয়েছে।

মওলানা রুহুল আমীন

[জ: ১৮৮২ খৃ—মৃ: ১৯৪৫ নভে:]

অবিভক্ত বাংলায় যে সব ওলামা এবং পীর-মাশয়েখের ক্ষুরধার লেখনী, ইসলামী দাওয়াত এবং ওয়াজ-নসীহতের ফলে মুসলিম বাংলায় ইসলামী চেতনা এবং মানুষের মধ্যে ধর্মভাব ও ধর্মপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে, মওলানা রুহুল আমীন তাঁদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নাম। এদেশে ইসলামী কৃষ্টি-তমদ্দুন ও শিক্ষাকে বহাল রাখা এবং এগুলোর প্রচারে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। আল্লাহপ্রেমে তাঁর বিগলিত অন্তর এবং ওয়াজের সময় আল্লাহভীতিতে প্রবাহমান অশ্রুধারা ও করুণ কন্ঠস্বর যে কোনো শ্রোতার মনকে ধর্মীয় আবেগে উদ্বেলিত করে তুলতো। বক্তৃতার মাঝে মাঝে দার্শনিক ও সূফী কবি জালালুদ্দীন রুমীর মসনভী কাব্য থেকে তিনি যখন আল্লাহপ্রেম-বর্ধক শেয়ার ও কবিতা সুর দিয়ে আবৃত্তি করতেন, তখন সভার সকল শ্রোতৃমন্ডলী তন্ময় হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতেন। মওলানা রুহুল আমীন বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, লেখক, সাহিত্যিক, বক্তা, রাজনীতিক, বাগ্মী, পীর। মওলানা রুহুল আমীন সাহেব উভয় বাংলায় সুললিত কন্ঠস্বরের যাদুমন্ত্রের অধিকারী এক বক্তা বা ওয়ায়েজ ছিলেন। কেবল তৎকালীন সময়ই নয়—আজও বহু ওয়ায়েজ যখন তাঁর সেই জনপ্রিয় সুরে ওয়াজ করেন কিংবা মসনভীর শেয়ার সুর করে পড়তে থাকেন, তখন গ্রামীন শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর অধিক আকর্ষণ ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১২৮৯ (?) বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণা জিলার বশিরহাট মহকুমার টাকী নারায়ণ-পুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্‌শী গাযী দবীরুদ্দিন ও মাতার নাম রাহীমা খাতুন। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই ধার্মিক ছিলেন। পুত্রকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করার জন্যে পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু মক্‌তব-মাদ্‌রাসার অভাবে রুহুল আমীন শৈশবে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন না। এগার বছর বয়সে তিনি পড়াশোনা আরম্ভ করেন।

তাঁর মেধা ছিল প্রখর। মাত্র তিন বছরেই তিনি কুরআন মজীদ, একটি ফার্সী কিতাব এবং কয়েকটি বাংলা পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর সূফী আবদুশ-শাকীর তত্ত্বাবধানে বশিরহাট হাইস্কুলের হেড মৌলবী ওয়াজিদ আলীর নিকট তিনি ফারসী ও আরবী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। ওয়াজিদ আলীর আকস্মিক ইন্তিকালের ফলে এবং বশিরহাটে তাঁর লেখাপড়ার কোন সুবিধা না থাকায় উক্ত সূফীর উদ্যোগে তিনি ১৪।১৫ বছর বয়সে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পুত্রের খরচের জন্যে তাঁর পিতা প্রতি মাসে দশ টাকা প্রেরণ করতেন।

মাদ্রাসায় প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করতেন। জামায়াতে উলা (ফাদিলে) পরীক্ষায় তিনি সমগ্র আসাম ও বাংলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মাদ্রাসায় অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে ইল্ম-এ-কেরাতে বিশেষ পারদর্শী কারী বাশীরুল্লাহ্‌র শিষ্যত্বে তিনি তাজ্‌বীদ-এর নিয়ম কানুনসহ কুরআন শরীফ আদ্যো পান্তপাঠ করেন। তৎপর ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে তিনি ভর্তি হন। সাংসারিক অসুবিধার কারণে এক বৎসর পর তাঁকে এটা পরিত্যাগ করতে হয়।

এক সময় তাঁর নিজ গ্রাম টাকী নারায়নপুরে নদীর ভাঙ্গনের আশংকা দেখা দিলে তিনি বশিরহাটে নতুন বাড়ী নির্মাণ করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য কিতাবসমূহ সংগ্রহ করেন। এ গ্রন্থাগারে প্রায় ২৫০০০ গ্রন্থ ছিল। (কর্মবীর মওলানা রূহুল আমীন, পৃ: ৯২)। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রবল। ওয়াজ এর আমন্ত্রণে তাঁকে প্রায়ই সফরে থাকতে হতো। সফরেও কিছু কিতাবপত্র তাঁর সঙ্গে থাকত। রেলগাড়ীতে, স্টিমারে বা স্টেশনে একটু ফাঁক পেলেই তিনি হয় কোনো কিতাব পড়তেন অথবা কিছু লিখতেন। তিনি অসংখ্য হাদীসের হাফিজও ছিলেন।

কিতাবী জ্ঞান-অর্জন শেষ করে তিনি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রথমে মওলানা গোলাম সালমানী (র) (মৃ: ১৩৩০/১৯১২)-এর এবং তাঁর

মৃত্যুর পরে মওলানা আবু বক্র সিদ্দীকী (র) (মু: ১৩৫৮/১৯৩৯)-এর মুরীদ হন। তিনি শেষোক্ত পীরের খিলাফত লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে ওয়াজ করা ও কিতাব রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন

শাহ আবু বক্র সিদ্দীকী (র)-এর প্রতিষ্ঠিত "আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েযীন এ-বাঙ্গালা"-এর তিনি সেক্রেটারী ও প্রধান প্রচারক ছিলেন (মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃ: ৩৩)। একাধিকক্রমে ৩০/৩২ বছর তিনি বাংলা ও আসামের শহর-গ্রামে ওয়াজ করেন এবং ওয়াজে তিনি কোরআন ও হাদীসের বাইরে কিছু বলতেন না। অনর্গল হাদীস আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি বিদ্‌আতী ও ভণ্ড ফাকীর-দরবেশদের সঙ্গে বহু স্থানে তর্কবিতর্ক (বাহাছ) করেন ও তাদেরকে দলীল-যুক্তি দ্বারা পরাজিত করেন। এরূপ বাহাছের কিছু কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, যথা গৌরীপুরের বাহাছ, সিরাজগঞ্জের বাহাছ, নবাবপুরের বাহাছ ইত্যাদি (কর্মবীর মাওলানা রূহুল আমিন পৃ. ৬৩—৬৯)।

তাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালী আলেমগণ সাধারণত: বাংলা ভাষার চর্চা করতেন না এবং বাংলাতে পুস্তক রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আবু বক্র সিদ্দীকী (র) রুহুল আমিনকে বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যখন তিনি তাঁর পীরের সংগে হজ্জ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর পীর তাঁকে বঙ্গ ভাষায় পরিষ্কার ভাবে হজ্জ ও যেয়ারতের বিবরণ লিখে ছাপিয়ে বাংগালী হাজ্জীদের হজ্জ সহজ সাধ্য করার নির্দেশ দেন। তিনি এ নির্দেশ পালন করেন। মাযাহাব অনুসরণ (তাকলীদ), কাদিয়ানী মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের মতামত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে তিনি যে কয়েক-খানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো : (১) মাযহাব মীমাংসা, (২) ছায়েকাতোল মোছলেমিন, (৩) দাফয়োল মোফছেদিন, (৪) ফেরকাতোন নাজেয়ীন, (৫) কাদিয়ানি-রদ (ছয় খণ্ডে সমাপ্ত)। প্রয়োজনীয় মাস্‌আলা-মাসায়েল সম্পর্কে বাংলায় নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব দেখে তিনি লিখেন : জরুরী মাসায়েল (৩ ভাগে), হানাফী ফেকাহতত্ব বা মাছলা ভাণ্ডার (৩ ভাগে), অতি জরুরী মাছলা মাছায়েল, ইত্যাদি। তিনি বহুবিধ ফাতওয়াও প্রদান করেছেন। সে সকল ফাতওয়া 'ফাতাওয়ায়ে আমিনীয়া গ্রন্থে (৭ ভাগে) সংরক্ষিত আছে। তিনি মওলানা আকরম

খাঁ (মৃ:১৯৬৮ খৃ:)-এর 'মোস্তফা চরিত' ও 'তাফ্সীর' গ্রন্থে উল্লিখিত আকাইদ সংক্রান্ত কিছু মত ও মন্তব্যের জবাবে 'খাঁ ছাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ', 'খাঁ ছাহেবের তাফছীরের প্রতিবাদ', 'আমপারার তাফছীর' ইত্যাদি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় কিছু সমস্যা সম্পর্কেও তিনি লেখনী চালনা করেন। তাঁর এ জাতীয় লেখা, যথা : (১) তরদীদোল মোবতেদীন, (২) বাগমারী ফকিরের ধোকাভঞ্জন, (৩) এবতালোল বাতেল, (৪) গ্রামে জোমা (জুমুআ:), (৫) ইসলাম ও সঙ্গীত, (৬) ইসলাম ও বিজ্ঞান, (৭) ইসলাম ও পর্দা, (৮) দালীন ও জালীনের মীমাংসা, (৯) খতম ও জিয়ারতের ওজরতের মীমাংসা ইত্যাদি। পীরী মুরীদী ও তাসাওউফ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রয়েছে। তাঁর 'বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ'ও কুরআন মজীদের প্রথম তিন পারার তাফসীর তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি জীবনী গ্রন্থও রচনা করেছেন, যথা : (১) ফুর-ফুরার পীর ছাহেবের বিস্তারিত জীবনী (পৃ: সংখ্যা ৪০৯), (২) হজরত বড় পীরের জীবনী (পৃ: সংখ্যা ১২২ এবং (৩) বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়ার কাহিনী। তিনি প্রায় ১২৫টি পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা এবং সবগুলোই বাংলা ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে ১১৪টি পুস্তক এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে কর্মবীর মওলানা রুহুল আমিন, ১১৫ ২০; আল-আমিন ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭, পৃ: ৯৮ ।

তাঁর সময় পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা অধিকতর দুরূপ ব্যাপার ছিল। এতদসত্ত্বেও মওলানা রুহুল আমিনের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ১৯২৬ সালে সাপ্তাহিক 'হানাফী' প্রকাশিত এবং এটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক 'মোসলেম' ও মাসিক 'সুন্নত অল-জামায়াত' প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি পত্রিকাই মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ইসলাম দর্শন', 'শরিয়াত', 'শরিয়াতে এসলাম' ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বাংলার বহু স্থানে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করে মসজিদ-মাদ্রাসার সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজ গ্রামে এতীমখানা ও ওল্ডস্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রাদেশিক জমিয়ত-এ-ওলামার সভাপতি ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি এক সময় শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কারণ, প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সংগে নীতির প্রশ্নে তিনি একমত হতে পারেন নি (আল-আমীন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ: ১০)।

তিনি অমায়িক, মিতভাষী, বিনম্র কিন্তু বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন অথচ খুব সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন। সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর পীর তাঁকে 'ইমাম' ও 'আল্লামা-ই-বাঙ্গালা' উপাধি প্রদান করেছিলেন (কর্মবীর মওলানা রুহুল আমিন, পৃ: ২৬, ২৭)। মওলানা রুহুল আমিনের বহু মুরীদ রয়েছে। খুলনার মুহাম্মাদ মুয়েযযুদ্দীন হামীদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (হামিদী চরিত, পৃ: ৭৩—৭৬)।

জীবনে বিশ্রামের অবকাশ তিনি পান নি। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয় পড়ে। তিনি অগত্যা কলকাতায় গিয়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীন হন। বাহ্যত: তাঁর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। এমন সময় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ১৬ কার্তিক (১৯৪৫ খৃ: ২রা নভেম্বর) শুক্রবার যথারীতি তাহাজ্জুদ ও ফজরের সালাত আদায় করে যখন তিনি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ওজীফা পাঠ করছিলেন, তখনই তাঁর ইন্তিকাল ঘটে। কলকাতায় একবার এবং বশিরহাটে আর একবার তাঁর সালাত-এ জানাযা পড়া হয়। শনিবার অপরাহ্নে তাঁর বাড়ীর সম্মুখস্থ আমবাগানে তাঁকে দাফন করা হয়।

— —

মওলানা নেছারুদ্দীন আহ্‌মদ

(জ: ১৮৭৩ খৃ:—মৃ: ১৯৫২ খৃ: ৩১শে জানু:)

বাংলাদেশের মানুষ পীর-মাশায়েখের সাহায্যেই বিশেষত: ইসলামের আলোর সন্ধান পেয়েছিল। এদেশের মানুষকে তাঁরাই যেমন ইসলামের সন্ধান দেন, তেমনি তাঁদের জীবনকে যখন বেদঅতশির্ক ইত্যাদি কুসংস্কার আচ্ছন্ন করে ফেলতো, তখন অন্ধকার থেকে তাদেরকে মুক্তকরে ইসলামের নির্ভেজাল পথে আনয়নে ওলামা-মাশায়েখ বৃন্দই যুগেযুগে এগিয়ে এসেছেন। পরাধীন-স্বাধীন, অনকূল-প্রতিকূল, সর্বাবস্থায়ই তাঁরা এ দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ওলামা ও পীর-মাশায়েখের সেই ধারারই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন শর্ষিনার পীর হযরত মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব। এ নক্ষত্রের আলো বহু ধারায় বিচ্ছুরিত হতো—শিক্ষাদানে, ওয়াজে, নছীহতে, লেখায়, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে, জাতীয় সংকটে রাজনৈতিক নেতৃত্বে। তিনি যেমন ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু, তেমনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও দ্বীনী শিক্ষার মহা সাধক। বাংলা ভাষাভাষী-দের মাঝে জ্ঞানের আলো বিশেষ করে দ্বীনী শিক্ষার আলো বিস্তারে অসংখ্য কীর্তির মাঝে মওলানা নিছারুদ্দীন সাহেবের সর্ববৃহত কীর্তি হলো বৃহত্তর বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠির অধীন শর্ষিনা দারুস্‌সুন্নাহ্ আলিয়া মাদ্রাসা। এটি দেশের উচ্চ দ্বীনী শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ। এ মহান পতিষ্ঠানটির ন্যায় এদেশে আরও বহু আলিয়া মাদ্রাসা থাকলেও ইল্‌মে হাদিসের সাথে সাথে এখানকার ছাত্রদের মধ্যে আমলী ও রুহানী প্রশিক্ষণ দানের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি মণ্ডিত এবং খ্যাত।

বরিশাল জিলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানাধীন শর্ষিনা গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (১৮৭২/৭৩ খৃ:) বাংলাদেশের অন্যতম মহান পীর ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক মওলানা পীর নেছারুদ্দীন সাহেবের জন্ম। তাঁর পিতার নাম সাদরুদ্দীন আহমদ। জনাব সাদরুদ্দীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত ও প্রতিভাবান গ্রাম-প্রধান ছিলেন। তিনি মরহুম হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র পুত্র হাজী সাঈদুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন।

পীর সাহেবের বাল্যশিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। বাল্যজীবনে তিনি সরল, সুবোধ, বিদ্যানুরাগী ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। ধার্মিক পিতামাতার প্রভাবে বাল্যজীবনেই তাঁর ধর্মীয় অনুরাগের স্ফুরণ ঘটেছিল। শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর মাতার চেষ্টায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুরের একটি মাদ্‌রাসায় তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষা অর্জন করেন। পরে তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাধ্যমিক মানের মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন।

কলকাতা মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা পীর হুগলী জিলার মওলানা শাহ সূফী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ উরফে আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর হাতে বায়'আত হন। অতঃপর তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর সাহচর্যে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা লাভ করেন।

এভাবেই তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি তাঁর মুরশিদের নির্দেশে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি ইল্‌ম-এ-মারিফাতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং পীরের নিকট হতে খিলাফত লাভ করতঃ সূফী তরীকায় দীক্ষা দানে অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

হেদায়াত ও তাব্‌লীগের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করে মুসলিম সমাজের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দর্শনে বিশেষভাবে মর্মাহত হন এবং শিক্ষা ব্যতীত এই সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়—এ সত্য উপলব্ধি করেন। এ চেতনা থেকে তিনি নিজ বাড়ীতে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর পীর সাহেবের নির্দেশক্রমে ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থাদী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে চলতে থাকেন। তা হলো, নিজ ও পার্শ্ববর্তী জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে হেদায়াত ও তাবলীগ করা, বাংলা ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি প্রণয়ন ও বিভিন্ন এলাকায় মস্‌জিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন। পরবর্তীকালে তিনি একজন কামিল পীর হিসাবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁর হাতে বায়'আত হয়। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ সারাদেশে ইসলামী

আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভাসমিতির মাধ্যমে তিনি বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করেন। তিনি দেশের লোক-দের ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং খালীফা ও ভক্তগণ এ মহান দ্বীনী খিদমতে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন। তিনি নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মানের ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নীত করেন। সরকার পরিচালিত কলকাতা মাদ্রাসার পরেই অবিভক্ত বাংলায় এটাই সর্বপ্রথম বেসরকারী কামিল মাদ্রাসা। এটি একটি বৃহৎ আবাসিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বহু শত শিক্ষার্থীর ফ্রী আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা রয়েছে। মাদ্রাসাটি প্রধানতঃ দেশবাসীর আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সরকারও মাদ্রা-সাটির উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ধর্মীয় ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষা-দীক্ষা ও দেশের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে একটি বার্ষিক মাহ্ফিলের আয়োজন করেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের চৌদ্দ, পনর ও ষোল তারিখে এ মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়। এত-দ্ব্যতীত তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর মাদ্রাসায় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসার উন্নতি বিধান, ইসলামী শিক্ষার সমস্যাদি পর্যালোচনা, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই এই মাহ্ফিলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্যে তিনি আলেম সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে বহু ইসলামী পুস্তক রচিত হয়। তন্মধ্যে তারীকু'ল-ইসলাম, তা'লীম-ই-মা'রিফাত, আল-জুমুআ, মাসায়িল-ই-আরবাআ, নারী ও পর্দা, মাযহাব ও তাকলীদ, ফতোয়া-ই-সিদ্দীকীয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকভাবে বিস্তারের লক্ষ্যে বহু সংখ্যক বিভিন্ন মানের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর সংখ্যা প্রায় শতাধিক। বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জিলার বিভিন্ন এলাকায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত।

পীর সাহেব অনেকগুলো সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তন্মধ্যে হিমায়াত-ই-ইসলাম তহবিল, এহইয়া-এ-সুন্নাত তহবিল উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত তহবিলে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হতো।

তিনি বিনয়ী ও ধনী-দরিদ্র সকলকেই সমানভাবে দেখতেন আদর আপ্যায়ন করতেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামী রীতিনিয়ম চালু ও অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী ছিলেন।

তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সংগে প্রত্যক্ষ জড়িত না থাকলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তখনকার পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের কল্যাণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংগে মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি সরাসরি যোগাযোগ ও পত্রালাপ করতেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করতেন।

পীর সাহেব ইসলামী আইন-কানুন মুতাবিক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৭ সালের ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর শর্ষিনাতে ঐতিহাসিক 'ওলামা' সম্মেলন আহ্বান করেন। দেশের বিশিষ্ট 'আলেম-ওলামা' ও রাজনীতিকগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচারকার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলায় মাহকামা-এ-কাযা প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহীত হয়। ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার উনাসী বছর বয়সে পীর সাহেব ইনতেকাল করেন। বাংলাদেশের ভিতর ও বাইরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত মুরীদ রয়েছে। তিনি জমিয়তে ওলামা-এ-বাংলার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রেখে যান। বর্তমান গদীনশীন পীর মওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ তাঁর বড় ছেলে এবং অপর ছেলের নাম মওলানা সিদ্দিক আহমদ যিনি মেঝো পীর সাহেব হিসাবে পরিচিত।

মওলানা নিছারুদ্দীন আহ্‌মদ মাদ্রাসা ছাত্র এবং ওলামা-এ-কেরামের মধ্যে ইসলামী আদর্শের অনুপস্থিতি দেখলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। কর্মজীবনে এসে যাতে কোনো মাদ্রাসা পাস ছাত্র আলেমসুলভ চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত না হয়, এ জন্যে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে ওছিয়ত করতেন। বরং তাঁর আজীবনের সাধনা এবং কর্মতৎপরতা এই কেন্দ্রবিন্দুকে নিয়েই আবর্তিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতি করা এবং ওয়াজের সাহায্যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অটল রাখার জন্যে

তিনি আমরণ চেষ্টা সাধনা করে গেছেন। মানুষকে আল্লাহ্‌র নেকবান্দায় পরিণত করার জন্য ইসলামের এই দরদী মোর্শেদ —শুধু ওয়াজ নসীহত, এবং মাদ্রাসা-মকতব প্রতিষ্ঠাতেই নিজের কর্মতৎপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষা আদর্শ বিস্তারকল্পে ইসলামী প্রকাশনা বিভাগও খুলেছিলেন। তাঁর একাজে সবচাইতে তাঁকে সহযোগীতা দিয়েছেন, তার সহকর্মী মাও: এমদাদ আলী সাহেব। বাংলাভাষায় শর্ষিনার ইসলামী সাহিত্য এদেশে ইসলামী মূল্যবোধ, কৃষ্টি তমদ্দুন রক্ষায় বিরাট সম্পদ। ফুরফুরা দরবারের দুই খলীফা হযরত মওলানা রুহুল আমীন এবং শর্ষিনার হযরত মওলানা নেছারুদ্দীন ও উত্তরসূরী মওলানা মুয়েজ্জুদীন হামিদী প্রমুখ বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে যে অবদান রেখে গেছেন, এগুলোর প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন ফুরফুরার পীর সাহেব হুজুর। এদিক থেকে বাংলা ভাষায় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তাদেরকে ইসলামের অনুসারী রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে হযরত মওলানা নেছারুদ্দীন সাহেবসহ ফুরফুরা দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ওলামা ও পীর মাশায়েখের সাহিত্য ক্ষেত্রের অবদানটিও বিরাট এক ব্যাপার।

রাজনৈতিক তৎপরতা

শর্ষিনার পরী মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব ও ফুরফুরার মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দীকী মুসলিম লীগ ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যেভাবে এ দেশের সকল মানুষের দুয়ারে পৌঁছাবার জন্যে তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন এবং ফুরফুরার বড় পীর সাহেব কর্তৃক স্থাপিত "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসামে"র তরফ থেকে মুসলিম লীগ নেতাদের কথা ও কাজে ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, তা সত্যিই সমাজের জন্যে প্রেরণার বিষয়। সিলেটের গণ ভোটের প্রাক্কালে শর্ষিণার পীর সাহেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, না জানি সিলেটের মুসলমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রায় দেয়। এ আশংকায় তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা আবুজাফর মুহাম্মদ সালেহ ছাহেবসহ বহু ভক্তকে সিলেটে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপারে শুধু রাজনৈতিক সুবিধাই যে মানুষ চায়নি এবং আলেম সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক না হলে যে এ দেশের মুসলমানদের ভিন্নমত প্রকাশ করার সম্ভাবনা ছিল, শর্ষিনার দূরদর্শী পীর নেছারুদ্দীন সাহেব কর্তৃক কায়েদে আযমকে লিখিত একটি চিঠি থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

"মুসলিম লীগ আজ যতোখানি রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই পরিমাণ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণে জনসাধারণ 'পাকিস্তান' শব্দ বার বার শুনিয়া কন্ঠস্থ করিলেও উহা তাহাদের কতোখানি আপনার জিনিস তাহারা সেইটা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের দিক দিয়া ভাল বুঝিতে পারে না—তাহারা উহা বুঝিতে চাহে ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির স্বীকৃতির ভিতর দিয়া এবং উহা কার্যত: কিভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাও কাজের ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।"

বস্তুত: ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের এজাতীয় জিজ্ঞাসার জবাব হিসাবেই কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, এ দেশের অর্থ ও সমাজব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বার বার ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ওয়াদা করেছিলেন। এ কারণেই দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে কায়েদে আযম তাঁর দক্ষিণ হস্ত মওলানা যাফর আহমদ আনছারীর মাধ্যমে প্রেরিত পয়গামে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করার ওয়াদা প্রদান করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

(জ: ১৮৮৯ খৃ:—মৃ: ১৯৬৮ খৃ: ১৮ই আগ

মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ ১৮৮৯ খৃ: চব্বিশ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমাধীন হাকিমপুর গ্রামের বিখ্যাত খাঁ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগষ্ট ঢাকায় ইনতেকাল করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা হাজী আবদুল বারী খাঁ গাজী। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১০/১২ বছর বয়সেই মাওলানা আবদুল বারী সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী ঘোষিত শিখ ও ইংরেজবিরোধী জেহাদে যোগদান করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত গমন করেছিলেন। খাঁ বংশের উর্ধতন পুরুষরা কুর বা ব্রাহ্মণ ছিলেন। জানা যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ একই বংশোদ্ভূত। (১)

বাল্যকালেই মওলানা আকরম খাঁ পিতৃ মাতৃহীন হয়ে পড়ায় বিভিন্ন অভাব, উপেক্ষা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হন। তিনি ১৯০১ খৃ: কল-কাতা মাদ্রাসা থেকে এফ এম পরীক্ষা পাশ করেন। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে মাদ্রাসায় সামান্যতম ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলা লেখা-পড়ার সুযোগ ছিলনা। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইংরেজী বাংলা জানতেন না। কিন্তু চেষ্টা থাকলে একজন লোক ভাষা-জ্ঞানের কোথায় উপনীত হতে পারে মওলানা আকরম খাঁ তার বড় প্রমাণ। তিনি চেষ্টা-সাধনা দ্বারা ইংরেজীতে ভাল জ্ঞানার্জন করেন এবং বাংলা ভাষায় ঐতিহ্যবাহী আজাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হওয়া ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আরবী, ফারসী ও উর্দূতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ফার্সীতেও কবিতা লিখতেন। স্টিন সাহেব কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ থাকাকালে এক সভায় আকরম খাঁ স্বরচিত একটি ফারসী কবিতা আবৃত্তি করে উপস্থিত আলেমদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক রূপেই মওলানা আকরম খাঁর কর্মজীবনের সূচনা ঘটে—(১৯১০ খৃ:)। এ পত্রিকায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার উর্ধে উঠে ইজতেহাদ করার চেষ্টা করেন। মুজতাহিদ সুলভ মনোবৃত্তি মওলানাকে কোরআন-হাদীস ও

(১) সওগাত, ঢাকা ৫৮, মাচ ১১শ সংখ্যা

আরবী ভাষা-সাহিত্য চর্চায় আজীবন নিমগ্ন রাখে। তাঁর যুক্তিবাদী ইজতেহাদের জন্যে কেউ কেউ তাঁকে মোতাজেলী ভাবাপন্ন বলতেন।

৪৭-এর আজাদী আন্দোলনে মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান অপরিসীম। মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আকরম খাঁ তখন তাঁর সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদের মাধ্যমে জনগণকে আজাদী পাগল করে তোলেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা তিনি ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগ সৃষ্টি করেন। মূলতঃ এজন্যেই বলা হয় যে, মওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর আজাদ পত্রিকা না থাকলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান হতোনা আর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতোনা। ফলে পশ্চিম বাংলার মতো ভারতের অধীন থাকতে হতো। আজ যে সকল পুরাতন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মওলানা আকরম খাঁর আদর্শকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেন, তাদের হয়তো একজনও বাদ পড়বেন না, যারা আজাদী আন্দোলনের বীর সিপাহী এই "মওলানা সাংবাদিকে'র কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ঋণী নন।

উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা মওলানা আকরাম খাঁর মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাঁর কর্মবহুল জীবনই এর জ্বলন্ত স্বাক্ষী। দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণের জন্যে তিনি স্বাধীনতাকে প্রথম ও প্রধান শর্ত গণ্য করেছিলেন। এজন্যেই তিনি পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে আপোষহীন ছিলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় ঐ সময় অনেকে এগিয়ে এসেছেন বটে কিন্তু জাতীয় জাগরণ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান সর্বোচ্চে। কেননা, তাঁর দ্বারাই বাংলার ঘরে ঘরে আজাদী পাগল মানুষের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী পৌঁছেছিল অধিক। তাঁর নির্ভীক ভূমিকার ফলে তিনি ইংরেজদের রোষ দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে "আরবের খেজুর গাছের তল থেকে আগত" বলে ভারত থেকে তাদের সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর অনুকূলে বহু অযুক্তির অবতারণা করে তারাই ভারতের একচ্ছত্র মালিক বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতেন। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাদের যাবতীয় কূটযুক্তির জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। মওলানা সাহেব খিলাফত, অসহযোগ

আন্দোলন সহ এ দেশের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গেই সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। মুসলমান প্রজাদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্যে তিনি "বঙ্গ প্রজা সমিতি" গঠন করেছিলেন। নিরাশাগ্রস্থ মুসলমানদের মধ্যে আত্মজাগরণ সৃষ্টি করতে হলে তাদের চিন্তার দুয়ারের কড়া প্রথম নাড়া দিতে হবে। এজন্যেই তিনি লেখনীর অস্ত্রকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং প্রথমে 'সেবক,' 'আল্-ইসলাম' ও উর্দূ দৈনিক 'জামানা' পত্রিকা বের করেন। সেবক পত্রিকায় "অগ্রসর! অগ্রসর!!" শিরোনামায় উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার তাঁকে গ্রেফতার হতে হয় এবং পত্রিকার জামানত তলব করা হয়। মওলানা আকরাম খাঁ কলমের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা-বাগ্মীতায়ও অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে সহজেই প্রভাব বিস্তার করতো। তিনিও অন্যান্যদের মত সর্ব প্রথম কংগ্রেসেই ছিলেন। কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের শক্তিকে অধিক জোরদার করেছিলেন। মূলতঃ ঐ সময়ই হিন্দু নেতাদের মুসলিম-স্বার্থ-বিরোধী মানসিকতার সঙ্গে তাঁর সঠিক পরিচয় ঘটে। বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের ভিতর দিয়েই মওলানা আকরাম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়।

১৯৩৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তিনি যোগদান করে-ছিলেন। ঐ অধিবেশনেই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মওলানা হাসরাৎ মোহানী। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মওলানা হাসরাৎ মোহানী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীর বিরোধীতায় তাঁর সে দাবী নাকচ হয়ে যায়। কেননা কংগ্রেস তখন পর্যন্ত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। অবশ্য মুসলিম লীগের অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার পরবর্তী কালে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হয়। (অতীত দিনের স্মৃতি পৃঃ ১৭১ দ্রঃ)

মওলানা আকরাম খাঁ মুসলিম লীগে যোগদান করে এর সাংগঠনিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিনি সভাপতি ছিলেন। অপর দিকে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজাদীর পরও তিনি দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মওলানা আকরাম খাঁ অবি-ভক্ত পাকিস্তান গণপরিষদ ও তালীমাতে ইসলামিয়া বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আইয়ুব সরকারের আমলে তিনি ছিলেন ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম

সদস্য। ১৯৫৪ সালে এই সংগ্রামী নেতা সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে সরে এলেও তাঁর কলমের সংগ্রাম আজাদ পত্রিকা মারফত অব্যাহত থাকে। এই বৃদ্ধ সংগ্রামী নেতা আইয়ুব আমলে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিলে নেমে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। সাবেক পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে বার্ধক্যের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি জীবনের চরম অবস্থায় পৌছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা কায়েদে আযমকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আজাদী সংগ্রামের এক নির্ভীক সৈনিক ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ। তিনি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ চেষ্টা করেন।

"বন্দে মাতরম" ও মওলানা আকরাম খাঁ

মুসলিম জাতীয়তা বোধের বিকাশ দানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মওলানা আকরাম খাঁ যেই বিরাট কাজ করেছেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজে অনুমেয়। কেননা জাতীয়তাবোধ তীব্রতর হওয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী জোরদার হয়েছিল। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, ব্যাঙ্গল প্যাক্ট ইত্যাদির ভিতর দিয়ে মুসলমানদের ব্যাপারে হিন্দু নেতাদের বিরূপ মনোভাবের দরুণ মুসলমানদের জাতীয়তাবোধ অনেক বৃদ্ধি পায়। তবে তা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ও 'শ্রীপদ্ম' প্রতীককে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস রাজনীতি ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এর রচয়িতা ছিল বিখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মুসলিম-বিদ্বেষে-পূর্ণ তাঁ গ্রন্থ 'আনন্দ মঠে' এ সঙ্গীতটি রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী একদল সন্তানের মুখে এই সঙ্গীতটি গাওয়ানো হয়েছিল। এছাড়া এটি দুর্গাদেবীর প্রশস্তি হিসাবে রচিত হয়েছিল। লা-শারীক এক আল্লায় বিশ্বাসী কোন মুসলমান একে কিছুতেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মেনে নিতে পারেনা। দলমত নির্বিশেষ সকল মুসলমান এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল। কংগ্রেসীরা তবুও একে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবেই রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। কিন্তু

মুসলমানদের প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠলে কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তা মিমাংসায় এগিয়ে আসেন। তিনি বললেন, প্রথম চার লাইনকে দুর্গার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ না করে দেশ মাতৃকার বন্দনা হিসাবে গ্রহণ করা চলে এবং ঐটুকু জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। রবিন্দ্রনাথের এ পরামর্শ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেও মুসলমানরা মানতে রাজী হলেন না। তারা জানালেন, বন্দনা ও পূজা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া মুসলমানরা আর কারুর করতে পারে না। তাছাড়া এর রচনার পটভূমি ও এর সঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষের যে যোগ রয়েছে, মুসলমানরা তা ভুলে যেতে পারেনা। এটা হিন্দুদের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারলেও মুসলমানদের কিছুতেই হতে পারে না।—("অতীত দিনেরস্মৃতি"।)

'বন্দে মাতরম' ও 'শ্রীপদ্ম'কে কেন্দ্র করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীপদ্ম অঙ্কিত মনোগ্রামকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ পত্রে প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। মওলানা আকরাম খাঁর পত্রিকা মোহাম্মদীতে শ্রীপদ্ম মনোগ্রাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুসলমান ছাত্রেরা যুক্তি দিত, 'শ্রী' হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সরস্বতী' এবং 'পদ্ম'কে তার আসন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পৌত্তলিক ভাবধারার মনোগ্রাম মুসলমানদের প্রতীক হতে পারে না। মওলানা আকরাম খাঁ বন্দে মাতরম ও শ্রীপদ্মের সপক্ষে আনীত যুক্তিসমূহ সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদীতে ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করতেন। এ আন্দোলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'শ্রী' বাদ হয়ে শুধু 'পদ্ম' থাকে। পদ্মকে বাংলাদেশের একটি ফুল হিসাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এতে মুসলমান ছাত্ররা অনেকটা দমে যায়। 'শ্রী পদ্ম' ও 'বন্দে মাতরমে'র আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা দীর্ঘ দিন থেকে নামের পূর্বে যেই 'শ্রী' ব্যবহার করত তা পরিত্যক্ত হয়। মুসলমানদের নামের পূর্বে 'জনাব' ও 'মৌলভী' ব্যবহারও তখন থেকেই বৃদ্ধি পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম চেতনাবিরোধী আরও বহু ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাড়িয়েছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তানকে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। এজন্যে পূর্ব থেকেই তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করেন।

বলাবাহুল্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি অনাসক্ত এদেশের আলেম সমাজের ও সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে লেখা ও সাংবাদিকতার প্রেরণা মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুনশী মেহেরুল্লাহ, ফুরফুরার পীর সাহেব, মওলানা রুহুল আমীন প্রমুখ আলেমরাই অধিক সৃষ্টি করেন। এভাবে ত্রিমুখী-চৌমুখী আন্দোলনেই ৪৭-এর স্বাধীনতা আসে।

———

মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী

[জ: ১৮৮৬ খৃ—মৃ:]

১৮৮৬ খৃ: বর্ধমান জেলার টুবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত লালবাড়ী মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক আরবী, ফারসী ও উর্দু শেখেন। অতঃপর তিনি কানপুরের জামেউল উলুম মাদ্রাসায় ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

মওলানা বাকী স্বীয় পিতা মওলানা আবদুল হাদীর (১৯০৬ খৃ:) ইন্তেকালের পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সের সময় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং উত্তরবঙ্গের আহলে হাদীস জামায়াতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ জামায়াতের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মওলানা আকরাম খাঁ, মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও ড: শহীদুল্লাহর পাশাপাশি তিনি আঞ্জুমানে উলামা-এ-বাঙ্গালা'র প্রতিষ্ঠা ও তার বিভিন্ন কর্ম তৎপরতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

আজাদী আন্দোলন

আজাদী আন্দোলনে মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মওলানা বাকী প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা কাফীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই উপমহাদেশের মুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলন ইতিহাসের দুই গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তিত্ব। জাতির সার্বিক কল্যাণ-চিন্তায় মওলানা কাফীর ন্যায় মওলানা বাকীও ছিলেন নিবেদিত। তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িত হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভি-যোগে তাঁকেও অতিরিক্ত জেল ভোগ করতে হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি কৃষক প্রজা আন্দোলনে যোগদেন। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং এ দেশবাসীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি সে সময় কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি হিসাবে জনগণের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করতেন। মওলানা বাকী ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে একে অধিক জোরদার করে তোলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। মওলানা বাকী আজাদী আন্দোলেনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, তার দীর্ঘ বিবরণ এখানে সম্ভব নয়। তিনি আজাদী-উত্তর কালেও মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার্ধক্যে পৌছেও ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ইংরেজীও জানতেন। কোরআন, হাদীস, ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল, "আল এসলাম" পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার একমাত্র পুস্তক হলো 'পীরের ধ্যান'।

———

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী

[জ: ১৯০০ খৃ: — মৃ: ১৯৬০ খৃ:]

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আজাদী আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী বীর ছিলেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক যুক্তিবাদী বিচক্ষণ আলেম ছিলেন। এক হিসাবে বলা চলে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টিকল্পে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, পুস্তক রচনা তথা সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে কয়জন আলেম নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মওলানা কাফী অন্যতম অগ্রপথিক। এই ইসলামী চিন্তাবিদ কলকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ থেকে ১৯১৯ সালে বি, এ, পাশ করে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিক মওলানা আবুল কালাম আযাদের সংস্পর্শে যান। সে সময় মওলানা আযাদ মাসিক 'আল হেলাল' পত্রিকার সম্পাদক। মওলানা আযাদ রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করে তিনি এখনকার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিকল্পে 'পূর্ব বাংলায়' আসেন। এখানে কিছুকাল সভা-সমিতির মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে পথনির্দেশ দিয়ে পুনরায় কলকাতা যান! মওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় খেলাফত কমিটির উর্দু দৈনিক 'যামানা' প্রত্রিকায় তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর সম্পাদকীয় প্রকাশের অভিযোগ মওলানা আকরম খাঁ ও পত্রিকার সহ-সম্পাদক শেখ আহ্‌মদ ওসমানী গ্রেফতার হলে তিনি ১৯২২ সালে 'যামানার' সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল্-কোরাইশী ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। সে সময়ও ঐ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এ দেশবাসীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরতেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুসলিম পার্টিতে শরিক হয়ে তিনি তাঁর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।

মওলানা কাফী এ দেশবাসীকে ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তিনি এ উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। বেশ কিছুদিন কারাগারে থাকার পর তাঁকে মুক্তি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুনরায় ৬ মাসের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে।

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুসলিম কনফারেন্সেও যোগদান করেছিলেন। আজাদী আন্দোলনের এই সংগ্রামী নেতা দেশ স্বাধীন হবার পর একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে রুগ্ন শরীর নিয়েও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আজাদী উত্তরকালে বরং তার কিছুকাল পূর্ব থেকেই তিনি এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে মসীযুদ্ধের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা থেকে ইসলামী জ্ঞান-সমৃদ্ধ গবেষণা মাসিক তারজুমানুল হাদীস প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা কাফী সাহেব একই স্থান থেকে সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশ করেন। নানা অসুবিধায় মাসিক 'তারজুমানুল কোরআনের' প্রকাশ কিছুদিন যাবত বন্ধ থাকলেও সাপ্তাহিক আরাফাত এখনও মওলানা কাফীর স্মৃতি নিয়ে ইসলামী জ্ঞান-পিপাসুদের খোরাক সরবরাহ করে যাচ্ছে। বার্ধক্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত থেকেও অবিভক্ত পাকিস্তানকে শোষণহীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তিনি কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলেন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা রাগেব আহসানের নিম্নের লেখাটি থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে :

"পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্যে তিনি আমাকে তাঁর দু'জন প্রতিনিধি দ্বারা ডেকে পাঠান। আমি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর খেদমতে হাযির হলে তিনি বল্লেন, পিত্তশূলের বেদনার জন্য যে অপারেশন করেছিলাম, তা বিফল হয়েছে। পিত্তকোষে কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেদনা আগের মতই বর্ধিত হয়েছে। ...... কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা আমাকে পানি থেকে তীরে নিক্ষিপ্ত অসহায় মৎস্যের ন্যায় বিচলিত করে তুলেছে। পাকিস্তানকে একটি সেকুলার স্টেটে পরিণত করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে, সে দৃশ্য অবলোকন করে আমি কিছুতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি না। এখন শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালার

উত্তর দেয়া একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করি। আমি বল্লাম, বান্দা খেদমতের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট আলেম এবং চিন্তাশীল সুধীবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, বিশেষ করে যারা ১৯৫১ এবং ৫৩ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কাফী সাহেব বল্লেন, এ ধরনের বৈঠকে দীর্ঘসূত্রিতার আশঙ্কা আছে। তবে ঢাকা শহরে অবস্থানরত চিন্তাবিদ ও আলেমগণের তরফ থেকে যদি প্রশ্নমালার উত্তর দেয়া যায় তা হলেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। ২৬শে মে রাত্র ১১টায় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর দীর্ঘ আলোচনা চলে।····· তিনি বেদনার ভাব অনুভব করলেন। তাঁর গায়ে জ্বরও এসে গেছে। তাঁর প্রস্তাবে ও সকলের সম্মতিতে আমার উপরই কমিশনের প্রশ্নমালার বিস্তৃত জবাবসহ একটি খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব অর্পিত হয়।······ পরবর্তী ৩রা জুন ওলামা ও সুধীবৃন্দের একটি বৈঠকে তা পেশ করতে হবে।·····মওলানা সাহেব আমাকে বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র, দেশ ও মিল্লাত এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত ও যুক্তিসিদ্ধ জবাব লিখতে হবে।····· আমি অনুরোধ করলাম, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনিও যেন তাঁর লিখনী ধারণ করেন। তিনি অসুস্থতার ওজর দেখালেও শেষ পর্যন্ত নীম রাযি হলেন। ······আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও প্রশ্নমালার উত্তর লিখতে বসে গেলেন। যদিও সে সময় তাঁর পিত্তশূল ক্রমে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল, মওলানা সাহেব তাঁর শয্যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেবিলে কেতাবপত্র সংস্থাপন করে লিখে চলেছেন। ডান হাতে অবিরাম গতিতে কলম চলেছে। বাম হাত বক্ষদেশে বেদনাস্থল চেপে রেখেছে। মাঝে মাঝে বেদনার অনুভূতি যখন সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন হাত দিয়ে ডলা শুরু করেছেন। এভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো।

একদিকে শরীরের অভ্যন্তরে পিত্তবেদনা, অন্যদিকে মিল্লাতের জন্য তাঁর অন্তরবেদনা—দুই বেদনায় তুমুল সংগ্রাম। আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ মওলানা কাফীর অটল সংকল্প : তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করবেন, তবে উঠবেন—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। ১লা জুন ১৯৬০ খৃঃ। জমঈতের (আহলে হাদীস)

অফিস সেক্রেটারী মৌলভী মীযানুর রহমান বি, এ, বিটি সাহেব উপরে এসে মওলানা সাহেবকে উপরোক্ত অবস্থায় দেখে আরয করলেন : হযরত নিজের শরীরের উপর রহম করুন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল দিন। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ—শরীরকে আরাম দিতে হবে। মওলানা সাহেব উত্তর করলেন : আপনাদের মুখে ঐ একই কথা—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, কিন্তু আমি স্বাস্থ্যের দিকে কি নজর দিব—এখন আমার জানেরও কোন পরওয়া নাই। সমস্তই পাকিস্তান ও ইসলামের জন্যে উৎসর্গীকৃত। এখন আপনি যান। নিচে গিয়ে দফতরের কাজ দেখুন, আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

এই বলে আগের অবস্থায়ই- - - -কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের মধ্যে ৩৮টির জবাব লিখার পর একদম অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন। বেদনার তীব্রতায় অনুভূতিহীন ও শক্তিহারা অবস্থায় মেঝের উপরে স্থাপিত পালঙ্কে নিপতিত হলেন আর এই পড়াই তাঁর শেষ পড়া।"

১৯৬০ সালের ৩রা জুনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র, পাকিস্তান ও মুসলিম মিল্লাতের চিন্তা মওলানা আবদুল্লাহিল কাফীর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মওলানা রাগেব আহসান তাঁর লেখাটির শিরোনামা একজন্যই দিয়েছিলেন—'হযরত আল্লামা কাফীর শাহাদত কাহিনী।' সত্যই তিনি ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলিম জাতির জন্যে নিজের স্বাস্থ্যকে বিলীন করে শাহাদতের অমিয় সুধাই পান করেছিলেন।

———

বাংলাদেশের

সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী

শহীদ মাহ্‌মূদ মোস্তাফা আলমাদানী (রহঃ)

[জন্ম-১৮৯৮/৯৯—মৃঃ ১২/৮/১৯৭১ খৃঃ]

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে বিদেশী আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরোধী ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম সাইয়েদ মাহ্‌মূদ মোস্তাফা আলমাদানী ১৯৭১ সালের ১২ই আগষ্ট ঢাকা জেলার মিরকাদিমে ওয়াজ করার সময় ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু একদল আততায়ীর দ্বারা নির্মমভাবে শহীদ হন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

বাংলার মাটিতে ইসলামের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করার জন্য সুদূর আরব দেশ থেকে অতীতে বহু ইসলাম প্রচারক মুবাল্লীগের এখানে আগমন ঘটছে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, সাধনা ও জেহাদের বদৌলতেই পৌত্তলিকতা, প্রকৃতিবাদিতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত বাংলার মাটি ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়েছে। ইসলামের জন্মভূমি থেকে দূরে দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে আজ যেই দশ কোটি তওহীদী জনতার বাস, এটা সেসব আরব মুবাল্লিগদেরই দান, অন্যথায় আজ হয়তো আমরা কেউ মূর্তিপূজারী হতাম, কেউবা বৃক্ষপূজারী বা অন্য কিছু। ঐ প্রচারকদের কেউ ছিলেন বণিক, কেউ নিছক ইসলাম প্রচারক আলেম, মোহাদ্দেস, সংগ্রামী মোজাহিদ। সে সব ত্যাগী মহাপুরুষকেই বাংলাদেশের মানুষ পীর আওলিয়া হিসেবে স্মরণ করেন। সিলেটে হযরত শাহ্‌জালাল (রহঃ)-এর মাজার, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন মাজার, মস্‌জিদ, বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনার গাঁয়ের হযরত শারফুদ্দীন আবুতাওয়ামা ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরীর নিদর্শন সহ তাঁদের বহু পুণ্যময় স্মৃতি এদেশের বুকে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এদেশে ইসলামের আলো বিস্তার করা, এখানকার মুসলমানদের খোঁজখবর নেয়া এবং যাবতীয় শির্ক বেদাত থেকে মুসলমানদের মুক্ত রাখার জন্যে শত শত বছর ধরেই আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের ইসলাম প্রচারকরা এখানে এসেছেন। অতীতের ইসলাম প্রচারকদের অনুকরণে চলতি শতকের মাঝামাঝি ও গোড়ার দিকেও আরব দেশ থেকে বহু ইসলাম প্রচারকের এখানে

আগমন ঘটে। বিশেষ করে ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দব্যাপী সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পর ইংরেজদের প্ররোচণায় আরবের শাসক শরীফ হোসাইন যখন তুর্কী খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে বিদ্রোহ করে, সে সময় ইসলামী রাষ্ট্রের বিচ্ছন্নতা রোধকল্পে প্রতিবাদকারী বহু মুসলিম মনীষী নিজ সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন। শাসকের এ অন্যায় কার্যকলাপ তারা সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের অনেকে এবং বংশধর কেউ কেউ উপমহাদেশসহ দূরপাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশে চলে যান এবং সে সব দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। আওলাদে রসূল শহীদ মওলানা মাহ্মূদ মোস্তফা আলমাদানী যুগ যুগের সেই মোবাল্লেগী ধারারই একটি অংশ ছিলেন। ইসলামের নিরলস খাদেম ইমানদীপ্ত এই সংগ্রামী মোজাহিদ এদেশের মাটিতে ইসলামী দাওয়াতের যেই মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করেছিলেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই পবিত্র লক্ষ্যে অটল অবিচল ছিলেন। নিজের দেহের সর্বশেষ রক্তবিন্দুটিও একই উদ্দেশ্যে ঢেলে দিয়ে তিনি "সত্যের সাক্ষ্যদানের" অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলার মাটিতে আওলাদে রসূলের এ "শাহাদাতের খবর দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি মুসলিম হৃদয় সেদিন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। গতানুগতিক রাজনৈতিক চিন্তার উর্ধ্বে উঠে সকলেই ধরে নিল দলমত নির্বিশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজর্গ আওলাদে রসূলের উপর এ হামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেরও অতিরিক্ত। এ হামলা ইসলামের উপরই হামলা। তাদের এই অনুভূতি প্রাক-স্বাধীনতা কি স্বাধীনতা উত্তর উভয় অবস্থায়ই ইসলামপ্রিয় জনগণকে বাংলার মাটিতে বিজাতীয় আধিপত্য ও তাদের ইসলামবিরোধিতার ব্যাপারে আরও অধিক সচেতন করে তোলে। আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ইসলামকে এদেশে প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিটি মুসলমান দুজয় মনোবল পোষণ করে। মওলানা মাদানীর শাহাদত সেই মনোবলকে অধিক চাঙ্গা করে তোলে। তাঁরই অনুসরণে একই মহৎ লক্ষ্য অর্জনে আজ হাজারো তরুন প্রাণ খোদার রাহে জীবন দানের জন্য প্রস্তুত।

মওলানা সাইয়েদ মাহ্মূদ মোস্তফা আলমাদানী যেমন ছিলেন একজন নির্ভেজাল খাঁটি মুসলমান, বিজ্ঞ আলেম, তেমনি ছিলেন জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সংগ্রামী মোজাহিদ। অন্যায়,

অসত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল আপোষহীন। তিনি একাধারে ছিলেন, মোবাল্লেগ রাজনীতিক, সমাজ হিতৈষী ও খোদাপ্রেমিক বুজর্গ। তাঁর ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। আতিথেয়তায় ছিল আরব্য শারাফাতের পূর্ণ প্রভাব। তাঁর প্রাঞ্জলনোচিত কথাবার্তা ও বর্ণনা ভঙ্গি প্রকৃত আভিজাত্য ও শাসক বংশের উত্তরাধিকারীত্বের প্রতিনিধিত্ব করতো। এ মহান ব্যক্তির শাহাদাতে এদেশের ইসলামী আন্দোলন এক নিষ্ঠাবান সংগ্রামী যোগ্য নেতাকে হারায়।

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় সম্ভ্রান্ত সাইয়েদ বংশে আনুমানিক ১৮৯৮/৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়েদ ইবরাহীম মোস্তাফা আলমাদানী। সাইয়েদ ইবরাহীম অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যেমন কঠোর ছিলেন, তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। ইসলামী মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও মুসলিম সংহতি বজায় রাখার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সাইয়েদ ইবরাহীম একজন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোক ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা লক্ষ্য করে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি যে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে চলছিল তিনি তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন। আরব তথা হেজাজ তখন বিশাল তুর্কী খেলাফতের অধীন। হেজাজের শাসক ছিলেন শরীফ হোসাইন। মুসলিম শাসনাধিপত্যের প্রাণকেন্দ্র তুর্কী খেলাফতের বিশাল পরিধিকে নষ্ট করে কি করে মুসলিম জাহানকে টুকরো টুকরো করা যায় এবং একে একে প্রতিটি ভূখণ্ডকে গ্রাস করা চলে, এটাই ছিল বৃহৎ শক্তিগুলোর দুরভিসন্ধি। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য-সংহতি নষ্ট করে তাদের দুর্বল করার জন্যে মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু করার প্ররোচনা দেয়। শরীফ হোসাইনকে তারা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, তুমি হচ্ছো বিশ্বমুসলিমের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনার শাসক। তোমার দেশ তুর্কী খেলাফতের অধীনে থাকা তোমারই অবমাননা নয়, মক্কা-মদীনারও অবমাননা।

এছাড়া ঐতিহ্যবাহী আরব জাতির উপর তুর্কীরা কর্তৃত্ব করবে এটা কি করে হতে পারে? তুমি তুর্কী খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসো।

তোমার বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনে আমরা সকল প্রকার সাহায্য করবো। তুমিই জয়যুক্ত হবে। কারণ তুর্কী খেলাফত যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তোমার বিরুদ্ধে কোনোরূপ সামরিক ব্যবস্থা নিলেও তাতে তারা জয়ী হতে পারবে না। মক্কার শাসনকর্তা শরীফকে বৃটিশ সরকারের এ মন্ত্র পুরোপুরি-ভাবে ধরেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পর হেজাজের শাসনকর্তা শরীফ হোসাইন তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। মওলানা শহীদ মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানীর পিতা সাইয়েদ ইবরাহীম মোস্তাফা শরীফ হোসাইনের মুসলিম সংহতি বিরোধী এই পদক্ষেপের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। এমনকি এ ব্যাপারে বিদ্রোহী শরীফ হোসাইন ও তার দোসর ইংরেজদের বিরুদ্ধে তুর্কী খেলাফতের পক্ষে তিনি যুদ্ধ ও করেন। এক পর্যায়ে শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে সাইয়েদ ইবরাহীম মোস্তাফা শাহাদাত বরণ করেন। সাইয়েদ ইবরাহীম মোস্তাফা ছিলেন অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইনের বংশজাত। সেইদিক থেকেই শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানী (রঃ) আওলাদে রসূলের অন্তর্ভুক্ত। মরহুম মাদানীর বংশ পরম্পরা উর্ধ্বতন ২২তম পুরুষে গিয়ে শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) ইবনে আবু তালীবের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তাঁর নসবনামা নিম্নে বর্ণিত হলো :

নসবনামা

সাইয়েদ মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানী, পিতা—সাইয়েদ ইবরাহীম মোস্তাফা আলমাদানী পিতা—সাইয়েদ আব্বাসুল মাদানী, পিতা—সাইয়েদ আব্দুল করীম আলমাদানী, পিতা সাইয়েদ হাসানুসসাদেক আলমাদানী, পিতা—সাইয়েদ নাসির হোসাইন সয়ূতী, পিতা—সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের, পিতা—সাইয়েদ আহম্মদ, পিতা—সাইয়েদ মুহাম্মদ হোসাইন তায়েফী, পিতা—সাইয়েদ আহ্মদ, পিতা—আব্দুল করীম, পিতা—সাইয়েদ আলী, পিতা—সাইয়েদ হাসান, পিতা—সাইয়েদ আব্দুল আজীজ, পিতা—সাইয়েদ ছালেহ্, পিতা—সাইয়েদ আব্দুল লতীফ পিতা—সাইয়েদুনা ইমাম মুসা কাজেম পিতা—সাইয়েদুনা ইমাম জাফর ছাদেক, পিতা—সাইয়েদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের, পিতা—সাইয়েদুনা

ইমাম আলী ওরফে যয়নুল আবেদিন, পিতা—সাইয়েদুশ শুহাদা ওয়া সাই-য়েদু শাবাবে আহ্‌লিল জান্নাহ্‌ সাইয়েদুনা ইমাম হোসাইন, পিতা—আসা-দুল্লাহিল গালিব ইমামুল মাসারেকে ওয়াল মাগারিব আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইঈন। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন দামাদ-এ সাইয়েদুল আম্‌বিয়া আহ্‌মাদুল মোস্তাফা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আলী হযরতের কন্যা বেহেশত বাসিনী রমণীকুলের নেত্রী হযরত ফাতেমা জোহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁরই গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। সুতরাং শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলামাদানী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এরই বংশধর ছিলেন।

শিক্ষা দীক্ষা

শহীদ মওলানা মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলমাদানী (রহ) মদীনা মোনাওয়ারাতেই বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। মওলানা মাদানী একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের সকলেই যে আলেম, কামেল, ওয়ালী এবং ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ বুজর্গ ছিলেন তাও সুস্পষ্ট।

উপমহাদেশে আগমন ও বৈবাহিক জীবন

শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলমাদানী সর্বপ্রথম তৎকালীন ভারতের ইসলামী জ্ঞান-চর্চা ও কৃষ্টিসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র স্বাধীন রাজ্য হায়-দারবাদে আগমন করেন। এখানে আগমনের পূর্বেই তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রথম বিবাহ করেন। তাঁর সেই স্ত্রীর গর্ভে তার প্রথম সন্তান মাসউদ মোস্তাফা আলমাদানীর জন্ম হবার পর সে স্ত্রী মারা যান। মওলানা মাদানী দুই বছরের শিশুপুত্র মাসউদকে সাথে নিয়েই হায়দারাবাদে আগমন করেছিলেন। হায়দারাবাদের নেজাম বাহাদুর ওসমান আলী খাঁ তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে রাখেন। নেজাম বাহাদুরের ছেলেরা তাঁর কাছে আরবী ও দীনী শিক্ষা লাভ করতো। হায়দারাবাদ কিছুকাল অবস্থানের পর মোস্তাফা মাদানী ভারতের যুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ)-এর

রায় বেরেলীতে একটি ইসলাম প্রচার মিশনের নেতা হয়ে চলে যান। তারপর সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। হিমালয়ান উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সংগ্রামী বীর মুজাহিদ শহীদে বালাকোট সাইয়েদ আহ্‌মদ শহীদের স্মৃতি বিজড়িত বেরেলীকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ বিস্তারকল্পে ভারতের বিভিন্নস্থানে সফর করতেন। পুত্র মাসউদ মোস্তাফাকে দেখা-শোনা করার জন্য তখন তিনি খ্যাতনামা আলেম বিশিষ্ট বুজর্গ মওলানা আবদুর রহমান আমরোহী (রহঃ) এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা হাফেজ আবদুর রহীম মরহুমের বিধবা কন্যার সাথে দ্বিতীয় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সে সময় তাঁর নিজের বয়স যেখানে ছিল বাইশ বছর এ স্ত্রীর বয়স ছিল তখন চল্লিশ বছর। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান ছিল না।

ঐ সময়ই একবার তিনি মওলানা আবদুর রউফ জৌনপুরীর সাথে প্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন। সে থেকে প্রতি বছর তিনি শুষ্ক ঋতুতে ইসলাম প্রচারের খাতিরে বাংলা ও আসাম সফরে আসতেন। বর্ষা ঋতুতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেই তাবলীগী সফরে থাকতেন। আওলাদে রসূল সাইয়েদ মাহ্‌মূদ মোস্তাফা আলমাদানী যেখানেই যেতেন স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁর প্রতি নবী বংশধর ও একজন আলেম হিসেবে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তাঁর চেহারা দর্শনে প্রিয়নবীর স্মৃতিই মুসলমানদের মনে জাগ্রত হয়ে উঠত। মানুষ তন্ময় হয়ে তাঁর কথা বার্তা শুনতেন। তাঁর তাবলীগী সফরে বিভিন্ন ওয়াজ নছীহতের দ্বারা বহু পথহারা মানুষ পথের দিশা পেয়ে আল্লাহওয়ালার পরহেজগার বান্দা বনেছে। বিশেষ করে মওলানা মাদানী কোরআন হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ওলামা-এ-কেরামের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বেদআত-শিরকের বিরোধিতায়

মওলানা মাদানী তওহীদের উপর অটল থাকার এবং প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য শিরক-বেদআত থেকে বেঁচে থাকার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তওহীদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই প্রায় ওয়াজ নসীহত তিনি শুরু

করতেন। শিরক বেদআত ও যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি কঠোর ও আপোষহীন। ইসলামের মৌল বিধানের সাথে কোনোরূপ সংযোজনকে তিনি পথভ্রষ্টতা বলে মনে করতেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির দরুন কোনো কোনো অতি উৎসাহী আলেমের তিনি বিরাগভাজনও হয়েছেন। তবে সম্পূর্ণ গোমরাহ বেদআতীরা ছাড়া আওলাদে রাসূল হবার কারণে মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। সকলেই তাঁকে সম্মান শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা মাদানী ভারতের বাইরেও বহুল পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে ইসলামের প্রতি মানুষের অনুরাগ অধিক হলেও এখানে ইসলামের নামে বেদআতের আক'রে অনেক কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। সম্ভবত এখানকার মুসলমান সরাসরি সাহাবা-এ-কেরাম বা তাবেঈ ও তাবেতাবেঈদের নিকট থেকে ইসলামের শিক্ষা না পাওয়াতেই এমনটি হতে পেরেছে একশ্রেণীর অগভীর দৃষ্টির ধর্মীয় লোক এসব কুসংস্কার ও বেদআতকে আরও প্রশ্রয় দেন। কোন কোন বেদআতের ব্যাপারে এক শ্রেণীর লোক এতই বাড়াবাড়ির চরমে গিয়ে পৌঁছে যে নিজের অলক্ষেই তারা এসব শিরক-বেদআতের মধ্য দিয়ে ইসলামেরও প্রকারান্তরে বিরোধিতা করে বসে। তাদের অস্তিত্ব এখনও নেই যে এমন নয়। এখনও বহু মানুষ ফরজ নামাজ ত্যাগ করে জিকির ও ঢোল পিটানোতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশ করে। তবে এদের সংখ্যা পূর্বে আরও অধিক ছিল। ঐ সকল বেদআতীর সাথে কোনো কোনো সময় তাঁর বাহাস মোনাজারাও হতো। তিনি তাদের বিরুদ্ধে সকল সময়ই কঠোর ভূমিকা বজায় রেখে চলেছেন। কোনরূপ ভীতি তাঁকে এতটুকু পিছু হটাতে পারতো না। তওহীদের প্রাণসত্তাকে সজীব ও নিষ্কলুষ রাখার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এই মরদে মোজাহিদ কয়েকবারই উগ্রবিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু সব সময় তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে সকল প্রতিকূলতার মোকাবেলা করেছেন। একবার তিনি চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জের এক বাহাস থেকে নৌকা যোগে ফেরার পথে ডাকাতিয়া নদীতে উগ্রপন্থী বেদআতীরা তাঁর নৌকার ওপর হামলা করলে নৌকাটি ডুবে যায়। তিনি কোনো প্রকারে রক্ষা পেয়ে অন্য নৌকার সাহায্যে ফরিদপুর জেলার সুরেশ্বরে গিয়ে উপনীত হন। তাঁর

সমস্ত কিতাবপত্র নদী গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যায়। পরে জনৈক জেলের জালে ঐসকল কিতাব আটকা পড়লে সে ঐ গুলো মওলানা মাদানীর নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

বাংলাদেশে আগমন

ভারত বিভাগের আগের বছর তাঁর আবাস কেন্দ্র বার বেরেলীতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। মওলানা মাদানীও সে দাঙ্গার কবলে পড়েন। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে জনৈক মহানুভব হিন্দু দারোগার সৌজন্যে তিনি কোনো রকমে দাঙ্গার কবল থেকে রেহাই পান এবং তৎকালীন পূব পাকিস্তানে চলে আসেন। মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলমাদানী ঐ বছরই (১৯৪৬খৃঃ) বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে আলেকান্দা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বরিশাল এলাকাকে কেন্দ্র করেই তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ইসলামের শিক্ষা আদর্শ বিস্তারের কাজ চালিয়ে যান। এখানেও বেদআত-শিরকের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। চাঁদপুর হাজীগঞ্জের কাছে ডাকাতিয়া নদীতে তাঁর ওপর হামলার ঘটনাটি এ সময়ই সংঘটিত হয়।

মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলমাদানী ১৯৬২ সালে বরিশাল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। ২২/৭, মোহাম্মদপুরে একটি নিজস্ব বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন।

মওলানা মাদানীর রাজনৈতিক জীবন

মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আল মাদানীর ধমনীতে যই মহাপুরুষদের রক্তধারা প্রবাহমান ছিল, তাঁর পক্ষে বিদেশ বিভূঁয়ে এসেও ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতা মুখবুজে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ভারতে মুসলিম আধিপত্য ছিনতাইকারী বৃটিশ সরকারের প্রতি তাঁর আক্রোশ ছিল সহজাত। কারণ মুসলিম সংহতির একনিষ্ঠ সেবক তাঁর পিতা সাইয়েদ ইবরাহীম মোস্তাফা বৃটিশ সৈনিক ও তাদের তাবেদার হেজাজের শাসনকর্তা শরীফ হোসাইনের সৈনাদের হাতেই শাহাদত বরণ করেছিলেন। সুতরাং ভারতকে ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত করার যেকোনো সংগ্রামের সাথে তাঁর সহযোগিতা ছিলো এক

স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাধীনতা ও বৃটিশ খেদা আন্দোলনের সাথে তিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথমে হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির সমন্বয়ে গঠিত বৃটিশ বিরোধী ও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত কংগ্রেসের সাথে মিশে তিনি কাজ করেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দের সদস্যরূপে স্বাধীনতা ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকেন। ফলে ভারতেও তাঁকে বৃটিশ সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়। এভাবে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ভারতীয় এলাকায় তিনি একদিকে আজাদী সংগ্রাম করেন এবং অপরদিকে শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকেন। নবী-বংশের একজন উত্তরাধিকারী হিসেবেই উপমহাদেশের সর্বত্র তিনি পরিচিত হয়ে পড়েন। ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁর ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা ও সঠিক পরিচয় গোপন না থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে তারা সাহস পায়নি। কারণ এতে এখানে ইংরেজ শাসনবিরোধী মুসলিমচিত্ত আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠাকে তারা বেশী ভয় করতো। চতুর ইংরেজ সরকার মওলানা মাদানীকে গ্রেফতার না করে কৌশলে তাকে তাঁর অবস্থান কেন্দ্র ত্যাগে বাধ্য করার চক্রান্ত করে। ১৯৪৬ সালের ঠিক মাঝামাঝি সময় তাঁর অবস্থান কেন্দ্র বেরেলীতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা দেখা দেয়। তখনই তাঁর এদেশে আগমন ঘটে যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

বৃটিশ শাসনের বিরোধিতা ও আজাদী আন্দোলন

মওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তাফা আলমাদানী ১৯৩১ সনের পর হিন্দু নেতাদের মানসিকতার গ্লানিতে কংগ্রেস থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং অখণ্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দ থেকেও বের হয়ে আসেন। মওলানা মাদানী তখন মুসলমানদের স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে কাজ করতে থাকেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সংগ্রামী বীর মোজাহিদ মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর সাথে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তান আন্দোলন করেন। স্বাধীনতা ও পাকিস্তান আন্দোলনের এই অবিশ্রান্ত কর্মী সিলেট গণভোট অনুষ্ঠানেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে কাজ করেন। অনেক বিজ্ঞলোকের মতে একজন আরবী মোহাজের হয়েও মওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তাফা আলমাদানী পাকিস্তানের সপক্ষে ঈমানী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজ করেছেন এবং পাকভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা,

পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সংহতির পক্ষে তাঁর যে অবদান রয়েছে, জন্মগত পাকিস্তানী নেতাদের দু'চারজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া অনেক নেতার জীবনেও তেমন দৃষ্টান্ত বিরল।

অবিভক্ত পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি দেশের সর্বত্র বিরাট বিরাট সভা সমিতি করে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা ও দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার অনুকূলে জনমত সৃষ্টির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মওলানা সাইয়েদ মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী তদানীন্তন নিখিল পাকিস্তান মারকাযী জমিয়তে ওলামা এ ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও কাউন্সিলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এছাড়া মওলানা মাদানী ছিলেন দলের সাবেক পূর্ব পাকিস্তান শাখার আজীবন সহকারী সভাপতি। মওলানা মাদানী রাজনৈতিক জীবনে কোনো দিন ক্ষমতা বা পদের লোভ দেখাননি। জানা যায়, ১৯৬৯ সনের আগষ্ট মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত উক্ত মারকাযী জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁকে দলের সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলে তিনি বিনয় সহকারে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমি অতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদ নিতে চাইনা। পদের বাইরে থেকেই ইসলামী আন্দোলনের কাজ করবো। এমনকি ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিতে আমি প্রস্তুত রয়েছি।" ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ এই মর্দে মোজাহিদ যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশেও ইসলামের সপক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে কোনোরূপ পরোয়া করতেন না। আল্লাহর দেওয়া জানকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করে দেয়ার মধ্যেই যে মুমিন জীবনের চরম সফলতা, এ বাস্তবতাকে খোদাপ্রেমিক মওলানা মোস্তাফা আল মাদানী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্যেই দেখা যায়, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট ইসলামী ছাত্র সংঘ নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের নামকরা ছাত্র শহীদ আবদুল মালেক যখন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিক্ষক মিলনায়তনে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন, তখন তাঁর জানাজা শেষে মুনাযাতের মধ্যে মওলানা মাদানী বলছেন, "হে আল্লাহ্ শহীদ আবদুল মালেকের

ন্যায় আমাকেও তোমার দীনের জন্যে শাহাদাত বরণ করার তওফীক দাও।" একথা সেদিন কে জানতো যে আওলাদে রসূলের এ দোয়া আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করে নিয়েছেন এবং তার এক বছর পর একই মাসে আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাঁর পিতা ইবরাহীম এবং পূর্ব পুরুষ শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইনের ন্যায় শহীদী মর্যাদায় ভূষিত করবেন।

অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে সহযোগিতা

শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলমাদানীর অন্তর ছিল সমুদ্রের ন্যায় বিশাল। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার সংকীর্ণতার লেশ মাত্র ছিল না। ইসলামের জন্যে যে যেখানে কাজ করতো তার প্রতিই মওলানা মাদানীর সমর্থন থাকতো। অপর একটি ইসলামী দলের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক সমর্থন ছিলো দলীয় গণ্ডির উর্ধ্বে। ইসলামী আন্দোলনে তৎপর যেকোনো দলের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতেন ও বক্তৃতা দিতেন। তাঁর এই উদারনীতি প্রতিটি ইসলামী দলের নেতা ও কর্মীকেই অভিভূত করতো। একারণে সকল দলের লোকই তাঁর প্রতি আলাদাভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিল। এটা তাঁর রাজনৈতিক মতের অস্থিরতার ফল ছিল না বরং এ নীতি ছিল ইসলামী আন্দোলনকে ব্যাপক ও জোরদার করার পবিত্রতম প্রেরণা সঞ্জাত।

আইয়ুব সরকার কর্তৃক ইসলামকে বিকৃতকরণ প্রয়াসের বিরোধিতা:

ইসলামী শাসনতন্ত্র চালু এবং দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অব্যাহত জনদাবীর সামনে কোনো সরকারেরই নতি স্বীকার না করে উপায় ছিল না। কিন্তু প্রতিবারই উপর তলার একটি বিশেষ চক্র এ দাবী বানচাল করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে "মুনকেরীনে হাদীস" ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কিছু প্রভাবশালী লোক এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় আচ্ছন্ন গুটিকতক ব্যক্তি এর সাথে জড়িত ছিল। চৌধুরী মুহাম্মদ আলী তৎকালীন পাকিস্তানের উজিরে আজম থাকাবস্থায় ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্রটি রচিত হয়, সেটা তুলনামূলকভাবে অনেকটা ইসলামিক ছিল। সেই শাসনতন্ত্রটিও ঐ চক্রের দরুনই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বরং তাকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্র নিয়েই আইয়ুবী মার্শাল'ল দেশে চালু হয়। আয়ুব সরকারও ইসলামের ব্যাপারে

গনদাবীকে উপেক্ষা করতে পারেনি। ফলে ইসলামকে আধুনিকীকরণের দূরভিসন্ধি নিয়ে "মুনকেরে হাদীস" ডঃ ফজলুর রহমানকে ডিরেক্টর করে কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি ইসলামকে তোড়-মোড় করে "ইসলাম" নামক একখানা গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৯৬৮ সনের প্রথম দিকে তদানীন্তন জাতীয় পরিষদে নেজামে ইসলাম দলীয় সদস্য আন্ত জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পার্লামেন্টারিয়ান শহীদ মৌলভী ফরিদ আহমদ ডক্টর ফজলুর রহমানের এ গ্রন্থের দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ও মতামতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উপস্থাপন করেন তখন নেজামে ইসলাম পার্টির তদানীন্তন সভাপতি মওলানা সাইয়েদ মোছলেহুদ্দীন, তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দ, নির্দলীয় ওলামা-এ-কেরাম এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ, মওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আজম ও জামায়াত কর্মীরা উক্ত পুস্তক ও তার প্রণেতা ডঃ ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রচণ্ড গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। নেজামে ইসাম পার্টির সহ-সভাপতি মওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তাফা আল মাদানী এই আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে কাজ করেছেন এবং দেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে এ আন্দোলনের বাণী নিয়ে মওলানা মাদানী সর্বত্র জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সভা সমিতি করেছেন। মওলানা মোস্তাফা মাদানী ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, দেশের সাধারণ ওলামা-এ কেরাম ও কর্মীদের এ আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নিলে শেষ পর্যন্ত ডঃ ফজলুর রহমান নিজ পদ থেকে ইস্তেফা দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ডক্টর ফজলুর রহমানের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়। একইভাবে আয়ুব খানের তথাকথিত মুসলিম পারিবারিক আইনের মধ্য দিয়ে ইসলামী আইনের বিকৃতির প্রতিবাদেও যে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেসময়ও শহীদ মওলানা সাই-য়েদ মাহমুদ মোস্তাফা আলমাদানী বিরাট ভূমিকা পালন করেন এবং অসংখ্য সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে এই মনগড়া আইনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মাদানীসহ ইসলামপ্রিয় দলগুলোর নেতা ও কর্মীরা যে সময় ডঃ ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেন সে সময় সারা দেশে সামরিক শাসন চালু বিধায় অন্যান্য সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই ছিলেন নিষ্ক্রিয়। দেশে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা দূরে থাক

একেকজন জাঁদরেল রাজনৈতিক নেতাও পত্র-পত্রিকায় পর্যন্ত কোনোপ্রকার বিবৃতি দানে সাহস পেতেন না। পরাক্রমশালী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আলেমদের দ্বারাই এভাবে প্রথম জনমত গড়ে ওঠে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্যে পটভূমি তৈরি হতে থাকে। মওলানা মোস্তাফা মাদানীসহ অন্যান্য ওলামা-এ-কেরাম, ইসলামী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ডঃ ফজলুর রহমান ও আইয়ুবী পরিবার আইনের বিরুদ্ধে সেদিন আন্দোলন করার ফলেই তৎকালীন একনায়কত্বমূলক শাসনের দুর্বলতাও জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুতঃ মাওলানা মাদানী ও অন্যান্য ইসলামপন্থী দলের নেতা ও কর্মীদের সৃষ্টি করা আইয়ুববিরোধী অন্দোলনের পটভূমিতেই পি ডি এম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মোভমেন্ট) গঠিত হয়। পি. ডি. এম. আন্দোলনের সময় প্রথম দিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো একে তেমন কোনো গুরুত্বই দিতে চায়নি। বরং এর অন্যতম নেতা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব হামীদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন পত্রিকায়ও সংবাদ ছাপা হতো ছোট্ট আকারে। এ দলকে অন্যান্য দলের প্রভাবিত সাংবাদিকরা জামায়াত প্রভাবিত বা ইসলাম পছন্দদের দ্বারা পরিচালনাধীন বলে উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে খবর প্রকাশ করতেন। বস্তুতঃ আইয়ুবের বিরুদ্ধে এখানে ইসলাম ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে এগুতেই থাকলো, তখন ঐসব রাজনৈতিক দলও শেষের দিকে এসে পি ডি এম-এ যোগ দেয়ায় এর নাম রাখা হয় ডি এ সি (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি)। পি ডি এম-এর আন্দোলনেই আইয়ুবের কোমর ভেঙ্গে আসছিল। কারণ দেশের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা এ দলেই ছিলেন। অন্যদের সহযোগিতা ছাড়াই আন্দোলন সফলতার দ্বার প্রান্তে ধীরে ধীরে পৌঁছুতে থাকে। তাতে তারা ভাবলেন নাজানি ময়দান থেকে উচ্ছেদ হতে হয়, তাই হুড়মুড় করে এসে তাতে যোগ দেন। পি ডি এম বা ডি এ সি-র গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে দুর্বার গতিবেগ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ খৃঃ মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবও ক্ষমতার মসনদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এদিক থেকে তৎকালীন পাকিস্তানে জনগনের মৌলিক অধিকার ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ফেরত পাবার আন্দোলনে যারা দেশ ও জাতির শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন শহীদ মওলানা সাইয়েদ মোস্তাফা আলমাদানীও এ ক্ষেত্রে

অনেক এগিয়ে। তিনিসহ এ ব্যাপারে আরও যাদের দান সবচাইতে বেশী তাদের নামও কোনো দিন সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে আসবে কি? আমাদের দেশে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যত আন্দোলন হয়েছে, নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করতে হলে সবগুলোই এদেশের ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত। অন্যথায় সে ইতিহাস হবে সত্য গোপনের ইতিহাস। জাতির সঠিক ইতিহাসের বদলে হবে তথ্য বিকৃতির ইতিহাস।

ডক্টর ফজলুর রহমানের ইসলাম বিকৃতির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহ্‌মূদ মোস্তাফা আলমাদানীর সংগ্রামী ভূমিকা একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার ছিল। তিনি ফজলুর রহমানের যুক্তির বিরুদ্ধে যেমন জোরালো যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করেন তেমনি বীরত্বের সাথে সরকারী ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি-দের প্রতিটি চ্যালেঞ্জেরও তিনি মোকাবেলা করেন। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জাফরের বাহাসের প্রস্তাবও শহীদ মওলানা মোস্তাফা মাদানী চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের যেকোনো স্থানে ফজ-লুর রহমানের সাথে আলাপ করার জন্য মওলানা মাদানী সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার ডঃ ফজলুর রহমানকে তার কাজ থেকে অপসারণের কথা ঘোষণা করেন।

জনকল্যাণ কাজে শহীদ মোস্তাফা মাদানী

ইসলামকে যে সব মহাপুরুষ মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তারা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এরই শিক্ষা আদর্শের প্রচার প্রসার ও স্থায়িত্বের জন্য তৎপর থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। জনগণের সেবা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। জন-সেবার যতগুলো দিক রয়েছে তন্মধ্যে সব চাইতে বড়দিক হলো তাদের মধ্যে মানবীয় সৎগুণাবলীর বিকাশ দান। শহীদ মওলানা মাহ্‌মূদ মোস্তাফা আলমাদানী এ মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারের সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এদেশে আগমন করেছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর নির্ধারিত তাবলীগী ওয়াজ-নসীহত ছাড়াও বাংলাদেশে জনসেবার প্রধান কাজ মানুষের অজ্ঞতা দূরিকরণ এবং সুশিক্ষার দ্বার। তাদের মানবীয় গুনাবলীর বিকাশ ও উৎকর্ষতা বিধানে

বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অসংখ্য জনহিতকর কাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হলো, তিনি প্রায় তিন শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের বহু প্রথমশ্রেণীর দ্বীনী মাদ্রাসার কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। যেমন, জামেয়া-এ-এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, পটিয়া জামিরিয়া, হাটহাজারীর মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা, জামেয়া-এ-কোরআনিয়া লালবাগ (ঢাকা), বড়কাটারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা (ঢাকা), ফরিদাবাদ এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা (ঢাকা) প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শহীদ মওলানা মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরিশাল মাহ্মূদিয়া মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বরিশাল মাহ্মূদিয়া মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে প্রতিবছরই বহু ছাত্র শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর ইসলামী জীবনাদর্শের প্রচার ও প্রসার দানের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র তিনি সফর করে বেড়াতেন এবং সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

মওলানা শহীদ মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী মোমেনশাহী জেলার সদর মহকুমার ভালুকা থানা ঈদগাহের স্থায়ী ইমাম ছিলেন। এই ঈদগাহে প্রায় দশবারো হাজার নামাজীর সমাগম হয়। এ অঞ্চল থেকে বেদ্আত ও কুসংস্কার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মওলানা মোস্তাফা মাদানী বহু দুস্থ অভাবী মানুষকে সাহায্য করতেন। তাঁর গোটা জীবন সমাজ সংস্কার, জনসেবা ও জনকল্যাণের মধ্য দিয়া অতি বাহিত হতো।

শাহাদাতের ঘটনা

পূর্বেই বলা হয়েছে, মওলানা সাইয়েদ মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী তাঁর প্রায় বক্তৃতার শুরুতেই তওহীদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নিজের বক্তব্য শুরু করতেন। ঢাকা জেলার মীরকাদিম এলাকার আবদুল্লাহপুর গ্রামেও একই ভাবে ১৯৭১ সালের ১০ই আগষ্ট এক ধর্ম সভায় মুসলমানদের ওয়াজ-নছীহত করছিলেন। তিনি কালিমা-এ-তাইয়েবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"র ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। রাত পৌনে আটটায় ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন এদেশে আধিপত্য

প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ও তাদের প্ররোচিত কতিপয় বিভ্রান্ত আততায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। আওলাদে রসূল ইসলামের মহান খাদিম মওলানা মাদানী তখনই সভামঞ্চে ঢলে পড়েন এবং কলমা পড়তে পড়তে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। মাওলানা মাদানী দেশের তৎকালীন গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে এখানে ইচ্ছা করলে ওয়াজে নাও আসতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীনের কথা, কোরআন হাদীসের কথা প্রচার করতে গিয়ে জীবন যায় যাক এই নির্ভীক ও ঈমানী চেতনা নিয়েই তিনি ঐ পরিস্থিতিতে রাজধানী ঢাকার বাইরে এই ঝুকিপূর্ণ ধর্ম সভায় যোগদান করেছিলেন। তাঁর এই সাহসিকতা ও ঈমানী চেতনাও একথারই প্রমাণ যে, তিনি অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মোজাহিদ কারবালার শহীদ ইমাম হোসেনের যথার্থ বংশধর ছিলেন। ইমাম হোসাইনও পরিস্থিতির প্রতিকূলতার তোয়াক্কা না করেই আল্লাহ্‌র সত্যদ্বীনের বিজয়ী পতাকাকে উড্ডীন রাখার নিমিত্ত সংগ্রাম করেছেন—আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মহাসত্যের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া

সাইয়েদ মাহ্‌মূদ মোস্তাফা আলমাদানীর এই শাহাদাত গোটা দেশবাসী এমনকি বহির্বিশ্বেও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। সারা দেশের মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। তাঁর এই নির্মম শাহাদাতের ঘটনা এদেশের ইসলাম ও ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি জঘন্যতম হামলা রূপেই সকলের কাছে বিবেচিত হয়। তাঁর পবিত্র শহীদী লাস রাজধানীতে আনয়নের পর শেষবারের মতো একবার দেখার উদ্দেশ্যে দলে দলে লোক তাঁর বাসভবনে হাজির হতে থাকে। লালবাগ শাহী মসজিদ এলাকার গোরস্তানে তাঁকে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। শোকেবিহ্বল জনতার জানাজার মিছিল বায়তুল মোকাররম থেকে সদরঘাট হয়ে লালবাগ মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে পৌঁছুলে সেখানে উপস্থিত জনতার কান্নার রোল এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা ঘটায়। সেখানে হাকীমুল উম্মত মরহুম মওলানা আশরাফ আলী থানভীর অন্যতম খলীফা ও লালবাগ শাহী মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা হাফেজ মুহাম্মাদুল্লাহ্ (হাফেজ্জী হুজুর) জানাজার ইমামত করেন। ঐদিন প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল দুর্যোগপূর্ণ।

মোষলধারে বৃষ্টির মধ্যদিয়েও তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক জনতার উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

নেতৃবৃন্দের শোকবাণী ও পত্রপত্রিকার মন্তব্য

মওলানা সাইয়েদ মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানীর নির্মম শাহাদাতের খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথেই দেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের শোকবাণী সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসব মন্তব প্রকাশিত হয়, নিম্নে সেগুলো উল্লেখিত হলো। মওলানা মাদানীর শাহাদাতের বাস্তব প্রতিক্রিয়া এসকল মন্তব্যের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা যাবে। প্রথমতঃ দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে তুলে ধরছি।

দৈনিক সংগ্রাম

"হযরত মওলানা সাইয়েদ মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানী ১৮৯৯ খৃঃ পবিত্র মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরওয়ারে দোজাহাঁ সাইয়েদুল মুরসালীন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বংশধর ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মওলানা সাইয়েদ মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানী ইসলামের সুমহান শিক্ষা-আদর্শের তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে এই উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। কেবল পাক ভারতেই নয় মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশের মুসলমানদের নিকট তিনি প্রিয় নবীর সুযোগ্য বংশধর ও একজন ইসলাম প্রচারক হিসাবে পরিচিত। কোরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে তিনি তাঁর মাতৃভাষা আরবী ছাড়াও উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এসব ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। শহীদ হযরত মওলানা মাহ্মুদ মোস্তাফা আলমাদানী (রহঃ) ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর বাকেরগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বাংলা ও আসামের সর্বত্র সভা-সমিতি করে ইসলাম প্রচার করেন। মওলানা মাদানী পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মওলানা শাব্বীর আহ্মদ ওসমানী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে বাংলার পীর-ওলামা মাশায়েখ

যখন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের সপক্ষে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন, তিনিও সে সময় সিলেট, আসাম সহ সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানের সপক্ষে সভা-সমিতির উদ্দেশে ঝটিকা সফর করেন।

শহীদ হযরত মওলানা মাহ্‌মুদ মোস্তাফা আলমাদানী ব্যক্তিগতভাবে একদিকে যেমন অত্যন্ত শরীফ ও অমায়িক ছিলেন, অপরদিকে বাতিলের বিরুদ্ধে ছিলেন নির্ভীক। তিনি ন্যায় এবং সত্য কথা বলতে কোনো প্রকার ভয়-ভীতির পরওয়া করতেন না। তিনি যে শহীদ-এ-কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধর এবং তাঁর ধমনীতে যে হোসাইনী রক্তধারা প্রবাহিত ছিল, বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন মনোভাবের মাধ্যমে তিনি নিজের জীবনের একাধিক ঘটনার দ্বারা তা প্রমাণ করে গিয়েছেন। পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এবং আইয়ুব সরকারের আমলে ডঃ ফজলুর রহমানের ইসলামের নামে অনৈসলামিক মতবাদ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর বিরাট ভূমিকাছিল। ইসলামবিরোধী যাবতীয় বাতিল মতাদর্শের বিরুদ্ধাচরণ ও পাকিস্তানকে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি প্রবল আগ্রহী ছিলেন।

গত ২৫শে মার্চ, বিদেশী চরেরা নাটোরে তাঁকে ও তাঁর সহচরদের উনিশ দিন যাবত বন্দী করে রেখেছিল। সেখান থেকে কোনো প্রকারে ছাড়া পেয়ে ঈশ্বরদী পর্যন্ত পৌঁছুলে এখানেও সেই চরেরা তাঁকে আটক করে সর্বস্ব লুট করে নেয় এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাঁর পরিচিত সেখানকার ভক্ত অনুরক্তদের চেষ্টায় সেবারের মতো তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

সেই উৎপীড়ন ও বন্দীশালা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কোনরূপ ভীত না হয়েই পুনঃরায় তিনি ইসলাম প্রচারে বের হন। গত পরশু ঢাকা জেলার মীরকাদিমে এমনিভাবের একটি ইসলামী জলসায় ওয়ায করা অবস্থায়ই তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের জাতশত্রুদের গুলীতে শাহাদত বরণ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মারকাযী জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির সহ সভাপতি ছিলেন।

শহীদ হযরত মওলানা সাইয়েদ মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী বাকেরগঞ্জ মাহ্মূদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া তিনি এপ্রদেশের শত শত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম ও পরিচালনায় সাহায্য-সহযোগিতা করে গেছেন। এই উপমহাদেশে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর লক্ষ লক্ষ আধ্যাত্মিক শিষ্য শাগরেদ রয়েছে।

(দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১২ ইং আগষ্ট ১৯৭১ ইং)

দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

মওলানা সাইয়েদ মাহ্মূদ মোস্তাফা আলমাদানী শাহাদাত বরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) মওলানা মাদানী মুন্সিগঞ্জ মহকুমার আবদুল্লাহপুর গ্রামে এক জমায়েতে বক্তৃতা দান কালে হিন্দুস্তানী এজেন্টদের দ্বারা গুলীবিদ্ধ হন এবং কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করতে করতে ঘটনাস্থলেই এন্তেকাল করেন। মওলানা সাহেবের শাহাদতের সংবাদটি আকস্মিক ও মর্মান্তিক হইলেও এই জন্য শোক প্রকাশের অবকাশ নাই। মওলানা ছাহেবের পাক রূহ জান্নাতবাসী হইয়াছে। তিনি দুনিয়ায় যে নেক কাজের জের রাখিয়া গিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহই তাহার সাক্ষী।

অজাত শত্রু বলিতে যাহা বুঝায় মওলানা মোস্তাফা আলমাদানী-সত্যিকার অর্থে তাহাই ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কোনো শত্রু ছিলনা ; দ্বীনী শিক্ষার আলো বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের উদ্যমে একাধিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন।

সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি মশহুর ছিলেন। ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি এই উপমহাদেশে আগমন করেন। এই উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের নকীবদের মধ্যে তিনিও একজন। সাবেক নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এন্তেকালের সময় তিনি নেযামে ইসলামের সহ-সভাপতি ছিলেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি বরিশাল জেলায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও তেজস্বিতার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি লোকই পরিচিত। তিনি তাঁহার ধর্ম-প্রাণতার জন্য এখানকার মানুষের নিকট একান্ত আপন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছিলে সারা ঢাকা বিস্ময়ে হতবাক ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। এমন মহান ব্যক্তির বুকে কেহ গুলী বিদ্ধ করিতে পারে ইহা কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে নাই। মওলানা মাহমুদ মোস্তাফা আলমাদানীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কাহারও শত্রুতা না থাকিলেও তাঁহার মতাদর্শের দুশমনের অভাব নাই। তিনি ছিলেন ইসলামের খাঁটি খাদেম। ইসলামের খেদমত করিতে করিতে তিনি দুশমনের হাতে প্রাণ দান করিয়াছেন। সত্যি-কারের শহীদের গৌরব তিনি লাভ করিয়াছেন। এমন মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু, এমন মৃত্যু সৌভাগ্যের মৃত্যু। শাহাদাতের সৌভাগ্যে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুর সাথে মওলানা মাদানী আল্লাহ্‌র অতি কামনীয় সান্নিধ্যে গমন করিয়াছেন আল্লাহ্ তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি নেগাহ্‌বান থাকিবেন। তিনি তাহাদের সহায়ক।

(দৈনিক আজাদ, ঢাকা ; শুক্রবার ১৩ই আগস্ট, ১৯৭১ ইং)

মওলানা মাদানীর শাহাদাতে গভীর শোক প্রকাশ করে ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক নেতৃবৃন্দ আন্তরিক শোকবাণী প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে দলীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (আমীর জামায়াতে ইসলামী) জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, মমতাজ দৌলতানা, এ. টি. সাদী, এখানকার অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলামী ছাত্রসংঘ নেতা মতীউর রহমান নিজামী, পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীন, এবং পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নওয়াবজাদা নাছরুল্লাহ্ খাঁ প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মওলানা মওদূদী

পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এক বিবৃতিতে বলেন, মওলানা সাইয়েদ মাদানী মদীনা থেকে এসেছেন এবং ইসলাম প্রচারকে জীবনের মিশন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানের এই অংশে ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামবিরোধী শক্তি এখান হতে ইসলামকেই নির্মূল করতে চায়, শহীদ মওলানা মাহমুদ মোস্তাফা আলমাদানীর শাহাদাত তারই প্রমাণ।

মওলানা জাফর আহাম্মদ আনছারী

করাচী হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্য মওলানা জাফর আহমদ আনছারী এক বিবৃতিতে বলেন, মওলানা সাইয়েদ মাহমূদ মোস্তাফা আলমাদানীর শাহাদাতের সংবাদে আমি গভীর ব্যথা ও উদ্বেগ বোধ করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁর রক্ত বৃথা যাবে না। কেননা শাহাদাতের রক্ত কোন দিনই বৃথা যায়নি।

মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আয'ম মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী এক বিবৃতিতে মওলানা সাইয়েদ মোস্তাফা আল-মাদানীর শাহাদাতকে এক বিরাট দুর্ঘটনা আখ্যা দিয়ে বলেন, আমি তাঁর শাহাদাতের সংবাদে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। তাঁর এই শাহাদাত শুধু তাঁর পরিবারবর্গেরই দুঃখ ও ক্ষতির কারণ নয় বরং তাঁর এই শাহাদাত একটা জাতীয় দুর্ঘটনা। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, বিদেশী স্বার্থে নিয়োজিত সন্ত্রাসবাদীদের এত সাহস যে, উন্মুক্ত জনসভায় মওলানা সাইয়েদ মোস্তাফা মাদানীকে তারা শহীদ করেছে।

মওলানা এহতেশামুল হক থানভী

পাকিস্তানের বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় অলেম মওলানা এহতেশামুল হক থানভী বলেন, রসূল করীম (সা:)-এর শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ ত্যাগ করার ফলে আমরা আঞ্চলিকতার অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছি। পূর্ব-পাকিস্তানে সম্প্রতি যা কিছু ঘটছে তা অত্যন্ত দুঃখ জনক। মারকাযী জামীয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা মওলানা সাইয়েদ মাহমূদ মোস্তাফা আল মাদানীর শাহাদাতে মুসলিম জাহানের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো। আমি তাঁর শাহাদাতের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাচ্ছি।

নবাবজাদা নাছরুল্লাহ খান

সাবেক পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নওয়াবজাদা নাছরুল্লাহ্ খানও মওলানা সাইয়েদ আলমাদানীর শাহাদাতে গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পীর মুহ্‌সেনুদ্দীন

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের (হাযারভী-মাহ্‌মুদ গ্রুপ) সভাপতি মওলানা পীর মুহসেনুদ্দীন এক বিবৃতিতে মওলানা সাইয়েদ মাদানীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মওলানা সাইয়েদ মাদানীর এই হত্যাকাণ্ড দেশের প্রতিটি মুসলমানের অনুভূতিকে নির্মমভাবে আহত করেছে। তাঁর মৃত্যুতে সারা মুসলিম জাহানের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

মওলভী ফরিদ আহমদ

মওলভী ফরিদ আহ্‌মদ এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতীয় চরেরা এভাবেই ইসলাম ও সত্যের মশালবাহীদের নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

তাছাড়া তাঁর এই শাহাদাত যে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায়ও শোকাঘাত হেনেছে লণ্ডন হতে প্রকাশিত ২৭শে আগস্ট ৯ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা (১৯৭১ইং) Impact International fortnightly-এ প্রকাশিত একটি ছোট্ট আন্তর্জাতিক সংবাদের প্রতি লক্ষ্য করলেই তা অনুধাবন করা যাবে। তাতে ষোল পৃষ্ঠার ৪র্থ কলামের শেষ পারার DIED শিরোনামায় গত আগস্ট মাসে যে চারিজন বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, তন্মধ্যে শহীদ মওলানা সাইয়েদ মাহমূদ মোস্তাফা আলমাদানীর নামটি তৃতীয় নম্বরে রয়েছে। যথা—

Gen gen Njein, 48, Lebanese chief of staff in a hali-copter crash in northern Lebenon. Sir, W, Le Gros clark, noted the greatest British physicl anthropotgist of the century and author of several books on evolution. Syed Mah-mood Mstafa Al-Madani, Vice-president East Pakistan Nijam-I-slam party shotdead on 1th August in Dhaka. George jcckson 28 (Solidad Brothers, the prison Letters of Gecrg jcekson) Killd by prison guards at San Quentun, California 22nd August.

এছাড়া সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল সংবাদপত্রেই তাঁর সম্বন্ধে শোকসংবাদ ও গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

জ্ঞানতাপস মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহঃ)

[জন্ম — ১২-১২-১৯০০— মৃত্যু ১৬-৮-১৯৭২— খৃঃ]

ইসলামী শাস্ত্র, দর্শন ও ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠক, গবেষক, লেখক সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক আলেম ও দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে হিমালয়ান উপমহাদেশে যে কয়জন প্রখ্যাত মনীষী গুজরে গেছেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা নূর মহাম্মদ আজমী (রহঃ) একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। মওলানা আজমী সাধারণভাবে এদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবি মহলে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক ও জ্ঞানতাপস হিসাবে পরিচিত। তবে তিনি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণ ও শিক্ষানীতির সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম তাত্বিক পুরোধা হিসাবেই অধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন বহু-মুখী প্রতিভার অধিকারী। বাংলা, আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্ব ছিল। ইংরেজী ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। এভাষায় রচিত তাঁর একখানা পুস্তিকাও আছে বলে জানা যায়। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তকসমূহ এবং প্রকাশিত প্রবন্ধাদি উল্লেখিত ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। ভাষা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে মওলানা আজমী ছিলেন এদেশের যুব-সমাজ বিশেষ করে মাদ্রাসা পাশ যুবক আলেম সমাজের জন্য প্রেরণার উৎস। মাতৃভাষা বাংলা আধুনিক শিক্ষার স্পর্শমুক্ত তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষায় জমাতে উলা পাশ একজন আলেমও যে চেষ্টা ও সাধনা বলে বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্ব অর্জন করতে পারেন এবং দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞান-গবেষণাকেন্দ্র থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিধারীদের চাইতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতার অধিকারী হতে পারেন, জ্ঞানসাধক মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ছিলেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ও অংকশাস্ত্রেও ছিল তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। বস্তুত: বাংলাদেশের মাদ্রাসা পাশ আলেম সমাজে মাতৃভাষা বাংলা এমনকি অন্যান্য আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও সাংবাদিকতার যে আগ্রহ চল্লিশের শেষ দশক

থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার মূলে মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা রুহুল আমীন ও মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী প্রমুখের জ্ঞান সত্তার পাশপাশি মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর জ্ঞান সত্তা অধিক প্রেরণা যুগিয়েছে।

মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী বুদ্ধিজীবি মহলে বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষা নীতির সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোধা হিসাবে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী শিক্ষানীতিকে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট ও প্রাণসত্তা ঠিক রেখে যুগোপযোগী বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তন এবং একে মুসলিম মিল্লাতের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পন মওলানা আজমীই প্রথম উপস্থাপন করেন।

ভারত বিভাগের পূর্ব থেকে কয়েক দশক পর্যন্ত এদেশের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষা সহ আধুনিক জ্ঞানের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি ও তার ক্রমোন্নতির পরবর্তী অব্যাহত প্রয়াস তাঁর শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন ও প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল। যথাস্থানে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনার ইচ্ছা থাকলো। এদেশের সরকারী, বেসরকারী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক শিক্ষা বিশেষতঃ মাতৃভাষা বাংলার সংযোজন ও অন্যান্য বিষয় পাঠ্যভুক্ত করণের ব্যাপারে চরম রক্ষণশীলতা ও কূপমণ্ডুকতার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে মওলানা আজমীই তাঁর শানিত যুক্তির প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। ইসলামী শিক্ষানীতিকে তার প্রাণসত্তা বজায় রেখে যুগোপযোগী, গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার যে আন্দোলন পাকিস্তান আমল থেকে চলে আসছিল, এর প্রধান উদ্গাতা মওলানা আজমীকেই বলতে হয়। মওলানা আজমীর নিত্য সঙ্গের সাথী মওলানা মরহুম শামসুল হক ফরিদপুরী ও মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবদ্বয়ের মতোই তিনিও আজীবন সূফী সাধকের ন্যায় সহজ সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বাংলাদেশের গৌরব জ্ঞানতাপস মওলানা আজমী নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত নেয়াজপুর গ্রামে খৃস্টীয় ১৯০১ উনবিংশ সালের

ডিসেম্বর মাসে রোজ রোববার (১৩৩৭ বাং) এক শেখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ আলী আজম ও মাতার নাম বেগম রহীমুন্নেসা। ভারতের আজম গড়ের ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান দারুল মুসান্নেফীন আজমগড়-এর ভাবাদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সে কারণে অথবা তাঁর পিতার নামানুসারে তিনি আজমী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ শেখ মনীরুদ্দীন ফরায়েজী বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণের পথিকৃৎ সংগ্রামী নেতা মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর অনুসরণের ফলেই ফরায়েজী নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

শারীরিক গড়ন, চোকা নাক, আরবীয় ধাঁচের চোয়াল ও মুখাবয়ববিশিষ্ট মওলানা আজমীর প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হতো যেন কোনো এক কালে বাংলার উপকূল এলাকায় যে সব আরব বণিক অথবা ধর্মপ্রচারক মোবাল্লিগ আগমণ করতেন, তাঁদের কারুর রক্তধারার তিনি উত্তরাধিকার ও স্মৃতি বহন করতেন। মওলানা আজমীর অকৃত্রিম আতিথেয়তা, উদারতা, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর আরবীয় চরিত্রেরই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করতো। এসব কারণে এবং মওলানা আজমীর পূর্ব পুরুষদের নামের সঙ্গে শেখ শব্দের সংযুক্তির দরুন মধ্যযোগে আগত কোনো আরব বংশীয় মোবাল্লিগের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর বংশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। মওলানা আজমীর মাতৃপিতৃ উভয় কুলের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে আরবী, ফারসী এবং বাংলা শিক্ষার চর্চা ছিল।

শিক্ষা দিক্ষা

মহান জ্ঞানসাধক মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর শৈশব শিক্ষার সূচনা হয় স্থানীয় মুনশী মুহাম্মদ হাতেম ও তাঁর পিতা শেখ আলী আজমের নিকট। পিতার নিকট বাংলা বর্ণমালা, জনাব মুনশী হাতেমের নিকট কোরআন মজিদ ও কিছু ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। এ সামান্য শিক্ষা লাভের পর বালক নূর মুহাম্মদ তাঁর বয়সের গুরুত্বপূর্ণ পনরটি বছর সাংসারিক কাজের মধ্যেই অতিবাহিত করেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের কোনোই সুযোগ ঘটেনি। ১৫ বছর পর তিনি গ্রামের নৈশ বিদ্যালয়ে পুরাতনপন্থী শিক্ষক মরহুম আবদুল লতীফ মোল্লার নিকট প্রথমে আর্যামাত্রা

এবং পরে রামসুন্দর বসাকের "বাল্যশিক্ষা" পাঠ আরম্ভ করেন। বলাবাহুল্য সাংবাদিক, জ্ঞান-গবেষণাসমৃদ্ধ বহু বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা কারী এশিক্ষাবিদের কোনো শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ এখানেই খতম।

কিশোর নূর মুহাম্মদের মনে মাঝে মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। কিছুতেই মাঠের কাজে মন বসতে চায়না। বসবেই বা কি করে? দেশ জাতি ও দ্বীনের বৃহত্তর সেবার দায়িত্ব যে তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। অতঃপর ১৯১৭ সালে জনৈক গুণী ব্যক্তির পরামর্শে ও আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে কিশোর আজমী ফেনীর দাগনভূঁয়া আজিজিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। সেখানে মরহুম মৌলভী আবদুল আজিজ আমানুল্লাহ্‌পুরী ও জনাব মৌলভী বশিরুল্লাহ ভোগল পুরীর নিকট তিনি আরবী, ফারসীর প্রাথমিক বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯২০—২১ খৃষ্টাব্দে জমাতে হাফতম ও শশম চট্টগ্রাম নেজামপুরের আবুরহাট মাদ্রাসায় মরহুম মৌলভী এলাহীবখশ ও মৌলভী মেহেরুল্লাহ্‌ প্রমুখের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

জ্ঞান-পিপাসু আজমী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম দারুল উলূম মাদ্রাসায় ডাবল প্রমোশনে জমাতে ছাহারমে ভর্তি হন এবং মওলানা মহব্বত আলী রামুবী, মওলানা শাহ নজির আহ্‌মদ ঘুনতী, মওলানা আমিরুদ্দীন রামুবী ও জনাব মওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখের নিকট জমাতে ছাহারম থেকে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জমাতে সুয়ামের পরীক্ষার পূর্বেই আজমীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এ ঘটনা তাঁর জন্য বিরাট প্রতিবন্ধক মনে করে তিনি সাময়িকভাবে হতভম্ব হয়ে পড়েন। সংসার সামলাবার জন্য তাঁকে পুনরায় বাড়ীমুখী হতে হয়। তাঁর মহৎ জীবনের যাত্রাপথে প্রতিকূলতা সাময়িক ভাবে চলার গতিকে মন্থর করতে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণরূপে অচল করতে পারেনি। দুর্জয় মনোবল ও কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতাই টিকে থাকতে পারে না। জ্ঞানপিপাসু যুবক আজমীর জীবনেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সাংসারিক বহুমুখী সমস্যা ও চিন্তার বাধা তাঁর উদ্যম ও জ্ঞানস্পৃহাকে দমাতে পারেনি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জমাতে উলা

পরীক্ষা দেন এবং যথারীতি না পড়ার দরুন যেখানে কোনো প্রকারে পাশেরও নিশ্চয়তা ছিলনা, সেক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় এদেশে দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহে আ'রবী, ফারসী ছাড়া মাতৃ-ভাষা বাংলা বা অপর কোনো ভাষা পড়ানো হতোনা। ঐ দুটি ভাষার কিতাবও তৎকালীন প্রচলিত উর্দুতেই বুঝানো হতো। যুবক আজমী নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ই ঐ সময় কিতাব পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু প্রাথমিক বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল অধ্যয়ন করেছিলেন। রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত বাংলা পাঠকারী আজমী এমনিভাবে বাংলা সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সাহিত্যিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আধ্যাত্মিকতা

শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর মওলানা আজমী শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। ঐ সময় তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও আত্মনিয়োগ করেন। চট্টগ্রাম নিবাসী বাংলার প্রখ্যাত সূফী সাধক আলেম ওলীয়ে কামেল এবং উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠ হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা জমিরুদ্দীন সাহেব (রহঃ)-এর নিকট তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। মওলানা আজমীর জীবনে তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদের বিরাট প্রভাব ছিল। হযরত মওলানা জমিরুদ্দীন সাহেব (রহঃ) যেরূপ 'বে-রিয়া' আবেদ ছিলেন, জ্ঞানতাপস হযরত মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহঃ)-ও অনুরূপ একজন 'বে-রিয়া' আবেদ ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা এবং অনুশীলন নিজস্ব পরিমণ্ডলের বিশেষ ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যেরা তেমন একটা জানতো না বললেই চলে। এব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত চাপা। তাঁর জীবনে তাযকিয়া-এ-নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি কি পরিমাণ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় তাঁর বাস্তব জীবন থেকেই তা সহজে অনুমেয়। সূফী সাধক পীর-ফকীরের ন্যায় তিনি সহজ সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। তবে প্রচলিত নিয়মে তিনি কাউকে মুরীদ করাতেন না। নিজেকে পীরসুলভ ভঙ্গিতেও জনসমক্ষে পেশ করতেন না। আজমী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, সদালাপি, মিষ্টভাষী, নিরহংকারী ও স্বল্পভাষী। তাঁর ব্যক্তিসত্তা ছিল এর এক জীবন্ত

ছবি। যাবতীয় বেদায়াত ও কুসংস্কারের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। যে-কোনো ধরনের লোকই তাঁর দরবারে আসুকনা কেন তিনি ধৈর্য্য সহকারে তার বক্তব্য শুনতেন। কোনো তত্ত্ব বা তথ্যগত ভুল না হলে আগত মেহমানের কথা কেটে নিজ বক্তব্য পেশ করার কোনো প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিলনা। আগতদের মধ্যে নিজের পাণ্ডিত্ব ফলাবার কোনো আগ্রহও তাঁর মধ্যে দেখা যেতো না। তাঁর সামনে থাকতো একটি তেপাই। তার ওপর কাগজ, কিতাব রেখে তিনি লেখাপড়া করতেন। নিজ হাতে নিজের সকল কাজ করতেন। কোনো লোক সে যত ভক্ত-অনুরক্তই হোক না কেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলে অসুস্থ অবস্থায়ও বিশেষ খাদেম ছাড়া তিনি তাদেরকে কাজের আদেশ করতেন না। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য এত তথ্য ও যুক্তি-নির্ভর ছিল যে, অনেক সময় বহু খ্যাতনামা লেখককে নিজের প্রায় ছাপানো বইয়ের কয়েক ফর্মা বাদ দিয়ে আজমী সাহেবের পরামর্শের আলোকে বইয়ের সে অংশ সংশোধন করতে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আলেম। ভদ্রতা জ্ঞান ছিল তাঁর অতি প্রখর। স্বাবলম্বিতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান ভূষণ। অর্থের লোভে তিনি নীতিভঙ্গ করে ইজ্জত ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার পাত্র ছিলেন না। মওলানা আজমী "উপরের হাত নিচের হাতের চাইতে উত্তম" এ হাদীসের যথার্থ প্রতীক হবার জন্যে আলেম সমাজকে উপদেশ দিতেন। তিনি পরভোজী হবার চাইতে শ্রম সাধনার জীবিকা অন্বেষণের ব্যাপারে আলেমদের তাগিদ করতেন। মওলানা আজমী এ কারণেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় হালাল রুজী তথা অর্থকরী শিক্ষার উপর অধিক জোর দিয়েছিলেন। আধুনিক সমাজ কাঠামোতে আলেম সমাজ জীবনের প্রায় সকল অঙ্গনেই অপাংক্তেয়। এসকল ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতিকে তিনি একান্ত জরুরী মনে করতেন। আলেমদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি, সমাজের সর্বস্তরে তাদের অনুগমন এবং স্বাবলম্বী জীবনের অধিকারী হবার প্রতি তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের জন্য দরদী আলেম সমাজকেই যোগ্যতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, আর এজন্যে জ্ঞানে-গুণে স্বাবলম্বী জীবনের অধিকারী হওয়া আবশ্যক বৈ কি।

মওলানা আজমী কখনও অপরের অনুগ্রহ লাভে রাজি ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি যার কোনো প্রকার বিনিময় প্রদান করতে পারবোনা এমন অনুগ্রহ লাভ করতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। কারও অনুগ্রহের বোঝা উঠানো অপেক্ষা হিমালয় পর্বত মাথায় উঠানোকে আমি সহজ বলে মনে করি।" বলাবাহুল্য, মওলানা আজমী তাঁর জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি এ নীতির উপর অটল ছিলেন। অপরের অনুগ্রহ লাভ অপেক্ষা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করাকে তিনি অধিক শ্রেয় মনে করতেন। নিজের সাধ্যমতো তিনি অপরকে সাহায্য দিতেন। সাধারণ দীন-দুঃখীদের করুণ চাহনি ও জীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁদের দৈন্যদশার অবসান কবে হবে, কবে এদেশে ইসলামী শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, দীনহীন মানুষ দেখলে তিনি প্রায় এরূপ খেদোক্তি করতেন। সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি কোনো মালিক পক্ষের শোষণমূলক আচরণের কথা শুনে তিনি নিজেকে অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করতেন এবং পরিতাপের সঙ্গে বলতেন, 'ইসলামী অর্থ এবং শ্রমনীতি কার্যকরী করা ব্যতীত এসব বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফুটানো সম্ভব নয়।" সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি বিধানকল্পে তিনি সকল সময় চিন্তাভাবনা করতেন। ইসলামী অর্থব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা ও ইসলামে দরিদ্রের অধিকার সম্পর্কে তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তকে বিভিন্ন আলোচনায় তাদের প্রতি নিজের দরদী মনেরই তিনি পরিচয় দিয়েছেন। "ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি" নামক বইটি মূলতঃ দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থার শিকার সাধারণ গরিব জনগণের প্রতি মওলানা আজমীর অকৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতির প্রেরণা থেকেই লিখিত হয়েছিল।

জাতীয় সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধানের চিন্তা মওলানা আজমীর মন মস্তিষ্ককে সকল সময় আচ্ছন্ন করে রাখতো। তিনি সাধারণতঃ নফল এবাদত বন্দেগী রাত্রিতে কিংবা রুদ্ধদ্বার কক্ষে সমাধা করতেন; মওলানা আজমী আনুষ্ঠানিক নফল এবাদত পালন করলেও জাতীয় সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান বের করার জন্য কোরআন-হাদীস ও কিতাব চর্চার গভীর গবেষণায় নিয়োজিত থাকাকে অধিক সওয়াবের কাজ বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী,

তবে কোনো ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রশ্নকারীর সামনে যে জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার খুলে ধরতেন তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকত না। বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানপরিধি এত ব্যাপক ছিল যে, অনেক বুদ্ধিজীবি তাঁকে ইনসাইক্লোপেডিয়া বলে আখ্যায়িত করতেন। ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি ছিলেন সহজ সরল জীবনের অধিকারী। তাঁর মতো লোক ঢাকা শহরে মাথা গুজবার মতো কোনো সুব্যবস্থার দিকে কোনো দিনই লক্ষ্য দেননি। তাঁর খাওয়া-পরাও ছিল আড়ম্বরহীন। এক কঠোর দরবেশী জীবন যাপনেই যেন তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। তাঁর দরবারে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা এবং কঠিন প্রশ্নাবলীর মীমাংসার জন্য যারা আসতেন, তাঁরা তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এবং কৃত্রিমতা-বর্জিত সৌজন্যবোধে মুগ্ধ হয়ে ফিরতেন। তাঁর সংস্পর্শে আসলে পূর্ব জামানারসূফী সাধক ও ইমাম মুজতাহিদদের স্মৃতিই মনে জাগতো।

আজমীর দরবারে জ্ঞানী ও জ্ঞান-অন্বেষীদের ভীড়

বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক তথা ইসলামের জটিলতর বিষয়সমূহ এবং দেশ ও জাতির কঠিন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য জ্ঞানীগুণী, শিক্ষিত-পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবি, আলেম-ওলামা, রাজনীতিক তাঁর দরবারে সকল সময়ই ভীড় করতেন। হোগলার চাটাইর উপরই কম্বল বিছিয়ে দিয়ে তিনি সকল শ্রেণীর লোককে অভ্যর্থনা জানাতেন।

ঢাকায় মওলানা আজমীর আলাপ আলোচনার সাথী ছিলেন বেশির ভাগ মরহুম মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, প্রাচ্যের ভাষাবিদ জ্ঞানতাপস মরহুম ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, ইসলামী চিন্তাবিদ সাহিত্যিক মরহুম মওলানা আকরাম খাঁ, ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ ও আরবী বিভাগের হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট মরহুম মওলানা শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ জ্ঞানীগুণীজন। মওলানা সাহেব (১৯৬০—৬২ ইং) চকবাজার মসজিদ সংলগ্ন একটি দোতলা বাড়ীতে অবস্থান কালে আছরের নামাজান্তে শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে প্রায় তাঁর কক্ষে দেখা যেতো। মওলানা আজমী সাহেব নিজেও প্রায় সময় রিকশাযোগে জাতির উল্লেখিত শিক্ষাগুরু মহান দিকপালদের অবস্থানকেন্দ্রে চলে যেতেন।

জ্ঞান গবেষণামূলক জটিল বিষয়সমূহ নিয়েই তাঁদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন। এ দেশে ইসলামী আন্দোলন সংগঠন জামায়েত ইসলামীর এক কালের নেতা মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম এবং জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট ও হৃদ্ধতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান ও ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁদের সাথে মওলানা আজমীর বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা সক্রিয় ছিল। মওলানা আজমীর দরবারে কেবল দেশের জ্ঞানীগুণীদেরই আগমন ঘটতো না, পাক-ভারতের বহু ওলামা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক বুদ্ধিজীবি, পণ্ডিত, ইসলামী চিন্তাবিদ আলেম-ওলামাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন। একবার এই নিরব সাধক মনীষীর অসুস্থতার খবর শুনে এ শতকের বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন।

তরুন লেখক গোষ্ঠী ও মওলানা আজমী

প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক এবং তরুণ আলেমরা মওলানা আজমীর নিকট অধিক ভীড় করতেন। প্রত্যেককেই তিনি যথাসাধ্য পথের দিশা দিতেন। তিনি তরুণ আলেমদেরকে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কোনো তরুণ আলেমের লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। সরলতা ও মুগ্ধতা সহকারে ঐ লেখকদেরকে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। বর্তমানে বাংলাদেশে আলেম লেখক বা সাংবাদিকদের অধিকাংশই মওলানা আজমীর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত।

জ্ঞান-গবেষণায় আজমী

তীক্ষ্ণ মনযোগ সহকারে পড়াশোনা এবং নিজ আগ্রহের প্রতিটি বিষয়ের উপর গভীর পর্যবেক্ষণের অভ্যাস ছিল আজমী স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। খোদ তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ ১৮ বছরকাল তিনি গড়পড়তা দৈনিক পঞ্চাশ পৃষ্ঠা করে বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব ও বইপত্র পাঠ করতেন। এছাড়া তিনি দৈনিক সংবাদপত্র সহ দেশের সাময়িক ও মাসিক পত্র-

পত্রিকাসমূহ রীতিমতো পড়তেন। মওলানা আজমী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অবসর নেয়ার পর অকূল জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন এবং ইসলামী শিক্ষা সংস্কারের বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতা গমন করেন। ১৯৪৫—১৯৪৬ সাল এ পুরো দুটি বছর তিনি কলকাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ নিয়ে জ্ঞান চর্চায় ডুবে থাকেন। আরবী, ফারসী ও উর্দূতে লিখিত দেশবিদেশের অগণিত গ্রন্থ এবং হাদীস, তফসীর ও ফেকাহ ছাড়াও এসময়ের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের উপর বইপুস্তক পড়াশোনা করেন। মওলানা আজমী বলতেন, বিষয়াবলীর মধ্যে কোরআন-হাদীসের পর ভুগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানই হচ্ছে আমার অধ্যয়নের উপভোগ্য বিষয়বস্তু।

"প্রাচ্য বিদ্যাভাণ্ডারের জীবন্ত বিশ্বকোষ"

মওলানা আজমী অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছিলেন। তিনি যে সম্পর্কে কলম ধরতেন, তা যেমন হতো যুক্তিপূর্ণ তেমনি তত্ত্ব এবং তথ্যে ভরপুর। কোনো তত্ত্বে তথ্যে সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি যে পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী পণ্ডিত মরহুম শেখ আবদুর রহীম বা ডক্টর শহীদুল্লাহ কিংবা মওলানা আকরাম খাঁ অথবা মওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী বা আলিয়া মাদ্রাসার আল্লামা কাশগরী অথবা মুফতী আমীমুল এহসান প্রমুখ বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করে সন্দেহমুক্ত হতেন, তাবত ঐ ব্যাপারে কলম ধরতেন না। কেননা এসব মহান জ্ঞানসাধক কেউ ব্যক্তিগত, কেউ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বিশাল গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের দ্বারাও সন্দেহমুক্ত না হলে, হয় পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মরহুম মুফতী মুহাম্মদ শফী কিংবা মওলানা মওদূদী অথব দারুল উলুম দেওবন্দের ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সাথে তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। বস্তুতঃ এসব কারণেই তাঁর লেখা তত্ত্ব, তথ্য যুক্তিপূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র হতো। মওলানা আজমীর বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা পদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক এবং ভাষা ছিল সরল, প্রজ্ঞা-পূর্ণ ও রুচী সম্মত। তাঁর লেখায় আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিলনা। তাঁর রচিত বই-পুস্তক ও প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়ে তিনি যথেষ্ট মননশীলতার

পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর লিখিত জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তক বিশেষ করে মেশকাতের অনুবাদ ভাষ্য তাঁকে চিরদিন অমর করে রাখবে। তাঁর দিবারাত্রির তপস্যাই ছিল লেখা আর পড়া। কোনোরূপ অসুখ বিসুখে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে না পড়া পর্যন্ত তিনি লেখা-পড়াতেই ডুবে থাকতেন। তিনি বলতেন, লেখাপড়ায় আমি এক অনুপম তৃপ্তি লাভ করি আর কলম ধরি নিজের কর্তব্য মনে করে। সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক যেকোনো ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গভীর জ্ঞান আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহু উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিকেও হতবাক করে দিতো। যেকোনো সমস্যার সন্তোষজনক এবং যুক্তিপূর্ণ ইসলামী সমাধান দানে তাঁর দক্ষতা দেখে মওলানা মুহাম্মদ আক্রাম খাঁ তাঁকে আখ্যায়িত করতেন "প্রাচ্য বিদ্যাভাণ্ডারের জীবন্ত বিশ্বকোষ" বলে।

মওলানা আজমীর কর্মজীবন

শিক্ষকতা ঃ ছাত্র জীবন সমাপ্ত হবার পর মওলানা আজমী শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্ম-জীবনের সূচনা করেন। প্রথমে তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বালুচৌমুহনী মাদ্রাসায় এবং পরে ১৯২৮—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেনী আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত থাকেন। এ সতর বছর সময়কালে তিনি বহু যোগ্য আলেম সৃষ্টি করেন।

মওলানা আজমীর শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে কর্মজীবনের সূচনা হলেও তাঁর জীবনের বেশির ভাগ অতিবাহিত হয়েছে কলমের জেহাদে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, বিংশ শতাব্দীর এযুগে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে কলমের জেহাদের গুরুত্ব অপরীসীম। অবশ্য শিক্ষকতার জীবন থেকেই তিনি এ জেহাদের সূচনা করেন। আক্ষরিক অর্থের শিক্ষকতা থেকে অবসর নেয়ার পর লেখনীর মাধ্যমে তিনি যে বৃহত্তর শিক্ষকতায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাতেও শিক্ষা নিয়েই তিনি চর্চা করেছেন অধিক। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারা তিনি এদেশের অগণিত সমস্যার মূল—শিক্ষানীতি সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। শিক্ষানীতির ভুলত্রুটি নির্দেশক তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ এদেশের ওলামা, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র মহলে বিপুল সাড়া জাগায়।

স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ

শিক্ষকতা জীবনের এক পর্যায়ে মওলানা আজমী স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নিজ কর্মক্ষেত্র ফেনী শহরে তিনি একটি খদ্দর ভাণ্ডার এবং ইংরেজ ভাবধারার বিরুদ্ধে স্বদেশী মতবাদ ও ভাবধারা প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজী পোশাক-আশাককে তিনি বিজাতীয় তথা গোলামী যুগের প্রতীক বলে মনে করতেন। তিনি একবার এ লেখকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"ইংরেজরা ইসলামী পোশাক-আশাকের প্রতি এদেশের মুসলমানদের মনে ঘৃণ্য ভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আজাদী সংগ্রামের বীর শহীদ টিপু সুলতান ও অন্যান্য মুসলিম শাসকদের জামা-পাগড়ী তাদের চাপরাসী ও খানসামাদের ব্যবহার করাতো। আমি সকল রিকসা ড্রাইভার ও মাঠে-ময়দানে কর্মরত শ্রমিকদেরকে রৌদ্র-তাপ থেকে রক্ষার জন্য ইংরেজ সাহেবদের হেট ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতাম। হেট খরিদের জন্য কোনো কোনো রিকশা চালককে সাহায্যও দিতাম।" জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বিজাতীয় চালন-চলন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর কিরূপ বীতশ্রদ্ধ ভাব ছিল তাঁর এ উক্তি থেকে তা সহজে অনুমেয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মওলানা আজমী মোটা রঙ্গিন খদ্দরের পোশাক ব্যবহার করেছেন। এটা নিশ্চয় তাঁর স্বদেশী সম্পদপ্রীতিরই সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলামী শিক্ষানীতির সংস্কারে মওলানা আজমী

যখনই কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ধর্মীয় রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছে, সেখানে মুসলমানদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও শৈক্ষিক সকল প্রকার অধঃপতন তরান্বিত হয়েছিল। এ উপমহাদেশে মুসলিম আধিপত্যের দিনগুলোতেও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এখানেও মুসলমানদের আধিপত্য বিনষ্ট হবার পেছনে ছিল একই কারণ। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে এ অবস্থা লক্ষ্য করে মুজাদ্দেদে আলফেসানীর পর সর্বপ্রথম এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ইমামুলহিন্দ দার্শনিক শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভী। মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী তাঁর গভীর পড়াশোনা ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে মনীষী ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর জীবন দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভী মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে

পুঞ্জিভূত কুসংস্কার, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে যেসব সংস্কার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, মওলানা আজমী সেগুলোর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর এ ভাবশিষ্য তাঁর সুচিন্তিত বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে তারই সাক্ষ্য রেখে গেছেন। বিশেষতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছিল ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর সংস্কার-প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। মওলানা আজমী বাংলাদেশের অশিক্ষা-কুশিক্ষার পংকিলাবর্তে নিমজ্জিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে সঠিক আত্মচেতনায় উজ্জীবিত করার জন্য জাতির রাহবর আলেম সমাজের মধ্যে নৈতিক বিপ্লব আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন। এ জন্য তিনি শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন।

ফেনী আলিয়া মাদ্রাসায় (১৯২৮—১৯৪৩ খৃঃ) শিক্ষকতা কালেই মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি এ দূরদর্শী শিক্ষাবিদের চোখে নগ্ন হয়ে ধরা পড়তে থাকে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটিসমূহের কথা ভেবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং এর প্রতিকারের জন্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। সর্ব প্রথম শিক্ষার মাধ্যমের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। বস্তু বা বিষয় রহস্যের সঠিক উপলব্ধি ও প্রকাশের জন্য মাতৃভাষা অপরিহার্য। কোর-আন মজিদও এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কোনো কল্যাণ সাধন করা যায় না। বাংলার আলেম সমাজ বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক-হীন অবস্থায় জাতির বৃহত্তর কোনো কল্যাণে আসবেনা—এ উপলব্ধি মওলানা আজমীকে ভাবিয়ে তোলে। পরাধীন বাংলার শিক্ষা-সংস্কারের পথিকৃৎ মওলানা আজমী তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাঙ্গনেই তাঁর সংস্কার-চিন্তা প্রয়োগে এগিয়ে আসেন। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক, স্থানীয় বিদগ্ধ শ্রেণী ও সমচিন্তার লোকদের দ্বারা এ উদ্দেশ্যে এক পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন। এজন্য তাঁকে বিরাট বিরোধিতারও সন্মুখীন হতে হয়। কেননা, মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষা ! এ যেন ছিল তখন এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

এভাবে মওলানা আজমী আলাপ-আলোচনা সভা ও লেখালেখির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে থাকেন এবং রক্ষণ-

শীলতা পরিহার করে সকলকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আশার আহবান জানান। তবে তাঁর এ আহবানে কে কতদূর সাড়া দিল, সেজন্যে তিনি অপেক্ষা না করে ১৯২৯ সালে ফেনী মাদ্রাসায় বাংলা সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ইসলামী শিক্ষানীতিতে তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে গোটা বাংলার মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে ফেনী মাদ্রাসাই প্রথম এ মর্যাদা লাভ করে।

যুক্তবাংলার শিক্ষানীতিতে সংস্কার পরিকল্পনার স্বীকৃতি

মওলানা আজমী বাংলার শোষিত অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে ইসলামী শিক্ষা-আদর্শের যাদুমন্ত্রে আত্মসচেতন করার যে মহান ব্রত নিয়ে শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, প্রথমে বাংলা ও পরে গোটা উপমহাদেশে তিনি তাঁর এ নিরব আন্দোলনের প্রসার দানে সচেষ্ট ছিলেন। মফস্বল শহর ফেনীতে বসে এ মহান উদ্দেশ্যে কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাই দেশ বিভাগের প্রাক্কালে (১৯৪৫ ইং) যখন বাংলাদেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্ন উঠে, মওলানা আজমী তখন কলকাতায় চলে যান। তিনি দু'বৎসর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা পাঠাগার এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করেন। তাঁর এ নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা-কর্মের ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি 'নেজামে তালীম' (শিক্ষা পদ্ধতি) নামক শিক্ষানীতির উপর উর্দু ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। অবিভক্ত বাংলার হক মন্ত্রী সভার শিক্ষামন্ত্রী জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জম উদ্দিন হোসাইনের সময় শিক্ষাসংস্কার উদ্দেশ্যে গঠিত শিক্ষা-কমিশনের সামনে মওলানা আজমীর মাদ্রাসা শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা পেশ করা হলে সৈয়দ মোয়াজ্জম উদ্দিন হোসাইন তাঁর মূল কাঠামোটির অনেকটাই গ্রহণ করেন। আজমী পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই 'মোয়াজ্জম শিক্ষা কমিশন' ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে সর্ব প্রথম বাংলা সাহিত্য, ভুগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতিকে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় তালিকাভুক্ত করেন। বস্তুতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং বৈষয়িক ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার প্রাণ সত্তা সহকারে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজানোই ছিল মওলানা আজমীর পরিকল্পিত শিক্ষানীতির মূল কথা।

সংস্কার আন্দোলনের বিস্তৃতি দানের প্রয়াস

মাদ্রাসা শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের ঢেউ যাতে উপমহাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এ উদ্দেশ্যে মওলানা আজমী তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাটি অবিভক্ত ভারতের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করেন। দেওবন্দ, ছাহারানপুর, ডাবেল, নাদ্‌ওয়া প্রভৃতি ইসলামী শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহের পণ্ডিতবর্গ তাঁর শিক্ষা-সংস্কারমূলক এ পুস্তকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁদের মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের অধ্যক্ষ মওলানা কারী তৈয়ব সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মওলানা তৈয়ব সাহেবের সঙ্গে মওলানা আজমী ১৯৪১ সাল থেকেই শিক্ষা-নীতি নিয়ে লেখালেখি করেন। তার পূর্বে এবং পরে কলকাতা মাদ্রাসা-এ-আলিয়ার অধ্যক্ষ মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিষ্ট্রারার জিয়াউল হক, কলকাতা ইসলামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি এর চর্চা করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি গঠনে আজমী

বাংলাদেশে জমিয়াতুল মোদাররেসীন নামে মাদ্রাসা শিক্ষকদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবে যে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব আজকাল দেখা যায়, শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ১৯৩০ সালে মওলানা আজমীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই তা গঠিত হয়। জমিয়াতুল মোদাররেসীন নামে 'ওল্ডস্কীম মাদ্রাসার' মোদার্রেসদের একতাবদ্ধ করা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি সাধন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে তোলাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের সুমহান লক্ষ্য।

জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার নেতৃত্ব দান

মওলানা আজমীর ইসলামী শিক্ষানীতি সংক্রান্ত জ্ঞানগর্ব প্রবন্ধাদি ও জাতীয় জটিল সমস্যবলীর উপর তাঁর সুচিন্তিত মতামত পত্রপত্রিকায় প্রায় প্রকাশিত হতো। শিক্ষানীতি সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য আলেম সমাজ ও সাধারণ মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে বিপুল জাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা-ছাত্র সমাজ এ শিক্ষা গবেষককেই তাদের সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত করে। মওলানা আজমী সাবেক পূর্বে-পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া বা আরবী ছাত্র সংঘের সভাপতি রূপেও মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে উন্নতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার এবং যুগসচেতন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন (১৯৬০ ইং)।

মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর প্রজ্ঞা ভিত্তিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সঠিক মনযিলে মাকসূদের সন্ধান দেয়। তাঁর নেতৃত্বকাল থেকেই মাদ্রাসা ছাত্রগণ অধিক পরিমাণে নিজেদের অধিকার সচেতন হয়। লক্ষ্মী বাজারের ডাফ্রিন হোষ্টেল থেকে বখশী বাজারের আধুনিক সুরম্য অট্টালিকায় আলিয়া মাদ্রাসার স্থানান্তর মাদ্রাসা-ছাত্রদের অধিকার সচেতনতার একটি জীবন্ত সাক্ষী। আজমীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রনেতারা সে দিন এ দাবীর সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিও করেছিল। কিন্তু তখন এ দাবি পূরণ না হলেও আজকের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব যে সেই দাবীরই ফলশ্রুতি তা অনস্বীকার্য।

সাংবাদিকতায় মওলানা আজমী

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। যে কোনো দাবীর সপক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্যোগে প্রচার মাধ্যমের একান্ত প্রয়োজন। মওলানা আজমী তাই একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে সচেষ্ট হন। এ যুগে ইসলামী শিক্ষা-আদর্শের বিস্তার ও তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশের দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। দেশবাসীকে তা অবহিত করা বিশেষ করে দেশের ওলামা, বুদ্ধিজীবি ও ছাত্র সমাজকে এব্যাপারে সক্রিয় করে তুলতে চাইলেন। জমিয়াতুল মোদারেসীনের মুখপত্র হিসাবে ফেনী থেকেবাংলা সাপ্তাহিক তালীম-এর প্রকাশ সেই উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। সাপ্তাহিক তালীম মওলানা আজমীর শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কিত ধ্যানধারণা ও সময়ের প্রয়োজন পূরণে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তিনি ১৯৫৫ থেকে ৫৮ সন পর্যন্ত এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তখনকার দিনে তালীমের সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য যে সকল প্রবন্ধ তাতে ছাপা হতো তার অধিকাংশই থাকতো শিক্ষা সংক্রান্ত।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা

জীবনের শেষাংশে মওলানা আজমী ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসাতেই অবস্থান করতেন। ফরীদাবাদ মাদ্রাসা সংলগ্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান "এদারাতুল মাআরেফ" তাঁর চিন্তা ও উদ্যোগেরই ফল ছিল। বাংলা ভাষা তথা আধুনিক শিক্ষায় মাদ্রাসা পাশ আলেমদেরকে পারদর্শী করে তোলা, তাদের সেই জ্ঞানলব্ধ চিন্তা দ্বারা বাংলা ভাষায় ইসলামী বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা এই

প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দেশবিভাগের সময় প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর কাজ আপাততঃ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা তিনি তাঁর সংস্কারবাদী চিন্তার যেই প্রবাহ সৃষ্টি করে গেছেন, তার প্রভাব সহজে মুছবেনা এবং একদিন তাঁর স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে যে কোনো স্থানে এর অস্তিত্ব জেগে উঠবেই। মওলানা আজমী ভারতের আজমগড়ের ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান "দারুল মোছান্নেফীন" "এবং দায়েরাতুল মাআরিফের" আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'এদারাতুল মাআরিফ' স্থাপনে তৎপর হন এবং অত্র মাদ্রাসা পরিচালক মরহুম মওলানা বজলুর রহমান সাহেবকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর আজীবনের লালিত চিন্তারই একটি ফলশ্রুতি।

মৃত্যুযাত্রী মওলানা আজমীর চিন্তা

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সামান্য কিছুদিন পরেই মওলানা আজমী ইহজগত ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর চলৎশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। নিজ হাতে কিছু লেখার পরবর্তে অপরকে দিয়েই প্রয়োজনীয় বিষয় লেখাতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর মাদ্রাসা শিক্ষার দুরবস্থা লক্ষ্য করে তিনি অধিক বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর ঐ অক্ষম অবস্থায়ও নিজের অনুসারী, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলকে চিঠি লিখিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, তারা যেন বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঐ সময় তিনি ক্ষমতাসীন স্থানীয় কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে সরাসরিও অনুরোধ জানিয়েছেন। দেশ, জাতি, ইসলামের প্রতি কতখানি আন্তরিক দরদ ও ভালোবাসা থাকলে একজন মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি এভাবে ইসলামী শিক্ষার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে পারেন, তা সত্যিই চিন্তার বিষয়।

ইজতেহাদ

মওলানা আজমী মহামনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর দর্শনের ভাবশিষ্য ছিলেন। শিক্ষামূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে তিনি ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর সংস্কার প্রচেষ্টায় এতই আকৃষ্ট ছিলেন

যে, তাঁর কাছে কোরআন হাদীসের পরে উত্তম কিতাব হচ্ছে ওয়ালি-উল্লাহ্ দেহ্লভীর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটি। এ প্রেরণা থেকেই তিনি মওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে সহযোগী করে উক্ত মহৎ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা একাডেমী সে পাণ্ডুলিপি শেষ পর্যন্ত কি করে ছিলেন, তা আর জানা যায়নি। মওলানা আজমী ওয়ালিউল্লাহ্ দর্শনের আদর্শে ইসলামের গতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের ব্যাপারে উদ্ভাবনী জ্ঞান ও ইজতেহাদের মাধ্যমে আধুনিক যুগের জিজ্ঞাসার জবাব দানে তিনি দ্বিধাহীন ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে কোরআন-হাদীসে পর্যাপ্ত জ্ঞানী ও ইজতেহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্যেই তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাসংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন। ইজতেহাদের উপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

জাতীয় সমস্যা ও জিজ্ঞাসার জবাবে

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা তথা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার জাতির প্রতি প্রদত্ত ওয়াদাসমূহের প্রশ্নে যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন, আজাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক দল এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কিছু মাত্র হলেও তা সততার সঙ্গে পালন করেছে। কিন্তু ইসলামের অনুকূলে তারা এখানে সামান্যতম কাজও না করে সম্পূর্ণ ছলচাতুরি ও ধূর্তামির আশ্রয় নেন। অপ্রিয় হলেও এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, মুসলিম লীগের দীর্ঘ দু'যুগের শাসনে তারা অবিভক্ত পাকিস্তানে নিজেদের প্রতিশ্রুতি মাফিক ইসলামের কোনো গঠনমূলক কাজতো করেনইনি বরং বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে চাতুর্যের সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধকে খতম করার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আজাদী হাসিলের অব্যবহিত কাল পরেই তাদের এহেন মানসিকতা দেশের ইসলামী জনতা আঁচ করতে সক্ষম হয়। ফলে জনগণের পক্ষ হয়ে যারা পাকিস্তানকে সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবি তোলেন, সেই দাবিদাওয়াকে বানচাল করার জন্য তারা নানাপ্রকার কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। ইসলামের নামে আজাদী

হাসিলকারীদের এ হেন ভূমিকা লক্ষ্য করে পূর্ব থেকে যারা এদেশে ধর্ম-নিরপেক্ষতা চালুতে সচেষ্ট এবং ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী ভূমিকা অনুসরণ করে বসেছিল, তারাও সুযোগ পেয়ে যায়। অতঃপর যখন এখানে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিরগণ আওয়াজ উঠতে থাকে তখনই মুসলিম লীগের অংশবিশে ও অমুসলিম লীগ মহল থেকে একই সুরে নেতিবাচক শব্দ উচ্চারিত হতে থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্রসংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারে কুটযুক্তির অবতারণা হয়। তখন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে কয়জন ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরুদ্ধাচরণকারীদের যাবতীয় কুট প্রশ্নের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়ে জাতিকে সংশয়মুক্ত করেন; তন্মধ্যে মনীষী মওলানা আজমী একজন। জাতীয় জীবনের একাধিক জটিল সমস্যার সমাধানসূচক জবাব দিয়ে মওলানা আজমী জ্ঞানগর্ভ ও সময়োপযোগী বক্তব্য রাখেন। যেমন, অবিভক্ত পাকিস্তানে ইসলামী শাসন তন্ত্র রচনাকালে সংখ্যালঘুদের স্থান নিয়ে বিতর্ক, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামের ভূমিবব্যস্থা আলেমদের বিরুদ্ধে ইংরেজী শিখতে না দেয়ার অভিযোগ প্রভৃতি প্রশ্নে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মুখে যেমন ছাই পড়তো তেমনি ইসলামপন্থী মহলে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতো। ঐ সকল আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুক্তিপূর্ণ জবাবের মধ্যে দু'একটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

পঞ্চাশের শেষার্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল আওয়ামী লীগের শাসনামল। তখন সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের উজিরে-আলা জনাব আতাউর রহমান খান। তাঁর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আতাউর রহমান খান সেদিন রিপোর্টের ভূমিকায় মন্তব্য করেছিলেন যে, "মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে সময় এবং অর্থের অপচয়।" জনাব খান ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ও ইসলামী নীতি আদর্শ মেনে চলা সত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সেদিন কেন এই মন্তব্য করেছিলেন জানিনা, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দেশের ইসলামী ছাত্র জনতা সেদিন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আতাউর রহমান খানের এ উক্তির প্রতিবাদে পত্রপত্রিকায় যথেষ্ট প্রতিবাদ হওয়া ছাড়াও সারা দেশে

প্রতিবাদ মিছিল, সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সবচাইতে যুক্তি-পূর্ণ লিখিত প্রতিবাদের মধ্যে মওলানা আজমী সাহেবের প্রতিবাদই ছিল বলিষ্ঠ। তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই প্রতিবাদটি ছিল এই—

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে আজমী

"শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা শিক্ষা"

"শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আতাউর রহমান খান তাঁহার অভি-ভাষণে মাদ্রাছা শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, মাদ্রাছা শিক্ষা সম্পর্কেও পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা শিক্ষার্থী অথবা সমাজের কোন উপকারেই আসে নাই। মাদ্রাছার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপে (সময় ও অর্থের) অপচয় বলিয়া উল্লেখ করা হইলে অতিশয়োক্তি করা হইবে না।"

জনাব খাঁ ছাহেবকে আমি প্রথমেই জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আমি সেই সকল লোকদেকই একজন, যাঁহারা মাদ্রাছা শিক্ষার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। তবে জনাব খাঁ ছাহেবের ন্যায় আমি উহাকে সময় ও অর্থের অপচয় বলিতে রাজী নহি। তার কারণ, কোরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা (মুছলমানরা) বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, ইহকাল ছাড়া পরকাল বলিয়াও একটি কাল আছে। পরকালে বিশ্বাস না করিয়া কেহ মুছলমানই হইতে পারে না। সুতরাং মুছলমানদের কাজ শুধু ইহকালিক নহে, পরকালিক কাজও কিছু আছে, যাহা ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় রকমই হইতে পারে। আর শরীয়-তের দৃষ্টিতে পরকালিক কাজই অপরটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যেমন দেখা যাক যে, মাদ্রাছা শিক্ষা এ সকল কাজের মধ্যে কোনটির উপযুক্ত লোক তৈয়ার করিতে সক্ষম কিনা?

প্রথমে ধরা যাক, পরলৌকিক ও সমাজগত কাজকে, যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইছলাম প্রচার ও ইছলামকে রক্ষা করার কাজকে যদি এই শ্রেণীর কাজের মধ্যে গণ্য করা হয় (তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে,) তাহা হইলে বলিতে হইবে, এ শ্রেণীর কাজের লোক এ যাবৎ এক-মাত্র মাদ্রাছা শিক্ষাই তৈয়ার করিয়া আসিতেছে। মাদ্রাছায় শিক্ষিত

লোকেরাই এদেশে ইছলাম প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহারাই আজ পর্যন্ত উহাকে এদেশে জিন্দা রাখিয়াছেন। তাহাদের কল্যাণেই জনাব খাঁ ছাহেব ও আমাদের পূর্ব পরুষগণ মুছলমান হিসাবে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছেন, অন্যথায় এই উপমহাদেশ হইতে ইছলামকে উৎখাত করার যে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, তাহাতে এদেশ হইতে ইছলাম কবেই উৎখাত হইয়া যাইত। খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতের হিন্দু-মুছলমানকে খৃষ্টান করার জন্য যে বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল এবং যার মুখে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহার কবল হইতে মুছলিম সন্তানদের রক্ষা করিয়াছিলেন এই মাদ্রাছা শিক্ষিত আলেমরাই। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি আর্যধর্মীরা মুছলমানদের আর্যধর্মে দীক্ষিত করার যে অভিযান চালাইয়াছিল তারও প্রতিরোধ করিয়াছিলেন এই আলেমরাই। এক কথায় ইংরেজ প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মুছলমানদের ধন গেল, মান গেল কিন্তু তাদের ইছলাম বাঁচিয়া রহিল। ইহা আশ্চার্য্যের ব্যাপার কি! প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও কাহারা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন এবং কাহারা ইহাকে ঘরে ঘরে পোঁছাইয়া দিলেন যার ফলে ভারতের মুছলমানদের সংখ্যা দাঁড়াইল দশ কোটিতে, যার ফলে পাকিস্তান কায়েম হইল। এ মাদ্রাছা ওয়ালারা নয় কি?

অনুরূপভাবে মুসলমানদিগকে জালেমদের জুলুম হইতে রক্ষা করা এবং দেশকে অন্যদের কবল হইতে আজাদ করার কাজকে যদি সমাজগত কাজ বলা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে মাদ্রাছা শিক্ষা এ শ্রেণীর কাজের লোক তৈয়ার করিতে বিলক্ষণ সমর্থ। বিগত দুই শতাব্দীর ভাটার ইতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। দেশী জালেমদের (যথা শিখ,) জুলুম হইতে রক্ষা এবং বিদেশীদের হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করার প্রথম প্রচেষ্টা এ মাদ্রাছা শিক্ষাওয়ালাদের দ্বারাই আরম্ভ হয়। হযরত ছৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর নেতৃত্বে আলেমদের এক বিরাট বাহিনী জেহাদে আজাদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং মওলানা ইছমাইল শহীদ প্রভৃতি বহু আলেম উহাতে শাহাদাত বরণ করেন। আর মওলানা ইমামুদ্দীন ও ছূফী নূর মোহাম্মদ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট আলেম গুরুতর রূপে আহত হন। মওলানা বেলা-

য়েত আলী, মওলানা এনায়েত আলী প্রমুখ আলেমগণ এই আজাদী-আন্দোলনেই জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৫৭ ইং সালের সিপাহী বিপ্লবে (আজাদীর দ্বিতীয় জেহাদেও) এ আলেমরাই অগ্রণী ছিলেন। মওলানা ইয়াহিয়া আলী ও মওলানা আহমদুল্লাহ প্রভৃতি আলেমগণের কথা স্বয়ং হান্টার ছাহেব (তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'আমাদের ভারতীয় মুছলমান') উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাজী-এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী, মওলানা রশীদ আহমদ গোঙ্গুহী ও মাওলানা কাসেম দেওবন্দী প্রমুখ ওলামা এই জেহাদে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও তাঁহারা পুনরুত্থানের চেষ্টা করেন। যারফলে ১৮৬৬ ইং মাওলানা ইয়াহিয়া আলী, মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা আব্দুল হক খায়েরাবাদী ও জাফর থানেশ্বরী প্রমুখ দেশপ্রেমিক ও বরেণ্য আলেমগণ যাবজ্জীবনের জন্য কালাপানিতে দ্বীপান্তরিত হন (আম্বালার ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী দ্রঃ)। গাজী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তৎপুত্র দুদুমিঞাও এই মাদ্রাসা শিক্ষিত শ্রেণীর লোকই ছিলেন।

এক কথায় অন্যরা যখন নিরাপদ দূরত্বে বসিয়া নিরব দর্শকের ন্যায় ইংরেজদের ধ্বংসলীলা দেখিতেছিলেন, কেহ বা ইংরেজদের কৃপা (চাকুরী) ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন এই মাদ্রাছার লোকেরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়া ইংরেজদের গোলাগুলীর সম্মুখে নিজেদের বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন।

মোট কথা আজাদী সংগ্রামের পরবর্তী ধাপ খেলাফত আন্দোলনের ইতিহাসেও মাদ্রাছা শিক্ষিত আলেমরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাছান, মাওলানা আব্দুল বারী লাখনাবী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী, মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী মাওলানা মনিরুজ্জামান ইছলামাবাদী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মাওলানা আজাদ ও মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী প্রমুখ আলেমগনের দান এ বিষয়ে অন্যদের তুলনায় কি কম ?

অবশেষে পাকিস্তান আন্দোলনেও মাদ্রাছাওয়ালারা অন্যদের এক ইঞ্চিও পিছনে না। বিশ্ববিখ্যাত পীর মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নীতি

সমর্থনের ফলে তাঁর হাজার হাজার শাগরেদ ও লক্ষ লক্ষ মুরীদ এদিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। মাওলানা শাব্বির আহমদ ওছমানী কায়েদে আজমের ডান-হাত হিসাবেই কাজ করেন এবং মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সংবাদ-পত্র দ্বারা সমগ্র দেশকে কাঁপাইয়া তোলেন। প্রসিদ্ধ পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ, পীর মানকী শরীফ, মাওলানা জাফর আহমদ ওছমানী, মও লানা মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাওলানা আতহার আলী ও মাওলানা শামছুল হক প্রমুখ পীর তাঁহাদের হাজার হাজার ভক্তসহ ইহাতে ঝাঁপা-ইয়া পড়েন। মোটকথা সীমান্তের শেষ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া চট্টগ্রামের সরহদ পর্যন্ত দেশের শতকরা নব্বই জন আলেমই এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

আর যদি আজাদী উত্তর যুগের রাজনীতির কথাই ধরা যায়, তা হইলেও দেখা যায়, এ সেদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করিয়াছেন মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও মাওলানা আক-রাম খাঁ, খাঁটি মাদ্রাছা পড়া দুইজন লোক। জামাতে ইছলামী পরি-চালনা করিতেছেন মওলানা ছৈয়দ আবুল আলা মাওদূদী ও মাওলানা আবদুর রহীম এবং নেজামে ইছলাম পরিচালনা করিতেছেন মাওলানা আতহার আলী ও মওলানা সিদ্দিক আহমদ। এমতাবস্থায় কি বলা যায় যে, মাদ্রাছা শিক্ষা 'সময়' ও অর্থের অপচয়?

এছাড়া সংবাদিকতাকেও যদি এ শ্রেণীর কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়,, তা হইলে বলিতে হইবে যে, মাদ্রাছা শিক্ষিতরা এ ব্যাপারে শীর্ষ স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মাওলানা জাফর আলী খাঁ (জমিদার), মাওলানা আজাদ (আলহেলাল), মাওলানা আহমদ ছায়ীদ (আল জমিয়ত), মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইছলা-মাবাদী, মাওলানা রুহুল আমীন (হানীফা) মাওলানা আহমদ আলী, মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী, মাওলানা খায়রুল আনাম খাঁ ও কাজী আবদুস শহীদ প্রভৃতি আলেমগণের সংবাদপত্র সেবার কথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

আর জাগরণীর গান গাহিয়া লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য মুসলমান দিগকে জাগাইয়া তোলাকেও যদি সমাজগত কাজ বলা যাইতে পারে,

তা হইলে বলিব যে, মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালীই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'মোছাদ্দছে হালী' দ্বারা মুছলিম জাতির ঘুম ভাঙ্গাইতে প্রয়াস পান। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফঘানী বিশ্বের মুছলমানকে ধাক্কা দিয়া বেদার করেন। স্যার সৈয়দ আহমদও একজন খাঁটি মাদ্রাছা শিক্ষার লোকই ছিলেন। মোটকথা, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মাদ্রাছা-ওয়ালাদের এ সকল কাজকে যে পর্যন্ত মুছিয়া ফেলা না যায়, বা সত্যের সম্পূর্ণরূপে অপলাপ করা না হয় অথবা দ্বীনের কাজকে অপ-কাজ বলা না হয়, সে পর্যন্ত কেহ বলিতে পারে না যে, মাদ্রাছার শিক্ষা সমাজ বা জাতির কোন উপকারেই আসে না।

যদি বলা হয় যে, মাদ্রাছা যাদের তৈয়ার করে, তারা আমাদের শাসনযন্ত্রে খাপ খায় না অথচ শাসনযন্ত্র পরিচালনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজগত কাজ। তবে বলিব, এ দোষ কার? মাদ্রাছা শিক্ষার, না, শাসনযন্ত্রের? দেশ হইল মুসলমানদের আর তার শাসন যন্ত্র হইল গয়ের ইছলামী।

ইংরেজ আমলের পূর্বের এমন কি ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেও যতদিন ত্রুটিপূর্ণ হইলেও ইছলামী শাসনযন্ত্র চালু ছিল, ততদিন মাদ্রা-ছাওয়ালারা উহাতে খাপ খাইত। এখনও আরব, ইরান প্রভৃতি মুছলিম দেশে খাপ খাইয়া থাকে। বাঙ্গালীদের মাপ যদি পাঞ্জাবীদের অথবা অন্যদের মাপে দেওয়া হয় আর বলা হয় যে, বাঙ্গালীরা সৈনিক বিভা-গের মাপে টিকে না, এদোষ কি বাঙ্গালীদের?

সে কথা না হয় বাদ দিলাম। মোয়াজ্জম কমিটির সংশোধিত সিলেবাস অনুসারে ১৯৬৪ ইং হইতে মাদ্রাছায় বাংলা, অংক, ভুগোল ইতিহাস, বিজ্ঞান এমন কি দশম মানের ইংরাজী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং দুই বছরে এ সিলেবাস পাশ করিয়া বহু ছাত্র বাহির হইয়াও গিয়াছে, তাহাদের কয়জনকেই বা শাসনযন্ত্রের নিম্নতম অংশে গ্রহণ করা হইয়াছে? এছাড়া স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদেরই যখন শাসনযন্ত্রে স্থান সংকুলান হইতেছে না, তখন মাদ্রাছাওয়ালাদের উহাতে খাপ না খাইলেই বা কি হইল? ইহাতে জবাব খাঁ ছাহেবের তো আনন্দিতই হইবার কথা। আর যদি উহা তিনি মাদ্রাছা ওয়ালাদের দরদেই বলিয়া থাকেন,

তাহা হইলে এবার যখন তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে প্রাইমারী শিক্ষকদের সহ বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের ৪ টাকা করিয়া মহার্ঘ্য ভাতা বাড়াইলেন, তখন মাদ্রাছাওয়ালাদের মাহরুম করিলেন কেন ?

এখন আসা যাক ব্যক্তিগত কাজের দিকে। ব্যক্তিগত কাজ বলিতে যদি জনাব খাঁ ছাহেব পারলৌকিক ব্যক্তিগত কাজকেই বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বলা যায় যে, এ ব্যাপারে মাদ্রাছা শিক্ষিত লোকেরা অন্যদের তুলনায় মোটেই পশ্চাতে নহেন। তাঁহারা এখনও আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে নামাজ, রোজা প্রভৃতি দ্বীনি কাজ করিয়া থাকেন। আর ইহার অর্থ যদি এরূপ ইহলৌকিক কাজই হয়, যাহা শুধু ভোগ বিলাসের উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে তবে সেরূপ কাজের যোগ্যতা কোন মুসলমানের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা ইছলামে ইহার সমর্থন নাই। আর ইহার অর্থ যদি নিছক বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনীয় কাজই হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, ইহা সত্য। মাদ্রাছা ওয়ালারা নিজেদের জীবন ধারনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায়। এজন্য দায়ী তাদের শিক্ষা নহে। তাঁহারা তো এমন একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন ও উহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যার জন্য পরিষ্কার নির্দেশ কোরআনে রহিয়াছে। আর এক জন লোক এক সঙ্গে কয়টি বিষয়েই বা শিক্ষা করিতে বা উহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে ? এই জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী সমাজ বা সরকার। সরকার সে সকল লোকদের জীবন ধারণের এমন কি কাহারো কাহারো বিলাস জীবন যাপনের পর্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, যাহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আর আলেমদের করিয়াছেন বঞ্চিত। যাহারা ইছলামকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন অথচ ইছলাম এমনকি খৃষ্টান সমাজ ব্যবস্থায়ও যার অনুকরণ আমরা কথায় কথায় করিয়া থাকি, এ শ্রেণীর লোকদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। অথচ মাদ্রাছা শিক্ষায় যে দোষত্রুটি রহিয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করি। তবে এজন্যও দায়ী সরকার। সরকার সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। উহার জন্য শিক্ষকের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহা সম্পর্কে বিদেশী

গবেষণার ফলাফল জানার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মাদ্রাছা শিক্ষার জন্য এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। সরকার ইহার উন্নতির জন্য কোনো ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াও এ যাবৎ মনে করেন নাই। এক কথায় বিগত দুই শতাব্দী যাবৎ মাদ্রাছা শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় মাদ্রাছা শিক্ষা যে এতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছে এবং এরূপ ফলদান করিতে পারিয়াছে, তাহা মাদ্রাছা শিক্ষার সহজাত রুহানী শক্তির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষার দোষত্রুটি যে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। মোটকথা মাদ্রাছা শিক্ষা সম্পর্কে জনাব খাঁ ছাহেবের মন্তব্যকে যে কোন দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, উহাকে সহজ সঙ্গত মন্তব্য বলা চলে না বরং উহাকে সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ বলাই সঙ্গত।"

দৈনিক আজাদ

৪ঠা পৌষ ১৩৬৪ বাংলা

এধরনের আরেকটি সমস্যা ছিল ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে আলেমদের ভূমিকা নিয়ে। অনেক দায়িত্বশীল রাজনীতিককেও এ অভিযোগ করতে শোনা যেতো যে, ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাতে পড়ার জন্যে আলেমরাই দায়ী। মাওলানা আজমী ১৮৬১ ইং সালে এ অভিযোগের জবাব দিয়াছিলেন। মূলত সে প্রবন্ধ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত তা নিয়ে তেমন একটা উচ্চবাচ্য আর শোনা যায় না।

ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাতে পড়ার কারণ

"ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাতে পড়ার কারণ অনেক। তবে প্রথমে আমরা দেখিব যে, এক শ্রেণীর লোক যে প্রচার করিয়া থাকেন, আলেমদের বিরুদ্ধ ফতওয়াই পাক ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় পশ্চাতে পড়ার কারণ, তাহাদের প্রচারণার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, ইতিহাস এ সম্পর্কে কি বলে?

কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা পাক-ভারতে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কীয় কতিপয় জরুরী বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহাতে মূল বিষয় আলোচনার অনেকটা সুবিধা হইবে।

(পাঠকবৃন্দ। ৪৮ পৃষ্ঠায় ১৮৬১ ইং স্থলে ১৯৬১ ইং পড়বেন—লেখক)

(ক) ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণ ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য আদৌ মাথা ঘামান নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম মিঃ অলিভার ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু কোম্পানীর ডাইরেক্টর ও পার্লামেন্ট সদস্যদের বিরোধিতার ফলে উহা বাতেল হইয়া যায়। অতঃপর ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং কোম্পানীর ডাইরেক্টার মিঃ চার্লসগ্রান্ট শিক্ষার সমর্থনে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদের শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা ও সুপারিশ করার জন্য এক শিক্ষা কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বড়লাটের নামে এক আদেশ জারী করা হয় এবং তজ্জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় মনজুর করা হয়।

(খ) সরকারী অর্থ প্রথমে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচ্য ভাষা ও প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্যই মনজুর করা হয়। অতঃপর ১৮৩১ সালে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং উহা শুধু ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

(গ) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অর্থের প্রায় সমস্তই এবং ১৮২৩ হইতে ১৮৫৪ পর্যন্ত ইহার অধিকাংশই মিশনারী স্কুল ও মিশনারী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন তথা খৃষ্ট ধর্ম প্রচারার্থেই ব্যয় করা হয়। ১৮৫২ সালে মাদ্রাজের জনসাধারণ মাদ্রাজের গভর্নরের বিরুদ্ধে শিক্ষা খাতের অর্থ মিশনারী কাজে ব্যয় করিতেছেন বলিয়া পার্লামেন্টে এক অভিযোগ করে। অতঃপর ১৮৫৪ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষিত হয়।

(ঘ) ১৭৫৭ হইতে ১৮১৩ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা-ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কেহ শখ করিয়া ইংরেজদের সহিত মেলামেশা করার

বা ইংরেজদের কথার অতরজমী করার উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিত। ১৮১৪ সাল হইতে উহা দ্বিতীয় ভাষারূপে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং ১৮৩৫ হইতে উহা আমাদের শিক্ষার মাধ্যমেও বাধ্যতামূলক বিষয় তথা জাতীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

(চ) নানা কারণে (সে সকল কারণ পরে বিবৃত হইবে) প্রায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পুরাপুরি প্রবেশ লাভ সম্ভবপর হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য আলীগড়ে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (১৮৭৮ সালে কলেজ ও ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচেষ্টা ও উৎসাহে মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

(ছ) ইংরেজী শিক্ষার দুইটি দিক রহিয়াছে। (ইংরেজী) ভাষা শিক্ষা, বিষয় শিক্ষা। আলেমদের নিকট শুধু ভাষা শিক্ষা সম্পর্কেই ফতওয়া চাওয়া হইয়াছিল? বিষয় শিক্ষা সম্পর্কে নহে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমরা দেখিব যে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলেমগণ ফতওয়া দিয়াছিলেন? ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে যে সকল আলেম ফতওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের সকলের ফতওয়াই নিয়মিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং পরে কিতাব আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল ফতওয়ার কিতাব অনুসন্ধান করিয়া এ সম্পর্কে যে সকল ফতওয়া আমরা পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:—

শাহ আবদুল আজীজ দেহলবীর ফতওয়া

[১৭৪৫—১৮২৩ খৃঃ]

শাহ ছাহেব শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সে যুগ হইতে এ পর্যন্ত সকল যুগের সকল শ্রেণীর আলেমগণেরই শীর্ষ স্থানীয়। ডাঃ হান্টার তাঁহাকে "শামসুল হিন্দ" বা ভারত রবি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় কিতাবে তাঁহার ফতওয়ার পূর্ণ বিবরণ দান করিয়াছেন। তিনি ১৭৪৫ সালে জন্মগ্রহণ এবং ১৮২৩ সালে এন্তেকাল করেন।

تعلیم انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و لغت و
اصطلاح اینها را دانستن باکے ندارد اگر بنیت مباح
باشد - زیرا نکه در حدیث وارد است که زید بن
ثابت بحکم آنحضرت صلعم روش خط و کتابت یهود
ونصاری و لغت آنها را آموخته بود برائے این غرض
که اگر برائے آنحضرت صلعم خط باین لغت ورسم خط
می رسد جواب آن تواند نوشت و اگر بمجرد خوش آمد
آنها و اختلاط با نها تعلم این لغت نماید باین وسیله
پیش آنها تقرب جوید پس البته حرمت و کراهت
دارد و قد مر آنفا آن للالة حکم ذی الالة -
(فتوی عزیزی جلد اول ص ۱۹۵)

"ইংরেজী পড়া অর্থাৎ উহার অক্ষর চিনা, উহা লেখা এবং উহার অভিধান ও পরিভাষা জ্ঞাত হওয়াতে কোন দোষ নাই—যদি উহা শুধু মোবাহ মনে করিয়া শিক্ষা করে। কেননা হাদীস শরীফে আছে :

রসুলুল্লাহ (দ:)-এর আদেশে ছাহাবী হজরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা:) ইহুদী ও নাছারাদের ভাষা ও উহা লেখার পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি রসুলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট ইহুদী ও নাছারাদের পক্ষ হইতে আগত চিঠিপত্রের উত্তর লিখিতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি কেহ শুধু তাহাদের (ইংরেজদের) খোশামোদী করার উদ্দেশ্যে অথবা উহা দ্বারা তাহাদের সহিত মিলামিশা করিয়া তাহাদের নৈকট্য লাভের গরজে উহা শিক্ষা করে তাহা হইলে উহা শিক্ষা করা হারাম বা মাকরুহ। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আসল জিনিষের যে হুকুম তাহার সহায়ক জিনিষেরও সেই একই হুকুম আর আসল জিনিষ অর্থাৎ তাহাদের খোশামোদী ও নৈকট্য লাভ হারাম বা মাকরুহ। (ফাতাওয়ায়ে আজীজী ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা)

মওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর ফতওয়া

[১৮২৮—১৯০৫ খৃ:]

سوال—انگریزی پڑھنا اور پڑھانا درست ہے یا نہیں؟

جواب—انگریزی زبان سیکھنا درست ہے بشرطیکہ کوئی معصیت کا مرتکب نہ ہو اور نقصان دین میں اس سے نہ آوے (فتوی رشیدی ۴۶۶)

প্রশ্ন—ইংরেজী শিক্ষা করা এবং উহা শিক্ষা দেওয়া দুরস্ত আছে কিনা?

উত্তর—ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা দুরস্ত আছে যদি শিক্ষাকারী উহার দ্বারা শরীয়তের কোনরূপ ক্ষতি না করে। রশীদ আহমদ (ফাতাওয়ায়ে রশীদী ৪৬৬ পৃ:)

মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবীর ফতওয়া

[১৮৪৭—১৮৮৬ খৃ:]

سوال—آموختن علم انگریزی چہ حکم دارد-

جواب—تعلم لغت انگریزی و آموختن طریق خط و کتابت آن اگر بقصد مشابہت و محبت وراد انگریزان باشد ممنوع است و اگر بغرض اطلاع بر مضامین کلام ایشان باخواندن خطوط ایشان باشد مضائقہ ندارد و در حدیث مشکوۃ شریف آوردہ کہ آنحضرت صلعم زید بن ثابت را تعلم خط یہود امر فرمودند و زید بن ثابت آن را بعرصہ قریب آموختند-

ابو الحسنات محمد عبد الحی

مجموعہ فتوی ص۳ ۲۰

درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ
باز میگوئی کہ دامن تر مکن ہشیار باش

প্রশ্ন— ইংরেজী শিক্ষা করা কি ?

উত্তর— ইংরেজী শিক্ষ করা এবং উহা লেখার পদ্ধতি আয়ত্ত করা যদি ইংরেজদের অনুকরণ করা বা তাহাদের মহব্বত ও ভালবাসার উদ্দেশ্যে হয় তাহা হইলে উহা নিষিদ্ধ। আর যদি তাহাদের কথার মর্ম বুঝার অথবা তাহাদের পত্রাদি পড়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহা হইলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা রছুলুল্লাহ (ছঃ) ছাহবী হযরত যায়েদ বিন ছাবেত্-কে ইহুদীদের লেখা শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) অল্প সময়ের মধ্যেই উহা শিক্ষা করিয়া লইয়া ছিলেন।
— (মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া —৩/২০ পৃঃ)

এ সকল ফতওয়া হইতে দেখা গেল যে, যে যুগে আলেমগণ ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিলে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে যুগের প্রসিদ্ধ আলেমগণ সকলেই ইহার সপক্ষেই ফত-ওয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইংরেজ আমলের একেবারে শেষের দিকে ১৯৩৫ —১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে মওলানা আশরাফ আলী থানবী ইহার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়াছেন। তাহা তিনি ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম লক্ষ্য করিয়াই মুসলমান যুবকদিগকে ইংরেজ তথা পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামী হইতে মুক্তি লাভের প্রেরণা দান বা মুসলমান জাতিকে আত্ম সচেতন করিয়া তোলার উদ্দেশ্যেই দিয়াছেন।

সুতরাং যাহারা প্রচার করিয়া থাকেন যে, আলেমদের বিরুদ্ধ ফত-ওয়াই মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় পশ্চাতে পড়ার কারণ, তাহার মূলে কোনই সত্য নাই! ইহা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত অথবা আলেমদের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত ধারণা।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহা হইলে ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাতে পড়ার কারণ কি? নিম্নে আমরা ইহার কতিপয় কারণ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম :—

(১) প্রথম কারণ হইল, মুসলমানদের খোদদারী বা আত্ম মর্যাদা-বোধ। প্রায় সাতশত বৎসর রাজত্ব করার পর সিংহাসনচ্যুত হওয়া মাত্র বিনা দ্বিধায় নিজেদের শিক্ষা ও সভ্যতাকে বিসর্জন দিয়া অন্যদের শিক্ষা ও সভ্যতাকে গ্রহণ করিবে এইরূপ মানসিক অধঃপতন তখনও তাহাদের ঘটে নাই। কায়েদে মিল্লাত নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ মরহুমও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের তাঁহার এক ভাষনে এ সম্পর্কে এই রূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ডাঃ হাণ্টারও মুসলমানদের দূরবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাই বলিতেছেন : বিগত পঁচাত্তর বৎসর হইতে বাংলার সভ্রান্ত পরিবারবর্গ হয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছেনা, হয় সেই সকল লোকের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য যাহাদেরকে আমাদের সরকার উপরে উঠাইতেছেন। তথাপি তাহাদের অবাধ্যতা ও অলসতার কোনো রূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। হইবে কি করিয়া তাহারা তো নওয়াব ও বিজয়ীদের বংশধর। — (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলামান ২৩০ পৃষ্ঠা)

অপর জায়গায় মুসলমানদের জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন : "যদি মুসলমানদের সামান্যও বুদ্ধিবিবেচনা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকিত এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইত। কিন্তু তাহা কি হয় ? একটা পুরাতন বিজয়ী জাতি কি সহজে নিজেদের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে ভুলিয়া যাইতে পারে ? - হিন্দুস্তানী মুসলামনস—২৪৭ পৃঃ

(১) সত্য কথা এই যে, যাহারা মনে করিয়া থাকেন যে, তৎকালের মুসলমানরা তাড়াতাড়ি ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া বড় বোকামীই করিয়াছেন, তাহারা আর যাহাই হউন না কেন মানব প্রকৃতি সম্পর্কে মোটেই অভিজ্ঞ নহেন।

(২) দ্বিতীয় কারণ হইল, মুসলমানদের ধর্মহারা হওয়ার অংশকা। ইংরেজী শিক্ষার প্রধান বিষয় এবং উহা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি তাহা অবগত হওয়ার পর মুসলমানদের এ আকাংখাকে কেহই অমূলক বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

ইংরেজী শিক্ষার প্রধান বিষয় এবং উহা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল ; তাহা যাঁহারা প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলেই ভাল হইবে। মিঃ অলিভার ১৭৯২ খৃ: ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "ভারতে প্রোটেষ্টান্ট মতের শিক্ষা ও উপাসনার উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা হউক। শিক্ষিত হইলে ভারতবাসীগণ খৃষ্টান হইয় যাইবে। যেহেতু শিক্ষিত লোকেরা বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মানুবত্তিতা ও ব্যক্তিগত ক্রমোন্নতির পথকে অধিকতর পছন্দ করেন। অতএব শিক্ষার ফলে ভারতে আমাদের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পক্ষান্তরে লোক অশিক্ষিত থাকিলে দেশে বিপ্লব ও অশান্তির সৃষ্টি করিবে।

(রৌশন মোস্তাকবেল—সৈয়দ তোফাইল আহমদ আলীগ)

বলাবাহুল্য যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্যবৃন্দ এই বলিয়া ইহার বিরোধিতা করেন যে, একই ধর্ম প্রবর্ত্তনে মানুষের উদ্দেশ্যাবলী এক ও অভিন্ন হইয় যায়। বস্তুত: যদি এইরূপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারত বর্ষ হইতে ইংরেজদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। লোকদিগকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করার নীতি এই অষ্টাদশ শতকে অসঙ্গত। যদি ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ লোকও খৃষ্টান হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে বড়ই অনর্থ ঘটিবে। আমেরিকায় আমাদের শিক্ষাগারও কলেজ প্রতিষ্ঠার ফল এই হইয়াছে যে, উহা আমাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এইভাবে যদি নৌজোয়ান পাদ্রিগণ ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোম্পানীর স্বার্থসমূহের বিলুপ্তি ঘটিবে। ভারতবাসীদের মধ্যে যাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন তাহারা যেন ইংলণ্ডে চলিয়া আসে।" —(রৌশন মোস্তাকবেল)

অতঃপর স্বয়ং কোম্পানীর ডাইরেক্টর মিঃ চার্লস গ্রান্ট ১৭৯৮ খৃঃ শিক্ষার সমর্থনে এক গ্রন্থ রচনা করেন। উহার একস্থানে তিনি বলেন (:) হিন্দুদিগকে আমাদের ভাষা শিক্ষা দিয়া তৎপর উহা দ্বারা তাহাদিগকে আমাদের শিল্প দর্শন ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া না দেওয়া ইংলণ্ডের ইচ্ছাধীন। কিন্তু যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই শিক্ষা নীরবে তাহাদের কুসংস্কারসমূহের মূলোৎপাটন করিবে এবং অবশেষে সেই সমূহের

ধ্বংস সাধন করিবে। (২) নিশ্চয় আমাদের ভাষার সাহায্যে হিন্দুদিগকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তা হইবে আমাদের ধর্ম শিক্ষাই। (৩) মুসলমানদের রাজত্ব কালে তাহারা হিন্দুদের চরিত্রের কোনো রূপ পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করে নাই। বরং তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপরই ছাড়িয়া দিয়াছে। (৪) হিন্দুরা এত দুর্বল চিত্ত যে, তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ততা সৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। (৫) শিক্ষা প্রচারের ফলে ভারতে কোন দিন আমাদের সিংহাসন প্রকম্পিত হইবে বা আমাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিবে এই আশংকায় ভারতবাসীদিগকে সত্য ধর্ম এবং আমাদের শিল্প-বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখা কখনও সমীচীন নহে।" (শিক্ষার ইতিহাস —রৌশন মোস্তাকবেল)

এ ছাড়া লর্ড মেকলে যিনি ইংরেজীকে আমাদের শিক্ষার বাহন করা সম্পর্কীয় বৈঠকের সভাপতি ছিলেন এবং স্বকীয় কাষ্টিং ভোট প্রয়োগ দ্বারা উহা পাস করিয়া লইয়াছিলেন, ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন :— আমাদের এই রূপ একটি দল তৈয়ার করা প্রয়োজন, যাহা আমাদের কোটি কোটি প্রজা ও আমাদের মধ্যে দোভাষী এবং রক্তে বর্ণে ভারত বাসী হইলেও মানসিকতার দিক দিয়া যেন ইংরেজ হয়। —(রৌশন মোস্তাকবেল)

এখন আমরা দেখিব যে, যাহারা বিনা দ্বিধায় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা কি হইয়াছিল। লর্ড মেকলে তাঁহার পিতাকে এই শিক্ষার ফলাফল জানাইতেছেন :—এই শিক্ষার প্রভাব হিন্দুদের উপর বিস্তারিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত কোন হিন্দু যুবকই কখনও স্বীয় ধর্ম মতের উপর টিকিয়া থাকিতে পারেন না। কেহ সাময়িক স্বার্থের খাতিরে হিন্দু থাকিলেও কেহ একত্ববাদী কেহ বা খৃষ্টান হইয়া যায়। আমার পূর্ণ বিশ্বাস : শিক্ষা বিষয়ক আমাদের কর্মসূচী কার্যকরী করা হইলে ৩০ বৎসর পর বাংলার একটি পৌত্তলিকও অবশিষ্ট থাকিবে না। —(রোশন মোস্তাকবেল)

মিঃ ট্রেলিভলিন বলিতেছেন : কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আমি যে সকল লোকের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, যাহারা খৃষ্ট ধর্ম

অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যাহারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন অথবা যাহাদের দ্বারা খৃষ্টধর্মের প্রভূত সাহায্য হইয়াছে তাহারা সেই সকল লোক যাহারা হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন।"
— (রৌশন মোস্তাকবেল)

তিনি ২৮শে জুন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড সভার বক্তৃতায় বলিতেছেন : যদি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে জানা যাইবে যে, হিন্দু কলেজ ও সরকারী পরিচালিত অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহে যে সকল শিক্ষিত যুবক খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা মিশনারী স্কুল দ্বারা ধর্মান্তরিতদের সংখ্যার সমান হইবে। (রৌশন মোস্তাকবেল) ১৮২৩ সনের ডিসেম্বরে গঠিত শিক্ষা কমিটি ১৮৩১ ডিসেম্বরে অষ্টম বার্ষিক রিপোর্ট এই রূপ দিতেছেন : হিন্দু কলেজগুলিকে উৎসাহ দানের প্রতি লক্ষ্য রাখাই এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা আশাতীত। ইংরেজী ভাষা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুদের নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। সৎ-বংশজাত উপযুক্ত যুবকদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্তি লাভের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ধর্মের বিধি-নিষেধের প্রতি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইতেছে। খুব সম্ভবত: দ্বিতীয় পুরুষই কলিকাতার হিন্দুদের ভাবধারা ও অনুভূতিতে এক বিরাট মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইবে।"
—(রৌশন মোস্তাকবেল)

এখন আমরা লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজের জনৈক মুসলমান ছাত্রের উক্তি নকল করিয়া এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটাইব। তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আলীগড় গেজেটে লিখিতেছেন—"সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন হিন্দু বা মুসলমান যুবক এইরূপ নাই, যাহার ধর্ম-বিশ্বাস পূর্বের ন্যায় সুদৃঢ় রহিয়াছে। এখানকার ছাত্রদের বক্ষ চিরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ধর্মের বিধি-নিষেধ তাহাদের কিরূপ চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনচেতা. তাহারা খৃষ্টান না হয় ধর্মদ্রোহী হইয়া যাইতেছে।" (হায়াতে জাবীদ—স্যার সৈয়দের জীবনী-হালী)

(৩) তৃতীয় কারণ হইল, মোসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা ১৭৫৭ সালে রাজ্য হারা হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই মোসলমানগণ সর্বহারা

হইয়া পড়িয়াছিল। (ক) ১৭৭২ সালেই ওয়ারেন হেষ্টিং রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এক নয়া আদেশ জারী করিলেন এবং প্রদেশের সমস্ত স্থায়ী ও মৌরসী বিধায় বর্দ্ধিত খাজনা দিতে অসম্মত হইলে তাঁহাদের জমিদারী ছিনাইয়া লইয়া যাহারা অধিক খাজনা দিতে সম্মত হইল, তাহাদের দেওয়া হইল। ফলে মোসলমান জমিদারগণ শত শত বৎসরের স্থায়ী ও মৌরসী জমিদারী হারাইয়া নিমেষের মধ্যে সর্বহার ও পথের কাঙ্গাল হইয়া গেল। প্রাদীজন, সি, মার্শম্যান তাঁহার "বাংলার ইতিহাসে" ইহার এইরূপ বিবরণ দান করিতেছেন: কিন্তু প্রজাগন (জমিদারগণ) যে পরিমাণ বর্দ্ধিত খাজনা দিতে রাজী হইল তাহা এতই কমছিল যাহাতে বন্দোবস্ত দাতাগণ রাজী হইতে পারিলেন না। সুতরাং তাহার এইরূপ ভাবে প্রকাশ্যে জমিদারী বন্দোবস্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন যে — যাহারা অধিক খাজনা দিতে রাজী হইবে, জমিদারী তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে। যেখানে পূর্ব জমিদার অথবা তালুকদার উপযুক্ত হারে বর্দ্ধিত খাজনা দিতে রাজি হইত তাহার জমিদারী বহাল রাখা হইত। অন্যথায় তাহাকে বরখাস্ত করিয়া তাহার জমিদারী অন্যকে দেওয়া হইত এবং তাহার জন্য কিছু বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইত।"

(তাওয়ারীখে বাঙ্গালা—তরজমায়ে ফারসী—হিসটোরী অব বেঙ্গল)

এখন জিজ্ঞাসা এই যে, যাহাদের বরখাস্ত করা হইয়াছিল তাহারা কাহারা? তাহারা মুসলমান জমিদারই। কারন তখনকার দিনে জমিদার বলিতে প্রধানতঃ মোসলমানরাই ছিলেন।

(গ) মুসলমানদিগকে সৈনিক, পুলিশ এবং অফিস আদালত প্রভৃতি যাবতীয় বিভাগের চাকরী হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। অথচ ইতি পূর্বে মোসলমানগণই ছিলেন এসকল বিভাগের সর্বেসর্বা। ডাঃ হাণ্টার লিখিতেছেন—

"মুসলমানদের অর্থ-উপার্জ্জনের দুটি প্রধান উপায়ঃ—সৈনিক এবং রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কে আমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহার বহু যুক্তি-প্রমাণ রহিয়াছে তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের এই ব্যবস্থার দরুন মোসলমান পরিবারসমুহ একেবারে ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে। আমরা মুসলমান সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সৈনিক বিভাগে ভর্তি করি নাই। কারণ আমাদের বিশ্বাস তাহাদিগকে ইহা হইতে দূরে রাখার মধ্যেই আমাদের নিরাপত্তা। আমরা তাহাদিগকে রাজস্বের লাভ জনক বিভাগ (অর্থাৎ জমিদারী) হইতে এজন্য বহিষ্কৃত করিয়াছি যে, ইহা সরকার ও প্রজা সাধারণ উভয়ের মঙ্গলের পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু এই সকল যুক্তি যতই মূল্যবান হউক না কেন পুরাতন মুসলমান ও নওয়াব-দিগকে কখনো খাজনা দিতে পারিবেনা -- যাহারা আমাদের সরকারের অন্যায় ব্যবহারের দারুন নিদারুন কষ্ট ভোগ করিতে আছেন। সৈনিক বিভাগ হইতে মোসলমানদের বেদখল করা তাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক বেইনসাফের বিষয়। রাজস্ব বিভাগ হইতে তাহাদের বিতাড়িত করাকে তাহারা অঙ্গিকার ভঙ্গেরই শামিল মনে করেন। তাহাদের ইজ্জত সম্মান বা অর্থ উপার্জনের তৃতীয় উপায় ছিল অফিস আদালতে চাকুরী। ইহাতেও তাহার সর্বেসর্বাই ছিল। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, আমাদের সময় যেসকল হিন্দুস্তানী সিভিল সার্ভিসে ভর্তি হইয়া-ছেন অথবা হাইকোর্টে জজের পদ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একজনও মোসলমান নাই। অথচ এই দেশ আমাদের হস্তগত হওয়ার কিছুদিন পর পর্যন্তও সরকারের সমস্ত কার্য্যই মোসলমানদের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। —(হামারে হিন্দুস্তানী মোসলমান ২১ পৃঃ)

এক কথায় কাল পর্যন্ত যাঁহারা চাকুরীর সর্ব্ব ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন, আজ তাহারা উহার সর্ব ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ডাঃ হাণ্টার কর্তৃক রচিত নিম্ন তালিকা হইতে পাঠকবর্গ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাংলার সরকারী চাকুরির বণ্টন : ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ :

		ইংরেজ	হিন্দু	মোসলমান	মোট
১।	একজিকিউটিভ সিভিল সার্ভিস	২৬০	×	×	২৬০
২।	দিওয়ানী আদালত বিভাগীয় অফিসার	৪৭	×	×	৪৭
৩।	একসট্রা এসিসটেণ্ট কমিশনার	২৬	৭	×	৩৩
৪।	ডিঃ মেজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬

৫।	ইনকামট্যাক্স এসেসার	— ১১	— ৪৩	— ৬	=৬০
৬।	রেজিষ্ট্রেশন	— ৩৩	— ২৫	— ২	=৬১
৭।	গুপ্ত আদালতে জজ ও সাব জজ	— ১৪	— ২৫	— ৮	=৪৭
৮।	মুনসেফ	— ১	— ১৭৮	— ৩৭	=২১৬
৯।	সর্ব্বপ্রকার পুলিশ অফিসার	— ১১৬	— ৩	— ×	=১১৯
১০।	পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্মেণ্ট	— ১৫৪	— ১৯	— ×	=১৭৩
১১।	ঐ বিভাগের আমলা	— ৭২	— ১২৫	— ৪	=২০১
১২।	ঐ বিভাগের একাউণ্টাণ্ট	— ২২	— ৫৪	— ×	=৭৬
১৩।	মোডক্যাল বিভাগ	— ৮৯	— ৬৫	— ৪	=১৫৮
১৪।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ	— ৩৮	— ১৪	— ১	=৫৩
১৫।	শিক্ষা ও নৌ প্রভৃতি বিভাগ	— ৪১২	— ১০	— ×	=৪২২
		১৩৩৮	৬৮১	৯২	২১১১

ইহাতো হইল উপরের গেজেটেড চাকুরীর কথা যেখানে মোসলমানদের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা হইত। আর নীচের ননগেজেটেড্ চাকুরী সমূহের মধ্যে যে পিয়ন ও চাপরাসী ছাড়া কোন মোসলমানই নাই তাহা বলাই বাহুল্য। (হামারে হিন্দুস্তানী মোসলমান ২৩৫ পৃ)

এখানে আসিয়া যাহারা ভাবিতেছেন যে, ইহাতো হইল ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলক ও শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার ২৫ বৎসর পরের তালিকা। সে সময় মোসলমানদের পক্ষে উচিৎ ছিল ইংরেজী শিক্ষা করিয়া চাকুরীর উপযুক্ততা অর্জ্জন করা। কিন্তু মুসলমানরা তাহা করে নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি আমি হাণ্টারের নিম্নলিখিত উক্তির প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি :—

আর আজ তাহার (মুসলমানরা) অপমান ও অধঃপতনের এমন চরম সীমায় পৌছিয়াছে যে, তাহারা সরকারী চাকুরীর উপযুক্ততা লাভ করিলেও সরকারী আদেশ দ্বারা তাহাগিকে বঞ্চিত করা হয়। তাহাদের কৃপার যোগ্য অবস্থার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করেননা। এমনকি উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।"

—(হামারে হিন্দুস্তনী মোসলমান ২৪৩ পৃঃ)

মনের দুঃখে এব্যাপারে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইতে চলিয়াছে। এখন আমরা উড়িষ্যার মোসলমান কর্তৃক উড়িষ্যার কমিশনারের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্র খানির মর্ম উদ্ধৃত করিয়া এব্যাপারে পরিসমাপ্তি ঘটাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে পাঠকবৃন্দ তখনকার মুসলমানদের নিদারুন দুদর্শা সম্পর্কে কিছুটা উপ-লব্দি করিতে পারিবেন। আবেদনে তাহারা বলিতেছেন : —

মহামান্য সম্রাজ্ঞীর একান্ত অনুগত প্রজা হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, সরকারী চাকুরী সমূহে আমাদের সমান অধিকার রহিয়াছে। সত্য কথা এই যে, উড়িষ্যার মুসলমানগণ দিনেরপর দিন এইভাবে পিষিয়া যাইতেছে যে, তাহাদের আর উঠিবার আশা নাই। উড়িষ্যার মুসলমানগন সভ্রান্ত কিন্তু সর্ব্বহারা। আমাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করার মত কেহই নাই। এখন আমাদের অবস্থা জলাশয় হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত মৎসের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহামান্য সাম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি হিসাবে হুজুর সমীপে অমরা উড়িষ্যার মুসলমানদের দূরবস্থার কথা নিবেদন করিলাম। আমাদের আশা জাতি ধর্মনিবিশেষে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ব্যবহার করা হইবে। সরকারী চাকুরী হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর আমরা দারিদ্র্য ও নৈরাস্যের এমন পর্যায়ে উপনীত হইয়াছি যে, ১০ শিং (৭৷৷৹ টাকা) মাহিনার একটি চাকুরী পাইলেও আমরা অন্ত-রের সহিত পৃথিবীর যে কোন সুদূর স্থানে গমন করিতে হিমালয়ের বরপাচ্ছন্ন শিখরে উঠিতে এবং সাইবেরীয় মহা প্রান্তরেও ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত আছি।

এই আবেদন পত্রখানি সম্পর্কে স্বয়ং হাণ্টার সাহেব এই মন্তব্য করিয়াছেন : "এই আবেদন পত্রের ভাঙ্গাচুরা ইংরেজী দেখিয়া কাহারো হাসি পাইলেও, ইহার মর্ম যুগে যুগে মানুষের হৃদয়কে প্রভাবিত করিবে।"

এমতাবস্থায় কোন মোসলমানের পক্ষে ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদান সম্ভবপর ছিল কি ?

(৪) চতুর্থ কারণ হইল, মোসলমানদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজে-য়াপ্ত করন। মোসলমানদের আমলে শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের নিকট

হইতে বেতন বা চাঁদা ইত্যাদির নামে কিছুই গ্রহণ করা হইত না বরং ইহার বিপরীত শিক্ষার্থীদের আবশ্যক কেতাব পত্র, বাসস্থান, খানা খোরাক, লেবাস পোষাক, এমনকি তেল-সাবানের ব্যয় পর্যন্ত সরকার, আমীর উমারা এবং দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গই বহন করিতেন। কেহ কোন মসজিদ, কেহ কোন পীর বোজর্গের খানকাহ্ বা মাজারের নামে উহার খরচ এবং মোসলমান ছেলেদের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বিরাট লাখেরাজ সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ পৃথক ভাবে শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াও তজ্জন্য পর্যাপ্ত পরিমান সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিতেন। ১৮২৮ সালে ইংরেজগণ আমাদের সে সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, ফলে আমাদের শিক্ষার প্রধান উপায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ ব্যাপারে এখানে ডাঃ হাণ্টারের মন্তব্যটি প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন: "আমরা শুধু এমন এক শিক্ষাব্যবস্থারই প্রবর্ত্তণ করি নাই, যাহা তাহাদের আবশ্যকতার সম্পূর্ণ প্রতিকূল বরং আমরা উহাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উহার বিরাট সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিয়াছি, যাহার উপর তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভরশীল। মোসলমানদের প্রত্যেক বিত্তশালী পরিবারই এমন সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় ভার বহন করিতেন যাহাতে স্বয়ং তাহাদের এবং প্রতিবেশী গরীব মোসলমানদের সন্তানরা মোফতে শিক্ষা লাভ করিত।" (হামারে হিন্দুস্তানী মোসঃ ২৪৪ পৃঃ)

আমাদের এ শিক্ষার সম্পদ কত বিরাট ছিল, তাহা ডাঃ হাণ্টারের উদ্বৃতিতেই বুঝা যাইবে। তিনি বলেন: আমরা যখন বাংলা প্রদেশ দখল করি তখন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্থ-অফিসার (মিঃ জেম্‌স গ্রান্ট) অনুমান করেন যে, (লাখেরাজ সম্পত্তির দরুণ) প্রদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভূমিই হুকুমতের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে।"
—(হামারে হিন্দুস্তানী মুসঃ ২৫৫ পৃঃ)

অতঃপর ডাঃ হাণ্টার বলেন:—লাখেরাজ সম্পত্তি পুনর্দখলের পর সরকারের বার্ষিক তিন লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা) রাজস্ব বৃদ্ধি পায় যাহার এক বিরাট অংশই মুসলমানগন কর্ত্তৃক ওয়াক্‌ফ করা সম্পত্তি হইতে লাভ হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের এই কার্যের দরুন

মোসলমানদের শত শত পুরাতন সম্ভ্রান্ত পরিবার ধ্বংস এবং তাহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে।

—(হামারে হিন্দুস্তানী মোসলমান ২৫৬—২৫৭ স ;)

বলাবাহুল্য যে, এই ওয়াক্ফ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তিই মোসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। কারণ, ইহাই ছিল মোসলমানদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন।

(৫) পঞ্চম কারণ হইল, শিক্ষাক্ষেত্রে বেতন প্রথা প্রবর্তন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থিদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করার নিয়মতো ছিলই না বরং তাহাদের যাবতীয় আবশ্যক খরচও দেশবাসীর পক্ষ হইতে চালানো হইত। ইংরেজরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা শিক্ষার্থিদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ আরম্ভ করে। অথচ মোসলমানগন শিক্ষাক্ষেত্রে এই দোকানদারী প্রথার সহিত আদৌ পরিচিত ছিল না। এ কারণে তাহারা ইহাকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতে থাকে এবং ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। এখানে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, একদিকে মোসলমানদের জমিদারী সমূহ ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং তাহাদের সমস্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এক কথায় তাহাদের পথের কাঙ্গাল করিয়া দেওয়া হয়। অপর দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবর্তন করা হয় বেতন গ্রহণ করার নীতি, কি ঘোর বিপদ ?

(৬) নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় মোসলমানদের ধর্ম সম্পর্কীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছেলেদের ছিল না। ইহা মোসলমানদের পক্ষে একটা অসহনীয় ব্যাপার। কারণ মোসলমানরা দুনিয়ার সর্বস্বহারা হইয়াও বাঁচিতে পারে, কিন্তু ধর্মহারা হইয়া বাঁচিতে পারে না। দেড়শত বৎসরের মাসিক অধঃপতনের ফলে আজকার মোসলমানরা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তখনকার মুসলমানরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ছিলেন। এমন কি ডাঃ হান্টারের ন্যায় একজন ইংরেজ মনীষীও ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন : 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মোসলমান যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই।

আমরা একথার প্রতি মোটেই লক্ষ্য করিনা যে, হিন্দুদের মধ্যেই প্রাচীন-কাল হইতেই এমন একটি শক্তিশালী পুরোহিত সম্প্রদায় চলিয়া আসিতে-ছে, যাহারা তাহাদের ছেলেদের শিক্ষাদান এবং ধর্মীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। তাহাদের প্রত্যেককেই নিজের ধর্মীয় কর্তব্য নিজেরই সম্পাদন করিতে হয়। তাহাদের পরিবারের প্রধান ব্যক্তিই তাহাদের প্রধান মুরব্বী, সমগ্র পরিবারের রাহনমায়ী তাহারই কর্তব্য। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা যাহা শুধু পার্থিব স্বার্থের ভিত্তির উপরই রচিত তাহা খুব অল্প জাতিরই প্রকৃতির অনু-কূলে। অনেক বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মতে আয়ারল্যাণ্ডে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার কারণ ইহাই।"

আমাদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিখিতেছেন : "ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে যে, মুসলমানরা এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা হইতে দূরে থাকিবে, যাহাতে তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই এবং যাহাতে তাহাদের নেহাত জরুরী বিষয়াবলী শিক্ষারও কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং যাহা তাহাদের স্বার্থের নিশ্চিত রূপে পরিপন্থী এবং তাহাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু এতদসত্বেও চাকুরীর বেলায় অনেক ইংরেজ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যেখানে অন্যেরা আমাদের শিক্ষাকে সাদরে গ্রহন করিয়াছে সেখানে মুসলমানরা তাহা হইতে দূরে থাকিবে কেন? আসলে আমরা এখন সেই পার্থক্যের কথাটি ভুলিয়া যাই যাহা অতই পুরাতন যত পুরাতন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতী অর্থাৎ সেই প্রার্থক্য প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক তাওহীদপন্থী জাতিকে মোশরেকদের হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। মোশরেকদের উপাস্য দেবতা যেহেতু বিভিন্ন, একারণে তাহাদের ধর্মীয় মত ও পথও বিভিন্ন। অতএব তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই নিজ মত ও পথ নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের ধর্মীয় বন্ধন হইল শিথিল। কিন্তু তাওহীদপন্থী মোসলমানদের পক্ষে তাহা মোটেই সম্ভবপর নহে। ইসলাম তাহাদিগকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করিতে এবং অটল ও অশি-থিল ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইতে বাধ্য করে। সুতরাং যে শিক্ষা তাহাদের

যে সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না তাহা কখনও তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারে না।

(হামারে হিন্দুস্থানী মোসলমান ২৫২—২৫৪ পৃঃ)

(৭) সপ্তম কারণ হইল মোসলমানদিগকে অমুসলমানদের নিকট শিক্ষা করিতে বাধ্য করা। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত সকল রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকই ছিলেন অমুসলমান। নিম্নস্তরে হিন্দু এবং উচ্চস্তরে হিন্দু ও ইংরেজ। কোথায়ও একজন মোসলমানেরও স্থান ছিল না। অথচ তখনকার সময় মুসলমানরাই ছিলেন ইহার জন্য উপযুক্ত। হিন্দুরা প্রায় সাত শত বৎসর মুসলমানদের অধীন থাকার দরুন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হারা হইয়া গিয়াছিল। অতএব তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কোন মুসলমান যুবকের পক্ষেই উচ্চ মনোভাবের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর নয়, ইহাই ছিল তখনকার মুসলমানদের ধারণা। মুসলমান ছেলেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করিতে সমর্থ নহে। এই অল্পদিন পূর্বে জনৈক মোসলমান জমিদার আমাদের একজন ইংরেজ অফিসারকে বলেন: "দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাদের এজন্য বাধ্য করিতে পারিবেনা যে, আমরা আমাদের সন্তানদিগকে হিন্দু শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পাঠাই।"

(৮) অষ্টম কারণ হইল, নতুন কোর্সে আরবী ফার্সী না থাকা। আরবী ও ফার্সী ভাষা হইল মোসলমানদের ধর্ম ও ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সুতরাং যে শিক্ষা আরবী ফার্সী বর্জিত, সে শিক্ষা কখনও মুসলমানদিগকে আত্মসচেতন করিয়া তুলিতে পারে না। ইহাই ছিল তখনকার মোসলমানদের বিশ্বাস অথচ নতুন শিক্ষাকোর্সে আরবী ফার্সীর কোনো স্থান ছিলনা। ডাঃ হান্টার কোর্সের এই ত্রুটিও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দ্বিতীয় কারণ হইল এই যে, আমাদের গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহ এইরূপ নহে, যাহাতে মোসলমান ছেলেরা যে সকল ভাষা শিক্ষা করিতে পারে যাহার দ্বারা তাহারা জীবনের ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী এবং ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের যোগ্য হইতে পারে।

(৯) নবম কারণ হইল, শিক্ষা কোর্সকে হিন্দুয়ানী ভাবধারা ভারাক্রান্ত ও মোসলমানী ভাবধারা বর্জিত করা। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার প্রথম হইতেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ অর্পিত হয় হিন্দুদের উপর। আগাগোড়া শিক্ষকও তাহারা, শিক্ষাকোর্স রচয়িতাও তাহারা। তাঁহারা সমগ্র শিক্ষা কোর্সকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ইতিহাস ঐতিহ্য দ্বারা এমন ভাবে ভারাক্রান্ত করিয়া ছিলেন যে, উহা মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও মারাত্মক হলাহল হইয়া দাঁড়ায়।

(মাসিক মোহাম্মদী—১৩৬৭ বাংলা আজাদী সংখ্যা)

ইসলামের সাথে পার্লামেণ্ট তথা রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের কি সম্পর্ক রয়েছে, এ ব্যাপারে সমাজকে সুষ্ঠু ধারণা দানেও আজমী সাহেবের দান রয়েছে। আমাদের সমাজ বর্তমানে এব্যাপারে সচেতন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে এর খাঁটি অনুসারী হতে হলে আনুষ্ঠানিক এবাদত বন্দেগী ছাড়াও একজন মুসলমানকে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও এর নির্ধারিত নিয়মরীতি মেনে চলতে হবে। এসকল ক্ষেত্রেও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইসলামী আইন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু জ্ঞানপাপী ছাড়া অন্যদের বুঝাবার ব্যাপারে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তেমন বেগ পেতে হয়না। কিন্তু এদেশে এই সমাজেই এমন একদিন ছিল যখন সাধারণ মুসলমানরা রাজনীতি ব্যাপারটাকেই সম্পূর্ণ দুনিয়াবী ব্যাপার বলে মনে করতো। কোনো আলেম বা ধার্মিক লোক রাজনীতি করলে সেটা তার তাকওয়া পরহেজগারীর কমতি বলে ধরে নেয়া হতো। খোদ্ আলেম সমাজেরও কেউ কেউ তাই মনে করতেন। ফলে কোথাও এমনও দেখা যেতো যে, একজন আলেম দীর্ঘ বিশ পঁচিশ বছর যাবত মুহাদ্দেসী করেছেন, বুজর্গ হিসাবেও পূর্ব থেকে খ্যাত কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির তাগিদে যখন তিনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন, তখন তাঁকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা শুরু হতো। যে সকল আলেম তাঁর উপস্থিতিতে অপর কারুর ইমামতীতে নামাজ আদায় করা কল্পনাও করতে পারতেন না, তাঁরা তখন তাঁর বদলে

অপর কোনো আলেমকে ইমামতীতে ঠেলে দিচ্ছেন অথচ তাকওয়া, পরহেজ-গারী ও এলেমবিদ্যার দিক থেকে ঐ ব্যক্তিকে হয়তো রাজনীতিতে অবতীর্ণ মোহাদ্দেস সাহেব আরও দশবছর পড়াবার যোগ্যতা রাখেন। আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলমান ও খোদ্ আলেম সমাজের মধ্যে রাজনীতি সহ জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের সাথে ইসলামের সম্পর্কের ব্যাপারে এই বিভ্রান্তিমূলক ধারণার দুটি কারণ ছিল। একটি হলো ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত ধর্মনির-পেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের প্রচারণা, অপরটি ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা অর্থাৎ ইসলামকে শুধু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও মীলাদে সীমিত ধর্ম বলে মনে করা। সমাজের ইসলামী জ্ঞান বর্জিত ঐ শিক্ষিত মুসলমান এবং তাবলীগ পন্থী বলে দাবীদার কিছু লোক ছাড়া সাধারণ ভাবে এবিষয়টি এখন সকলের কাছে পরিষ্কার। এ বিভ্রান্তি দূরীকরণে জামায়াতে ইসলামী এবং জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টির আন্দোলন বিরাট দায়িত্ব পালন করেছে। শুরুর দিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের তীব্র প্রচারণার মুখে যারা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এসম্পর্কে সমাজের আলেম-গরআলেম নির্বিশেষে সকলকে সঠিক ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন, তাদের দান ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী বৈ কি। ঐতিহাসিক মর্যাদা এজন্যই বল্লাম, তাঁদের পূর্বে যাঁরা এসমাজে ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার জন্যে নিষ্ঠা-আন্তরিকতা নিয়ে নিরলস ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাদের কোনো লেখা গ্রন্থপুস্তকে এবাক্যটি পাওয়া যায়না যে,—"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।" বলাবাহুল্য, মুসলিম সাহিত্যে শেষের দীর্ঘ কয়েকটি কাল এ বাক্যটির অনুপস্থিতির দরুনই ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মুফতী মাহ্‌মুদ দেওবন্দীর ভাষায় "কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে সনদতুল্য" শতাব্দীর চিন্তানায়ক মওলানা মওদূদীই প্রথম এবাক্যটি মুসলমানদের সামনে "দিক-দর্শন কাটা" হিসাবে তুলে ধরেছেন। তার সাথে সাথে সমাজের শিক্ষিত মহলকে লেখার মধ্য দিয়ে এর তাৎপর্য এবং রাজনীতি ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দানের জন্যে যেসব মনীষী কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা নূরমুহাম্মদ আজমীর স্থান শীর্ষে। এদিক থেকে "ইসলাম ও

রাজনীতি" কিংবা "ইসলাম ও গণতন্ত্র" এই নামের তৎকালীন কোনো লেখা প্রবন্ধের আলাদা গুরুত্ব থাকে বৈ কি। নিম্নে সে সময়কারই এসম্পর্কিত তাঁর একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ধর্ম ও রাজনীতি

"আজকাল এক শ্রেণীর লোকের মুখে শোনা যায়, ধর্মের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।' কথাটা যে মোটেই সত্য নহে এমন নহে, বরং দুনিয়াতে এমন অনেক ধর্ম আছে, রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজনীতির সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই, যথা খৃষ্টধর্ম। খৃষ্টধর্ম কতক বিশিষ্ট আকীদাহ্ বা থিওলজিরই নাম, যাহাতে কেবল স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সম্পর্ক এবং পরলোক তত্ত্বেরই আলোচনা রহিয়াছে, মানবের ইহলৌকিক জীবনও আলোচনাতে কোন স্থান পায়নাই। এ কারণে খৃষ্টান জগৎ ধর্ম অর্থে বুঝিয়া থাকে এই থিওলজিকেই (থিওলজিই তাহাদের নিকট রিলিজিয়ন)। এক কথায় খৃষ্টধর্ম বৈরাগ্যের ধর্ম। এই রূপ ধর্ম কোন নির্জ্জন-বাসী সাধু সন্ন্যাসীর পক্ষে উপযোগী হইলেও কোন সংসারধর্মী মানুষের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে।

কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে এ ধারণা মোটেই সত্য নহে, ইসলাম পূর্ণ জীবন দর্শনেরই অপর নাম। ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নাই। মানুষ সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সংসার জীবন যাপন করিবে এবং উহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই পরকালের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে, ইহাই ইসলামের আদর্শ। সুতরাং একজন সংসারধর্মী মানুষের পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ের আবশ্যক, ইসলামে তার সবই রহিয়াছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে, ইসলামের খোদা রহমান ও রহীম, সৃষ্টি করিয়া তিনি আমাদিগকে বিনা আলোকবৃত্তিকার অন্ধকারে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেন নাই বরং দয়া করিয়া তিনি আমাদের শরীর ও আত্মার উন্নতি এবং ইহা—পরকালের মঙ্গলের জন্য যেখানে যাহা আবশ্যক সমস্তেরই সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক স্তরে তিনি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিয়াছেন। মানব জীবনের এমন কোন স্তর নাই যাহার প্রতি তিনি আলোক সম্পাত করেন

নাই। তিনি যেরূপ স্রষ্টা সেরূপ সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তদ্রূপ সৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও পূর্ণ ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধেও পূর্ণ ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হইতে রাজা-প্রজার সম্পর্ক পর্যন্ত এমন কোন সম্পর্ক নাই যাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি তিনি আমাদের হুশিয়ার করিয়া দেন নাই। এক কথায় তিনি শুধু আমাদের হুশিয়ার করিয়াই দেন নাই, আমাদের পারলৌকিক জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমাদের ইহলৌকিক জীবনকে দ্বেষ, হিংসা, লোভ, লালসা, কাম, ক্রোধ ও পক্ষপাত দুষ্ট কতিপয় অর্ব্বাচীন মানুষের হাতে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি যুগপৎ ভাবে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য আবশ্যক বিধি-বিধান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই কামেল বিধি-বিধান বা পূর্ণ জীবন দর্শনের নামই ইসলাম। ইসলাম শুধু নামাজ রোজা বা জিকির-আজকারের নাম নহে।

অধিকন্তু তিনি এই ইসলামের প্রতি আপন বান্দাদেরকে পথ প্রদর্শন করার জন্য যুগে যুগে তাহাদের মধ্য হইতে এক একজন আদর্শ চরিত্র মানবকে রাছুল রূপে মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি ইসলামের বিধি-বিধান সম্বলিত "আল কেতাব" অবতীর্ণ করিয়াছেন। মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সেই রাছুল বর্গের শ্রেষ্ঠ ও শেষ রাছুল এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ "কোরান" সেই "আল-কেতাব"-এর শেষ ও পূর্ণ সংস্করণ। মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) স্বীয় জীবনকে "আল-কেতাব" বা কোরানের মোতাবেক গড়িয়া তুলিয়া আমাদের জীবন সংগ্রামের প্রত্যেক স্তরের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন হীরার সাধক, অহীর বাহক, আধ্যাত্মিকতার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মের প্রচারক এবং মছজিদের ইমাম, অন্যদিকে ছিলেন বিচারালয়ের বিচারপতি, দেশের শাসক, জাতির নেতা, সমাজের সংস্কারক, পরিবারের অভিভাবক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রধান সেনাপতি। তাই আল্লাহ বলেন, "তোমাদের জন্য রছুলুল্লাহ্‌র জীবনে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।" (কোরআন) মোটকথা এই যে, তাঁহার জীবন "আল-কেতাব"-এরই ভাষ্য, যাহার অপর

নাম ছুন্নাহ্ আর এই কেতাব ও ছুন্ন'হ্ উভয় মিলিয়া রচনা করিয়াছে শরীয়তে মোহাম্মদী এবং শরীয়তে মো'হাম্মদীই হইল ইসলামের পূর্ণ-বিকাশ। আল্লাহ্ উম্মতে মোহাম্মদীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের মঙ্গলার্থে পূর্ণ পরিণত করিলাম।

ইসলাম যে পূর্ণজীবন পদ্ধতিরই নাম, সে সম্পর্কে এ যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলিতেছেন, কোরান মুসলমানদের জীবনের কর্ম পদ্ধতি। ইহাতে ধর্মকর্ম, সামাজিক, পারিবারিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী সামরিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা-বলী বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্মানুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন যাত্রার দৈনন্দিন কাজ করা পর্যন্ত, আত্মার মুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শারীরিক সুস্থতা পর্য্যন্ত, দল বা সম্প্রদায়ের দাবীদাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের দাবীদাওয়া পর্যন্ত, সৎস্বভাব ও সদাচারের বিবৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পাপাচারের বিবৃতি পর্য্যন্ত, নৈতিক কর্মফল হইতে চারিত্রিক কর্মফল পর্যন্ত, এক কথায় মানুষের সকল কাজের বিচার সমষ্টি হইল কোরান।

এতদ্‌ব্যতীত ছুন্নাহ্ বা হাদীছের অধ্যায়গুলির প্রতি সাধারণ ভাবে দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাদীছের কতিপয় প্রধান প্রধান অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা গেল :

সন্তানের নামকরণ, আকীকা, শিক্ষা, ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, শ্রমের মাহাত্ম্য, জীবিকার্জন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায় বাণিজ্য, সুদ, দেউলিয়া, ধার-উদার, লাগিত-বর্গা, দান-হেবা, অছীয়ত, ইজারা, বন্ধক পতিত জমি উদ্ধার, ফরায়েয বা উত্তরাধিকার আইন।

বিবাহের আবশ্যকতা, পাত্রী দেখা, মহরানা, আক্‌দ-নিকাহ, অলীমা, যে সকল নারীর সহিত বিবাহ অবৈধ, স্ত্রীর সহিত মিলন, স্ত্রীর সহিত খোশালাপ, বিভিন্ন স্ত্রীর মধ্যে ব্যবহারের সমতা রক্ষা, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, সন্তান পালন, তালাক-ইদ্দতের খোরপোষ, দাসদাসী আজাদ করার উপদেশ, মুনিব-ভৃত্যের পারস্পরিক অধিকার, শাসকের আনুগত্য, শাসক মণ্ডলীর কর্তব্য, কর্মচারীদের বৃত্তি, বিচারকের কর্তব্য, সাক্ষ্য-গ্রহণ, শাস্তি বিধান, দিওয়ানী ও ফৌজদারী আইন।

জেহাদের মর্যাদা, জেহাদের প্রস্তুতি বা সমরায়োজন, যুদ্ধ পরিচালন ব্যবস্থা, আশ্রয় প্রদান, সন্ধি স্থাপন, যুদ্ধ বন্দীদের ব্যবস্থা, শিকার করা, শিকারী পশুপক্ষীর শিক্ষা।

পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ, বৈধ ও অবৈধ পোষাক, আংটি ব্যবহার ও জুতা পরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, চুল দাড়ি পরিপাটি রাখা, চিরুনী করা, ছবি ব্যবহার।

চিকিৎসার আবশ্যকতা, চিকিৎসার নিয়ম, শুভ বা অশুভ নির্ধারণ, গণক-ঠাকুরের দ্বারা গণান, কতিপয় স্বপ্নের বিবরণ, স্বপ্নের তাবীর, ছালাম-কালাম, উঠাবসা, চলাফেরা, পায়খানা-প্রস্রাব, হাচি-হাসি, হাসিঠাট্টা, লজ্জা সরম।

বাগ্মিতা, কবি ও কাব্য, গান-বাদ্য, অপবাদ ও মানহানি, গালমন্দ, ফখর পক্ষপাতিত্ব, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সম্পর্ক ত্যাগ, চঞ্চলতা, রাগ ও ক্রোধ, অহঙ্কার, অবজ্ঞা, জুলুম বা অন্যায়-অত্যাচার, লোভ-লালসা, প্রতিবেশীর হক, দারিদ্রের মার্য্যাদা, দরিদ্রের হক, অতিথি সেবা ও আতিথ্য গ্রহণ, সৃষ্টির প্রতি দয়া, আল্লার ওয়াস্তে অকৃত্রিম ভালবাসা, রোগীর সেবা, মৃত্যুকালীন কর্ত্তব্য, কাফন, দাফন।

ফেতনা ও বিপর্যয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী, আত্মকলহ ও খুনাখুনি, কেয়ামতের আলামত, প্রলয়, হাশর, নশর, হিসাব, কিতাব, ন্যায় অন্যায়ের বিচার, বেহেশ্ত, দোজখ, আল্লার দীদার প্রভৃতি। এইগুলি হইল হাদীছের অধ্যায়। এই সকল অধ্যায়ে এ সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রহিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও যাহারা মনে করেন যে, ইসলাম শুধু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক বা রোযা-নামায তথা আধ্যাত্মিকতারই নাম, তাহারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইসলামের বিকৃত অর্থ করিতে চাহিতেছেন।

ইসলাম ও গণতন্ত্র: আজকাল এক শ্রেণীর লোকের মুখে ইসলামের গণতন্ত্র, গণতন্ত্রই ইসলাম, ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—এই ধরনের একটা কথা শোনা যায়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা

সাম্যবাদ প্রভৃতির সহিত যে ইসলামের কোন বিষয়েরই মিল নাই, তাহা নহে বরং বহু বিষয়ে পরস্পরের মিলও রহিয়াছে। গণতন্ত্র যেরূপ রাজতন্ত্র তথা ব্যক্তি বিশেষের সার্বভৌমত্বের পোষকতা করে না, ইসলামও তাহা করে না। উভয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ধর্ম ও কৃষ্টির স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সমর্থক। সাম্য, মৈত্রী ও উদারতা ইত্যাদি সম্পর্কেই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। তথাপি বলিতে হয়, ইসলাম ও গণতন্ত্র এক ও অভিন্ন নহে, যেরূপ মানুষ ও বানর এক ও অভিন্ন নহে অথচ মানুষ ও বানরের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বহু মিল রহিয়াছে। কারণ, ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ এবং কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্যও রহিয়াছে। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের এবং আইন-কানুন রচনা ও উহার নীতি নির্ধারণ করার চরম অধিকারও তাহাদেরই আর ইহাই হইল গণতন্ত্রের প্রাণ। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ যাহা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা বৈধ, আর যাহা অবৈধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাহা অবৈধ, আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার জনগণ শরাব, জুয়া, গণিকাবৃত্তি, সুদকে বৈধও করিতে পারেন অবৈধও করিতে পারেন—চরম অধিকার তাহাদেরই।

পক্ষান্তরে ইসলাম বজ্র কন্ঠে ঘোষণা করিতেছে : সমগ্র জগতের সার্বভৌম অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই, আইন-কানুন রচনা ও তাহার নীতি নির্ধারণ করার চরম অধিকারও কেবল মাত্র তাঁহারই। জনগণ তাঁহার খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। তাঁহার হুকুম-আহ্‌কামকে কার্য্যকরী করা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করার পক্ষে সহায়তার উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে হইতে যোগ্যতর ব্যক্তিকে নির্বাচন করাই তাহাদের একমাত্র কাজ। তাঁহার নির্ধারিত নীতির বিপরীত কিছু করার অধিকার তাহাদের নাই।

তাঁহার অবৈধ করা শরাব, জুয়া, গণিকাবৃত্তি ও সুদকে সমগ্র দুনিয়ার জনগণ মিলিয়াও বৈধ করিতে পারে না। তদ্রূপ তাঁহার বৈধ করা কোন বিষয়কেও তাহারা অবৈধ করিতে পারে না। ইহা হইল উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

সাম্যবাদ প্রভৃতির সহিত যে ইসলামের কোন বিষয়েরই মিল নাই, তাহা নহে বরং বহু বিষয়ে পরস্পরের মিলও রহিয়াছে। গণতন্ত্র যেরূপ রাজতন্ত্র তথা ব্যক্তি বিশেষের সার্বভৌমত্বের পোষকতা করে না, ইসলামও তাহা করে না। উভয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ধর্ম ও কৃষ্টির স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সমর্থক। সাম্য, মৈত্রী ও উদারতা ইত্যাদি সম্পর্কেই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। তথাপি বলিতে হয়, ইসলাম ও গণতন্ত্র এক ও অভিন্ন নহে, যেরূপ মানুষ ও বানর এক ও অভিন্ন নহে অথচ মানুষ ও বানরের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বহু মিল রহিয়াছে। কারণ, ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ এবং কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্যও রহিয়াছে। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের এবং আইন-কানুন রচনা ও উহার নীতি নির্ধারণ করার চরম অধিকারও তাহাদেরই আর ইহাই হইল গণতন্ত্রের প্রাণ। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ যাহা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা বৈধ, আর যাহা অবৈধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাহা অবৈধ, আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার জনগণ শরাব, জুয়া, গণিকাবৃত্তি, সূদকে বৈধও করিতে পারেন অবৈধও করিতে পারেন—চরম অধিকার তাহাদেরই।

পক্ষান্তরে ইসলাম বজ্র কন্ঠে ঘোষণা করিতেছে : সমগ্র জগতের সার্বভৌম অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই, আইন-কানুন রচনা ও তাহার নীতি নির্ধারণ করার চরম অধিকারও কেবল মাত্র তাঁহারই। জনগণ তাঁহার খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। তাঁহার হুকুম-আহ্‌কামকে কার্য্যকরী করা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করার পক্ষে সহায়তার উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে হইতে যোগ্যতর ব্যক্তিকে নির্বাচন করাই তাহাদের একমাত্র কাজ। তাঁহার নির্ধারিত নীতির বিপরীত কিছু করার অধিকার তাহাদের নাই।

তাঁহার অবৈধ করা শরাব, জুয়া, গণিকাবৃত্তি ও সূদকে সমগ্র দুনিয়ার জনগণ মিলিয়াও বৈধ করিতে পারে না। তদ্রূপ তাঁহার বৈধ করা কোন বিষয়কেও তাহারা অবৈধ করিতে পারে না। ইহা হইল উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

মোটকথা এই যে, তিনি হিংসা-বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার অনুর্দ্ধ কতিপয় মানবের হস্তে অপর সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণাধিকার ছাড়িয়া দেন নাই। বরং তিনি নিজেই স্বীয় কিতাবে শাসনতন্ত্রের নীতি এবং আবশ্যক আইন-কানুন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। রছুলে করীম (দ:) ছুন্নাহ্ দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীন উহা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সব যুগের কিতাব ও সুন্নাহ্তে বিশেষজ্ঞদেরকে ইজতেহাদের ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, উপরোক্ত মৌলিক পার্থক্য ব্যতীত উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে যথা :

(ক) গণতন্ত্রে পার্টি গঠন কার্যাত: অপরিহার্য্য। গণতন্ত্রী দেশে কোন বিরোধী পার্টি না থাকিলে সে দেশের হুকুমত হইয়া পড়ে স্বৈরাচারী। বস্তুতঃ বিরোধী দলই গণতন্ত্রী হুকুমতকে সুষ্ঠুতা দান করিয়া থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে পার্টি গঠনের মানে এই হইয়া থাকে যে, যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি পার্টির সদস্য থাকিবেন, মতামত প্রকাশ কালে পার্টিমতের পোষকতা করা তাহার পক্ষে অবশ্য ফরয। আর পোষকতা না করা পার্টি ত্যাগেরই শামিল, যদিও পার্টির অবলম্বিত পন্থা ন্যায়-নীতি বা সত্যের বরখেলাফই হউক না কেন? অপর পক্ষে ইসলাম, বিরোধিতার ভিত্তিতে স্থায়ী দল গঠন ও ন্যায় নীতি বা সত্যের অপলাপের পোষকতা করে না।

(খ) বর্তমান গণতন্ত্রে ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে কোন বিশেষ ধর্ম, মতাবলম্বী হওয়া শর্ত নহে। অপর পক্ষে ইসলাম এমন একটি বিশিষ্ট মতবাদের নাম, যাহাতে ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এক ও অভিন্ন। সুতরাং কোন ব্যক্তির পক্ষে মোছলেম জাতির নেতৃত্বাধিকার বা রাষ্ট্রনায়ক পদ লাভের জন্য মোছলমানদের এই আদর্শবাদে বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক, যেরূপ ভাবে লীগ বা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধিকার লাভের জন্য লীগ বা কংগ্রেসী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রের নায়ক একাধারে রাজনৈ-

তিক নেতা ও ধর্মনৈতিক ইমাম। ইসলামী শরিয়তের বহু হুকুম আহ্-কাম কার্য্যকরী করা হয় একমাত্র তাঁহারই আদেশে। মূলকথা এই যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র এক ও অভিন্ন নহে। যেরূপ ভাবে পুঁজি-বাদী গণতন্ত্র ও রুশীয় সাম্যবাদ এক ও অভিন্ন নহে।

গণতন্ত্র স্বীয় বৈশিষ্টাবলী সহ স্বয়ং একটি তন্ত্র। সাম্যবাদও নিজ বৈশিষ্ট্যসমূহ লইয়া মোস্তাকেল একটি তন্ত্র, সেইরূপ ভাবে ইসলামও আপন বৈশিষ্ট্যসকল লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি তন্ত্র। মানব জীবন সম্পর্কে তাহার নিজস্ব একটি কর্মপদ্ধতি এবং স্বতন্ত্র একটি কার্য্যসূচী রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইসলামের পূর্ণ কর্মসূচীকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, সেই হইল মোছলেম জাতির একজন সদস্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তি অনুসারে ইসলামের কিছুটা গ্রহণ, কিছুটা বর্জনের নীতি অবলম্বন করিয়াছে, সে হইল ইসলামের পরিভাষায় বিধর্মী। আল্লাহ্ বলেন, "যাহারা বলে যে, আমরা কতক বিশ্বাস করি আর কতক অবিশ্বাস করি এবং তাহারা এতদোভয়ে মধ্যবর্তী পন্থা আবিষ্কার করিতে চাহে, তাহারা নিশ্চিত রূপে কাফের।"

দুঃখের বিষয়, আজকাল এক শ্রেণীর লোক নিজদিগকে মোছল-মান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন অথচ ইসলামের পূর্ণ প্রোগ্রামকে গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের মাপকাঠি হইতেছে পাশ্চাত্য মতবাদ। পাশ্চাত্য মতবাদের সহিত ইসলামের যতখানি খাপ খায়, তাঁহারা ছেরেফ ততখানিই গ্রহণ করিতে রাজী। পাশ্চাত্যের অধিবাসী তাহাদিগকে ধর্মান্ধ বা প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বিদ্রূপ করিবে —এই ভয়ে তাঁহারা "ইসলামী গণতন্ত্র" নামে পূর্ণ ইসলামও নহে, পূর্ণ গণতন্ত্রও নহে—এইরূপ একটি জগাখিঁচুড়ী পাকাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইসলামের সহিত তাঁহাদের কতখানি সম্পর্ক আছে একটুখানি চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি।

মওলানা আজমীও রাজনীতি

মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীকে দলীয় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সরাসরি দেখা না গেলেও তিনিও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল নিরব অথচ সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি অনেক রাজনীতিকের উপদেষ্টার

মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছিল। রাজনৈতিক কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে অনেক রাজনৈতিক নেতাকেই তাঁর কামরায় এসে পরামর্শ নিতে দেখা যেতো। ইসলামপন্থী সকল রাজনৈতিক দলের নেতা তো তাঁর পরামর্শ গ্রহণে যেতেনই, পরন্তু যাদের কাছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিষয় গৌণ ব্যাপার ছিল, তাঁরাও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁর থেকে পরামর্শ নিতেন। এপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা খাজা আহমদের একটি উক্তি লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন, "তাঁহার নিরব অথচ সচেতন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। রাজনীতির বহু কঠিন জটিলতার ব্যাপারে তাঁহার সাথে আমার আলোচনা হয়েছে এবং অনেক সময় তাঁহার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মতামত আমাকে চলার পথে সাহায্য করিয়াছে।"

—(খাজা আহ্মদ আঃ লীগ এম পি. ছিলেন।)

জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমীয়তে ওলামা-এ-ইসলাম প্রভৃতি ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা মওলানা আজমী থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেতেন। এগুলোর সাথে জড়িত তাঁর অনেক প্রত্যক্ষ শীর্ষ ও ভাবশীষ্য রয়েছে। তিনি অত্যন্ত উদার মনের অধিকারী ছিলেন বলে সকলের প্রতিই তাঁর ব্যবহার একরকম ছিল। তিনি ইসলামপন্থী রানৈতিক দলসমূহের কর্মীদেরকে বহুমুখী যোগ্যতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করতেন। মওলানা আজমী শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র একনিষ্ঠ ভাবশীষ্য বিধায় ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতো তিনিও জ্ঞানগবেষণায় নিজের জীবন অধিক কাটান। ইসলামের শক্তিবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে মৌখিক ও লেখায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। মোটকথা, মওলানা আজমী ছিলেন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ইসলামপন্থী দলগুলোর রাজনীতির তাত্বিক গুরু।

লিখিত গ্রন্থাবলী

মওলানা নূরমুহাম্মদ আজমীর সাধনাময় জীবনের বহু নিদর্শন হিসাবে এদেশের পত্রপত্রিকায় অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। তবে তাঁর সাধনা জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো (১) "হাদীসের তত্ব ও ইতিহাস।" (হাদীস বিজ্ঞান ও ইতিহাস) অনেক জ্ঞানী-গুণীর মতে, আরবী

উর্দু ও, ফারসী ভাষায় একক কোনো গ্রন্থে হাদীস সংক্রান্ত এত অধিক সংখ্যক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ অতি বিরল। এটি একটি বিরাট ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে মওলানা আজমীর অক্ষয় গবেষণা কর্ম হিসাবে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

২। খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

৩। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

মওলানা আজমীর রচিত উল্লেখিত ৩টি বই তৎকালীন সময় বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস এর শেষের দিকে তিনি দু'শতের অধিক বাংলা ভাষাভাষী মোহাদ্দেসের সংক্ষীপ্ত জীবনী আলোচনা করেছেন, যারা সিয়াহ্‌সিত্তার কোনো কোনো কিতাব শিক্ষা দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে ৫০ এর মতো লোকেরই বাংলা বা উর্দুতে কিছুনা কিছু রচনা রয়েছে। হাদীসের পরিচিতি ও গোড়ার কথা এবং হাদীসের পরিভাষা থেকে আরম্ভ করে বাংলা-ভারতে হাদীসের চর্চা ও মোহাদ্দেসীনের সংক্ষীপ্ত জীবনী এবং মাদ্রাসা পরিচিতি পর্যন্ত কোনো কিছুই এপুস্তকে বাদ পড়েনি।

৪। জগৎবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মেশকাতের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর আর একটি কীর্তি।

৫। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা : এতে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা রয়েছে। এ বইয়ের কতিপয় প্রবন্ধ উর্দু ভাষায়ও অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উর্দু ভাষায়

৬। নেজামে তালীম (শিক্ষাপদ্ধতি) ১৯৪৬ সালে কলকাতা হতে বড় সাইজে প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে বইখানা শেষ হয়ে যায়। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান অধ্যক্ষ মওলানা তৈয়ব সাহেব, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ও মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিষ্ট্রারার মওলানা জিয়াউল হক সাহেব, 'জমিয়াতুল মোদার্রেসীনে বাংলার সাধারণ সম্পাদক মওলানা ওবায়দুল হক সাহেব, তৎকালীন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মোজাফ্‌ফর-

হোসাইন সাহেব ও E B R রেলওয়ের এখনকার চীফ ইঞ্জিনিয়ার কাজী জহুরুল হোসাইন প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বইটির ভূয়ানী প্রশংসা করেন।

৭। আদাবে তরবিয়ত

(ইসলামী আদব-কায়েদা) (নেজামে আলীমের দ্বিতীয় খণ্ড)

৮। তালীকাত-এ-ওলামা-এ পাক ও হিন্দ

(ক) তাতে এ উপমহাদেশে প্রাক উর্দূ যুগ থেকে একশত বছরের আলেমদের লিখিত কিতাবের নাম তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

(খ) ইসলামী নেজামে তালীম কে চান্দ অমূল।

৯। আরবী ইংরেজী ভাষায়

তারীখু ফনুনিত্তাফসীর (তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস)। এগ্রন্থে প্রথম হিজরী থেকে ১৪ শতকের শেষ অর্থাৎ কিতাব লিখা পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের তফসীর লেখক (জানামত), যত ভাষায় তফসীর লিখা হয়েছে সব-গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাতে প্রায় সাড়ে ৯ শত তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

১০। New Arabic word book

১১। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়

১৯৩৭ থেকে মওলানা আজমী দৈনিক আজাদ ও নবযুগে লিখতে শুরু করেন। মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও, মদীনা, পৃথিবী, ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, দিশারী, মিনার, জাহানে নও, ইনসাফ, সংগ্রাম প্রভৃতি দৈনিক, মাসিক ও সাময়িকীতে মওলানা আজমীর বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ঐ গুলোর মোটামুটি তালিকা নিম্নরূপ

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর আলেম সমাজ ও রাজনীতি
(২) ভারতে ইংরাজ রাজত্বের গোড়াপত্তন (মাসিক মোহাম্মদী ১৯৪০ ইং)
(৩) ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা (মাসিক মোহাম্মদী ১৯৫০ ইং)
(৪) ফেলেস্তীনে ইহুদী (মাসিক মোহাম্মদী ১৯৫১)
(৫) ইজতেহাদের আবশ্যকতা (ঐ ১৯৫৫ ইং)

(৬) ইসলামে দরিদ্রের অধিকার (বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত)
(৭) আমাদের শিক্ষা সমস্যা
(৮) প্রবাদবাক্য
(৯) একমাত্র পথ
(১০) ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাতে পড়ার কারণ (ঐ ১৯৬১ ইং)
(১১) ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত (১৯৬১ আগষ্ট)
(১২) ইংরেজ আমলে ভারত বর্ষ (১৯৬৩ ইং)
(১৩) বাংলা সাহিত্যের উপর ইসলামে প্রভাব (১৯৬২ ফেব্রুঃ)
(১৪) মাদ্রাছা শিক্ষা উন্নয়ন
(১৫) পাক-ভারতে কোরআনের তাফসীর
(১৬) বাংলা-ভারতে এলমে হাদীস
(১৭) পাক-ভারতে লিখিত হাদীসের কিতাব (১৯৬০)
(১৮) হযরত আবু হোরায়রা ও ইবনে আববাস
(১৯) ইজতেহাদ (দিশারী ১৯৬৫ জানুঃ)

শেষ বিদায়

জ্ঞানতাপস মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী …… সালে ঢাকা থেকে যাবার পর নিজ গ্রাম ফেনীর নেজামপুরে অবস্থান করতে থাকেন। ১৬ই আগষ্ট ১৯৭২ সালে দিবাগত রাত ৯-১০ মিনিটের সময় তিনি সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে এ দুনিয়া ত্যাগ করেন। মরহুম মওলানা আজমী সাহেব জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে যে কীর্তি রেখে গেছেন, ঐগুলোর মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন। তাঁর জ্ঞানগত গ্রন্থাবলী ও উজ্জ্বল কীর্তি সমূহ চির-দিন তাঁকেই অমর করে রাখবেনা, এদেশের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানা-নুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রেরণা জোগাতে থাকবে।

মনীষী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে মওলানা আজমী

মহান চিন্তাবিদ মওলানা আজমীর যে বছর ইন্তেকাল হয় তখন পরলোক-গত শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় সমাসীন। স্বাধীনতার বয়স মাত্র দু'বছর আট মাস ষোলদিন। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি,

মূল্যবোধ ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব সমূহ নিয়ে যেসব দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র লেখালেখি করতো, সেগুলো ছিল নিষিদ্ধ। ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যোবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বুদ্ধিজীবীদের ও অনেকেই তখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে কারাগারে কিংবা বিচ্ছিন্নও অজ্ঞাত বাসে অবস্থান করছেন। ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে সমাজের ইসলামী ব্যক্তিত্ব সমূহের মতপার্থক্যের বিষয়টি পূর্ব থেকেই ছিল সুস্পষ্ট। ঐ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাজারের সংবাদপত্র সমূহে মওলানা আজমীর মৃত্যু কিংবা তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা আদর্শ সম্পর্কিত আলোচনা বা কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের আশা করা ছিল বাতুলতা।

এখানে গুটিকতক মনীষীর কিছু মন্তব্য আজমী সাহেব সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছি।

অধ্যাপক আবুল কাসেম [বাংলা কলেজ, ঢাকা]

"মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী সমসাময়িক জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। জ্ঞানের অন্বেষণে তাঁর নিরলস সাধনা, সত্য উদ্ধারে তাঁর অবিশ্রান্ত তৎপরতা, অতীতের মহাসমুদ্র থেকে বিরল জ্ঞানের মুক্তা আহরণের জন্য তাঁর অতন্দ্র গবেষণা, আর নির্ভীক ইজতেহাদী মনোভাবের জন্য তিনি ইংরেজী ও আরবী শিক্ষিত উভয় মহলের কাছে অতিশয় বরণীয় হয়ে আছেন। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর পুরা জীবনটি তিনি জ্ঞানের সাধনায় উৎসর্গ করেছেন। কোন রকমে অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে খাঁটি জ্ঞানের এমন নিঃস্বার্থ সাধক এই যুগে আমাদের আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ।

অধ্যক্ষ আবুল কাসেম আদামুদ্দীন

[সম্পাদক বাংলা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, সহ-সম্পাদক ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ নওগাঁ কলেজ ও অধ্যাপক শান্তি নিকেতন বিশ্ব ভারতী।]

"মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী সেই শ্রেণীর খ্যাতিসম্পন্ন আলেম, যারা বিদ্যালয় ত্যাগের পর কিতাবপত্রকে সালামু আলাইকুম" না বলে "দোলনা হইতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর"—বাণীর অনুসরণে আজীবন জ্ঞান সাধনায় রত ছিলেন।"

অধ্যক্ষ নুরুল করিম [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ]

"মওলানা আজমী সাহেবের ধ্যান-ধারণা, মানবতা বোধ, জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহা, ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা, সার্বজনীন প্রীতি, পাণ্ডিত্ব ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিভা মুসলিম সমাজের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁহার ন্যায় ত্যাগী, উদারচেতা, ধর্মবিশেষজ্ঞ আলেম যদি সমাজে ২০/২৫ জন থাকিত, তবে ইসলামের সুদিন দেখা দিত। তিনি কেবল একাই আমাদের জন্য ত্যাগ ও জ্ঞানসাধনার নমুনা রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও উপকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার মেধার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।"

অধ্যাপক ইবরাহিম খাঁ। [সুপরিচিত সাহিত্যিক]

"মওলানা আজমী ছাহেবের ইছলামিয়াত বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান, সত্যের প্রতি তাঁর অটুট নিষ্ঠা, নিজ জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য তাঁর অক্লান্ত সাধনা, মুসলিম সমাজের তমদ্দুন ও তাহাজীব প্রচারে তাঁর বিনিদ্র আকুতি, কথায় লেখায় চিন্তায় তাঁর প্রশংসনীয় এসব গুণের কারণ স্মরণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আজ সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।"

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক [নাছিরপুর কলেজ, বরিশাল, প্রাক্তন গবেষণা অফিসার ও ডিরেক্টর, ইসলামীগবেষণাগার ফরিদাবাদ]

"হজরত আজমীর ন্যায় মহান চিন্তাবিদ আলেমের তিরোধানে পাক-ভারত-বাংলা-উপমহাদেশের যে ক্ষতি হলো, তা অপূরণীয়। বিশেষ করে বাংলার মুসলিম মানস যে ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব হারালো, তা আর কোনো দিন ফিরে পাবার নয়।"

ডাক্তার অছিউদ্দীন [প্রাণীয়া হোমিয় হল, ঢাকা]

"দীর্ঘ সময় এ মহামানবের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর স্বভাব, চরিত্র জ্ঞান ও গুণের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তার দ্বিতীয় নমুনা বিরল। এমন অমায়িক বিনয়ী মধুর স্বভাবের মানুষ, এমন সুদূর প্রসারী জ্ঞানের মহা সত্য সাধক, এতবড় ধর্মভীরু খোদাভক্ত প্রাণ, এত কঠোর কর্তব্য

নিষ্ঠ, নিরলস কর্মী-আমার জীবনে আমি কোথাও দেখিনি। তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ, জ্ঞানের সাগর, এক অনন্য সাধারণ দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন, জগতকেও ধন্য করেছেন।"

পীর মওলানা শাহ মুহাম্মদ সিদ্দীক

"মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর মত প্রখ্যাত আলেম ও নিরলস জ্ঞান-সাধকের জীবন ইতিহাস ও গবেষণার ফসলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মুসলিম সমাজের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। দ্বীনী এলেমের চর্চাবিমুখ এই যুগসন্ধিক্ষণে জ্ঞানতাপস মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর চিন্তা ও আদর্শ মুসলিম মানসে যেন উদ্যম ও চেতনার উন্মেষ ঘটায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ইহাই আমার মুনাজাত।"—আমীন।

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

"ফেনীর মওলানা মরহুম নূরমুহাম্মদ আজমীর বিশিষ্ট সাধনা ও সুকৃতির স্মৃতি রক্ষার্থে একটা "স্মারক গ্রন্থ বের হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কারণ, তাঁদের মতো জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর একমাত্র না হলেও একটি প্রধান উপায় হচ্ছে 'স্মারক গ্রন্থ' প্রচারের মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে তাঁদের জীবন আলেখ্য তুলে ধরা।

এ আলেখ্য সঠিক ভাবে চিত্রিত হলে এহবে দেশের মানুষের কাছে একটা আদর্শ।

মওলানার সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় ছিল। কোর-আন হাদীস, ফেকাহ্, উসূল, প্রভৃতি ইসলামী শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্ব গভীর ও বিশাল ছিল। আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে এক এক সময় মরহুম মওলানার পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার প্রতিও তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল, তা আমি বুঝতে পারতাম।

বাংলা ভাষায় আমাদের আলেম সমাজের অজ্ঞতা দুঃখজনক হলেও মরহুম মওলানার ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। মরহুম মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মরহুম মওলানা আক্রাম খাঁ, মরহুম মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান

এবং এই শ্রেণীর আরও দু'একজন মওলানা ব্যতীত বাংলা ভাষায় মওলানা আজমীর যে অধিকার ছিল তা আমি তখনকার অন্য কোনো মওলানার কাছে দেখিনি। তিনি বেশ কয়েকটি ইসলামী বই বাংলায় রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন।

সব চাইতে আশ্চর্য ও প্রশংসনীয় ব্যাপার হইল এই যে, মরহুম মওলানা আজমী বাঙালীদের জন্যে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থ প্রচারের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমাদের ইসলামী শিক্ষা বাংলা ভাষার মধ্যস্থতায় না দিলে ইসলাম থেকে যাবে 'কিতাবে'—মানুষের মধ্যে নয়। অথচ, ইসলাম প্রচারিত হয়েছে মানুষের জন্যে।

ইসলাম ধর্মে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর ও ব্যাপক, চিন্তার রাজ্যে তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল প্রগতিশীল এবং ব্যক্তিগত জীবন যাপনে তিনি ছিলেন একান্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর। আমাদের দেশে এমন মনীষীর কদরদানি বড় একট হয় না। মরহুম মওলানা আজমীও তার ব্যতিক্রম নন। আমাদের দেশের এ অবস্থার অবসান কবে হবে, সে কথা কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারে।

আল্লাহ্ তায়ালা পরলোকগত মওলানার রূহের মাগফিরাত করুন এবং তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের সম্পূর্ণতা দান করুন।"

খাজা আহ্মদ [এম. পি.]

"মরহুম মওলানা নূরমুহাম্মদ আজমী সাহেবকে আমি চিনতাম, জানতাম। আজমী সাহেব ফেনী এলাকার 'দুয়াম ছাব' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ফেনী হইতে দীর্ঘদিন পূর্বে তাঁহার কর্মকেন্দ্র ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানীতে থাকিয়াই তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন ও ইসলামী জীবন দর্শনের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তাঁহার নিরব অথচ সচেতন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। রাজনীতির বহু কঠিন জটিলতার ব্যাপারে তাঁহার সাথে আমার আলোচনা হয়েছে এবং অনেক সময় তাঁহার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মতামত আমাকে চলার পথে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য অমায়িক

ব্যবহার, সাক্ষাতপ্রার্থীদের মুগ্ধ করিত। তাঁহার সরল জীবন যাপন ও গভীর পাণ্ডিত্বপূর্ণ রচনা সম্ভার ভাবীকালের বাংলাদেশকে আধ্যাত্মিক দিক হইতে মানব কল্যাণের মহত্তর পথে আগাইয়া দিতে পারিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

তাঁহার লিখিত সকল জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর সংকলন, মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হইলে এই মনীষীর অতুলনীয় অবদান দেশ ও বিশ্ববাসীকে মহৎকাজে অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

আবুল হোছাইন রহমানী [সহ-অধ্যক্ষ ফেনী কলেজ]

"আমার চির হিতাকাঙ্খী শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আলহাজ হজরত মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহঃ)-কে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে না ফেলিয়া একজন অসাধারণ মানব হিসাবে চিহ্নিত করিলে মোটেই অযৌক্তিক হইবেনা বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই উপমহাদেশের আলেম সমাজ, ইংরেজী শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলমানগণ যখন নানা রকম কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও গোড়ামির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল, তখনই মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে এই সর্বজনমান্য মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

১৯২৭ ইংরেজী সনে বর্তমান ফেনী আলিয়া মাদ্রাছার একজন নগণ্য ছাত্র হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তদবধি তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখিতেন।

যিনিই তাঁহার সাহচর্যে আসিতেন, তিনিই তাঁহার মধুর অমায়িক ব্যবহার ও নানাবিধ বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান উপলব্ধি করতঃ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভরে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। আমি যখনই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতাম তখনই মনে হইত যে, আমার অপেক্ষ. অধিক স্নেহের পাত্র তাঁহার নিকট অন্য কেহ ছিলনা। মরহুম মওলানা আজমী (রহঃ)-এর নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভরে আকৃষ্ট হইতেন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে যখনই কোনো বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইয়াছি, তখনই তিনি আমাকে উহার এত সহজ

সুন্দর সমাধান দেখাইয়া দিতেন, যাহাতে ভবিষ্যতেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার মস্তক নুইয়া পড়িত।

তিনি একাধারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, রাজনীতিবিদ, সদালাপী মিষ্ঠভাষী স্বদেশপ্রিয় ছিলেন। এই কারণেই সকল শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি সমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ……তাঁহার জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মুসলমানগণ সত্যকারের ইছলামী পথ খুঁজিয়া পাক ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।"

কাজী ফজলুল হক [মোক্তার, ফেনী]

"খনির গর্ভে হীরক থাকে, সাগরের তলায় মুক্তা। কারও নজরে বিশেষ পড়েনা। যখন তোলা হয়, ধরা হয় চোখের সামনে, চোখ ঝলসে যায় এদের আলোর ছটায়। ফার্সী কবি বলেছেন, কদ্‌রে গুল্‌ বুলবুল বদানাদ, ইয়া বদানাদ শাহ্‌ পরী, কদ্‌রে গওহার শাহ্‌ বদানাদ ইয়া বদানাদ গওহারী।—"ফুলের মূল্য বুলবুল বুঝে আর বুঝে পরীর রাণী, জহরতের মূল্য রাজা বুঝে আর বুঝে জহুরী।"

ফেনীতে নূর মুহাম্মদ আজমীর জন্ম, ফেনীতেই মৃত্যু। তাঁর কর্মস্থল বিশেষতঃ কলিকাতা ও ঢাকায়। ব্যবসা পড়া ও লেখা।

রোগা পাতলা শরীর, অতিসাধারণ পোষাক, চেহারা সুশ্রী বলা যায় না। কিন্তু ঐ লোকটির লেখা একবার যে পড়েছে, সেই জেনেছে পাণ্ডিত্ব তাঁর কত গভীর। সেকালে কলিকাতার মাসিক মোহাম্মদী ও অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর লেখা, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়ে প্রথম লিখককে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। কিন্তু তখন জানতামনা যে, তিনি আমারই ফেনীর লোক।

১৯৪০ সালে প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে আসি। তিনি তখন ফেনী মাদ্রাসার সহকারী অধ্যক্ষ বা দুয়াম সাহেব। রাজনীতিতে তিনি দূর-দর্শী ছিলেন। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁর দান ছিল অশেষ, যেটার পেছনে ছিল তাঁর আন্তরিকতা, যাহা অন্য দশ জনের ছিলনা।

আল্লামা নূরমুহাম্মদ আজমী এক ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনা এদেশের সুধী সমাজে প্রচুর প্রশংসা পাইলেও নিজের জন্ম-ভূমি ফেনীতে খুব আলোড়ন আনেনি। আমরা তজ্জন্য লজ্জিত।

আল্লামার লিখিত অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ সংকলনের জন্যে দেরীতে হলেও যে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে, তাহা ভাবীকালের জন্যে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

ইংরাজীতে যাকে বলে Versatile genius বহুমুখী জ্ঞান ও মেধার অধিকারী এই মহাপণ্ডিতের আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা লেখা অসংখ্য। সমগ্র উপমহাদেশে এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেও তাহা সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছে। এই জ্ঞানের খনির সঠিক মূল্যায়ন রাম, শ্যাম, যদুর জন্য নহে। কারণ, তিনি নাটক, নভেল বা গানের বই লিখেননি, লিখে-ছেন জ্ঞানের বই। জহুরিরাই শুধু জহরতের কদর বুঝবে। এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।"

মওলানা আবদুল মান্নান [প্রধান মোহাদ্দেছ, ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা]

মরহুম মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী সাহেব আমার স্নেহবান ওস্তাদ। ফেনী আলিয়া মাদ্রাসায় জমাতে হাস্তম হতে জমাতে উলা পর্যন্ত একজন নগণ্য ছাত্র হিসাবে তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করার আমার সুযোগ হয়েছিল। নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে মরহুম আজমী আমাদের নিকট অত্যন্ত ভক্তিভাজন ছিলেন। যেমনি ছিল তাঁর জীবন বিচিত্র, তেমনি ছিল তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে তিনি সকলকে আপনজন মনে করতেন। মেঘ যেমন সর্বত্রই বারি বর্ষণ করে থাকে, তিনিও তেমনি সকলকে অকাতরে জ্ঞান বিত-রণ করে থাকতেন। শুধু নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক বুঝাইয়া দেওয়াকে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং তাঁর শিক্ষাদানের লক্ষ্য থাকতো যে, কি করে ছেলেরা আদর্শ মানুষ হবে, শিক্ষাজগতে তাদের জড়তা দূর হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হবে। হীনতা ও মনের দুর্বলতা বিদূরিত হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার নিমিত্ত তাদের মনোবল ও সাহস অর্জিত হবে এবং কি করে তারা কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীন ও দুনিয়ার

সামঞ্জস্য রক্ষা করে স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবন যাপনে সক্ষম হবে — এধরনের সামগ্রিক আলোকপাত করাই ছিল তাঁর শিক্ষাদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে সকল কাজেই স্বাবলম্বী হতে উপদেশ দিতেন। তিনি বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, কতিপয় মছলা-মাছায়েল জানার নামই ইসলাম নহে বরং ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের মধ্যে নেহায়েত ঘনিষ্ঠ মিল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নামই ইসলাম। তিনি যে কিতাব পড়াতেন, তা বিষয় হিসাবে পড়াতেন এবং তার উপর মৌলিক ও ঐতিহাসিক আলোকপাত করতেন।

হজরত আজমী সাহেব অন্যায়কে কখনও বরদাশত করতেননা। তিনি তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জেহাদী মনোভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন এবং ছবক পড়া কালীন সময় মাঝে মাঝে অতীতের বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহাসিক কাহিনী সমূহ তুলে ধরে তাঁর শিষ্যদেরকে অন্যায় ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে নির্ভীক সৈনিক হিসাবে গড় তোলার চেষ্টা করতেন। তিনি বৃটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে গোলামীর জিঞ্জিরকে তুড়ে স্বাধীনতা অর্জনে উৎসাহ প্রদান করতেন।

মরহুম আজমী থেকে আমরা প্রকৃত মানবতার অনেক সন্ধান পেয়েছি। তাঁর শিক্ষা, চিন্তা ও আদর্শ অমর হয়ে থাকুক এবং তা জনসমাজে আদৃত ও প্রতিফলিত হয়ে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হোক। রাববুল আলামীনের দরবারে এটাই আমাদের কামনা।"

সূফী রাজনীতিক মওলানা আতহার আলী

[জঃ ১৮৯১ – মৃঃ ১৯৭৬ ইং ৫ই অক্টোঃ]

মওলানা আতহার আলী (রহঃ) ছিলেন বাংলাদেশের ওলামা জাগরণ ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ। ইসলামী জাগরণের একজন আপোষহীন নিঃস্বার্থ সংগ্রামী নেতা। সাথে সাথে ছিলেন আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু। এই উভয় গুণের সমাবেশ আতহার ব্যক্তিত্বকে যেমন আক্ষরিক অর্থেই 'আতহার' তথা দুর্নীতি মুক্ত এক পবিত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে, তেমনি মুসলিম জীবনের পরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি বিকাশ ও উৎকর্ষতা বিধানকারী এক মহান দিকদর্শক হিসেবেও আমরা তাঁকে দেখতে পাই। যার ব্যক্তিত্বে এই উভয় বিরল গুণের সমন্বয় সাধিত হয়েছে, তাঁর কর্মময় জীবনের চর্চা পরবর্তীদের কল্যাণেই প্রয়োজন – তাঁকে ধন্য করার জন্যে নয়।

যে কোনো মহৎ ব্যক্তির জীবন থেকে যথার্থ শিক্ষা ও প্রেরণা পেতে হলে তাঁর জীবনের সঠিক মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। এদেশের সমাজ জীবনের মূলভিত্তি ঠিক রাখা এবং সমাজের চিরায়ত মূল্যবোধ ও স্বাধীন-সত্তাকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে আলেমদের দান অপরিসীম। অনুকূল প্রতিকূল যে কোনো অবস্থায় জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনায় তাকে উজ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে আলেমদের উজ্জ্বল ও নিঃস্বার্থ অবদান থাকা সত্বেও এক শ্রেণীর লোক তাদের এ অবদানকে স্বীকার করতে চায় না। তাদের জাতীয় পর্যায়ের কীর্তিকলাপ ও অবদানসমূহকে যেন আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট থেকে আড়ালে রাখার এক প্রচ্ছন্ন প্রয়াস সক্রিয়। সবচাইতে বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখনই, যখন দেখি অন্যেরা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যেখানে ঐ সকল ব্যক্তিত্বের জাতীয় পর্যায়ের অবদানকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়, সেক্ষেত্রে তাদের উত্তরসূরী ও ভাবশীষ্যরাও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও মৌনতার ভাব অবলম্বন করেন। [কবিলম্বে হলেও 'ইসলামি ফাউণ্ডেশনসাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা এবং "মওলানা আতহার আলী স্মৃতি সংসদের" যৌথ উদ্যোগে ৩১-৮-৮৩ ইং বাংলাদেশের সংগ্রামী আলেম মওলানা আতহার আলী (রহঃ)-এর কর্মজীবনের

উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করায় প্রতিষ্ঠান দু'টি মোবারকবাদ পাবার যোগ্য।]

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবন সকল সময় মানুষকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। যেকোনো কারণেই হোক কোনো জাতি যদি আপন ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বকীয়তা ও পূর্বসূরীদের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে জাতীয় চেতনা লোপ পেতে থাকে। সে জাতি শিকার হয়ে পড়ে স্থবিরতার। তার মধ্যে দেখা দেয় হতাশা ও হীনমন্যতা, আর এই হতাশা ও হীনমন্যতাই ঐ জাতির প্রাণশক্তিকে কুরে কুরে খেতে থাকে। অতঃপর পরমুখাপেক্ষিতা আচ্ছন্ন করে ফেলে সেই জাতি সত্তাকে, যার নির্মম পরিণতি হিসাবে একদিন সে বন্দী হয়ে পড়ে পরাধীনতার অক্টোপাশে। জাতির সেই দুঃসময়টিতে যেসব কৃতি সন্তান তাকে নেতৃত্ব দেয়ার দুর্জয় মনোবল নিয়ে এগিয়ে আসে, যাদের দ্বারা জাতি সঠিক পথের দিশা পায়, নব প্রেরণায় হয়ে ওঠে উজ্জীবিত, তাদেরই আমরা বলে থাকি জাতির পথিকৃৎ। মওলানা আতহার আলী (রহঃ) বাংলাদেশের তওহীদী জনতা ও গোটা আলেম সমাজের জন্যে তেমনি ছিলেন এক পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সংগঠক, সূফী রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক।

পূর্বাহ্নেই বলেছি যে, কোনো মহৎ ব্যক্তির জীবন থেকে যথার্থ প্রেরণা পেতে হলে প্রথমে তাঁর জীবনের সঠিক মূল্যায়ন চাই। এটা করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল কর্মময় জীবনের সূচনা ও তৎকালীন পারি-পার্শিক অবস্থা বিশেষ করে চিন্তাগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অবস্থার মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন। এদিক থেকে মওলানা আতহার আলী (রহঃ)-এর জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে আমাদেরকে চলে যেতে হবে আজ থেকে আরও পেছনে—সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বরং তারও পেছনে।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

মওলানা আতহার আলী (রহঃ) ১৮৯১ খৃঃ (মোতাঃ ১৩০৯ হিঃ) সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার থানার গোজাদিয়া গ্রামের এক ধর্মপরায়ণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ উত্তর ইরান থেকে প্রাচীন মুসলিম শাসকদের আমলে সিলেটে এসে বসবাস

করেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মুরাদাবাদের কাসেমিয়া মাদ্রাসায় ও রামপুর রাজ্যের নবাব পরিচালিত মাদ্রাসায় বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর হিন্দুস্তানের ছাহারানপুর ও পরে বিশ্ববিখ্যাত দারুলউলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর মওলানা আতহার আলী (রহঃ) উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী সংস্কারক, আধ্যাত্মিক সাধক ও হাজারের অধিক গ্রন্থ প্রণেতা মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নিকট আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং তাঁর থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মওলানা আতহার আলী সাহেব যেসব শিক্ষকের কাছে ইসলামের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের একেকজন শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে কেবল উপমহাদেশেরই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন না বরং গোটা আলমে ইসলামেও তাঁদের খ্যাতি রয়েছে। যেমন, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রমুখ। উস্তাদদের প্রতি যে তাঁর কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাঁদের পবিত্র স্মৃতিকে নিজের অন্তরে সদা জাগরুক রাখার জন্যে পুত্রের নাম আনোয়ার শাহ এবং দাদা পীর হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ) এর নামে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম 'জামেয়া-এ-এমদাদিয়া' নাম করণ থেকেই তা সহজে অনুমান করা চলে।

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কার

দেওবন্দ ও থানাভবন থেকে স্বদেশে ফিরে এসে মওলানা আতহার আলী (রহঃ) ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সিলেটের এবং কুমিল্লার একাধিক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। কুমিল্লার জামেয়া-এ-মিল্লিয়া (বর্তমানে কাসেমুল উলূম) মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। সেখান থেকে হয়বত নগর এবং পরে ১৯০৯ সালে কিশোরগঞ্জ ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হন ও একজন পীর হিসাবে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। সাথে সাথে তিনি যাবতীয় কুসংস্কার, শির্ক বেদয়াতের বিরুদ্ধেও মুসলমানদের সতর্ক করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, যুক্ত বাংলায় শ্যামা হক

মন্ত্রী সভার আমলে ১৯৪২ ইং কিশোরগঞ্জ মসজিদটির সামনে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গানবাদ্য করে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করায় এখানে এক দাঙ্গা হয়। তাতে মসজিদের মুসল্লী শহীদ হলে তখন থেকে ঐ মসজিদটি শহীদী মসজিদরূপে পরিচিত হয়। মওলানা আতহার আলী সাহেবের মাধ্যমে মসজিদটি পুনর্গঠিত ও এর আয়তন বর্ধিত হয়। কিশোরগঞ্জের ইসলামী চেতনা ও সংগ্রামী ঐতিহ্যের স্মৃতিমণ্ডিত শহীদী মসজিদকে কেন্দ্র করেই উত্তরকালে এদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক বিশেষ স্তর অতিবাহিত হবে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়কৃত মওলানা সাহেবের আকাংখিত 'জামেয়া-এ-এমদাদিয়া'—এটা যেন ইতিহাসের এক আশ্চর্য মিলন। কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদ যখন থেকে মওলানা আতহার আলী সাহেবের কর্মজীবনের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিগণিত হয় এবং তখনও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলনের কাজে বের হননি, তখন তাঁর গঠনমূলক কাজসমূহের মধ্যে একদিকে ছিল মানুষকে ইরশাদ ও নসীহতের মাধ্যমে ধর্মপরায়ণ করে তোলা, অপর দিকে স্থানে স্থানে মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। ফলে তাঁকে কেন্দ্র করে কিশোরগঞ্জ এলাকায় একটি সুন্দর ইসলামী পরিবেশ গড়ে উঠে। তাঁর খ্যাতি বাইরের অন্যান্য জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। খোদাপ্রেমিক লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসতো। সকাল ৭টা থেকে এগারটা পর্যন্ত সাক্ষাত প্রার্থীদের সাথে তিনি দ্বীন ও মারেফতের কথা আলোচনা করতেন। তাদের উদ্দেশে মূল্যবান উপদেশ দিতেন। তাঁর থেকে দ্বীন-শরীয়ত ও মারেফতের সবক নেয়ার জন্যে মানুষ ১৬/১৭ মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে আসতো। তাঁর মতো একজন বুজর্গ ব্যক্তিকে পেয়ে সংশ্লিষ্ট ও বাইরের পরিচিত এলাকার লোকজন পরম তৃপ্তি অনুভব করতে থাকে।

মওলানা আতহার সাহেব এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজের মানুষকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করতে হলে এবং সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে ইসলামী মূল্যবোধ ও এর ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সর্বত্র মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে অনেক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

রাজনৈতিক ভাবধারার উন্মেষ

মওলানা আতহার আলী সাহেবের শিক্ষা জীবন যেসব মহামণীষীর সংস্পর্শে অতিবাহিত হয়েছিল, তাঁরা যেমন ইসলামী জ্ঞানবিশেষজ্ঞে উঁচু স্তরের পণ্ডিত ও জ্ঞানসাধক ছিলেন, তেমনি বিশ্বপরিস্থিতির ব্যাপারেও ছিলেন সচেতন। বিশেষ করে পরাধীন ভারতে ইংরেজ উৎখাত আন্দোলন ও ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুমের শিক্ষক হওয়ায় তৎকালীন বৃটিশ ভারতের রাজনীতির বিষয়টি ছিল তাঁদের নখদর্পণে। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে মরহুম মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী তো অবিভক্ত ভারতের আজাদী আন্দোলনের ত্যাগী ও সংগ্রামী সিপাহ্‌সালারই ছিলেন, যাঁরা খেলাফত আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে জড়িত ছিলেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো ব্যক্তি ছিলেন যাদের সহকর্মী এবং সংগ্রামী নেতা শেখুলহিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন যাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রপথিক। ফলে শিক্ষকদের প্রভাবে মওলানা আতহার আলী সাহেবের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র জীবন থেকে রাজনৈতিক ভাবধারা ও সচেতনতা বিদ্যমান ছিল। তাঁর এই সচেতনতাই উত্তরকালে দেশ, জাতি ও ধর্মের মহান কল্যাণ সাধনে তাঁকে রাজনৈতিক অঙ্গনে টেনে আনে। অন্যথায় তিনিও তৎকালীন সমাজের এ শ্রেণীর আরও দশটি ব্যক্তির মতোই সমাজ জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনের দায়দায়িত্ব থেকে উদাসীনই থাকার কথাছিল। মূলতঃ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা নিজের শিক্ষা পরিবেশ ও তৎকালীন রাজনৈতিক পারিপার্শিকতা থেকেই উপ্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকে মুসলমান নেতারা ক্রমশঃ কংগ্রেস ত্যাগ এবং মুসলিম লীগে যোগদান শুরু করেছিলেন। মওলানা মুহাম্মদ আলীরও ইন্তেকাল হয়। অতঃপর ভারতীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সমাসীন হন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। গান্ধী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে পড়েন। বাংলায় স্বরাজ আন্দোলনের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে ফাটল বৃদ্ধি পায়। — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর সহযোগী সুভাষ-

চন্দ্র বসু জাপানে চলে যান। হিন্দু-মুসলিম ফাটল জোড়া দেওয়ার জন্য তখন প্রতিনিধিত্বকারী কোনো শক্তিশালী হিন্দু নেতা রাজনৈতিক দৃশ্যপটে কর্মরত ছিলেন না। মওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসেই থেকে যান। মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী অখণ্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে ওলামা -এ-হিন্দের সভাপতি থাকেন। ঐ সময় মওলানা আতহার আলী সাহেবের পীর মুরশিদ হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভী ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সমর্থন করেন।

রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ

যাহোক ইতিমধ্যে বৃটিশ শাসিত হিমালয়ান উপ-মহাদেশে যখন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দেখা দেয় এবং মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসে, তখনই মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, খানকার এই সূফী সাধক নিজের পূর্বসূরীদের অনুকরণে জাতি, ধর্ম ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সিলেট ও সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানভুক্তির প্রশ্নে যখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তিনি উপমহাদেশ খ্যাত অন্যান্য ওলামা-এ-কেরামের সাথে সিলেট রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠানে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। সিলেটে জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দের প্রভাব বেশী থাকায়, সে এলাকাকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি করণে কি বেগ পেতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। মওলানা আতহার আলী সাহেবকে সেদিন এ চিন্তা অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল যে, তাঁর জন্মভূমি ও শাহজালালের পুণ্যভূমি সিলেট জেলা কারও ভুলের কারণে না জানি চিরদিনের জন্যে হিন্দু ভারতের দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এজন্যে তিনি উক্ত গণভোটের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং উপমহাদেশের পাকিস্তান সমর্থক অন্যান্য খ্যাতনামা আলেমদেরকেও সিলেটে নিয়ে সভা-সমিতি করিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মওলানা সহুল উসমানীর নাম উল্লেখযোগ্য। মওলানা সহুল উসমানী সিলেট থেকে গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচিত ছিলেন। '৪৭-এর আজাদী আন্দোলনে বাংলাদেশের যেসব ওলামা ও পীর-মাশায়েখ অক্লান্ত পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল

কাফী, মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, শর্ষিনার পীর মওলানা নেসারুদ্দীন সাহেব, ফুরফুরার পীর সাহেব, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব, মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ সাহেব প্রমুখের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য।

ওলামা জাগরণ ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই উপমহাদেশের আলেমদের রাজনৈতিক তৎপরতার গৌরবময় অতীত রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের রয়েছে অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য। কিন্তু এসত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের শেষমধ্য পর্যায়ে এমন কি শেষ পর্যায়েও বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে আলেমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর থেকেই রাজনীতির উত্তাপ থেকে দূরে থাকার এই মনোভাবের সূত্রপাত হয়। অতঃপর খেলাফত আন্দোলন ও ১৯৪৫ সালে কলকাতা মুহম্মদ আলী পার্কে মওলানা আযাদ সোবহানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে যখন ওলামায়ে হিন্দের পাল্টা নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম গঠিত হওয়া, মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীকে ঐ জমিয়তের সভাপতি করা, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেমদের ভূমিকা থাকা—তাঁদের এতসব রাজনৈতিক তৎপরতা থাকলেও বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে আলেম সমাজের মধ্যে তখনও রাজনৈতিক স্থবিরতা ছিল অতি মারাত্মক ধরনের। রাজনীতিকে অনেকেই মনে করতেন 'তাকওয়ার খেলাফ।' পার্লামেণ্টের সাথে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার হুজুরদের আবার কি সম্পর্ক এ রকম একটি ভাব ছিল সর্বত্রই বিরাজমান। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিকরা এ মনোভাবটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে এবং এখনও চাচ্ছে। কোনো কোনো আলেমের নিকট ইসলামী রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি উভয়ই সমান ছিল। রাজনীতি মাত্রেই তাদের কাছে 'দুনিয়াদারী' বলে বিবেচিত হতো। অবশ্য রাজনৈতিক ময়দানে নোংরামি ও অসাধুতার কারণেই আলেমদের মধ্যে এভাব দেখা দিয়েছিল, যদিও তাঁরা এটা ভুলে গিয়েছিলেন যে, রাজনীতির যাবতীয় নোংরামি ও অসাধুতা দূরীকরণের দ্বীনী-দায়িত্বও তাঁদের উপরই অর্পিত। কেননা, জনজীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক সকল

কিছু সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মহানবী (সাঃ) এজন্যেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে বিভ্রান্ত, অসৎ, অসাধু নেতৃত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। মরহুম মওলানা আতহার আলী নবী-জীবনের সেই প্রেরণায়ই উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলে তিনি পরবর্তী কালে তৎকালীন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজনীতির ব্যাপারে আলেম সমাজের এই সার্বিক অনীহার পটভূমিতে তাঁর সাথে সেদিন যারা সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর সহকর্মী ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মাছিহাতার পীর সাইয়েদ মওলানা মোছলেহুদ্দীন সাহেব, হযরত নগর আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক মোহাদ্দেস অনলবর্ষী বক্তা মওলানা আশরাফ আলী সাহেব ও মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মও-লানা আতহার আলী মরহুমের পূর্বে শর্ষিনার পীর মওলানা নেসারুদ্দীন সাহেব জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তাঁর পর মওলানা আতহার আলী সাহেবই জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই আলেমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে এদেশের কওমী ও আলিয়া পদ্ধতির মাদ্রাসাসমূহের লাখ লাখ ছাত্রের মধ্যেও তাঁর এ আন্দোলন বিরাট দোলা দেয় এবং নবচেতনার সৃষ্টি করে। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে নেমে মওলানা আতহার আলী (রহঃ)-কে সেদিন সাধারণ আলেমদেরকে বুঝাতে হয়েছে এ আন্দোলনের গুরুত্ব, ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী শাসনতন্ত্র। এ উদ্দেশ্যে তিনি "ইসলামী শাসন কেন চাই" সর্বপ্রথম এ নামে একখানা ছোট্ট বই লিখেন। সেদিন তাঁর এই বইতে উদ্ধৃত করা ৩টি আয়াত ইসলামী রাজনীতি আন্দোলনের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান ও আলেমদের চিন্তার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। ইতিপূর্বে কত শত বার এসব আয়াত সকলের দ্বারা পঠিত হলেও সেদিন এগুলো এক নতুন ব্যঞ্জনা ও নতুন আবেদন নিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছিল। আয়াত তিনটি ছিল এই—(১) ওয়া মান্ লামইয়াহ্‌কুম্ বিমা অনযালাল্লাহু ফা-উলাইকা হুমুল ফাসেকূন। (যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক জনগণকে শাসন করেনা তারা ফাসেক। (২) —ফাউলাইকা হুমুযযালেমূন। (—তারা যালিম)

(৩)। —ফাউলাইকা হুমুল কাফেরূন। (—তারা কাফের)। রাজনৈতিক ঐ প্রেক্ষাপটে এ সাথে আরেকটি হাদীসের উদ্ধৃতি এ দেশের গোটা আলেম সমাজকে আরও সংগ্রামমুখর করে তুলেছিল। হাদীসটি হলো —আফযালুল জিহাদে কালিমাতু হাক্কিন ইন্‌দা সুলতানিন্ জায়ের ("অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় কথা বলাই উত্তম জেহাদ।") পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর লিখিত আরও ২ খানা বই "নেজামে ইসলামের আলোতে" এবং "ইসলামী জীবন দর্শন" এ তিনখানা বই ইসলামী রাজনীতির সূচনা পর্বের জন্যে খুবই উল্লে-খযোগ্য। অবশ্য জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তা-নায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) তারও বহু পূর্বে ইসলামী রাজনীতির উপর উর্দু ভাষায় অনেক জ্ঞানগর্ভ বই লিখেছিলেন। অতঃপর জামায়াতের পক্ষ থেকেও ঐ সকল বই একটার পর একটা বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকলো। অপরদিকে ১৯৫৩ সালে জামায়াতের কাজেরও এখানে সূচনা হলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত নেতা চৌধুরী আলী আহমদ খানের নেতৃত্বে মওলানা আবদুর রহীম মরহুম আবদুল খালেক ও অধ্যাপক গোলাম আযম প্রমুখের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ক্রমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলল আর সাথে সাথে ইসলামের সাথে রাজ-নীতির সম্পর্কের প্রশ্নে সৃষ্ট বিভ্রান্তিও ধীরে ধীরে দূর হতে লাগলো। বিশেষ করে জামায়াতের বক্তব্য আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তায় ইসলামের ব্যাপারে নতুন আগ্রহের সৃষ্টি করলো। ঐ সময় শর্ষিনার বর্তমান পীর সাহেবও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। ইসলামী রাজনীতিতে সিলসিলাভুক্ত লোকদের অংশগ্রহণে সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী পীর মোহসেনুদ্দীন সাহেবও বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

ওলামা ঐক্য সৃষ্টিতে মওলানা আতহার (রহঃ)

যাবতীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে ঐক্য-বদ্ধভাবে কাজ করার উদার মানসিকতার অধিকারী মওলানা আতহার আলী সাহেবের আন্দোলন আজকের বহুধাবিভক্ত আলেমদেরকে সেদিন এক কাতারে আনতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে অনুষ্ঠিত বিরাট বিরাট সভা-সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণসমূহের মাধ্যমে তিনি ও

তাঁর সহকর্মীরা যদি এদেশের আলেম সমাজ ও সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন না করতেন, তাহলে দেশের পার্লামেণ্টের সাথে আলেমদের কি সম্পর্ক একথা বুঝাতে আরও দীর্ঘদিন সময় লাগতো বৈ কি। ছোট-খাটো ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলেম সমাজে মতবিরোধ থাকলেও সেদিন গোটা বাংলার আলেম সমাজ মওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকারের যাবতীয় অনৈসলামিক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এ দেশের এমন কোনো জেলা, মহকুমা শহর ছিল না, যেগুলোতে মওলানা আতহার আলী সাহেব ঝটিকা সফর এবং সভা কনফারেন্স করেননি। তিনি দেশের সকল মত ও পথের বড় বড় মাদ্রাসা সমূহে গিয়ে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার এবং ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। আইয়ুব শাসন আমলে ইসলামী ও অন্যান্য দাবীদাওয়া অনাদায় থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ বিশেষ উদ্দেশ্যে আইয়ুবের অনুসৃত নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। তা না করলে ওলামা-মাশায়েখের সে ঐক্য আজও হয়তো বহাল থাকত।

দূরদর্শী ও নির্ভীক সংগ্রামী নেতা মওলানা আতাহার আলী সাহেব সেদিন সাধারণভাবে আলেম সমাজকে রাজনীতিতে নামাবার ব্যাপারে কি না পরিশ্রম করেছিলেন।

'৫০-এর দশকের শুরুতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ওলামা কনভেনশনে তাঁর প্রদত্ত লিখিত ভাষণ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ঐভাষণের মধ্যে তিনি সাধারণভাবে আলেম সমাজকে ইসলামী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছিলেন—

"যে সমস্ত মহানুভব বন্ধু মাদরাসা, মসজিদ এবং খানকাসমূহের আবেষ্টনীতে থাকিয়া ইসলামের মহান খেদমত আনজাম দিতেছেন, জাতির এ দুর্দিনে কওম ও মিল্লাতের এজতেমায়ী খেদমত ও সংঘবদ্ধ সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণ করা তাঁহাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত বিরোধী শক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্রের পথ রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের প্রচেষ্টা সফল-

কাম হইলে সর্বপ্রথম তাহারা ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই ধ্বংস করিবে এবং বাছিয়া বাছিয়া তাহারা ইসলামের পতাকাধারীদেরকেই খতম করিবে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা, মসজিদ ও মাদরাসার সহিত যদি আপনাদের দিলী মহব্বত থাকে, প্রাণের আকর্ষণ থাকে, ইহাদের ভবিষ্যত যদি আপনারা উজ্জ্বল করিতে চান, প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, তবে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করাইবার সংগ্রামে পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে এই দাবীকে গণদাবীতে পরিণত করিতে হইবে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে এমন গণ আওয়াজ উঠাইতে হইবে, যাহার সামনে সকল বিরোধী আওয়াজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া যায় এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা সাহস হারাইয়া ফেলে।"

মওলানার এ আহবানে কেবল আলেম সমাজে নয় ইসলাম দরদী বহু আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও সাড়া জেগেছিল। ইসলামের সংগ্রামী মুজাহিদ খ্যাতনামা পার্লামেণ্টারিয়ান মরহুম এডভোকেট মৌলভী ফরিদ আহ্মদ-সহ অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি

১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ এলাকা ও বর্তমান পাকিস্তান নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হলো। পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী করাচীতে জিন্নাহ্ সাহেবের অভিপ্রায়ে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করেন মওলানা শাব্বির আহ্মদ উসমানী আর সাবেক পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ঐ পতাকা উত্তোলন করেন মওলানা থানভীর খলীফা ও ভাগ্নে মওলানা জাফর আহমদ উসমানী। পাকিস্তানে মোহাজের সমস্যার সমাধান ও দেশ গড়ার প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে না হতেই '৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জিন্নাহ সাহেবের ইন্তেকাল হয়। জানাযার নামাজে ইমামতি করেন মওলানা শাব্বীর আহ-মদ উসমানী। অতঃপর তিনি নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসাবে পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র নীতি প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ দাবী তোলেন। কিন্তু তখনই মুসলিম লীগ নেতৃত্ব গড়িমসির

কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। অবশেষে গণপরিষদে মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর ক্ষুরধার যুক্তি ও জনমতের চাপে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাব পাশ হয়। তার কিছুকাল পরেই মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ইন্তেকাল করেন। তারপর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দেশের ইসলামী জনতা যা প্রত্যাখ্যান করেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি ছিলেন তখনও শর্ষিনার পীর হযরত মওলানা মরহুম নেসারুদ্দীন সাহেব। তিনি বার্ধক্য জনিত অসুস্থতার দরুন কর্মক্ষতা হারিয়ে ফেলায় তখন জমিয়তের কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মওলানা আতহার আলী সাহেব সে আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনিই জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন।

নেজামে ইসলামের শ্লোগান

তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার এভাবে নিজেদের পূর্বেকার সকল প্রতিশ্রুতিকে বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গড়িমসি শুরু করে দেবে, এটা সকলের কাছে ছিল এক বিস্ময় ও ক্ষোভের ব্যাপার। পাকিস্তানে ইসলামের উন্নতি না ঘটলে, ইসলামী আইন শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হলে, এখানে অন্যায় অবিচার, দুর্নীতি, বৈষম্য ও ইসলাম গর্হিত কাজের দৌরাত্ম্য চলবে আর পরিণামে বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তান ভয়াবহ অবস্থার শিকার হবে, এটা মওলানা আতহার আলী সাহেব ও তাঁর সহকর্মী অন্যান্য ইসলামী নেতৃত্ব ভালো করেই অনুধাবন করেছিলেন। এ জন্যে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র ও ইসলামী হুকুমতের দাবীতে বাংলাদেশের সর্বত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে একেক জায়গায় দু'তিনদিন ব্যাপী বিরাট বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তিনি তাঁর আন্দোলনের শ্লোগান হিসাবে বেছে নেন "নেজামে ইসলাম দিতে হবে" "আমরা চাই নেজামে ইসলাম।"

"নেজামে ইসলাম পার্টি" গঠিত হবার পূর্বে দলমত নির্বিশেষে ইসলামী শাসনকামী সকলে এ শ্লোগান বিশিষ্ট ব্যাজ পকেটে ধারণ করতেন। বিশেষ করে

ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে যেখানে সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো সেখানে প্রায় সকলের বুকেই এ ব্যাজটি শোভা পেতো।

সিলেটে অনুষ্ঠিত ওলামা কনফারেন্স

করাচীর ঐতিহাসিক ওলামা সম্মেলনের পূর্বে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে জমিয়তে ওলাম-এ-ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিলেটে। ঐ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আল্লামা সুলাইমান নদভী। তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন মওলানা এহ্তেশামুল হক থানভী, আল্লামা রাগেব আহসান, মরহুম মওলানা ডক্টর সানাউল্লাহ, মরহুম মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, ডক্টর মোয়াজ্জম হোসেন প্রমুখ বিশিষ্ট ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ। মওলানা আতহার আলী সাহেব কয়েক মাস সিলেটে অবস্থান করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এ বিরাট কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলেন। ঐ কনফারেন্সের কাজকে সুষ্ঠু ভাবে আনজাম দেবার জন্যে সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম মজদ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীকে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল। ঐ কনফারেন্সে পাকিস্তানের জন্যে প্রথম একটি ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া মূলনীতি দাঁড় করানো হয়। মরহুম মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করেন। পরে মওলানা এহ্তেশামুল হক থানভীর উদ্যোগে এবং আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর সভাপতিত্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ওলামা কনফারেন্সে ইসলামী শাসনতন্ত্রের যে ঐতিহাসিক ২২ দফা মূলনীতি সর্বসম্মতিক্রমে প্রণিত হয়, সিলেটে অনুষ্ঠিত বিশেষ ওলামা কনফারেন্সে প্রণিত মোসাবিদা তাতে অনেক সহায়ক হয়। ১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গোটা পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেষে সকল মত ও পথের ওলামা-এ-কেরাম ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি তৈরির প্রশ্নে ঐক্যের এক অভূতপূর্ব নজির দেখিয়েছিলেন। গোটা মুসলিম বিশ্বে ঔ সম্মেলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই সম্মেলনে শিয়া, সুন্নী, আহলে হাদীস, দেওবন্দী, রামপুরী, ফুরফুরী, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি দলীয় দৃষ্টিকোণের কোনো বালাই ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মওলানা সাইয়েদ

আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতির চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতিতে সে দিন বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। করাচীর ওলামা সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণ সহ জমিয়ত নেতা মওলানা আতহার আলী সাহেব বিশেষ মর্যাদায় যোগদান করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলতে হয় যে, সকল ছোটখাটো মতভেদের উর্ধে উঠে করাচী কনফারেন্সের সর্বদলীয় ওলামার ঐতিহাসিক ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আলেমদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, এটি যেমন সকল সময়ের জন্যে মুসলমানদের ঐক্যের একটি দিকদর্শন তেমনি ঐক্যের মস্ত বড় এক ভিত্তি। সেদিন ওলামা-এ-কেরাম যেই পরমতসহিষ্ণুতার প্রমাণ এবং 'এ'তেসাম বিহাব্লিল্লাহ্' ও "বুনইয়ান-এ-মারসূস"-এর পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ বাংলাদেশে নানা কারণে তা ব্যাহত। এটা কি তৎকালীন বিরাট বিরাট ওলামা ব্যাক্তিত্বের অনুপস্থিতির কারণে, না 'এ'তেসাম বিহাব্লিল্লাহ্'র আদর্শ থেকে আমাদের দুর্ভাগ্যজনক বিচ্যুতি বা মনের ক্ষুদ্রতার ফল? মওলানা আতহার আলী সাহেব, মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, শর্ষিনার পীর সাহেব, ফরিদপুরস্থ বাহাদুরপুরের পীর সাহেব, ফুরফুরার পীর সাহেব, মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব, মওলানা উসমানী ও মওলানা মওদূদী সাহেবদের আমলে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী আন্দোলন সম্ভব হয়ে থাকে, আজ তা হতে পারবেনা কেন? এক কথায় নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে হেযবুল্লাহ্, আহ্লে হাদিস, এমন কি শিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ সহ যদি ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক তখন ঐক্যবদ্ধ হতে পেরে থাকেন, সে ক্ষেত্রে আজ ওলামা-এ-কেরামের মধ্যে বহুধাবিভক্তি কেন? শাহজালাল, হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও খান জাহান আলীর বাংলাদেশ ও তাঁদের অক্লান্ত সংগ্রাম সাধনার ফলশ্রুতি আজকের ১০ কোটি বাংলাদেশী মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে এখানে শোষনহীন ইসলামী জনকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সকলের একযোগে কাজ করা উচিত নয় কি? বলাবাহুল্য, সাধারণ খুঁটিনাটি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলেম সমাজের এই অনৈক্যের ফলে যদি মরহুম মওলানা আতহার আলী সহ অতীতের সে সকল বুজর্গানে দীনের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হয়, তা হলে সে জন্যে

সামগ্রিকভাবে নেতৃস্থানীয় সকলকে যেমন একদিন ইতিহাস ও আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদেহী করতে হবে, তেমনি অতীতের মহৎ ও বুজর্গ ওলামা পীর-মাশায়েখের আত্মার অসন্তুষ্টিরও শিকার হতে হবে সকলকে। বিশেষ করে ঐ সকল যোগ্য তরুণ কর্মঠ আলেম ও ইসলামের অনুসারীদেরকে এ প্রশ্নের অধিক সন্মুখীন হতে হবে, যারা ইচ্ছা করলে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল মত ও পথের কর্মকর্তা পর্যায়ের ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামপন্থীদের এক করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে সক্ষম।

পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক কনফারেন্স

করাচী সম্মেলনের সর্বদলীয় ওলামার ২২ দফা ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লেয়াকত আলী খানের হাতে অর্পণ করা হয়। সারা পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবীকে আরোও জোরদার করার জন্যে দেশের উভয় অঞ্চলে বড় বড় সভা-সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন মন্ত্রী সভার আমলে দু'দিন ব্যাপী ঢাকায় মওলানা আতহার, মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ প্রমুখ ওলামা-এ-কেরামের উদ্যোগে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আতহার আলী সাহেবের আহবানে পালিত হয় নেজামে ইসলাম দিবস।

রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী

মওলানা আতহার আলী সাহেব আধুনিক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া না শিখেও আধুনিক রাজনীতি ও সমাজ দর্শন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি নিজে বাংলা, উর্দু, আরবীতে বক্তৃতা দিলেও মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব ছিল তাঁর কাছে অনেক। তিনি মনে করতেন, বিষয় ও বস্তুরহস্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ ও অপরকে যথার্থ জ্ঞান দিতে হলে মাতৃভাষাই হচ্ছে তার প্রধান মাধ্যম। তিনি বলতেন, পবিত্র কোরআনের সূরা ইবরাহীমের একটি আয়াত থেকেও মাতৃভাষার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেখানে বলা হয়েছে, "আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছি, যেন সে এর মাধ্যমে আমার বাণী মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে

করতে পারে।" বস্তুত একারণেই মওলানা আতহার আলী সাহেব বাংলা ভাষাকে 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়েছিলেন। তাঁর জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম বাংলাকেই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বংকৃতি দেয়।

"নেজামে ইসলাম পার্টি" গঠন ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৭ বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। দেশে কোনো শাসনতন্ত্র নেই। অপর দিকে অন্যান্য সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নিজেদের অনেকটা পাকিস্তানের কায়েমী ও স্থায়ী শাসক বলে ভাবতে শুরু করেছেন। চতুর্দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং তাদের বিভিন্ন জুলুম-নিপীড়নের অবসানের জন্যে দাবী উঠেছে। বহু আন্দোলনের মুখে অতঃপর নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সেই সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম নির্বাচন পরিচালনার জন্যে পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করেন। নিজেদের দাবী ও শ্লোগানের ভিত্তিতেই তার নাম রাখা হয় "নেজামে ইসলাম পার্টি।" মওলানা আতহার সাহেবের নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম আন্দোলন এত খ্যাতি অর্জন করেছিল যে, আন্দোলনের মূল দল জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের নাম তখন গৌণ হয়ে পড়ে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে তখন শেরে বাংলা মৌলভী এ কে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টি, মওলানা ভাসানী সাহেবের আওয়ামী মুসলিম লীগ ও মওলানা আতহার আলী সাহেবের নেজামে ইসলাম পার্টিই বিরোধী দলীয় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল ছিল। বিরোধী দল সমূহের যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রশ্ন দেখা দিলে মওলানা আতহার আলী সাহেব তখন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার শর্তে এতে যোগ দেন। আওয়ামী মুসলিম লীগও এ ঐক্যে শরীক হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে "হক-আতহার-ভাসানী যুক্ত ফ্রণ্টের" হাতে মুসলিম লীগ নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। খেলাফতে রব্বানী পার্টিও যুক্ত ফ্রণ্টের অন্ন দল ছিল। '৫৪ সালের নির্বাচনে মওলানা আতহার আলী সাহেব কিশোর গঞ্জ থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগই সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। যুক্তফ্রণ্ট পার্লামেণ্টারী পার্টিতে নেজামে ইসলামের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে তা ছিল ৪। তা সত্বেও নেজামে ইসলাম পার্টি কেন্দ্রে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনায় এবং প্রদেশিক পরিষদে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের নাম করণ করা হয় "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান।"

সৌদী আরবের তৎকালীন বাদশাহ ঐ সময় পাকিস্তান সফরে এলে তিনিও পাকিস্তানে ইসলামী নেজাম প্রবর্তণের সুপারিশ করেন এবং নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মওলানা আতহার আলী সাহেবের অভিনন্দন পত্রের জবাবে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মওলানা আতহার আলী সাহেব এক নির্ভীক রাজনীতিক ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা যুক্তফ্রণ্ট নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কলকাতা সফরে গেলে তাঁর এক বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে দেন। পূর্ব পাকিস্তানে ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্ণর করে পাঠানো হয় এবং ৯২ ক-ধারা জারি করে শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে কারারুদ্ধ করা হয়। মওলানা আতহার সাহেবই তখন সর্বপ্রথম ৯২ ক - ধারার এবং শেরে বাংলার গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল পদে ছিলেন গোলাম মুহাম্মদ। মওলানা আতহার সাহেব পল্টন ময়দানের এক প্রকাশ্য সভায় দু'মাসের মধ্যে প্রদেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করার দাবী জানিয়ে বক্তৃতা দেন। ৫৯ দিন অতিবাহিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি দেয়া হয়। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রী সভায় নেজামে ইসলাম পার্টির কুমিল্লার মৌলভী আশরাফুদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রী এবং এডভোকেট নাসীরুদ্দীন আইন মন্ত্রী ছিলেন। নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন মৌলভী এডভোকেট ফরিদ আহমদ। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রণ্ট থেকে সরে দাঁড়ায় এবং মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের একটি অংশ নিয়ে ন্যাপ গঠন করেন।

পার্লামেন্টে মওলানা আতহার ও সংখ্যা লঘু সদস্য

মওলানা আতহার সাহেব একজন নিঃস্বার্থ রাজনীতিক ও সমাজ সেবী হিসাবে তাঁর বক্তব্যের একটি আলাদা প্রভাব ছিল। এ জন্যে দেখা যায়, পরিষদে এই সূফী সাধক রাজনীতিকের প্রভাব শুধু মুসলিম সদস্যদের উপরই পড়তোনা অমুসলিম সদস্যগণও তাঁর বক্তব্যে প্রভাবিত হতেন। ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে মওলানা আতহার আলী সাহেব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে একবার মদ, জুয়া ও বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্যে প্রস্তাব এনেছিলেন। শ্রী প্রভাস চন্দ্র লাহেড়ীর নেতৃত্ব একদল হিন্দু এম পি তখন ঐ প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মওলানা সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

মওলানা আতহার সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শীতা ও কর্মতৎপরতা যে কত আকর্ষণীয় এবং সফল ছিল, তা এথেকেই অনুমান করা যায় যে, এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ পাকিস্তানের উজির আজম চৌধুরী মুহাম্মদ আলী তাঁর নিজস্ব পার্টি "তাহরীক-এ-ইসতেহ্কামে পাকিস্তান" দলটি ভেঙ্গে দিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান করেছিলেন।

এছাড়াও আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত বহু আইনজীবী, শিক্ষাবিদ বুদ্ধি জীবি, লেখক, সাংবাদিক তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর প্রধান মন্ত্রীত্বের সময় ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তার দ্বারাই পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষিত হয়। ঐ শাসনতন্ত্রে দেশে কোরআন সন্নাহ্র ভিত্তিতে ইসলামী আইন চালু করার সংবিধানিক প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়। ঐ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে শরীক ছিল যুক্তফ্রণ্টের কোয়ালিশন সরকার, যার প্রধান অঙ্গদল ছিল নেজামে ইসলাম পার্টি এবং শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি। বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তখন জতীয়-পরিষদে ইসলামপন্থী সদস্যদের নেতৃত্ব দিতেন মওলানা আতাহার আলী সাহেব।

আইয়ুবী মার্শাল ল' ও মওলানা আতহার

সাবেক পূর্বপাকিস্তানে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী সভার স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯৫৮ সালে যখন আয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশে মার্শাল ল' জারী করেন এবং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন, তখন মওলানা আতহার সাহেব কিশোরগঞ্জে এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামেয়া-এ-এমদাদিয়ার উন্নয়ন এবং মুরিদানের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন। এরি মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর দ্বীনী দায়িত্ব পালন করেন ও শিক্ষা সংস্কারের কাজ এগিয়ে নেন।

৬২ সালে পুনঃরায় রাজনীতিতে আগমন

আইয়ুব খান সরকার ১৯৬২ সালে সারা দেশের রাজনৈতিক দল-সমূহের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিলে মওলানা আতহার আলী সাহেব নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে পার্টির পুনঃর্জীবনের কথা ঘোষণা করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারনে দলের তদানীন্তন প্রাদেশিক সভাপতির পদে তিনি ইস্তেফা দেন। প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে প্রথমে মওলানা সৈয়দ মোছলেহ্ উদ্দিন সাহেব ও পরবর্তী কালে মওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর সংগ্রামী নেতা মওলানা আতহার সাহেব সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে চলে যান।

আইয়ুবের পরিবার আইনের বিরোধীতা

বার্ধক্য জনিত কারণে এই সূফী রাজনীতিক দলীয় নেতৃত্ব থেকে ইস্তেফা দিলেও কোনো জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দেখা দিলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না বরং শারীরিক দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে মানসিক শক্তির উপর ভর করে সংগ্রামী চেতনা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আমরা তাঁর এ অবস্থা যেমন দেখেছি আইয়ুবের শাসন আমলে ইসলাম পরিপন্থী পারিবারিক আইন বিরোধী আন্দোলনের সময়, তেমনি দেখেছি ভোটাধিকার পূনঃরুদ্ধার আন্দোলনের সময় ৬৫ সালের নির্বাচনের সময়। অনুরূপভাবে '৬৯ সালেও যখন আলেমদের বহু পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বরূপ রচিত মন্দের ভাল

'৫৬ সালের শাসনতন্ত্রটি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা বাতিল করার দাবী উত্থিত হয় তাঁর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছি।

আইয়ুব খান যখন ইসলাম পরিপন্থী পরিবার আইন জারি করেন, তখন আলেম সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রায় পরপরই কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ফজলুর রহমান এবং 'মুনকিরীনে হাদীস'-এর সহায়তায় আইয়ুব খান ইসলামকে আধুনিকী করণের কাজে হাত দেন, তখন মওলানা সাহেব তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও তথাকথিত পরিবার আইন এবং ডক্টর ফজলুর রহমান ও 'মুনকিরীনে হাদীসে'র বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রচণ্ড আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। ঐ সময় সারাদেশে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন না থাকলেও ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে বড় বড় সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে আইয়ুবের তীব্র সমালোচনা হতে থাকে। ঐ সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য ওলামা, মওলানা আতহার আলী সাহেব ও তাঁর দল নিয়ে আইয়ুবের অনৈসলামিক পদক্ষেপ ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে তুলেছিলেন, একদিন তারই পটভূমিতে এদেশের গণতান্ত্রিক ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। জামায়াতে ইসলামী, মওলানা আতহার আলী সাহেবের নেজাম ইসলাম পার্টি, জমিয়তে ওলামা ও অন্যান্য ইসলাম পন্থী দল ও ব্যক্তি যদি সে দিন এ আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত গড়েনা তুলতেন, জাতীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সে দিন পি ডি এম গঠন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ ছিল। বলাবাহুল্য, পি, ডি, এম-এর ঐ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পূর্ণ ইসলামপন্থী বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের অধিক প্রচেষ্টার দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকার তথা হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আইয়ুব খানের বিরোধিতা করেন। নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হবার পর মওলানা আতহার সাহেবকে প্রথম কারারুদ্ধ করা হয়। অতঃপর

'৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। কারামুক্তির পর তিনি ওয়াজ-নসীহত এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বীনি প্রশিক্ষণ দান ও কিশোরগঞ্জ জামেয়া-এ-এমদাদিয়ার উন্নয়ন কর্মেই অধিক মনোনিবেশ করেন। তখন তিনি জামেয়ার প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে সময়োপযোগী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রসারে নিয়োজিত হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে মওলানা সাহেব পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরি ও দেশকে ইসলামী করণের একটি প্রাথমিক সোপান বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ঐ শাসনতন্ত্র অনুসারে কোরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী আইন প্রণয়ন যদি নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং প্রচলিত আইনসমূহ শরীয়ত সম্মত করে ফেলা হয়, তাহলে দেশে ধীরে ধীরে সামাজিক ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবার পথ উন্মুক্ত হবে। এজন্যেই দেখা যায়, ১৯৬৯ সালে ইয়াহ্ইয়ার শাসনামলে যখন '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তিরোহিত হতে থাকে, তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি শারীরিক ভাবে রাজনীতি করার ক্ষমতা অনেকটা হারিয়ে ফেল্লেও রাজনৈতিক সফর শুরু করেছিলেন। পি ডি পি-তে যোগদানে অনিচ্ছুক পাকিস্তান জমিয়তে ওয়ামা-এ-ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি তাঁকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মনোনীত করে। যদিও অনেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি তাকিয়ে পুনঃরায় তাঁর এ কাজে আসাকে সময়োপযোগী মনে করেন নি। আসলে ইসলামী প্রেরণায় উজ্জীবিত লোকেরা ইসলামের সামান্যতম ক্ষতি দেখলেও বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনিও ছিলেন তেমনি। ঐ সময় শুধু '৫৬-এর শাসনতন্ত্রের বাতিলের প্রশ্নই তাঁকে বিচলিত করেনি এখানে অন্যান্য কারণও ছিল। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের শেষদিকে এক শ্রেণীর লোক '৫৬-এর শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের সাথে সাথে গণআন্দোলনের সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রের দাবী এবং ইসলামের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে আওয়াজ তুলেছিল। তারা বলতো, "ধর্মকে শিকায় তুলে রাখো, সমাজ জীবনে এর কোনো স্থান নেই।" এ শ্লোগানের বিরুদ্ধে আলেম সমাজকে সচেতন করার ঈমানী দায়িত্ব পালন করাকেও মওলানা সাহেব জরুরী

মনে করেছেন। তাই শারীরিক অক্ষমতাকেও তিনি উপেক্ষা করে একাজে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন।

এক কথায়, ৪৭-এর স্বাধীনতা অর্জন, ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা, দেশে ইসলামী আইন চালু। আইয়ুব শাসনামলে হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ পনঃর্ব-হালের সংগ্রাম সহ পূর্বাপর জাতীয় প্রতিটি সংগ্রামে তিনি জড়িত ছিলেন। আইয়ুব শাসনের পূর্বে তিনি যুক্ত-নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচনের প্রশ্নেও তাঁর সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং যুক্ত নির্বাচনের কুফল জন সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশকে একটি শোষণহীন জনকল্যাণমূলক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল মওলানা আতহার আলী সাহেবের একমাত্র লক্ষ্য।

একটি মহান পদক্ষেপঃ জামেয়া-এ-এমদাদিয়া

একথা না বললেও চলে যে, স্বাধীনতার আগপর উভয় অবস্থায় আমাদের সমাজে যত ইসলাম বিরোধী তৎপরতা এবং ইসলামের প্রতি অনীহা এমনকি জাতীয় চারিত্রিক অধঃপতন সকল কিছুর মূল কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়, ফলে এদেশের মুসলমান প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন নিজেদের সন্তানকে পড়তে দিয়ে পূর্ণ সান্ত্বনা পাননা, তেমনি আধুনিক তথা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তান দিয়েও তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। এ দেশের কোনো মানুষ এটা চায় না যে, তার সন্তান উচ্চ আধুনিক শিক্ষা লাভ এবং বৈষয়িক সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়ে জীবনকে সুন্দর করতে গিয়ে ধর্মকে বিসর্জন দিক। আবার এটাও তারা চায় না যে, তাদের সন্তান মস্ত বড় আলেম হয়ে পরমুখাপেক্ষী হোক, কাঙ্গালের মতো জীবন যাপন করুক। বরং তারা একই সাথে নিজেদের সন্তানকে ধার্মিক, সৎ ও সুন্দর জীবন-উপকরণের অধিকারী দেখতে চায়। দেখতে চায়, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ সরকার বিদায় নেয়ার পর দেশবাসীর ঐ মহান আশা-আকাঙ্খার প্রতি কোনো সরকারই গভীর ভাবে মনযোগ দেননি এবং দেশের জন্যে কল্যাণকর একটি

শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেননি। সকলে বিদেশী চশমা দিয়েই এ দেশবাসীকে দেখে আসছে। আলিয়া পদ্ধতির শিক্ষায় এ প্রয়াস চল্লেও সেখানে নানা কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাণসত্তার অনুপস্থিতির অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়েও কোনো মহানুভব ব্যক্তি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি তখনও ভ্রুক্ষেপ করেননি। কিন্তু একমাত্র মওলানা আতহার আলী সাহেব সর্বপ্রথম এব্যাপারে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে জাতির এহেন জরুরী কাজ অতি সহজে করা যেতো। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে মাওলানা অতহার আলী সাহেব নিজেই বেসরকারী পর্যায়ে এ দেশবাসীর চির আকাঙ্খিত সেই মহান শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া পত্তনে এগিয়ে আসেন। তিনি ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে কিশোরগঞ্জে "জামেয়া-এ-এমাদাদিয়া" নামে নতুন শিক্ষা নীতিতে একটি প্রতিষ্ঠান করেন। এর মধ্য দিয়ে দেশবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বেসরকারী পর্যায়ে এ শিক্ষানীতির জনপ্রিয়তা সৃষ্টির দ্বারা পরবর্তীকালে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ ছাঁচে গড়ে তোলা এবং আমাদের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণকারী যোগ্য নাগরিক ও সমাজ পরিচালক সৃষ্টি করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শিক্ষিত বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরনির্ভর হলে ইসলামের যথার্থ খেদমত আনজম দেয়া যায় না, তিনি এই ভেবে স্বাবলম্বী জীবনের অধিকারী হবার জন্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থকরী শিক্ষারও ব্যবস্থা রেখেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের পেছনে তাঁর মানসিক কায়িক ও আর্থিক অপরিসীম পরিশ্রম ব্যয়িত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বৈষয়িক দিক থেকে নিজেকে সুখী সমৃদ্ধ করার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। জাতীয় সমস্যাবলীর সাথে সাথে "জামেয়া-এ-এমদাদিয়া"র চিন্তা ভাবনাই তাঁকে সকল সময় আচ্ছন্ন করে রাখতো। তিনি বিদেশে গেলে সেখান থেকেও পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নেয়ার আগে জামেয়া-এ-এমদাদিয়ার খবর নিতেন। তাঁর অগণিত শিষ্য শাগরিদের বিপুল অর্থ এ জামেয়াতে রয়েছে। প্রথম দিকে মওলানার পরিকল্পনা মাফিক যদিও তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে জামেয়া-এ-এমদাদিয়াকে তাঁর

লক্ষ্য উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং সম্মুখে এগিয়ে নেয়ার জন্যে যোগ্য সহযোগীর অভাব অনুভব করেছিলেন, কিন্তু পরে এ সংকট কেটে যাবার সময় ঘনিয়ে আসলে ৭০-এর নির্বাচনের পর দেশে বৃহত্তর রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। অতঃপর স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি পর্বে মওলানা অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ হন। কারা মুক্তির পরও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহল তাঁকে নিজের রক্তে গড়া সাধের জামেয়-এ-এমদাদিয়াতে প্রবেশাধিকার দেয়নি। কিন্তু তাতেও ইসলামের নেতা হতোদ্যম হননি। জীবন সায়াহ্নে নিজের সেই স্বপ্ন সাধ পূরণের জন্যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

সমাজ সেবায় কৃতিত্ব

খোদাভীতি, নিষ্ঠা, সততা, সদিচ্ছা ও কর্তব্যপরায়ণতা থাকলে রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে দীর্ঘদিন সমাসীন না থেকেও যে জনগণের জন্যে কাজ করা যায়, তার একটি বড় প্রমাণ হলো মওলানা আতহার আলী সাহেব। তিনি রাজনীতিতে আসার আগেই সমাজিক অনেক কাজের মাধ্যমে জন-প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কিশোরগঞ্জকে তিনি নানাভাবে উন্নত করেছেন, যার দীর্ঘ বিবরণ এ নিবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। তিনি জনপ্রতিনিধি থাকা অবস্থায় বা এ পদ থেকে সরে যাবার পরও কিশোরগঞ্জে অনেক উন্ন-য়ন মূলক কাজ করেছেন। কিশোরগঞ্জে অতি স্বল্পসময়ের উদ্যোগে টেলি-ফোন একচ্যাঞ্জ স্থাপন তাঁরই একটি কীর্তি। এছাড়া দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ও অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁর একাধিক অবদান রয়েছে। মন্ত্রী ও প্রশাসন বিভাগীয় উচ্চ কর্মকর্তা হতে শুরু করে মহকুমা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে সমীহ করতেন এবং তাঁর কাজ নিয়ে গড়িমসি করতে সাহসী হতেন না। জনপ্রতিনিধি থাকা অবস্থায় তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট তাঁর কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, "এ ধরনের নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক ব্যক্তি পেলে একটি দেশকে অল্পদিনেই উন্নত করা যায়।"

ইন্তেকাল

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে মোমেনশাহী শহরে অবস্থিত থাকুল উলুম মাদরাসাটিকে একটি আধুনিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্যে তিনি এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মওলানা আতহার আলী সাহেবের জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল বলেই ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা এবং নিজের বার্দ্ধক্যজনিত কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এ মহান কাজে নিবেদিত থাকতেন। ঐ অবস্থায়ই ১৯৭৬ সালের ৫ই অক্টোবর তিনি চির বিদায় গ্রহণ করেন। বিবেকবান সমাজের কর্তব্য হলো তাঁর সে অসম্পূর্ন গুরু দায়িত্বকে পরিপূর্ণতার রূপ দান করা। সূফী রাজনীতিক ও নির্মল চরিত্রের এই নেতা সকল সময় মানুষের সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা ও দোয়া পাবার যোগ্য সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিগত চরিত্র

রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার আলেম সমাজের পথিকৃৎ, ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহ্সালার মওলানা আতহার সাহেব ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। ন্যায় এবং সত্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভীক ও আপোষহীন। দোর্দন্ড প্রতাপশালী কোনো কর্তা ব্যক্তি ও শাসকের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করতে তিনি আদৌ পরোয়া করতেন না। তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আলেম। সাধারণত: রাজনৈতিক অঙ্গনে পা রাখার সাথে সাথে কোনো কোনো আলেমের ধ্যান ধারণ, চলন-বলন ও রীতি-নীতিতে পরিবর্তন এমনকি বিকৃতিও দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর গোটা জীবন একই ভাবে অতিবাহিত হয়েছে। রাজনীতির ভিতর বাইর সকল সময় তিনি কায়কারবার, চালচলন, রীতিনীতিতে তাঁর আধ্যাত্মিক আলেম সুলভ চরিত্র বজায় রেখেছেন। কোনো উচুঁ দরের ব্যক্তি বা তাঁর দলের কোনো মন্ত্রী পর্যায়ের লোকও তাঁর নির্ধারিত 'আমলের' সময় সাক্ষাত প্রার্থী হলে তিনি তাঁর ঐ সকল আমল, তসবীহ, নফলিয়াত ত্যাগ করতেন না। বরং ঐ সব 'মামুলাত' থেকে অবসর হয়ে তাদের সাথে কথা বলতেন। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমলের নির্ধারিত কর্মসূচী

পরিবর্তন করতেন না। যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলতেন। প্রতিটি সভায় তিনি দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথকে সুগম করার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে যখন মুনাজাত দিতেন, তখন তাঁর ছোয়াল ও দাড়ি বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য গোটা মজলিসের লোকদের অন্তরকে বিগলিত করে দিত। তিনি রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যাবার পূর্বে সকলকে নিয়ে হাত তুলে মুনাজাত করতেন। কি পার্লামেন্ট কি জনসভা খোদাভীতি তাঁর অন্তরে প্রবল থাকত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হয়ে কিংবা সমর্থন না দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসে বাতিল পন্থীদের হাতে উম্মতের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়াকে তিনি নাজায়েয বলে মনে করতেন। এ জাতীয় ভাবধারার আলেমদেরকে তিনি সঠিক পথের অনুসারি বলে মনে করতেন না।

অন্যায় অসত্য ও বাতিলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। বাতিলের বিরুদ্ধে সকল সময় তাঁর ভূমিকা ছিল আপোষহীন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতাসীনদের কোনো লোভ প্রলোভন বা রক্তচক্ষু কোনো দিন তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। অজ্ঞাতসারে কোনো ত্রুটি তাঁর থেকে সংঘটিত হয়ে গেলেও সাথে সাথে তিনি তা শোধরানোর জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন স্থির সিদ্ধান্তের লোক। যেটাকে তিনি ন্যায় ও সত্য জ্ঞান করতেন, তাঁকে সহজে ঐ মত থেকে সরানো মুশকিল ছিল। তিনি সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকতেন। সময়ানুবর্তিতা ও কর্তব্য নিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজে দীর্ঘসূত্রিতা বা গাফিলতি কাকে বলে তিনি জানতেন না।

এ সংগ্রামী আলেম নেতার মধ্যে একই সময় অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সাধারণভাবে যেগুলো অন্যদের মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। তিনি একাধারে ছিলেন আধ্যাত্মিক নেতা, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা, সমাজ নেতা, সংগ্রামী রাজনীতিবিদ, সমাজ সচেতন সংগঠক, সংবাদপত্র সেবী। তাঁর উদ্যোগে সাপ্তাহিক "নেজামে ইসলাম' দৈনিক 'নাজাত"

পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং দৈনিকটি দীর্ঘদিন স্থায়ী না থাকলেও সাপ্তাহিকটি ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে একসময় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এ সাপ্তাহিকটি নেজামে ইসলাম আন্দোলন ও তার বিরোধীদের জবাবে বিরাট সহায়ক ছিল। সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম ও দৈনিক নাজাতের দ্বারা মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে অনেক লেখক ও কিছু কিছু সাংবাদিকও তৈরী হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের বীরসেনানী এ ত্যাগী মোজাহিদের জীবনাদর্শে এদেশের মুসলিম যুব সমাজের গড়ে ওঠা এবং তাঁর আদর্শকে বাংলাদেশের মাটিতে বাস্তবায়িত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই এ মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শিত হতে পারে। জামেয়া-এ-এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, সেখানকার শহীদী মসজিদ, মোমেনশাহীর দারুল উলূম মাদ্রাসা এবং আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক যুগল গুণ সমৃদ্ধ মওলানা আতহারের জীবন চিরদিন এ দেশবাসীর প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

[৩১শে আগস্ট '৮৩ ইং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।]

মওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

[জঃ ১৮৯৫—মৃঃ ১৯৬৮ খৃঃ]

বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে কোরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ যে কয়জন আলেম মনীষী জন্ম নিয়েছেন এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থেকেও সূফী সাধক হিসাবে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে হেদায়াতের প্রেরণা রূপে গণ্য হতেন, তাদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা শামসুলহক ফরিদপুরী ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। অধিকাংশ সূফী সাধক ও আধ্যাত্মিক পীরকে দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে পূর্ণসচেতন থাকতে ও সেগুলোর সমাধান কল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালনে খুব কমই দেখা যায়। সাধারণতঃ এধরনের লোক সদাসর্বদা আনুষ্ঠানিক এবাদত বন্দেগী, যিকির-ফিকির এবং প্রচলিত ওয়ায-নছীহতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। চলমান বিশ্বপরিস্থিতি এবং জাতীয় জীবনের নিত্যনতুন উদ্ভূত সমস্যাবলী থেকে তাঁরা অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই দূরে থাকতে চান। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কোথায় কি ঘটছে সেদিকে তাঁদের বড় একটা ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কিন্তু মহান আধ্যাত্মিক সাধক ইসলামী জ্ঞান-বিশেষজ্ঞ মওলানা শামসুলহক ফরিদপুরী ছিলেন একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন ছিলেন সূফী মানসের অধিকারী তেমনি ছিলেন পূর্ণ সমাজ সচেতন ও একজন রাজনীতিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের প্রতি ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আজাদী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৪০ থেকে ৪৭-এর আজাদী লাভ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা ছাড়াও প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরমুহূর্ত গুলোতেও তিনি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী স্বভাবগতভাবে বিনয়ী, নম্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তবে জাতীয় জীবনের যেকোনো সমস্যায় তিনি নির্ভীক ভূমিকা পালন করতেন।

তিনি কারও রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে কথা বলতেন না। মওলানা শামসুল হক সাহেব দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা সকল ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রধানতঃ শিক্ষা-সাহিত্য অঙ্গনে বিরাট অবদান রাখলেও দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বার্ধক্য জনিত কারণে শেষের দিকে রাজনৈতিক অঙ্গণে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে তেমন একটা দেখা না গেলেও ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীবৃন্দের সাথে ঘনিষ্টভাবে তাঁর যোগাযোগ বজায় ছিল। তিনি ছিলেন যাবতীয় কোন্দল ও সঙ্কীর্ণতার উর্ধে। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর আলেম ও মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সাধনে সদা সচেষ্ট। জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে দেশের আলেম সমাজের ঐক্যবদ্ধ মতামত ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলে, তাঁর নেতৃত্বেই সেটা সম্ভব হতো।

মওলানা শামসুল হক সাহেব বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার, শির্ক ও বেদায়াতের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর ছিলেন। ধর্মের নামে ব্যবসায় ও পীরী মুরীদিকে অর্থোপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের তিনি তীব্র নিন্দা করতেন। বিভিন্ন জাতীয় সমস্যায় দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, ইসলামী মনীষী ও আলেম সমাজের সর্বসম্মত রায়ের খেলাফ কোনো আলেম বা পীর ক্ষমতাসীন সরকারের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতিকে সমর্থন করলে তিনি তাদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। ধর্মীয় কোনো ফিৎনার উদ্ভব ঘটলে তিনি দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসতেন। আইয়ুব শাসনামলে হাদীস অস্বীকৃতি ও ইসলামী পারিবারিক আইনের বিকৃতি ও তার পূর্বে কাদিয়ানী ফিৎনার সময় সেগুলোর মোকাবেলায় তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বস্তুবাদী শিক্ষা ও জীবনদর্শনের প্রাধান্য হেতু বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম যুব সমাজের ধর্মবিমুখতা এবং সমাজের ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয় খোদাপ্রেমিক এই অকৃত্রিম সমাজদরদী ব্যক্তিটিকে অধিক বিচলিত করে তুলতো। এ দুরবস্থার হাত থেকে সমাজকে রক্ষাকল্পে ওলামাকুল শিরোমণী মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সদা উদ্বিগ্ন থাকতেন। শিক্ষা ব্যবস্থা সহ সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সাধনকল্পে তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি এ

উদ্দেশ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুজর্গ ও মহা-সাধক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর আদর্শে দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার, পীরিমুরিদী ও মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজ সংস্কার সাধন এবং সমাজের মানুষকে সৎকর্মশীল, সৎ নাগরিক ও ইসলামী আদর্শের খাঁটি অনুসারী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি অন্তরের গভীর দরদ দিয়ে বেশ অনেকগুলো পুস্তক রচনা করে গেছেন। অন্য ভাষাভাষী মনীষীদের একাধিক গ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর লিখিত এসব বই কেবল বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারেরই সম্পদ নয়, মানুষকে চরিত্রবান, খোদাভীরু করণে, সমাজ সংস্কারে ও ইসলামী আন্দোলনকে সুসংহত করার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

সূফী সাধক মওলানা ফরিদপুরী সাহেবের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ, সংস্কারক, লেখক, সেমাজ-সেবী নেতা এবং সাথে সাথে নিঃস্বার্থ খাঁটি পীর। জাতি ও ধর্মের একনিষ্ঠ দরদী এ বিরল ব্যক্তিত্ব সকল শ্রেণীর মানুষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। নীতি আদর্শের প্রশ্নে কোনো দিন অন্যায় অসত্যের কাছে মাথা নত করতেন না। কোনো প্রকার লোভ প্রলোভন ও চাপের মুখে নতি স্বীকার করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। দ্বীন ও শরীয়তের মাপকাঠির ব্যতিক্রম তিনি কোনো কিছু করতে রাজি হতেন না। পরহেজগারী, খোদাভীতি, সাধুতা, ভদ্রতা, নম্রতা, সহনশীলতা, পরোপকা-রিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভূষণ। মওলানা শাম-সুল হক ফরিদপুরী ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন খালেছ একজন নায়েবে নবী তথা অন্যতম 'ওয়ারেসে আম্বিয়া' হিসাবেই নিজ ব্যক্তি চরিত্রকে গড়ে তুলেছিলেন। নিষ্ঠাবান খোদাপ্রেমিক এ মহৎ ব্যক্তির পরি-শিলিত কর্মময় জীবন হাজারো মানুষের জন্যে হেদায়াত ও পথের দিশা হিসাবে কাজ করেছে। তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত দেশবিদেশে ছড়িয়ে আছে। শত শত ছাত্র তাঁর কাছে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে দেশ, সমাজ ও দ্বীন-শরীয়তের খাদেম হিসাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ইসলামের আলো বিস্তার করছে। মওলানা ফরিদপুরীর মতো আদর্শবান এবং বিভিন্ন-

মুখী জ্ঞানপ্রতিভার অধিকারী খোদাভীরু আলেমের নেতৃত্ব যে মুহূর্তে সমাজের অধিক প্রয়োজন, সে মুহূর্তে তাঁর অনুপস্থিতিতে গোটা বাংলার মানুষ বিরাট শূন্যতা উপলব্ধি করেছে।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষাদিক্ষা

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সদর থানার অধীন গওহারডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বাংলার কৃতিসন্তান ওলামাকুল শিরোমণী মওলানা শমসুল হক ফরীদপুরী (রহঃ) (১৩০২ বাং মোঃ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব মুন্সী আবদুল্লাহ্ ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। মরহুম মুন্সী আবদুল্লাহ্ ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের একজন সংগ্রামী কর্মী ছিলেন। তিনি ইংরেজ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে পাটনা জেলে দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিলেন। মওলানা ফরিদপুরীর জীবনের বিরাট সাফল্যের পেছনে পিতার সংগ্রামী জীবনের কর্মতৎপরতা, ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্যে ত্যাগ ও দরদমিশ্রিত চিন্তা ভাবধারার প্রভাব বহুলাংশে কাজ করেছে।

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর যে যুগে জন্ম, সেযুগে আজকের ন্যায় হাতের কাছে কোনো বিদ্যালয় পাওয়া যেতোনা। দূরবর্তী কোনো মক্তব বা টোলে গিয়েই প্রাইমারী শিক্ষা লাভ করতে হতো। তাছাড়া এখনকার মতো মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যাও তেমন ছিলনা। বিশেষ করে গোপালগঞ্জের মতে হিন্দু প্রধান এলাকায় হিন্দু শিক্ষকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। শিশু শামসুল হক কথাবলার উপযোগী হবার পর গওহার ডাঙ্গা গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাটগাতী গ্রামে গিয়ে এক হিন্দু শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি যশোর জেলার ভাগুদিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করেন। সেখানকার লেখাপড়া সমাপ্তির পূর্বেই তিনি কলকাতা চলে যান। কলকাতা পৌঁছার পর আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাঙ্গলো ফারসিয়ান বিভাগে ভর্তি হন এবং শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও স্বর্ণপদক লাভ করেন।

কলেজ জীবন থেকে প্রত্যাবর্তন

কলকাতা থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৫টি বিষয়ে লেটার সহ স্কলারশীপ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী বালক শামসুল হক ফরিদপুরী অতঃপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। কলেজ জীবনে নিছক বস্তুবাদী শিক্ষায় তাঁর যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। আধুনিক যুবক ছাত্র শামসুল হকের মন এক অজানা জ্ঞানের সন্ধানে সদা ব্যাকুলতা অনুভব করতো। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূলের হাদীসের অন্তর্নিহিত ভাবরহস্য জানার জন্যে তাঁর মনে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কলেজের পড়া ত্যাগ করে তিনি মাদ্রাসা লাইনে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেই যুবককে আল্লাহ্ তায়ালা ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে লাখো মানুষের হেদায়াতের অছিলা বানাবেন, যিনি যুগযুগের নবী-রসূলদের কাজের উত্তরাধিকারী হয়ে আদম সন্তানদের সীরাতুল মুস্তাকীম তথা খোদাপ্রদত্ত পথের দিশারী হবেন, তাঁকে আল্লাহ্ পাক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি করে অন্য শিক্ষায় নিয়োজিত রাখতে পারেন? কাজেই যুবক শামসুল হককে তিনি অতি দ্রুত ইসলামী জ্ঞান সাধনায় আগ্রহী করে তোলেন। এই উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার পদপীঠ বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে লেখাপড়া করার জন্যে জনাব শামসুল হক ফরিদপুরী মনঃস্থির করলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে কোরআন-হাদীসের শিক্ষায় গভীর মনোনিবেশ করেন। অবশ্য মরহুম মওলানা থানভীর পরামর্শে তিনি এর পূর্বে একই লাইনের বিখ্যাত মাদ্রাসা ছাহারানপুরেও কয়েক বছর ধরে অন্যান্য বিষয় সমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। মওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) অল্প দিনেই দারুল উলূমের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় তাঁর যশঃ ও প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত অনেক সুপণ্ডিত ও খোদাভীরু শিক্ষকের নিকট জনাব শামসুল হক সাহেবের জ্ঞান লাভ করার সুযোগ ঘটে। তিনি হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের পূর্বে আরবী সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্র, সৌরজগত বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র,

ইল্‌মে নাহু ও ইলমে ছরফ, অলঙ্কার শাস্ত্র, সূক্ষতত্ব জ্ঞান শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্র, নৈতিক চরিত্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ব বিজ্ঞান, ইসলামের মূলনীতি শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মোটকথা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম নীতি শাস্ত্র, হাদীস তাফসীর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল পর্যায়ে অসাধারণ ব্যূৎপত্তি ও পাণ্ডিত্ব অর্জন করে তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

মওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী বিভিন্নমুখী এত কিছু জ্ঞান সাধনার মধ্যেও নিজের মনে অপর একটি শূন্যতা উপলব্ধি করতেন। বাহ্যিক জ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে তিনি আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। কেননা তিনি মনে করতেন, ইসলামী ইল্‌ম বিদ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনের যাবতীয় অন্যায় প্রবণতা দমন করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন। তা না করতে পারলে সকল কষ্ট পরিশ্রমই নিস্ফল যেতে বাধ্য। তাঁর মনের এই আধ্যাত্মিক শূন্যতা দূরীকরণার্থে তিনি অবসর সময় খাটি সূফী বুজর্গ ও সাধকদের সংস্পর্শে কাটাতেন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালাতেন। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার এ মহান উদ্দেশ্য সাধন কল্পেই শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হবার পরও তিনি দু'বছরকাল দেওবন্দে অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত আলেম ও পীর হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভীর নিকট তিনি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

"সকাল বেলার প্রাকৃতিক লক্ষণ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট দিনটি আজ কেমন যাবে।" তেমনি মওলানা শামসুল হক ফরীদপুরীর শৈশব ও যৌবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকেই অনুমিত হয়ে ছিল যে, তিনি ভবিষ্যত কর্মজীবনে মহত্বের এক শীর্ষস্থানের অধিকারী হবেন। তাই ছাত্র জীবনের তারুণ্য চপলতা কিংবা যৌবনের স্বাভাবিক উদ্যাম অস্থিরতা জনিত বাড়া-বাড়ি তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। তিনি জীবনের শুরুতেই নিজেকে ভার-সাম্যপূর্ণ একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন। ছাত্র জীবনেই তাঁর মধ্যে বিশ্বস্ততা, সাধুতা, সময়ানুবর্তিতা, ন্যায় পরায়ণতা, ধৈর্য্যশীলতা, সত্যানুরাগিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী ও চারিত্রিক মাধুর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ

তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তাই তাঁকে মহত্বের উচ্চ শিখরে পৌঁছুতে সাহায্য করে।

হায়দ্রাবাদের চীফ জাষ্টিজ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করেন যথাক্রমে ১৯২৮ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। সে সময় হায়দ্রাবাদের নেজাম মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর নিকট তাঁর দেশে চীফ জাষ্টিজের দায়িত্ব পালনের যোগ্য একজন বিজ্ঞ আলেম চেয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। মরহুম মওলানা মাদানী এ পদের জন্যে শিক্ষা থেকে সদ্য অবসর প্রাপ্ত মওলানা শামসুল হক ফরিদ-পুরীকে আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বল্লেন, হুজুরের নির্দেশ আমার জন্য পালনীয়। তবে আমি পূর্ব থেকে স্থির করে রেখেছি যে, নিজ দেশেই ইসলামের খেদমত করবো। কেননা, বাংলাদেশে ইসলামের বহুবিধ কাজের প্রয়োজন। ওখানে সঠিক ইসলামী শিক্ষার অভাবে শির্ক, বেদায়াত নানাবিধ কুসংস্কার দ্বীনের পথকে কণ্টকিত করে রেখেছে। এ ছাড়া উচ্চ বেতনে এত উচ্চ চাকুরী করার অভিপ্রায়ও আমার নেই।”

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা আদর্শ বিস্তারে- ব্রতী হন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের বিস্তার কিভাবে করা যায়, মওলানা ফরিদপুরীর এটা এক বিশেষ চিন্তা ছিল। তাতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ছাড়াও অপর একটি কারণ ছিল এই যে, ১৮৫৭ সালে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে আলেম সমাজ ও সাধারণ মুসলমানরা হেরে যাবার পর ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বৃটিশ ভারতে টিকিয়ে রাখার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যেই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দারুলউলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সেখানকার কর্তৃপক্ষ দেওবন্দ থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদের সকল ছাত্রকেই নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা

প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বীনী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়ে থাকেন। যেসব ছাত্রের মধ্যে লেখা ও সাহিত্য চর্চার প্রতিভা থাকে, তাদেরকে বই পুস্তক লেখার ও সেগুলোর মাধ্যমে দ্বীনের শিক্ষা আদর্শ বিস্তারের পরামর্শ দেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী পূর্বেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে তাঁর প্রতি উভয় প্রকারের দায়িত্বই এসে বর্তায়। বলাবাহুল্য, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা তথা অবিভক্ত ভারতের আজাদী সংগ্রামের নায়ক সংগ্রামী ওলামা-এ-কেরাম যদি ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে এখানে টিকিয়ে রাখার জন্যে দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার এই কর্মসূচী না নিতেন, তাহলে দীর্ঘ ইংরেজ শাসনের পরিণতিতে এদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো, একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। ইসলামের নামে বাংলাদেশ সহ ১৯৪৭ সালে যেই অবিভক্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার স্বপ্নও সুদূর পরাহতই থেকে যেতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাদেশও স্বাধীন হতো না। যার বড় প্রমাণ দিল্লীর কর্তৃত্বাধীনের পশ্চিম বাংলা। মুসলিম শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতের তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-বৃদ্ধির এটাও এক প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মনবাড়িয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের মহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সর্বপ্রথম ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মনবাড়িয়ার ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান কাজ শুরু করেন। সেখানে কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি মাদ্রাসাটিকে দাওরা-এ-হাদীস (টাইটেল) পর্যন্ত উন্নীত করেন। সে সময় তার সহকর্মী ছিলেন মরহুম তাজুল ইসলাম সাহেব, পীরজী হুজুর এবং হাফেজ্জী হুজুর। দেওবন্দ ও মওলানা থানভীর দরবারেও তাঁরা এক সাথেই ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসাকে দাওরা-এ-হাদীস মাদ্রাসায় উন্নীত করার পেছনে মওলানা ফরিদপুরী ও তাঁর সহকর্মীদের অন্তরে যেই প্রেরণা কাজ করেছিল, তা হলো, সে সময় এক সিলেট ও চট্টগ্রাম ছাড়া 'সিহাহ্ সিত্তা হাদীস' শিক্ষাদানের অপর কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

গজালিয়া মাদ্রাসা স্থাপন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদানকালেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর যোগ্যতা, খোদাভীরুতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি যেখানেই যেতে সর্বত্রই ওয়ায নছীহতের মধ্য দিয়ে ইসলামী শিক্ষা-বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেসব এলাকায় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, সেখানে প্রতিষ্ঠান কায়েমের জন্যে তিনি অধিক মনযোগী হতেন। পদ্মানদীর দক্ষিণ পাড়ে কোনো বড় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বলে তিনি বাগেরহাট মহকুমার নিকটবর্তী গজালিয়া গ্রামে (১৯৩৩ খৃঃ) একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে পাঁচ বছর দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের কাজে তাঁর যে দুজন বিশিষ্ট সহকর্মী হাফেজ্জী হুজুর এবং পীরজী হুজুর তাঁর সাথে ছিলেন, গজালিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কালেও তাঁরা তাঁর সাথী ছিলেন। এ মাদ্রাসা থেকে মওলানা মমতাজুদ্দীন ও মওলানা ইছহাক প্রমুখ বিজ্ঞ আলেম বের হয়ে ইসলামী শিক্ষার বিরাট সেবা করেন।

ঢাকায় গমন ও বড় কাটারা মাদ্রাসা স্থাপন

কোনো স্থানের কেন্দ্রীয় মর্যাদার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাধারণত দেশের কেন্দ্র স্থলেই প্রচার মাধ্যমগুলো থাকে। সমাজে মহৎ কিছু প্রচার করতে হলে কেন্দ্র থেকেই সেটা তাড়াতাড়ি সমাজের লোকজনের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী এদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছিলেন, খুলনার গজালিয়ার মতো একটি নিভৃত পল্লীতে থেকে তা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। বিশেষ করে সমাজ সংস্কার ও ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ বিস্তার-কল্পে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির যে মহৎ চিন্তা করেছেন, সেটা তো গ্রামে থেকে একেবারেই অসম্ভব ছিল। কাজেই তিনি গজালিয়া মাদ্রাসায় কিছু দিন কাজ করার পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁর কর্মস্থল স্থানান্তর করেন। এখানে আসার পরপরই ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিপনী কেন্দ্র চকবাজারের পাশে বড় কাটরায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। উক্ত মাদ্রাসাই বর্তমান কালে "আশ্‌রাফুল উলূম মাদ্রাসা" নামে দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ। বুড়ী গঙ্গানদীর

তীরে মোগল শাসনামলের একটি বিরাট পুরাতন তেতালা ভবনে উক্ত মাদ্রাসাটি অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী "জিন্‌জিরার হাফেজ সাহেব" নামে খ্যাত জনৈক মহানুভব ব্যক্তির সহযোগিতায় মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেসময় তাঁর সহযোগী ছিলেন মরহুম মওলানা আবদুল ওহাব পীরজী হুজুর, হাফিজজী হুজুর প্রমুখ। মওলানা সাহেব বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় অনেক দিন যাবত অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। বরং বলা চলে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টি এখানেই বেশির ভাগ অতিবাহিত হয়।

গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

ঢাকার আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালীনই মওলানা ফরিদপুরী সাহেব গোপালগঞ্জস্থ নিজ গ্রাম গওহার ডাঙ্গায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে "খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। এ মাদ্রাসাটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য উচ্চ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৩১ জন উপযুক্ত শিক্ষক এ মাদ্রাসায় শিক্ষাদান কাজে রত। প্রায় সহস্রাধিকছাত্র এ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর পবিত্রদেহ বুকে ধারণ করে এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে ইসলামের আলো বিতরণ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর এখান থেকে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করে হক্কানী আলেম হয়ে দেশবিদেশে ইসলামের সেবা করছে।

লালবাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

জামেয়া-এ-কোরআনিয়া লালবাগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে দ্বিবিধ মতের সন্ধান পাওয়া যায়। (১) ১৯৪০ থেকে '৪৭ সালের আজাদী অর্জন পর্যন্ত মওলানা ফরিদপুরীকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎপরতায় ব্যস্ত থাকতে হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তিনি পুনরায় বড় কাটারা মাদ্রাসার প্রতি পূর্ণ-মনোযোগ দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্তদের সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে তিনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে মোগল স্মৃতি বিজড়িত লালবাগের কিল্লার পাশে "জামেয়া-এ-কোরআনিয়া লালবাগ" স্থাপন করেন। (২) মওলানা ফরিদপুরী সাহেব আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে সমাসীন থাকাবস্থায়ই একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) লালবাগ শাহী

মসজিদ প্রাঙ্গণে বসে বহু লোককে শরবত পান করাচ্ছেন। এ স্বপ্ন দেখার পর মওলানা সাহেব কয়েকদিনের মধ্যেই মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খানের সহায়তায় ও স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সহযোগিতায় জামেয়া-এ-কোরআনিয়া লালবাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা ত্যাগ করে লালবাগ মাদ্রাসায় গিয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে ইসলামের আলো বিস্তার করতে থাকেন। এ সময় তাঁর বিরাট সহযোগী ছিলেন মওলানা জাফর আহ্‌মদ ওসমানী ও হাফেজজী হুজূর। মওলানা ওসমানী আশরাফুল উলূল মাদ্রাসায় প্রধান মোহাদ্দেস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের হেড ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, হাফেজজী হুজূর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই লালবাগ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা ত্যাগের পেছনে কোনো মতপার্থক্য বা ইখতিলাফ থাকলেও সেটা যে "ইখতিলাফুল ওলামা রহমত" ধরনেরই ইখতিলাফ ছিল ঐতিহাসিক লালবাগের ঐতিহাসিক দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্র লালবাগ মাদ্রাসার অস্তিত্বই তার বড় প্রমাণ।

ফরিদাবাদ মাদ্রাসা

বেসরকারী উচ্চ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজধানী ঢাকা নগরিতে বর্তমানে ইসলামিয়া মাদ্রাসা এবং লালবাগ ও আশরাফুল উলূম মাদ্রাসাদ্বয়ের পাশাপাশি ফরিদাবাদ এমদাদুল উলূম মাদ্রাসাটিও সপ্রশংস ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ মাদ্রাসাটিকে পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসার রূপ দানে এর সাবেক অধ্যক্ষ কুমিল্লার মরহুম মওলানা বজলুর রহমান দয়াপুরীর অক্লান্ত প্ররিশ্রম ও চেষ্টা সাধনা ছিল। তবে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং মওলানা বজলুর রহমান মরহুমকে এখানে অধ্যক্ষ করে এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধানে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর বিরাট অবদান রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর সাথে কলকাতার বিখ্যাত মুসলিম ধার্মিক ব্যবসায়ী ওয়াছেল মোল্লার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে ওয়াছিল মোল্লার পুত্র জনাব কবীরুদ্দীন-সিনেমা হল করার উদ্দেশ্যে ঢাকার ফরিদাবাদে সাড়ে পাঁচ বিঘা সম্পত্তি খরিদ করেছিলেন। মওলানা সাহেব পরম্পর তা জানতে পেরে জনাব কবীরুদ্দীনকে

তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে বলেন। যথাসময় জনাব কবীরুদ্দীন মওলানা শামসুলহক সাহেবের দরবারে উপস্থিত হন এবং কোনো কথা জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তিনি বলতে থাকেন যে, "হুজুর আমাকে যে জন্যে ডেকেছেন, আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি ফরিদাবাদের ঐ সাড়ে পাঁচ বিঘা সম্পত্তি হুজুরের নামে দলীল করে দিয়েই এখানে এসেছি। আপনি মোতাওয়াল্লী রূপে ঐ জায়গায় যেকোনো মহৎ কাজ করতে পারেন এবং আশা করি দয়াপূর্বক নিজেও সেখানেই বাড়ী ঘর করে থাকবেন।" মওলানা শামসুল হক সাহেব একথায় যুগপৎভাবে খুশি ও বিস্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, "বাবা, জায়গার আমার কোনো দরকার নেই। একটি দ্বীনি শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাবার উদ্দেশ্যেই আমি এ সম্পত্তি ব্যবহার করবো। করেছেনও তাই। তিনি ফরিদাবাদের ঐ জায়গা মাদ্রাসার নামে ওয়াকৃফ করে দিয়েই তাঁর সহকর্মী প্রখ্যাত বুজর্গ হাফেজজী হুজুরকে তার পৃষ্ঠপোষক করে সেখানে একটি দ্বীনী মাদ্রাসার সূচনা করেন। তারপর মরহুম মওলানা বজলুর রহমান দয়াপুরী আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে মওলানা শামসুল হক সাহেব তাঁকেই ফরিদাবাদ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মনোনীত করেন এবং এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা গড়ার সিদ্ধান্ত নেন (সন ১৯৬৫ ইং) এবং মাদ্রাসার জন্য মমিন মোটরস কোম্পানীর প্রদত্ত দশ হাজার টাকা দিয়ে কাজ শুরু করার জন্যে তা দয়াপুরীর হাতে তুলে দেন।

মওলানা মরহুম বজলুর রহমান দয়াপুরী মাদ্রাসা পরিচালনায় তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাকে সফলভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফরিদাবাদ মাদ্রাসাটি তাঁর জীবদ্দশায় একটি উচ্চ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণতি হয়। বর্তমানে এই আবাসিক মাদ্রাসাটিতে প্রায় হাজারের অধিক ছাত্র ইসলামী জ্ঞানার্জনের কাজে নিয়োজিত আছে। মওলানা দয়াপুরীর হাতে মাদ্রাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে দেখে এর পৃষ্ঠপোষক মোহতারাম হাফেজ্জী হুজুর এ ব্যাপারে নিঃশ্চিন্ত হন এবং নিজের উদ্যোগে ঢাকার উপকন্ঠে কামরাঙ্গির চরে গিয়ে ইসলামের আরেকটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। এককালের কামরাঙ্গির চর বর্তমানে মরহুম ফরিদপুরী ও হাফেজজী হুজুরের আধ্যাত্মিক উস্তাদ মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নামানু-

সারে আশরাফাবাদ নামে আজ খ্যাত। সেখানে বুড়িগঙ্গানদীর তীরে অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত স্থানে গগনচুম্বি এক বিরাট আবাসিক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। মাদ্রাসার সাথে নির্মিত হয়েছে বিশাল আয়তনের একটি মসজিদও।

রাজনীতিতে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী

এদেশের সমাজ জীবনে যেই মহা পুরুষ আমূল পরিবর্তনের জন্যে সদা অস্থির, যার দেহমন, কলম সমাজ জীবনের সর্বস্তরে খোদায়ী জীবনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত, তিনি কি করে রাজনীতি বিমুখ থাকতে পারেন? ১৮৫৭ সালের মহা আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পিতা মুনশী আবদুল্লাহ্ র ন্যায় একজন ইসলামী মোজাহিদের রক্তধারা যেই শামসুলহকের ধমনীতে প্রবাহমান, তাঁর জন্যে মুসলিম জাতিকে ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়াই ছিল স্বাভাবিক।

"নিজের অবস্থা ভালো করা" কিংবা অপর কোনো ব্যক্তিস্বার্থ চারিতার্থ করার গতানুগতিক রাজনীতিতে মওলানা সাহেব কোনো দিনই জড়িত ছিলেন না। রাজনৈতিক অঙ্গনকে যাবতীয় স্বার্থপরতা, অন্যায় ও বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষাকল্পে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এদেশে প্রতিষ্ঠার জন্যে আজীবন তিনি নানাভাবে সংগ্রাম করেছেন। খেলাফত ও আজাদী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবেই সর্বপ্রথম (১৯২০ খৃ:) রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর পদচারণা ঘটে। কলেজের পড়া ত্যাগের পেছনে তাঁর ইসলামী শিক্ষা লাভের প্রেরণা ছাড়াও এটি অন্যতম কারণ ছিল বলে জানা যায়। ভারত বিভাগ প্রশ্নে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুলউলূম দেওবন্দ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সেখানকার বিজ্ঞ আলেমগণ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন—খণ্ডভারতের সমর্থক ও অখণ্ড ভারতের সমর্থক। উভয় দলেই মওলানা ফরিদপুরীর পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদগণ ছিলেন।

একটি দূরদর্শী

অখণ্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দের নেতা হলেন মরহুম মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (শায়খুল হাদীস ও হেড মোদার্রেস দারুলউলুম দেওবন্দ) আর খণ্ড ভারত তথা পাকিস্তানের সমর্থক জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের নেতা হলেন মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (সাবেক হেড মোদার্রেস

দারুলউলূম দেওবন্দ।) কারুর যুক্তি আর্গুম্যান্টই কোনো দিক দিয়ে জোরালো কম ছিল না। এমন সময় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে দেওবন্দপাশ কোনো আলেমের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে পোঁছা সহজ ব্যাপার ছিল না। মওলানা শামসুল হক সাহেব পাকিস্তান সমর্থন করলেন এবং মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। কিন্তু তথাপিও লীগ নেতাদের কারও কারও আমল-আখলাখ ও ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণার প্রেক্ষিতে অনেক আলেমই লীগকে সমর্থন দিতে চাননি। এছাড়া এসব নেতা দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন বলেও কোনো কোনো আলেম ও বিচক্ষণ ব্যক্তির একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল। তবে এটা সত্য হলেও যেহেতু ঐ মুহূর্তে এরূপ ধারণার ব্যাপকতা মুসলমানদের স্বাধীন সার্বভৌম আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো, এ অবস্থা অনুভব করেই মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী অস্থির হয়ে ওঠেন এবং বাংলার সকল ওলামা পীর মাশায়েখ যাতে ঐক্যমতে থেকে পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করেন, সেজন্যে তিনি তৎপর হন। মওলানা সাহেব এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিশিষ্ট্য ওলামা ও পীর-মাশায়েখের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে কলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত ওলামা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীকে দলীয় প্রধান করে সে কনকারেন্সেই জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম গঠিত হয়।

১৯৪৬ সাল থেকে '৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান কায়েম হওয়া পর্যন্ত মওলানা ফরিদপুরী অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন এবং পাকিস্তানের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে মুসলমানদেরকে ঐক্য-বদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি ঐতিহাসিক সিমলা কনফারেন্সে এক জেহাদী ভাষণ দিয়ে ছিলেন। তাঁর উক্ত ভাষণে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। অতঃপর জিন্নাহ্ সাহেব তাঁকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি করতে আগ্রহী হন। কিন্তু তিনি জিন্নাহ সাহেবের এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানান এবং তাঁর বদলে মরহুম খাজা নাজিমুদ্দীনকে বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি করার পাল্টা প্রস্তাব দেন। উক্ত কনফারেন্সে শেরে বাংলা মৌলভী এ কে ফজলুল হক, হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব

খাজা নাজিমুদ্দীন, তমীজুদ্দীন খান ও মওলানা আকরাম খাঁ মওলানা আতহার আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী এক পর্যায়ে 'জমিয়ত-এ-ওলামা ইসলাম বাংলার' সভাপতি ছিলেন এবং মরহুম মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ছিলেন সেক্রেটারী। তখন নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মওলানা জাফর আহমদ উসমানী এবং সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন মওলানা এহ্‌তিশামুল হক থানভী। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাংলার জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম তথা এ দেশের সর্বদলীয় ওলামা ও পীর-মাশায়েখ বিরাট ভূমিকা পালন করে। শর্ষিনার মরহুম পীর মওলানা নেছারুদ্দীন সাহেব এবং ফরিদপুরের পীর বাদশাহ মিঞা সাহেবও জমিয়তে ওলামা এ-ইসলামের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। সিলহেট পাকিস্তান ভুক্তির প্রশ্নে অনুষ্ঠিত রেফারেণ্ডামে এসব ওলামা-এ-কেরাম বিশেষ করে পরবর্তী সময়ে জমিয়তের সংগ্রামী নেতা মরহুম মওলানা আতহার আলী ও মওলানা সাইয়েদ মোছলেহ্‌উদ্দীনের অবদান অপরিসীম।

বস্তুতঃ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগ এবং জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম রাজনৈতিক প্রশ্নে অভিন্ন সত্তা হিসাবেই পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করেছিল। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ৪৭-এর স্বাধীনতার পর এক পর্যায়ে সাবেক পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মুসলিম লীগের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় তা থেকে ইস্তেফা দিয়ে সরে আসেন।

রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও প্রতিরক্ষায় সহযোগীতা

'৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়। কিন্তু প্রথম দিকে পাকিস্তানের শৈশব ছিল "ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সরদার"-এর মতো। মোহাজেরসহ অসংখ্য সমস্যারভারে দিশেহারা। সে সময় দেশরক্ষায় এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার

ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক রূপে স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত "ন্যাশনাল গার্ড" এবং আনছার বাহিনী-ই দেশের স্বল্পসংখ্যক সেনা বাহিনীর পাশাপাশি মস্তবড় রক্ষাব্যূহ হিসেবে কাজ করেছে। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী তখন তাঁর মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরই কেবল এ ব্যাপারে যোগ দিতে নির্দেশ দেননি বরং সারা দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তাঁর যত শিষ্য-সাগরেদ ছিল বিশেষ করে তাদেরকে এবং সাধারণভাবে সকল যুবকদেরকে এ দু'টি বাহিনীতে অধিক পরিমাণে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেন।

ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে মওলানা ফরিদপুরী

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ৪৭-এর আজাদী সংগ্রামে যেমন মুসলিম জনতা ও আলেমদের সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি যে সুমহান লক্ষ্য নিয়ে আজাদী অর্জিত হয়েছিল সেই লক্ষ্যের খাতিরেও তাঁর কষ্ট, সাধনা ও পরিশ্রমের অন্ত ছিলনা। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণতি করার জন্যে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন এবং বার্ধক্যেও ইসলামী আন্দোলনে জড়িত প্রতিটি সংস্থা-সংগঠনের প্রতি তাঁর সহযোগিতা ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তিনি ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের জুন-জুলাইতে পাকিস্তানে আদর্শ প্রস্তাবের চার দফার সমর্থনে সর্ব প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর উদ্যোগেই লালবাগ জামে মসজিদে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা জাফর আহমদ, উসমানী, কাশ্মীর সমস্যার উপরও ঐ সভাতে প্রস্তাব নেয়া হয়। ১৯৫০ সালে লেয়াকত আলী খানের পেশকৃত শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির সমালোচনা থেকে শুরু করে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তাতে মওলানা ফরিদপুরী গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে ছিলেন। ১৯৫১ইং সালে ২১-২৪শে জানুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি রচিত হয়, তিনি সে সব মূলনীতি রচয়িতাদের অন্যতম। ঐ সালেই তিনি ১৩ই অক্টোবর মোমেনশাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে মুসলিম লীগের সমালোচনা এবং ৪ দফা আদর্শ প্রস্তাবের সমর্থনে বিরাট সভা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তখন সেখানে মুসলিম লীগেরও কাউন্সিল অধি-

৯—

বেশন চলছিল। এ ছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দ্যেশ্যে লীগ সরকার সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে একটি আইন তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এর সপক্ষে কোনো সাড়া না পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগে সমর্থন আদায়ের অভিপ্রায় নিয়ে উজিরে আজম লেয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং এ উদ্দেশ্যে মোমেনশাহীতে যখন সভা করতে যাচ্ছিলেন, তখন অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই মওলানা শামসুল হক সাহেব তাঁর কিছু সহকর্মীর সাহায্যে এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন এবং স্থানীয় জামে মসজিদে সভা করেন। ফলে লেয়াকত আলী খান তাঁর জনসভায় এ সম্পর্কে কোনো প্রকার বক্তব্য না রেখেই নিজ বক্তৃতা শেষ করে চলে যান। সেদিন আলেমদের প্রতি স্থানীয় লীগ নেতারা অধিক চটেগিয়ে-ছিলেন।

এসব মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার সপক্ষে গণপরিষদের সদস্য বিশেষ করে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একাধারে তিন মাস করাচীতে অবস্থান করেছিলেন। এ ছাড়া বাইরে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সভাসমিতিতেও বক্তৃতা বিবৃতিতো তাঁর ছিলই।

প্রকাশ থাকে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র জীবদ্দশাতেই দেশের ওলামা-এ-কেরাম ও ইসলামী বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে জনগণ তাঁর কাছে চার দফা শাসনতান্ত্রিক মৌলনীতি পেশ করেন। তার ভিত্তিতেই ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর জিন্নাহ্ সাহেবের তিরোধান ঘটে। তারপর মুসলিম লীগ মহলের সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতাদের গড়িমসি দেখে এ নিয়ে দেশ জোড়া আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে পরবর্তী শাসকরা অন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু তাতে আন্দোলনকে দমানো যায়নি। বরং আজাদী আন্দোলনের বীরসেনানী মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী সহ অন্যান্য খ্যাতনামা ওলামা-এ কেরাম, এবং মওলানা ফরিদপুরী মওলানা মওদূদীর গ্রেফতারীর তীব্র নিন্দা করেন ও মওদূদী সাহেবকে মুক্তিদানের জন্যে সর্বত্র প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করেন। এ উপলক্ষে

আলাপ আলোচনা ও প্রচার-প্রতিবাদের ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ক্ষতি হবার বদলে বরং গ্রেফতারীতে উপকারই অধিক হয়েছে। অতঃপর গণপরিষদের অন্যতম সদস্য মওলানা উসমানীর প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ১৫ই মার্চ পাকিস্তানের গণপরিষদে ৪ দফা আদর্শ প্রস্তাব পাশ হয়। তাতে দেশবাসী আশা করেছিল যে, এবার হয়তো ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী স্বীকৃত হলো এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার মাধ্যমে দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ থেকে গেল। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রথম উজিরে আজম লেয়াকত আলী খান কর্তৃক পরিষদে উত্থাপিত শাসনতান্ত্রিক খসড়ায় উক্ত আদর্শ প্রস্তাবের তেমন কোনো প্রতিফলন দেখা গেল না। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে লেয়াকত আলী খান খসড়াটি প্রত্যাহার করে নেন। ওলামা-এ-কেরাম থেকে তিনি শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং ঐ সকল পরামর্শ পরীক্ষা করার জন্যে 'তালীমাত-এ-ইসলামিয়া' বোর্ড গঠন করেন। কিন্তু শাসক মহলের উদ্দেশ্য যেহেতু ভিন্নরূপ ছিল, তাই তারা নানাভাবে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে জনগণকে ভুল ধারণা দিতে শুরু করেন। তাদের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাবিমুখ গোষ্ঠি এগিয়ে এসে বলতে থাকে যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র আবার কি? কারও মতে, এ বিজ্ঞানের যুগে ইসলামী শাসন চলতে পারে কি? কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে, "বিভিন্ন মযহাব অনুসারীদের দেশ পাকিস্তানে ধর্মীয় নানান মতের আলেমদেরও এক হওয়া সম্ভব নয়, ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরীও অসম্ভব। এরূপ করা হলে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান কোন্ মযহাবের ভিত্তিতে চলবে? গোটা পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর ওলামা-এ-কেরাম এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে যে সব খ্যাতনামা ওলামা-এ-কেরামের নেতৃত্বে মতলববাজদের চ্যালেঞ্জের জবাবে সারা দেশের সকল মতের ওলামা, মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীও একজন। আলেম সমাজ সেদিন কোনো কোনো নেতা, উপনেতার এরূপ সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ১৯৫১ সালের ২১-২৪শে জানুয়ারী চারদিন পর্যন্ত করাচীতে শিয়াসুন্নী, হানাফী, আহলে হাদীস সব দলের ৩১ জন আলেম মওলানা সোলায়মান নদভীর সভা-

পতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সর্বসম্মতি ক্রমে ২২ দফা মূলনীতি রচনা করেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদে দ্বিতীয় বারের মতো একটি খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। তা পর্যালোচনার জন্যে ১৯৫৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী পুনঃরায় করাচীতে এক ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ২২ দফার আলোকে খসড়ার চুলচেরা সমালোচনা হয়।

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ১৯৫৩ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে অংশগ্রহণসহ এ ব্যাপারে দেশজোড়া বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক যেসব ইসলামী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোতেও যোগদান করেছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামী শাসনতন্ত্র রচণা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক সময়োপযোগী বহু প্রবন্ধও তিনি স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। করাচীর দ্বিতীয় দফা ওলামা সম্মেলনের দশদিন পর ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্যে (১৯৫৩ ইং ২৮শে মার্চ) পাকিস্তানের খ্যাতনামা কয়েকজন আলেমকে গ্রেফতার করা হলে মওলানা ফরিদপুরী দেশের অন্যান্য ওলামা-এ-কেরাম নিয়ে তাদের মুক্তির জন্যে লীগ সরকারের কাছে দাবী তোলেন এবং দেশজোড়া আন্দোলন ও প্রতিবাদ সভা করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহবান জানান।

আলেমদের গ্রেফতারীর ব্যাপারে পটভূমি তৈরির উদ্দেশ্যে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিকে অছিলা করা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃত আলেমদের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীও ছিলেন। "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক একখানা পুস্তক লেখার 'অপরাধে' তাঁকে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশবিদেশের জনমতের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে সরকার মৃত্যু দণ্ডাদেশকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করেন এবং ২০ মাস কারাবরণের পর ১৯৫৫ সালে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর দীর্ঘদিনের সাহাচর্য্য প্রাপ্ত বিশ্বস্ত তিন জন শিষ্য এ লেখককে জানিয়েছেন যে, মওলানা মওদূদীর ফাঁসির আদেশ শুনে সেদিন ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁরা মওদূদী সাহেবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত করণ ও আশুমুক্তির

জন্যে নিজে ও অন্যান্য লোকদের মারফত পাক-সরকারের কাছে হাজার হাজার টেলিগ্রাম ও দাবিনামা প্রেরণ করেছেন। কেননা তিনি এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মওলানা মওদূদী সাহেবের মতো ইসলামী আন্দোলনের একজন বিচক্ষণ মোজাহিদ নেতাকে ফাঁসি দেয়া হলে পাকিস্তানেরই নয় দুনিয়াময় ইসলামী আন্দোলন ও মুসলমান জাতির এক বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যাবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা ও পাকিস্তানকে খাঁটি শোষণহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন এবং বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। প্রসঙ্গতঃ সে সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা বলতে হয়। অন্যথায় তাঁর জীবনের সঠিক মূল্যায়নের দিক থেকে ত্রুটি থাকবে বৈ কি। ১৯৫৩ সালে সর্বদলীয় আলেমদের ২২ দফা মূলনীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা বানচালের ষড়যন্ত্র সাময়িক ভাবে কাদিয়ানী দাঙ্গার ছুতা ধরে কিছুটা জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে নিতে চেষ্ট করলেও আন্দোলন অব্যাহতই ছিল। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে তা জোরদার হতে থাকলো। কিন্তু অন্যদিক শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা দিল। তারই পরিণতিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র নিয়ে অধিক টানবাহানাকারী গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ উজিরে আজম খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করে দেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত ফ্রণ্টের কাছে মুসলিম লীগ নির্বাচনে হেরে যায়।

১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ ব্যতীত এখানে উল্লেখযোগ্য তিনটি রাজনৈতিক দল ছিল। মুসলিমলীগ ত্যাগকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে (১) আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং শেরেবাংলা মওলভী এ. কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে (২) কৃষক শ্রমিক পার্টি। জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের বহত্তর অংশ মওলানা আতহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে (৩) নেজামে ইসলাম পার্টি (অবশ্য নেজামে ইসলাম পার্টির নেতারা তাঁদের পার্টিকে জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামেরই পার্লামেণ্টারী দল হিসাবেই পরিচয় দিতেন।)

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের হাত থেকে ক্ষমতা হাতে আনা ছাড়া কারুর দাবি দাওয়াই পূরণ হবার নয়—এযুক্তিতে লীগ বিরোধী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ২১ দফা'র ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট কায়েম করে এবং সবাই ইসলামী শাসন কায়েমের ওয়াদা করেন।

কিন্তু মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও অন্যতম জমিয়ত নেতা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ মুসলীমলীগ ত্যাগ করে জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের পার্লামেন্টারী দল গঠন ও নেজামে ইসলাম পার্টির যুক্ত ফ্রন্টে শরিক হবার প্রশ্নে নেজাম নেতাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেণ। তাঁরা যুক্তফ্রণ্ট অপেক্ষা মুসলিম লীগকেই তুলনামূলক ভাবে শ্রেয় মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম লীগ ৫৪-এর নির্বাচনে জয়ী হলে বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা। কেননা, মুসলিম লীগ নেতারা বহু নাকানি চুবানীর আশঙ্কা দেখে তাদের কাছে এমর্মে লিখিত ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমরা শেষ বারের মতো ওয়াদা দিচ্ছি যে, ভোটে জয়যুক্ত হলে ইসলামী শাসন কায়েম করবো। ২৫টি আসন আলেমদের জন্যে ছেড়ে দেবো, যেগুলোর মনোনয়নের দায়িত্বভার থাকবে মওলানা ফরিদপুরীর উপর। কিন্তু নেজাম নেতারা মুসলিম লীগের এ ওয়াদা বিশ্বাস করেননি। মওলানা ফরিদপুরী মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী দলের সদস্য থাকার যে কথা পূর্বে বলা হয়েছিল, সেটা এসময়েরই কথা। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ এবং মওলানা শামসুলহক ফরিদপুরীর দৃষ্টিতে যুক্ত ফ্রণ্টের যেসব অঙ্গদল ছিল দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা ক্ষমতা লাভে সক্ষম হলে মুসলিমলীগ অপেক্ষাও ইসলামী শাসনতন্ত্রের সাথে অধিক বিশ্বাস ঘাতকতা করবে। এ ছাড়া তিনি মনে করতেন, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে এর এমন কিছু নেতৃত্ব গজিয়ে উঠবে যাদের দ্বারা দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও আঞ্চলিকতার ভাব অধিক মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং ইসলামী মূল্যেবোধের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হবে। পরন্তু কোনো স্থিতিশীল সরকার গঠিত হতে পারবেনা। এনিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টি তথা যুক্তফ্রন্টে যোগদানকারী জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পত্র-পত্রিকায় মওলানা সাহেবের তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করেননি। অথচ শেষে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হবার পর যুক্তফ্রন্টেরই কোনো কোনো প্রভাবশালী অঙ্গদল দেশের এ অঞ্চলে পৃথক নির্বাচন চালুর এবং জাতীয় পরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার বিরোধীতা করে। এছাড়া তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতা জাতীয় আশা-আকাঙ্খার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্য দিয়ে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই ফুটে উঠে। লীগ পার্লামেণ্টারী দলের অধিবেশনে মওলানা ফরিদপুরী বলেছিলেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে লীগ শতকরা ১০টির বেশি আসন পাবেনা। বাস্তবেও নির্বাচনী ফলাফল তাই হয়েছিল। তবে নেজাম নেতারা ঐসময় যুক্ত ফ্রন্টে যোগ না দিলে ৫৪ সালের মুসলিম লীগ বিরোধী জোয়ারে নির্বাচনে আলেম তথা ইসলামী শাসনতন্ত্র কামী-দের পাশ করাও কঠিন হতো বৈ কি। মওলানা আতহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম পার্টির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সদস্য, যুক্ত ফ্রন্টের প্লাটফরম থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন বলেই ১৯৫৬ সালে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর প্রধান মন্ত্রীত্বের সময় শাসনতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত ইসলামী রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য যুক্ত ফ্রন্টেরই কোনো কোনো অঙ্গদল (নির্বাচনী ওয়াদার বরখেলাফ) ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল।

যাহোক, অতঃপর নেজামে ইসলাম পার্টি ও তার জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের প্রচারের মুখে মওলানা ফরিদপুরীর মুসলিম লীগ সমর্থক জমিয়তের প্রচার তেমন না থাকলেও মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খানের নেতৃত্বাধীন জমি-য়তে ওলামা-এ-ইসলাম ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যায়। মওলানা আতহার আলী সাহেবের হাতে নেজামে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামা-এ-ইস-লাম উভয়ের নেতৃত্ব চলে যাবার পরও মওলানা ফরিদপুরী ইসলামী আন্দো-লনে সকল সময় তাঁকে ও তাঁর দলকে পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

সে সময় দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম প্রভৃতি পত্র-পত্রি-কায় পৃথক নির্বাচনের সপক্ষে তিনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে লীগ নেতাদের গড়িমসির ফলে ১৯৫৪ সালে অধিকাংশ আলেম তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়াতে এবং নেজামে ইসলাম পার্টির

মাধ্যমে যুক্ত ফ্রণ্টে চলে যাওয়াতেই পূর্ব পাকিস্তানে লীগের ভরাডুবি ঘটেছে, এ অনুভূতি থেকেই কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকার দ্রুত ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হন। তৎকালীন উজিরে আজম বগুড়ার মুহম্মদ আলী ১৯৫৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জাতিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র দেবেন বলে ওয়াদা প্রদান করেন। কিন্তু তাতে গভর্ণর গোলাম মুহাম্মদ অসন্তুষ্ট হয়ে যান। (৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর) তিনি ডিসেম্বর মাস আসার আগেই গণপরিষদ বাতিল করে দেন এবং কেন্দ্রে টেলেণ্টেড কেবিনেট -- প্রতিভাশালীদের মন্ত্রী সভা গঠন করেন। গভর্ণর তাদের সাথে শলাপরামর্শ করে জাতির ঘাড়ে অনৈসলামিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট গভর্ণরের এ ক্ষমতা নেই বলে রায় প্রদান করেন। ফলে ১৯৩৫ সালের মে মাসে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে নতুন গণপরিষদ নির্বাচিত হয়। ইতিমধ্যে গোলাম মোহাম্মদ বিদায় নেন এবং জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। মোহাম্মদ আলী নতুন সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় আলেমদের ২২ দফার আলোকে ১৯৫৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বিল অনুমোদিত হয়। ১৯৫৬ সালে ২৩শে মার্চ নয়া শাসনতন্ত্র কার্যকরী করার জন্যে সমগ্র জাতি ইসলামী শাসনতন্ত্র দিবস পালন করে। অন্যান্য আলেমদের সাথে এ সময় মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীও ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে মোটামুটি গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে জাতি তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে বলে আশ্বস্ত হন। এ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু পর্দার অন্তরালে থেকে ইসলাম বিরোধী ও স্বার্থবাদী চক্রের সহায়তায় ইস্কান্দর মীর্জা ও আইয়ুব খান চক্র ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক শাসন জারি পূর্বক ১৯৫৬ সালের আইনানুগ শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেয় এবং পাকিস্তানের যাবতীয় বিপর্যয়ের বীজ বপন করে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান তার মনগড়া এক শাসনতন্ত্র জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তাতে ইসলাম ও গণতন্ত্র ছিল নামকা ওয়াস্তে। ফলে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে আইয়ুব সরকার ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু অদূরদর্শী ও চরমপন্থী দু'জন নেতার বাড়াবাড়িতে জাতি গণতন্ত্র ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের একান্ত কাছে এসেও তা থেকে বঞ্চিত হয়।

গোটা দেশ ১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের সম্মুখীন হয়, যা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করে দেয়।

আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ

১৯৫৫ সাল। পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রীত্বের আমল। প্রদেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধনকল্পে তাঁরই নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্টে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ ছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে সময় এবং অর্থের অপচয়। এছাড়া ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী বিষয় উঠিয়ে ফেলার সুপারিশও তাতে ছিল।

ঐ রিপোর্ট সর্ব সাধারণে প্রকাশ হতে না হতেই তার বিরুদ্ধে দেশের ইসলামী জনতা প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে। সে সময় এ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী একজন। তিনি রিপোর্টের প্রতিবাদে সর্বত্র জনসভা করেছেন। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও এর প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি সংবাদপত্রে নিজের লেখা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ও অধ্যাপক গোলাম আজম—এ তিনজনের তিনটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পরই উক্ত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশ জোড়া ছাত্র জনতার মাঝে বিরাট আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। সেই আন্দোলনেরই একপর্যায়ে কোর্ট কাছারীর সম্মুখস্থ ঢাকার সাবেক 'ডিবি হলে' মওলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে ও কবি গোলাম মোস্তাফার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্রেরা উক্ত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আইয়ুব আমলে নির্ভীকতা

দীর্ঘ একযুগের অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা ও বহু আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রটি রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে এ উদ্দেশ্যে যারা শুরু থেকে কষ্ট পরিশ্রম করে আসছেন, আইয়ুব খানের মতো একজন সেনাপতি ক্ষমতায় এসেই উক্ত শাসনতন্ত্র বাতিল

ঘোষণা করলে স্বভাবতঃই তাদের অন্তরে অধিক ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়া ঐ শাসনতন্ত্রটি ছিল গোটা জাতি কর্তৃক গৃহীত। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীও একই কারণে অর্থাৎ '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিলের ঘোষণায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। তবে তিনি উদ্যম হারাননি। বিরোধীতার ধরন হয়তো ভিন্ন প্রকারের হবে কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই নিশ্চুপ থাকা যাবে না, সুতরাং মওলানা সাহেবের পরামর্শ ও সহযোগিতা ক্রমে আইয়ুব শাসন প্রবর্তিত হবার কিছুদিন পরই ঢাকার স্বাটন রোডস্থ মসজিদ প্রাঙ্গনে ও তার এক বছর পর (১৯৬০ সালে) সিদ্ধেশ্বরীতে যথাক্রমে একটি সিম্পোজিয়াম ও একটি ইসলামিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটির উদ্যোক্তা ছিল 'মজলিসে তামীরে মিল্লাত।'

এ সময় সকলপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা ও সভাসমিতি নিষিদ্ধ থাকলেও সীরাতুন্নবী জলসা ও ইসলামের শিক্ষা আদর্শের আলোচনামূলক সভাসমিতি নিষিদ্ধ ছিল না। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও তাঁর সহকর্মী ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা অতঃপর ঢাকার বাইরেও একই পদ্ধতিতে ইসলামী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করতে থাকেন। বলাবাহুল্য, সারা দেশের সকল শ্রেণীর ওলামা, ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীবৃন্দ আইয়ুব শাসনের শুরুতে অনেকটা কিংকর্তব্য বিমূঢ় ছিলেন। মওলানা ফরিদপুরী সাহেব নির্ভীকতার সাথে ইসলামের নামে বের হয়ে পড়ায় সকলের মধ্যেই এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। চলমান ইসলামী আন্দোলনের গতি আইয়ুবী সামরিক আইনের ফলে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেও এভাবে পুনর্বার ইসলামী আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই একটি সম্প্রদায় কর্তৃক কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার ঘোর বিরোধিতার কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তারা এ থেকে পাশকেটে যাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছে। এমনকি মরহুম তমিজউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনে প্রাথমিক আলোচনায় পাকিস্তানকে সেকুলার ষ্টেট (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র) করার পক্ষে এবং একে ধর্মরাষ্ট্র করার বিপক্ষে অধিকাংশ সদস্যের অনুকূল মতামত গ্রহণেও ঐ মহলটি অনেকটা সফলতা লাভ করেছিল। গণপরিষদে বক্তৃতাদানকারী

সদস্যদের বক্তব্য শেষে স্পীকার মরহুম তমীজুদ্দীন খান পরিষদের অন্যতম সদস্য মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানীর প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ জানালেন। মওলানা উসমানী তখন লীগ সদস্যদের বক্তৃতা শোনার পর বিস্ময়ের এক অতলান্ত সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি পরিষদে দাঁড়িয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের সপক্ষে এমন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতা শেষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সপক্ষে মতামত ব্যক্তকারী প্রতিটি সদস্য তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করেন এবং মওলানা উসমানীর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান। ঐ অধিবেশনেই আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আদর্শ প্রস্তাব পাশের পথে আরোপিত কুচক্রিমহলের সকল ষড়যন্ত্র জাল বানচাল হয়ে যাওয়ায়, তারা ইসলামের মৌলিক উৎস কোরআন ও সুন্নাহ থেকে একটিকে অর্থাৎ সুন্নাহকে পৃথক করার জন্যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। "মুনকেরীনে হাদীস" অর্থাৎ হাদীস অস্বীকার কারীদের পেছনে দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সমর্থন ছিল। পাকিস্তানের মৌলিক বিষয়াদিতে তাদের ছিল গভীর হাত। তাদেরই তরফ থেকে করাচীর দৈনিক পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ জাফরী সুন্নাহর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে, সারা দেশব্যাপী '৫৫ সালে এর প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সে সময় 'ফিৎনা-এ-এনকারে হাদীসের" বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম আইনে সুন্নাহ্‌র গুরুত্বকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন। জাফরীর উক্তির প্রতিবাদে ঢাকাতে ১৯৫৫ সালে বিরাট ওলামা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

মুনকেরীন-এ-হাদীস তখনকার মতো প্রকাশ্যে এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করা থেকে বিরত থাকলেও সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে তাদের শিকড় মজবুত থাকায় পরোক্ষভাবে সুন্নাহ্ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। বলাবাহুল্য এ মহলটিই সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস না পেয়ে ইসলামকে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপনের নামে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়। মুনকির-এ-হাদীস এবং কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনসটিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর ফজলুর রহমান একদিকে ইসলামকে আধুনিকীকরণের গবেষণায় নিয়োজিত হন, অপরদিকে আইয়ুবকে দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধ বর্জিত সমাজের উপরতলার অত্যা-

ধুনিকা কিছু মহিলার চাপে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে একটি কোর-আন সুন্নাহ্ বিরোধী আইন চালু করার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করে। দেশে সামরিক আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় এর বিরুদ্ধে তখন কোনো কথা বলা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার ছিল বৈ কি। কিন্তু মওলানা সাহেব এর কোনো তোয়াক্কা না করে আইয়ুবের পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের এ ব্যাপারে বিশিষ্ট কতিপয় আলেমের নিকট থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ কালে যথেষ্ট উদ্যোগের পরিচয় দেন। পরিবার আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি নির্দেশ করে লিখিত এবং আলেমদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বই প্রকাশ করা হয়। ঐ বইতে মওলানা ফরিদপুরী ও দেশের অন্যান্য খ্যাতনামা ওলামা-এ-কেরাম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্যে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবের নিকট দাবি জানান। উক্ত পারিবারিক আইনের বিরোধীতায় জনমত গঠন ও সাথে সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবিতে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতেও তিনি অংশ নেন।

মওলানা ফরিদপুরী সাহেব নিজে পরিবারিক আইন এবং আইয়ুব প্রবর্তিত জন্মনিয়ন্ত্রণের আইনের বিরুদ্ধে আলাদা দু'খানা বই রচনা করেন। এ পুস্তক দু'খানা এবং তাঁর পক্ষ থেকে সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনার জন্যে তাঁকে আইয়ুব সরকারের রোষাণলে পড়তে হয়। ১৯৬২ সালে মওলানা ফরিদপুরী এবং তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী নেতা মওলানা আব্দুর রহীমকে পরিবার আইনের সমালোচনার জন্যে ঢাকার ডিপুটি কমিশনার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজ নিজ নীতির উপর সম্পূর্ন অটল থাকেন।

মার্শাল-ল'ভঙ্গ করা

পারিবারিক আইনের ব্যাপারে সরকারকে টেলিগ্রাম ও পত্রের দ্বারা দেশের ইসলামী জনতার মনোভাব জানানো অব্যাহত থাকে। অতঃপর সরকারবিষ য়টি আঁচ করতে পেরে অর্ডিনেসটি ধামাচাপা দিয়ে রাখেন এবং এটিকে শিথিল করে ঐচ্ছিকের পর্যায়ে নিয়ে আসেন। এদিকে আইয়ুব সরকার ফরিদপুরীকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, তিনি যেন মার্শাল ল'র বিরোধিতা না করেন। কিন্তু তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর কাজ করেই যেতে থাকেন। পুনঃর্বার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ও ঢাকা বিভাগের কমিশনারের মাধ্যমে তাকে মার্শাল ল-এর বিরোধিতা না করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু

তারপরও তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে এক শুক্রবারে সারা দেশে একটি ফতোয়া জারি করা হয় এবং সর্বত্র মিছিল ও হরতাল আহবান করা হয়। সরকার একথা জানতে পেরে সান্ধ্য আইন জারি করেন। তা সত্ত্বেও শোভা যাত্রা বের হয়। আইয়ুব সরকার তখন উক্ত অর্ডিনেন্স আইন পরিষদের হাতে ন্যস্ত করেন। তারপর কমিশনার তঁাকে আবার ডেকে নিয়ে বল্লেন যে, আপনি কি জানেন না যে, বর্তমানে দেশে মার্শলল' ও সান্ধ্য আইন জারি আছে? সরকার পুনঃরায় আপনাকে এ ব্যাপারে সাবধান করতে আমাকে বলেছেন। মওলানা ফরিদপুরী জবাবে বলেছিলেন, "আমারও একজন সরকার আছে। সে সকরকারের নির্দেশ হলো, তুমি কোরআন বিরোধী আইনের বিরোধীতা করো। তাই আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য।" কমিশনার তখন মওলানা সাহেবকে বিদায় দিয়ে বিষয়টি উর্ধতন মহলকে জানান। কিন্তু আইয়ুব খান তাঁকে গ্রেফতার করার অর্ডার দিতে সাহস করেন নি।

দশ লাখ টাকা প্রত্যাখান ও আইয়ুব খানের সাথে বাকযুদ্ধ

মওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী ইসলামের নীতি আদর্শের উপর ছিলেন ইস্পাত কঠিন। কোনো হুমকি বা লোভ প্রলোভন তাঁকে চুল পরিমানও ইসলামী আদর্শ থেকে টলাতে পারতো না। তাঁর জীবনে বিভিন্ন জটিল মুহূর্তেও নীতি, আদর্শ নিষ্ঠার যেমন বহু প্রমাণ মিলে, তেমনি বিপুল পরিমাণ অর্থ-প্রলোভনের প্রতি ঘৃণাভরে উপেক্ষা প্রদর্শনেরও বহু দৃষ্টান্ত তিনি রেখে যান। খাটি খোদাভীরু ঈমানদিপ্ত আল্লাহ্‌র একজন অতি প্রিয় মোজাহিদ বান্দাই শুধু এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নিজেকে স্থির রাখতে পারেন এবং নির্ভীক চিত্তে অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হবার ক্ষমতা রাখেন। মওলানা শামসুল হক সাহেবের জীবনেও তাই দেখা যায়।

পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণার সামনে পরাজিত মনের অধিকারী অন্যান্য মুসলিম শাসকদের ন্যায় আইয়ুব খানের মধ্যেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে হীনমন্যতা ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে সরাসরি দেশের ইসলামী জনতার মতের বিরুদ্ধে কিছু করাও ছিল অসুবিধা। তাই তিনি হাদীস অস্বীকারকারী এবং দুর্বল ঈমানের কিছু সংখ্যক চতুর বুদ্ধিজীবীর পরামর্শে ইসলামী আবরণের মধ্য দিয়েই ইসলাম পরিপন্থী পদক্ষেপ সমূহ

গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামকে আধুনিকীকরণের উদ্ভট মনোবৃত্তি ছিল তাঁর মধ্যে প্রকট। কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনষ্টিটিউট এবং ঢাকার ইসলামিক একাডেমীতে বিশেষ চিন্তার দু'জন ডিরেক্টর নিয়োগ থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুরুতেই দেশের বিচক্ষণ ও খাঁটি আলেমগণ ইসলামকে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপের প্রতিবাদ করায়, আইয়ুব খান তাঁর সপক্ষে কিছু আলেম হাত করার চেষ্টা করেন। যেহেতু প্রতি যুগে যুগেই কিছু না কিছু দুনিয়াদার স্বার্থপর ধর্মব্যবসায়ী আলেম থাকেন, অর্থ এবং পদলিপ্সায় পড়ে যেকোনো বাতিলপন্থী শাসকের "হাঁ"-এর সাথে হাঁ এবং "না" এর সাথে 'না' মিলাতে তাদের একটুও বিবেকে বাধে না। আইয়ুব আমলেও একই ধরনের কিছু আলেম পাওয়া যায়নি যে এমন নয়। কিন্তু দেশের ইসলামী জনতা এই স্বার্থপরদের কথা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মুসলিম পরিবারিক আইন তৈরীর পর আইয়ুব খান মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে একাধিক বার দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নানা অজুহাতে তার থেকে দূরে সরে থাকতেন। অতঃপর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যখন তিনি ১৯৬৪ সালে রাওয়ালপিণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন, সেসময় তাকে হাতের কাছে পেয়ে তাবেদার বানাবার জোর প্রচেষ্টা চলে। প্রায় সময় তাঁর কাছে লোক পাঠানো হয়। মওলানা সাহেব বহু চিন্তা ভাবনার পর তথাকথিত মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন ও অন্যান্য অনৈসলামিক পদক্ষেপের ব্যাপারে সরাসরী আইয়ুব খানের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর একদিন তিনি প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর পারিবারিক আইন বাতিল করার জন্যে তাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় ঘটেনি। অতঃপর তিনি পুনর্বার হাসপাতালে আসার পর পূর্ব পাকিস্তানী বিশিষ্ট তিন জন মন্ত্রীর মাধ্যমে গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার নাম করে তাঁর কাছে দশ লাখ টাকার একটি চেক পাঠানো হয়। তাঁকে এতদূরও বলা হয় যে, এসব টাকার কোনো হিসাব চাওয়া হবে না। মওলানা ফরিদপুরী সাহেব উক্ত দশলাখ টাকার চেক ফেরত দিয়ে মন্তব্য করেন, "খান সাহেব মনে করেছেন, টাকার দ্বারা শামসুল হককে কেনা যাবে। তা ইনশাআল্লহ কোনো দিনই সম্ভব হবে না।" অবশেষে তাঁকে এক সরকারী ভোজ সভায় দাওয়াত গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া

হলো। তিনি ছাফ জবাব দিয়েছিলেন যে, যার নীতিকে সমর্থন করতে পারি না, যার টাকা ফেরৎ দিলাম, তার দাওয়াতে যাওয়া কি করে সঙ্গত হতে পারে ?

সরকারের মনগড়া ঈদের বিরোধিতা

১৯৬১ সালে ঈদের চাঁদ নিয়ে আইয়ুব সরকার এক হটকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। গভীর রাতে করাচীতে চাঁদ দেখা গেছে বলে পূর্ব পাকিস্তানেও ঐ অনুসারে পরদিন ঈদ করতে হবে, এ মর্মে তৎকালীন গভর্ণরের কাছে নির্দেশ আসলো অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কোনো জেলাতেই চাঁদ দেখার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণর মোনায়েম খানের নির্দেশে স্থানীয় ডিসি মওলানাকে পরদিন ঈদ করার কথা বল্লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরং মাইক যোগে সকলকে ঐদিন ঈদ না করার জন্যে সর্বত্র ঘোষণা করে দেন। অতঃপর ডিসি পুনরায় গভর্ণরের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে বলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন যে, "ডিপুটি কমিশনার সাহেব, আপনি দয়া করে আবদুল মোনায়েম সাহেবকে বলে দেবেন, এ অবস্থায় আমি মোনায়েম সরকারের আদেশ অনুরোধ কিছুই মানতে রাজী নই।" উল্লেখ যে, প্রত্যেক এলাকার অন্তত পাঁচ শত মাইলের ভিতরে চাঁদ দেখা গেলে তখনই ঐ এলাকায় পরদিন ঈদ করা যায়। এর চাইতে দূরবর্তী এলাকায় চাঁদ উঠার খবরে ঈদ করা শরীয়ত সম্মত নয়। মওলানা ফরিদপুরী সাহেব এ নীতির উপর অটল ছিলেন। এবং সরকারের চাপের মুখে পরদিন ঈদ করে মহান একটি ফরজ রোযা নষ্ট করার মতো জঘন্য কাজ করতে কিছুতেই রাজি হননি।

আইয়ুব শাসনামলে ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় বার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে আইয়ুব খান করাচীতে এক ওলামা ও মাশায়েখ কনফারেন্স আহবান করেছিলেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী এ কনফারেন্সের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেননি। আইয়ুব খানের প্রতি সমর্থন জানাননি। অবশ্য তারই এক সপ্তাহ পূর্বে পীর মাশায়েখের মধ্য থেকে এদেশের কেউ কেউ ঢাকার চক মসজিদে অনুষ্ঠিত এক ওলামা সম্মেলনে কোরআনের কাফের, ফাসেক ও জালেম সম্পর্কিত

আয়াত যারা পরোক্ষভাবে আইয়ুবের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু বিমানের মুফত টিকেট পেয়েই নিজেদের সব বক্তব্য বেমালুম ভুলে গিয়ে উক্ত কনফারেন্সে গিয়ে যোগ দিতে ও পরে আইয়ুব সমর্থক বনে যেতে তাদের দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, আইয়ুবের পারিবারিক আইন-সহ ইসলামিক সকল কাজের সমালোচনাকারী ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম রত অনেক নিষ্ঠাবান মোজাহিদকে এহেন ব্যক্তিরাই আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের খারিজ বলে ফতোয়া দিতেও কুন্ঠিত হয়নি। যা হোক, অতঃপর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ফীল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান নিজেই ঢাকা আসেন এবং প্রেসিডেণ্ট ভবনে দেশের বিশিষ্ট ওলামা ও পীরদের দাওয়াত করে নেন। মওলানা ফরিদপুরী সাহেব প্রথমে ওলামা প্রতিনিধি দলের সাথে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেণ্টের এই বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃত জানিয়ে ছিলেন। পরে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ও মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর অনুরোধে যেতে সম্মত হন। তবে মওলানা সাহেব মজলিসে কিঞ্চিৎ বিলম্বে পেঁৗছেন এবং গিয়ে প্রেসিডেণ্টের সম্মুখস্থ আসনেই তশরিফ রাখেন। উক্ত বৈঠকে বিশিষ্ট মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। খান সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন নির্বাচনে আগত পীর-ওলামাগণ তাকে সমর্থন জানাবেন, এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি তাদের বিদায় দেবেন। কারও কারও সাথে করাচীতে কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আলেমদের মতে আনতে হলে মওলানা ফরিদপুরীকে অবশ্যই মতে আনতে হবে, এ জন্যে এখানে এই আয়োজন। এক পর্যায়ে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব সবাইকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "আশা করি আসন্ন নির্বাচনে আপনারা আমার প্রতি সমর্থন জানাবেন।" প্রেসিডেণ্টের কথা শেষ হতে না হতেই কোনো কোনো মাকা মারা ব্যক্তি তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, ঐ দু'একজন পূর্ব থেকেই এ জন্যে তৈরি হয়ে আছিলেন। কিন্তু নির্ভীক মোজাহিদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী মুজাদ্দেদে আলফেছানীর নৈতিক দৃঢ়তা নিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবকে সরাসরি তাঁর মুখের উপর জিজ্ঞেস করে বসলেন যে, আপনি নিজের বিগত দীর্ঘ কয় বছরের শাসনামলে পাকিস্তান তথা ইসলামের উন্নতিকল্পে এমন কি কাজ করেছেন, যদ্দরুন আলেম সমাজ আপনাকে সমর্থন করতে পারে?" আইয়ুব খান বল্লেন, "আমি বহু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করেছি।" স্কুলের অষ্টম শ্রেণী থেকে ইসলামিয়াত ও আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। মাদ্রাসায় ফাজেল পাসের পর আইএ ভর্তি হবার সুযোগ দিয়েছি।" জবাবে মওলানা ফরিদপুরী বল্লেন, "আপনি ইসলামিয়াত শিক্ষা হ্রাস করে দিয়েছেন। ইসলাম বিরোধী শিক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ইংরেজ আমলে স্কুলে এর চাইতেও বেশী আরবী ছিল। ইসলামিয়াত ও আরবীকে আপনি ঐচ্ছিক্য বিষয়ে পরিণত করেছেন, এ স্থলে সে সময় ছিল বাধ্যতামূলক। এছাড়া আপনি ইসলামবিরোধী সহশিক্ষা চালু করেছেন। নাচ, গান, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে জরুরী বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। কোরআন বিরোধী "মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ করেছেন। শরীয়ত বিরোধী পরিবার-পরিকল্পনা আইন পাশ করে ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করেছেন। আপনার আমলে নগ্ন ছবি অশ্লীল গান, ইত্যাদির অধিক উন্নতি ঘটেছে। সুতরাং আপনি কোনো রকম সমর্থন পেতে পারেন না। তবে হাঁ পরিবার পরিকল্পনা, ও পারিবারিক আইন বাতিল করে যদি দেশে ইসলামী শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে আপনি অবশ্যই সমর্থন পাবেন। নিজে ভোট চাওয়ার দরকার হবে না, আমরাই এ ব্যাপারে চেষ্টা করবো।" আইয়ুব খান জানালেন, "এসব বিষয় আমি আইন পরিষদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এ সম্পর্কে কিছু করা আমার ক্ষমতার বাইরে। যা হোক আপনি আমাকে সমর্থন না করুন কিন্তু বিরোধিতা করবেননা—চুপ থাকবেন।" মওলানা শামসুল হক সাহেব তখন উত্তর দিলেন যে, "আমি আমার দায়িত্ব পালন করেই যাবো।" প্রসঙ্গত ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও ইসলামিক একাডেমীর কথাও আলোচিত হয়। ইসলামের সেবায় এগুলোর মাহাত্ম্য বর্ণনা শুরু করা হলে এক পর্যায়ে মওলানা ফরিদপুরী সাহেব মন্তব্য করেন যে, কার্যতঃ এগুলোর দ্বারা ইসলামের ফায়েদার পরিবর্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে—এসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইসলামের সেবার প্রচারণা 'বকওয়াস" ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। অতঃপর এনিয়ে কথা কাটাকাটি হতে হতে বিষয়টি রীতি মতো তিক্ত বাকযুদ্ধে পরিণত হলো। প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব এক পর্যায়ে রাগের মাথায় বলে বসেন যে, "দখিয়ে মওলানা, আপনেকো সাম্ভালকে বাত কিজিয়ে, মাই পাঠান কা বাচ্চা পাঠান হোঁ।" মওলানা ফরিদপুরীও তখন মুখের-উপর বলে দিয়েছিলেন'—"দেখিয়ে খানসাব, আপ আগার

পাঠান কা বাচ্চা পাঠান হাঁ, তো মাইভী মুসলমান কা বাচ্চা মুসলমান হোঁ। আল্লাহ্ কে সিওয়া মাই কিসীকো নাহী ডরতা হোঁ। আপহী বাতাইয়ে, ইয়েহ্ ধোকাবাজী নাহী তো কেয়া হ্যায়। এহাঁ আপ ইসলামিক একাডেমী বানায়া আওর এক এ্যায়সা আদমীকো উসকা ডিরেক্টর মোকার্রার কিয়া, যু নামাজ তক নাহী পড়্তা হ্যায়। ইয়েহ্ আদমী এহাঁ ইসলাম কা কেয়া রিসার্চ কারেগা? বেনামাজী ডিরেক্টর লেগোঁ কো বেনামাজীহী বানানেকা রিসার্চ কার সিক্তা হ্যায়। এ্যাসি তারহে ডক্টর ফজলুল রহমানকো আপ নে মারকেজী ইসলামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট কে ডিরেক্টর বানায়া, যু সুন্নাহ্ কো এন্‌কার কারতা হ্যায়। উয়হ্ আদমী রিসার্চ কারেগা, তো সাব মুসলমানোকো মুনকির-এ-হাদীস বানানেকা রিসার্চ কারেগা।"

অর্থাৎ—দেখুন খান সাহেব, আপনি যদি পাঠানের বাচ্চা পাঠান হয়ে থাকেন, জেনে রাখুন, আমিও মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান। আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আপনিই বলুন, এগুলো গল্প এবং ধোকাবাজি ছাড়া আর কি হতে পারে? এখানে আপনি ইসলামিক একাডেমী স্থাপন করেছেন এবং এমন একজন ব্যক্তিকে এর পরিচালক নিযুক্ত করেছেন যিনি খোদ নিজেই নামাজ আদায় করেন না। নামাজ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এহেন ব্যক্তি ইসলামের কি গবেষণাটা করবেন? বেনামাজী পরিচালক মানুষকে বেনামাজী করারই রিসার্চ করতে পারে। তার সংস্পর্শে এসে মানুষ বেনামাজীই হবে। এমনিভাবে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনসটিটিউটে ডক্টর ফজলুর রহমান কে পরিচালক নিযুক্ত করেছেন, যিনি খোদ নিজেই (ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মূল ভিত্তি) সুন্নাহ্‌কে অস্বীকারকারী। সে রিসার্চ করলে, সকল মুসলমানকে হাদীস অস্বীকারকারী রূপে গড়ে তোলারই রিসার্চ করবে।"

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে মওলানা সামসুল হক ফরিদপুরীর এ বাকবিতণ্ডা চলাকালে সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই অনেকটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, এমন একজন পরাক্রমশালী সামরিক অধিনায়ক ও রাষ্ট্র প্রধানকে তারই মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের সামনে এরূপ সরাসরি তীব্র সমালোচনা শাস্তিরও কারণ হতে পারতো। কেননা, সেটা ব্যক্তি-

গত মর্যাদার প্রশ্ন। চতুর্দিকে সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত এ পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসার সময় মওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী বলে আসলেন, "এখানে বসে কথা বলা ঈমানের ক্ষতি ছাড়া কিছু নয়, চলুন আমরা বের হয়ে যাই।"

বাদশাহ্ ফয়সলের আমন্ত্রণে মওলানা ফরিদপুরী

আইয়ুব খান মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর সাথে যুক্তিতে হেরে গিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহসী হননি। তবে অপর এক দিক দিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে ত্রুটি করেননি। সেটা হলো ঐ বছরই সৌদি আরবের বাদশাহ্ তাঁকে রাবেতা-এ-আলমে ইসলামীর মহাসম্মেলনে সৌদি আরবে যাবার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। ঐ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের সমস্যা, সংহতি ও দ্বীনী উন্নতি অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। মওলানা সাহেবকে আইয়ুব সরকার বিদেশ যাবার পাসপোর্ট দেননি। সেখানে মুসলিম বিশ্বের বহু রাজনীতিক অভিজ্ঞ ওলামা, ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ যোগদান করেছিলেন। বহু প্রতিক্ষার পর 'মুফতীয়ে আজম পাকিস্তান' মওলানা শফী সাহেবের মাধ্যমে রাওয়ালপিণ্ডি হেড কোয়ার্টার থেকে খবর নিয়ে কারণ জানা যায় যে, খোদ আইয়ুব খান তাঁকে বিদেশ যাবার অনুমতি দেয়ার জন্য অফিসে নিষেধ করে রেখেছেন। তাঁকে তিনি পাকিস্তানের "এক নম্বর শত্রু" বলেও মন্তব্য করেছিলেন।

গভর্ণর আজম খানের দরবারে মওলানা ফরিদপুরী

ন্যায়, সত্য ও দ্বীন শরীয়তের প্রশ্নে মওলানা ফরিদপুরীর নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। গভর্ণর মুনায়েম খানের পূর্বে একবার গভর্ণর আজম খান এভাবে ওলামা প্রতিনিধিদের সাথে গভর্ণর হাউজে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি ওয়াজ নছীহতের দ্বারা জনগণকে সৎ নাগরিকে পরিণত করার জন্যে আলেম সমাজের প্রতি আহবান জানিয়ে ছিলেন। মওলানা ফরিদপুরী তখন আজম খানকে বলেছিলেন, "মোহতারাম গভর্ণর ছাহেব। ডক্টর বিমারকো কিৎনাহী আচ্ছা দাওয়া কেউ না পিলায়ে, আগার বিমারকী তরফ সে হামেশা বদপরহেজী চলতি রাহে, তু দাওয়া কারেগার না হোগা।

অর্থাৎ "রুগী ওষুধও খাবে কুপথ্যও খাবে তা হবে না—তাতে রোগের কোনো উপশম ঘটবে না। ওষুধ খাবার সাথে সাথে কুপথ্যও পরিহার করতে হবে।

সাহিত্য কর্মে ছাত্রদের উৎসাহ দান

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজ সাহিত্যে উন্নত সমাজের পাশাপাশি এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, বাঙ্গালী মুসলমানদের সাহিত্য, সাংবাদিকতা চর্চার মূলে শুরুতে যেসব মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা ও প্রেরণা কাজ করেছে, তাদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম। এক্ষেত্রে অন্তত: নিকট অতীতের দিকে তাকালেও যাদেরকে আমাদের সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করতে হয়, তাঁরা হলেন মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, মওলানা বাকী, মওলানা রুহুল আমীন, মওলানা আহমদ আলী, মওলভী মজিবুর রহমান প্রমুখ কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বাংলা সাহিত্য সাংবাদিকতায় আলেমরা পথিকৃৎ হলেও বাংলাদেশের মাদ্রাসা সমূহে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা এক রকম ছিল না বল্লেই চলে। এমনকি এক সময় কোনো কোনো মাদ্রাসা পাশ করা আলেম মাতৃভাষায় একখানা চিঠি লিখতেও হিমশিম খেয়ে যেতেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী মাদ্রাসায় মাতৃভাষা চর্চার এ দুরাবস্থা লক্ষ্য করে উদ্বেগ বোধ করেন। তিনি মাদ্রাসাসমূহে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের এবং ছাত্রদের বাংলা সাহিত্য চর্চার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেন। মাদ্রাসা বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসা সমূহে যেখানে সংবাদ পত্র পাঠ একরকম নিষিদ্ধ ছিল, তিনি ছাত্রদের জন্যে আলাদা পাঠাগার স্থাপন করে সংবাদপত্র পাঠ, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা, বই পুস্তক রচনা করা, ভাষান্তরিত করণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি মাদ্রাসা পাশ তরুণ ওলামা ও শিক্ষারত ছাত্রদের উদ্দেশে প্রায়ই বলতেন, এযুগে ইসলামের উপর যত হামলা আসছে, তার অধিকাংশই চিন্তামূলক বিষয়কে ভর করেই আসছে। ইসলাম দুশমনদের মোকাবেলায় আজকাল অতীতের তরবারির জেহাদের চাইতে কলমের জেহাদই মোক্ষম পন্থা। হাজার অস্ত্রধারী যা করতে না পারে একজন দুর্বল লেখক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে কলমরূপ হাতিয়ার দ্বারা দুশমনের মোকাবেলায় অধিক সফলতা অর্জন করতে পারে। মওলানা

শামসুলহক ফরিদপুরী নিজে একথা যে কত গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মই এর বড় প্রমাণ।

ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা

কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের প্রচার, প্রসার এবং যাবতীয় কুসংস্কার ও গোমরাহী থেকে তাদের রক্ষা করতে হলে বিপুল ইসলামী সাহিত্য তৈরি আবশ্যক। সাথে সাথে ঐ সকল সাহিত্যে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসা ও প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনকারী যুক্তি-প্রমাণাদি থাকাও জরুরী। মাদ্রাসা পাশ আলেম সমাজ শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর যাতে এ মহান দায়িত্ব সুচারু রূপে পালনে সক্ষম হন, এজন্যে তিনি কোরআন-হাদীসের গবেষণা, ভাষা, সাহিত্য চর্চা, পুস্তক রচনা ও অনুবাদ শিক্ষা ইত্যাদি জ্ঞান চর্চার খাতিরে একটি ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। সমচিন্তার অধিকারী ও তাঁর ইসলামী আন্দোলনের সাথী মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর পৃষ্ঠপোষকতায় ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় 'এদারাতুল মাআ'রিফ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, এটাই তাঁর এবং আজমী সাহেবের দীর্ঘদিনের চিন্তা এবং আকাঙ্খার ফসল ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ও মওলানা আজমীর প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা পাশ বেশ কিছু আলেম লেখক এখান থেকে তৈরি হয়। অবশ্য এ গবেষণাগারটি সংগঠনে অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মরহুম মওলানা বজলুর রহমান ও চট্টগ্রামের মওলানা হারুন সাহেবেরও বহু অবদান ছিল। ৭০-এর গোলযোগে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। ফরিদাবাদ মাদ্রাসার বর্তমান কর্মকর্তাগণ চেষ্টা করলে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির কাজ পুনঃরায় শুরুও হতে পারে।

খৃষ্টান মিশনারীদের মোকাবেলা

মুসলিম জনবহুল বাংলাদেশ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিক সমস্যাই এখানকার প্রকট ; এছাড়া মাঝে মধ্যে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার দারিদ্র পীড়িত মানুষকে আরও দিশাহারা করে তোলে। এসব কারণে দুঃস্থ মানুষের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এখানকার এই দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র মোচন ও দুঃখী মানুষদের মুখে হাসি ফুটাবার যথাযথ পদক্ষেপ- সরকারী বেসরকারী কোনো পর্যায়েই তেমন একটা নেই বল্লে চলে। সকলে নিজেকে নিয়ে

বেশি ব্যস্ত। ফলে বিপুল সংখ্যক সর্বহারা মানুষকে খৃষ্টান মিশনারীরা সাহায্যদানে অনায়াসেই ধর্মান্তরিত করে চলেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড ও বিশেষ করে উপজাতীয় এলাকার হাজার হাজার মুসলমানকে খৃষ্টান মিশনারীরা সেবামূলক কাজের দ্বারা আকৃষ্ট করে খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী করে ফেলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ গঠিত হবার পর তৎকালীন সরকার ৩০ লাখ শিশুকে দত্তক হিসাবে বিদেশে পাঠান। তারা খৃষ্টান মিশনসমূহের তত্ত্বাবধানেই লালিত পালিত হচ্ছে ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভ করছে। পরিণত বয়সে এসব শিশু কোন্ ধর্মাবলম্বী হয়ে বাংলাদেশে আসবে? এদেশ এবং তার প্রতিবেশী ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় রাজ্য সমূহে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা লক্ষ্য করে ইতিমধ্যেই সমাজের বহু সচেতন ব্যক্তি বাংলাদেশকে সুদূর ভবিষ্যতে বৈরুতে পরিণত করার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। মওলানা ফরিদপুরী ১৯৬২ সালে এদেশের খৃষ্টান তৎপরতার দিকে বিশেষ মনযোগ দেন। তিনি মওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী ও দেশের অন্যান্য ওলামা-এ-কেরামের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করে মুসলিম ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। খৃষ্টান মতবাদ খণ্ডন করে (১) পাদ্রীদের গোমর ফাঁক (২) আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়? (৩) শত্রু থেকে হুশিয়ার থাকো (৪) চারি ইঞ্জিল ইত্যাদি বই লিখেন এবং সাথে সাথে ইতিবাচক কাজ হিসাবে কিছু সেবামূলক কাজেও হাত দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খাদেমুল ইসলাম জমায়াতে'-এর কর্মীরা অনেক স্থানে দুস্থ মানুষের সেবামূলক অনেক কাজও করেছে। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন "ইসলামের সবচাইতে বেশি দুশমনী করেছে ইহুদী খৃষ্টানরা। তারা সর্ব কালে সবযুগে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় আছে। মহানবীকে একবার উপর থেকে পাথর ফেলে হত্যা করতে চেয়েছে। একবার হাদিয়া স্বরূপ প্রেরিত খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে। খোলাফা-এ-রাশেদীন এবং বনী উমাইয়াদের শাসন কালে তারা অনেক জাল হাদীস সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। আব্বাসীয় শাসনামলে মদীনা থেকে মহানবীর লাশ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল।" এছাড়া মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে কলহ সৃষ্টির ইন্ধন যোগাতে তাদের জুড়ি নেই। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর হত্যা ও সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম ইতিহাসের যে কলঙ্কজনক কয়টি

রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছে, তাতে তাদেরই চক্রান্ত অধিক কাজ করেছে। আব-দুল্লাহ্ বিন সাবার অনুসারীদের উসকানি ও ষড়যন্ত্রই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এমনকি যে তিনজন ব্যক্তি তাঁর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, অনেক ঐতিহাসিকের মতে ঐগুলো ইহুদী-খৃষ্টানদেরই চর ছিল।

বস্তুতঃ খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতার মোকাবিলায় ইসলামী প্রচার ও সেবা কাযের জন্যেই মওলানা ফরিদপুরী সাহেব তাঁর খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের শাখা হিসাবে 'আঞ্জুমনে তাবলীগুল কোরআন' নামে একটি জামায়াত গঠন করে-ছিলেন। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা জাফর আহমদ উসমানী এবং যথা-ক্রমে সভাপতি সেক্রেটারী ছিলেন মওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ এবং মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার ও খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য তিনি উল্লেখিত আঞ্জুমনের তরফ থেকে কয়েক জন কর্মীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করেন।

কোরআনিয়া মক্তব প্রতিষ্ঠার অভিযান

শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। কোনো মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বীনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকলে, সে সমাজ অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মচ্যুত হয়ে পড়বে। এ দেশে ইসলামী আধিপত্যের যুগ থেকেই কোরআনিয়া মকতবসমূহ মুসলিম ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাগার হিসাবে চলে আসছে। কিন্তু পঞ্চাশের মাঝামাঝিতে জেনারেল লাইনের প্রাইমারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে সেখানে ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক করার ষড়যন্ত্র টের পেয়ে মওলানা ফরীদপুরী এক দিকে যেমন এহেন সুপারিশ সম্বলিত আতাউর রহমান শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন, তেমনি সারা দেশময় গ্রামে গ্রামে কোরআনিয়া মকতব ও হেফ্জখানা প্রতিষ্ঠার এক অভিযান চালান। তাঁর ভক্ত-অনুসারী ও বন্ধুবান্ধব সকল ওলামা-এ-কেরাম তাঁর এ উদ্যোগে বিশেষ ভাবে সাড়া দেন। খোদার ফজলে বর্তমানে সারা দেশে অসংখ্য মকতব ও হেফজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। মওলানা ফরিদ-পুরী সাহেব এ ব্যাপারে অধিক উদ্বিগ্ন হবার কারণ এই ছিল যে, প্রাই-মারী শিক্ষা যদি বাধ্যতামূলক হয় এবং সেখানে ধর্মশিক্ষা ঐচ্ছিক বা স্কুল

মার্কা হয়, তা হলে দ্বীনী শিক্ষার জড়ই কেটে দেয়া হবে। দেশের কওমী ও সরকারী মাদ্রাসাগুলোতে মকতব থেকে ছাত্র জোগান দেয়া না হলে প্রতিষ্ঠিত সকল শ্রেণীর মাদ্রাসাতেই কয়েক বছরের মধ্যে তালা পড়ে যাবে। কোরআনিয়া মকতবগুলোকেই মুসলিম সমাজের প্রাইমারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ণ মর্যাদায় উন্নীত করার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ছিল। এখান থেকে প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা লাভের পর এবার কেউ মাদ্রাসায়, কেউ বা অন্য কোনো শিক্ষা লাইনে যাবে। যারা পরে কোনো লেখাপড়া করবেনা তারাও ইসলামী মৌলিক বিষয়সমূহ এ ধরনের প্রাইমারীতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। মওলানা ফরিদপুরীর মকতব প্রতিষ্ঠার অভিযান একটি সময়োচিত এবং জরুরী পদক্ষেপই ছিল।

"কোরআন তহবিল" গঠনে উৎসাহ দান

আল্লাহ্‌র পথ এবং গাইরুল্লাহ্‌র পথের পার্থক্য জানার জন্যে এটি একটি বড় প্রমাণ যে, কেউ আল্লাহ্‌র পথের সন্ধান পেলে গোটা দুনিয়াবাসীকে এদিকে টেনে আনতে চায় আর দুনিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হলে মানুষ অপরকে সহজে সে পথের সন্ধান দিতে চায়না। চাইলেও ঐ পর্যন্তই, যে পরিমানের দ্বারা তার নিজ স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা না থাকে। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী আল্লাহ্‌র পথের সাধনার স্বাদ পেয়েছিলেন। তাই গোটা জাতিকে তিনি এপথে আনার জন্যেই সদা ব্যস্ত থাকতেন এবং এ পথ থেকে কারুর বিচ্যুতি কিংবা অপর কেউ এ পথের পরিবর্তে জাতিকে ভিন্ন পথে নিবার চেষ্টা করলে, তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠতো। তাই আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহবানের নির্ধারিত কর্মসূচীর বাইরেও তিনি কিছু কাজ করতেন। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি মাঝে মাঝে অনেক জরুরী ইশ্‌তেহার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে জাতিকে ভালো কাজের প্রতি আদেশ কিংবা শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ বা মতবাদ থেকে দূরে সরে থাকার আহবান জানাতেন। এ ধরনেরই তাঁর একটি আহবান ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারে কোরআন তহবিল গঠন করার।

বর্তমানে দেখা যায়, সমাজের অনেক শিক্ষিত লোক খবরের কাগজ, সিনেমা পত্রিকা, নোভেল নাটক, রেডিও, টিভি, ক্যাসেট বিদেশী পত্রপত্রিকা

ইত্যাদি ক্রয়ে বহু টাকাপয়সা ব্যয় করলেও নিজের এবং নিজ পরিবারের লোকদের কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে কোনো টাকা-পয়সা ব্যয় করতে ইচ্ছুক নয়। কেউ নিজের ছেলে মেয়েকে কোনো আলেমের দ্বারা কোরআন মজিদ পড়াতে চাইলেও এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, ইংরেজী, অঙ্ক ও সঙ্গীত মাষ্টারকে মাসে যেখানে মোটা অংকের টাকা টিউশনী বাবত দিতে কুন্ঠিত হন না সেক্ষেত্রে মৌলভী সাহেবকে মাসে ১০০ টাকা দিতেও তার কলজে ছিঁড়ে যায়। পত্রপত্রিকা, সিনেমা, খেলাধূলার টিকেট ক্রয় ও অন্যান্য খাতে বহু অর্থ ব্যয় করলেও বাংলা অনুবাদবিশিষ্ট, কোরআন, হাদীস ও ধর্মীয় কোনো বই পুস্তক কেনার জন্যে তার কাছে টাকা থাকেনা। অতীতে এলাকাবাসী যৌথ উদ্যোগে অনেক সময় অপর বড় বড় কাজ করলেও কোরআন শিক্ষার জন্যে কোনো কোনো স্থানে কোরআনিয়া মকতব বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হলে সহায়ক মিলতো না। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে মহান আল্লাহ্‌র কালামের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া, এবং নিজের পরিবার বর্গকে সে সম্পর্কে জ্ঞানদান করার উদ্দেশ্যে দ্বীনী বই খরিদ করার জন্যে মওলানা ফরিদপুরী শিক্ষিত সমাজের প্রতি আহবান জানাতেন। তিনি বলতেন, নিজ নিজ এলাকায় মুসলিম ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার জন্যে বিশেষ একটি ঘর ও তার শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি খরচ বাবত হাসিমুখে অর্থ সাহায্য দানকে মুসলমানদের সৌভাগ্য জনক কাজ মনে করা উচিত। এসব কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হবার জন্যেই তিরি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে একটি কোরআন তহবিল গঠনের আহবান জানান। তাঁর এ আহবান যেমন অতি বাস্তবধর্মী তেমনি একটি অন্তর নিসৃত সুষ্ঠু পরিকল্পনা। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে "কোরআন তহবিল" নামক একটি তহবিল কায়েম থাকলে তার মধ্যদিয়ে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ধর্মীয় চাহিদা পূরণে যেমন তা সহায়ক, তেমনি এ উদ্যোগ ধর্মীয় ব্যাপারেও অধিক মনযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য। তিনি ১৯৬২ সালে "কোরআন তহবিল" গঠনের আহবানের সাথে কোরআনের যে একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা যেকোনো মুসলমানকে এব্যাপারে উদ্বুদ্ধ না করে পারেনা। তিনি লিখেছেন, কেয়ামতের ময়দানে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করবেন যে, "হে খোদা, আমার কওম তোমার এই কোরআন কে বাদ দিয়ে রেখেছিল।"

খাদেমুল ইসলাম জামায়াত প্রতিষ্ঠা

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর জীবনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বিভিন্ন ভাবে ইসলামের শিক্ষা আদর্শ বিস্তার। এজন্যে তিনি তাঁর দ্বীনী কাজের বহু-মুখী কর্মসূচীকে বাস্তব রূপদানের প্লাটফরম হিসাবে ১৯৪০ সালে "খাদে-মুল ইসলাম জামায়াত" নামক একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ জামাতের মাধ্যমে কর্মীদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বীনী দায়িত্ব পালনে প্রেরণই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ জামায়াতের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাউকে দিতেন তিনি মাদ্রাসা স্থাপন ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব কাউকে ওয়াজ নছীহতের দ্বারা ইসলাম প্রচারে, কাউকে মসজিদ সংগঠনে, কাউকে দ্বীনী বইপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার কাজে, কাউকে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে, কাউকে মসজিদে মসজিদে দ্বীনী বইয়ের লাইব্রেরী স্থাপনে। সাধারণ মানুষদের মাঝে ইসলাম বিস্তারে খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচীতে ছিল, বয়স্ক লোকদেরকে শিক্ষাদানের জন্যে দৈনিক সকালে নামাজের পর কিছু তালীম এবং সপ্তাহে এক দিন সকালে একত্রিত হয়ে দ্বীনী আলোচনা করা। যিকির-আযকার করা। যারা শিক্ষিত তাদের মাঝে দ্বীনী বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করা, মসজিদে পাঠ-চক্র কায়েম করে একজন বই পড়ে অন্যদেরকে শোনানো এবং পরে শ্রোতাকে পঠিত বিষয়ের সারমর্ম পুনঃরায় জিজ্ঞেস করা।

"খাদেমুল ইসলাম জামায়াত" ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্বে তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক তৎপরতা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, বই-পুস্তক রচনা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকে তেমন একটা মনযোগ দিতে পারেননি। আইয়ুব শাসনামলের প্রথম দিকে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এমনকি নেজামে ইসলাম, জমীয়তে ওলামা-এ-ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর মতো দলগুলোও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, তখন তিনি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে খাদেমুল ইসলাম জামায়াতকে মুসলিম ও ইসলামের খেদমতে জোরে শোরে কাজে লাগান। এ সংগঠনের তরফ থেকে খৃষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী, কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট (সমাজতন্ত্রী)-দের দুরভিসন্ধি ও প্রতারণা সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বেশ কয়েক খানা যুক্তিপূর্ণ বই প্রকাশ করা হয়।

ইমাম সমিতি গঠন

ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সকল সময় নিজের চিন্তার চাইতে ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি অবনতির চিন্তাই অধিক করতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় যখন তাঁর বার্ধক্য পীড়া দিনের দিন বেড়ে যেতে থাকলো, দ্বীনী ব্যাপারে তাঁর পর্ব চিন্তা আবং বৃদ্ধি পেলো। তাঁর আজীবনের চেষ্টা সাধনা যে মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল, সে কাজ চালু থাকার জন্যে তাঁর পরিকল্পিত সব সংস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজে বত- তিনি যেন তাঁর জীবদ্দশায় এটাই দেখে যেতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অনেক দিনের পরিকল্পনা দেশের মসজিদসমূহ সংগঠন ও ইমামদেরকে ঐক্য- বদ্ধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। ১৯৬৬ সালে খুলনা টাউন মসজিদে বিরাট ওলামা কনফারেন্স ডেকে 'আয়েম্মা-এ-মাছাজিদ' বা ইমাম সমিতি গঠন করেন এ সমিতি খুলনা বিভাগের ৫টি জেলার ইমামদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রিক না হওয়াতে তার তেমন প্রচার ছিল না

পীর বা আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষক রূপে মওলানা ফরিদপুরী

কোরআন সুন্নাহ্ তথা গোটা ইসলামের শিক্ষা আদর্শেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মশুদ্ধির দ্বারা মহান আল্লাহ্র প্রিয় বান্দায় পরিণত হওয়া। তাঁর ইচ্ছা বাসনার সামনে নিজেকে নিবেদিত করে দেয়া। এমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিভিন্ন বুজর্গ কোরআন সুন্নাহ্র আলোকে বিশেষ বিশেষ পন্থার উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলোকে তরীকা বলা হয়। ঐ সকল তরীকার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির বিশেষ চেষ্টা সাধনাই পরবর্তী পর্যায়ে "তাসাওফ' নামে খ্যাত হয়। তাসাওফের বিশেষ প্রক্রিয়ায় যারা বৈষয়িক স্বার্থের অতিরিক্ত লোভ পরিহার করে মুসলমানদেরকে খাটি ইসলামের অনুসারী করার প্রশিক্ষণ দেন, তাদেরকেই পীর এবং যারা প্রশিক্ষণ লাভ করেন তাদেরকে মুরীদ বলা হয়। মুরীদের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা পোষণকারী যিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে ইচ্ছুক। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী একজন খাটি পীর ছিলেন। তাঁর কাছে মুরীদ হবার পূর্বে করণীয় কাজ ছিল,—"জীবনের পণ" নামক তাঁর লিখিত একখানা বই সম্ভাব্য মুরীদকে ৩ বার পড়তে হতো। তা পড়ার পরও যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে মুরীদ হবার জন্যে জেদ করতো, তখন ঐ ব্যক্তিকে উক্ত বইয়ের

মাঝে উল্লেখিত কতিপয় অঙ্গিকারে আবদ্ধ হতে হতো এবং তাতে দস্তখত দিতে হতো। মওলানা সাহেব সাক্ষী হিসাবে তাতে দস্তখত করে মুরীদকে বইটি দিয়ে দিতেন। তারপর দ্বিতীয় সবকে তাকে নামাজ পড়তে বলতেন ও ৩য় সবকে আকিদুদ্দীন, পীরের পরিচয় ও মুরীদের কর্তব্য, কছদুচ্ছাবীল, হায়াতুল মুসলিমীন, বেহেশতী জেওর পড়তে বলতেন।

'তাসাওফ' সম্পর্কে মওলানা ফরিদপুরীর লিখিত 'তাছাওফ তত্ব' নামক একখান মূল্যবান পুস্তক আছে। তাসাওফ সম্পর্কিত তাঁর পুস্তকসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাসাওফ ও একে কেন্দ্র করে যেসব স্বার্থপরতা চলছে, সেসব বিষয় তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং খাটি অখাটি চিনার জন্যে বড় চমৎকার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মওলানা ফরিদপুরীর অবর্তমানে মারেফত, তরিকত, ইত্যাদি চর্চার জন্যে তিনি তাঁর মুরীদানকে "কছদুচ্ছাবীল" বাংলা কিতাব খানা পড়ার জন্যে বিশেষ উপদেশ দিয়ে যান।

মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সংযুক্তি প্রসঙ্গে

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী প্রথমে ইংরেজী ও পরে কোরআন হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় কি কি ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে, সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এ জন্যে তিনি ছিলেন উভয় শিক্ষারই সংস্কারের পক্ষপাতী। তাঁর মতে, দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে যেই হীনমন্যতা রয়েছে, তার প্রধান কারণ হলো, শুধু বস্তুবাদী শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞতা। এজন্যে তিনি আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কোরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে মুসলিম যুব সমাজকে আত্মসচেতন ও জাতীয় গৌরববোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীদার ছিলেন। তিনি তাঁর বইতে লিখে গেছেন, "ওহীর জ্ঞান তথা কোরআন সুন্নাহ্‌র শিক্ষার আলো ব্যতিরেকে মানব সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। ধর্মহীন কর্ম এবং কর্মহীন ধর্ম উভয় দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাই জাতিকে পুঙ্গ করে।"

মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসা সমূহে এক সময় মাতৃ-ভাষা বাংলার চর্চা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলের মতোই অস্পৃশ্য ছিল। এখন অনুরূপ

অবস্থা বিদ্যমান না থাকলেও কওমী মাদ্রাসায় বাংলা ভাষা যে এখনও উপেক্ষিত তা না বল্লেও চলে। ফলে ঐ সকল মাদ্রাসা থেকে আমাদের বহু প্রতিভাবান ছেলে পাশ করে বের হলেও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তর অঙ্গণে ইসলামী শিক্ষা আদর্শ প্রচারে তেমন অবদান রাখতে পারে না। অবশ্য দুএকটি ব্যতিক্রম আলাদা কথা। মওলানা ফরিদপুরী মাদ্রাসা থেকে এ দৃষ্টি-ভঙ্গি উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কোরআন হাদীসের জ্ঞানের পূর্ণতা ও তা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস, ভূগোল পাঠ্যভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন—যদিও তাঁর অনেক সহকর্মীর জন্যে সেটা নিজের প্রভাবাধীন মাদ্রাসাসমূহে আশানরূপ ভাবে চালু করতে পারেননি। দ্বীনী শিক্ষাবিস্তারে যুগচাহিদার এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টিকে তিনি একটি ইসলামী ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের দ্বারা ব্যাপক প্রসার দিতে আগ্রহী ছিলেন। আরও খুলে বলতে গেলে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই তিনি গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে আশাবাদী ছিলেন।

ইসলামী ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য হিসাবে ফরিদপুরী

আইয়ুব সরকারের আমলে ষাটের দশকের প্রথম দিকে কোনো দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে বড় রকমের সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা বের করার ব্যাপারটি ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সকল মাদ্রাসা থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীতে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়েছিল। স্মরণকালের ইতিহাসে সেটা ছিল এক বৃহত্তর ছাত্র শোভাযাত্রা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণর জেনারেল আজম খান মাদ্রাসা ছাত্রদের এ দাবী মেনে নেন এবং এ উদ্দেশ্যে ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনের নেতৃত্বে এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর শিক্ষা সম্পর্কিত উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকেও এ কমিশনের অন্যতম সদস্য করা হয়। কিন্তু আজম খানের পরবর্তী গভর্ণর মোনায়েম খাঁ সরকার টালবাহানা করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। এসব টালবাহানা দেখেই মওলানা ফরিদপুরী তৎকালীন ডি পি আই জনাব শামসুল হক সাহেবকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "জেনে রাখুন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ঢেলে সাজানো না হয়, তা হলে ভবিষ্যত বংশধররা ধর্ম শিক্ষা বঞ্চিত হয়ে চরিত্রহীন ও ইসলাম বিরোধী হবে। অতঃপর তার পরিণতি স্বরূপ ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়ে আসবে।"

কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দান

দ্বীনী শিক্ষা লাভ করার সাথে সাথে কিছু অর্থকরী শিক্ষাও যদি না থাকে তা হলে জীবিকা অর্জনের তাগিদে শিক্ষার্থীরা দ্বীনী শিক্ষাকেই ব্যবহার করতে থাককে। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় অনেক সময় দ্বীনী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যাহত হবার উপক্রম হয়। এখলাসে ত্রুটি দেখা দেবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বীনী শিক্ষা যাতে খালেছ দ্বীনী কাজেই ব্যবহৃত হয় এবং বৈষয়িক অর্থকরী কাজে তা ব্যবহার করতে না হয়, এজন্য মওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) দ্বীনী মাদ্রাসা সমূহে কারিগরি তথা অর্থকরী শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর কারিগরি শিক্ষার প্রতি এত অনুরাগ ছিল যে, তিনি তাঁর গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় একটি কারিগরি বিভাগ খুলেছিলেন। মোল্লাহাটের তাঁর জনৈক ভক্ত আবদুল আজীজ সাহেবের দ্বারা ঢাকা শহর থেকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে জিনারদি থেকে একটি তাঁত ক্রয় করিয়ে মাদ্রাসায় শিল্প কারিগরি কাজের উদ্বোধন করেছিলেন।

আলেম সমাজে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল এই যে, তিনি খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েল নিয়ে আলেমদের পারস্পরিক এখতেলাক ও কোন্দলের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এসব ব্যাপারে তাঁর মতো উদার নীতি গ্রহণকারী আলেমের সংখ্যা অতি নগণ্য। একশ্রেণীর সংকর্ণমনা লোকের মতো মশা মারতে কামান দাগানো এবং পান থেকে চুন খসতেই অপর মতের আলেম বা সাধারণ মুসলমানকে বিভিন্ন ধর্মীয় গালি দ্বারা আহত করা এবং নিজে হক্কানী হবার ভাব দেখানো এসব তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। কোরআন সুন্নাহর মৌলিক কোনো বিধানের যদি কেউ বিরোধী না হয় কিংবা ঐ বিরোধীতায় সহযোগিতা না করে, এমন প্রতিটি মত ও পথের অনুসারীদেরই তিনি আপন মনে করতেন এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। উপরোক্ত মানদণ্ড ছাড়া মযহাবী, লা-মযহাবী, মীলাদে কেয়ামী

বেকেয়ামী, দেওবন্দী, রামপুরী, শফিনী, ফুরফুরী, তাবলীগী, জামায়াতী এসব পার্থক্যবোধ দ্বারা তিনি পরিচালিত হতেন না। বস্তুতঃ একারণেই ইসলাম বা মুসলমানের জাতীয় কোনো সঙ্কট মুহূর্তে কোনো প্রকার পদক্ষেপ নিতে হলে তিনি যদি ওলামা সম্মেলন আহবান করতেন, তখন দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁর ডাকে সাড়া দিত।

মওলানা ফরিদপুরী ওলামা সম্প্রদায় ও সাধারণ ভাবে মুসলমানদের মাঝে খুঁটিনাটি বিষয় নিষ্পত্তি করে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, তাঁর জীবনের একাধিক ঘটনা ও তাঁর বহু লেখার মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্ট। যেসব বিষয় নিয়ে কোনো কোনো আলেম অপর আলেমকে কাফের খেতাব দিতেও দ্বিধা করে না, সে ক্ষেত্রে তিনি কিভাবে ঐসকল ব্যাপারে নিজের সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করে বিরোধ দূরীকরণ ও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, তা লক্ষ্যনীয়। এমর্মে খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানাধীন কুলিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত আহলে হাদীস ও হানাফীদের মধ্যকার একটি "বাহাছ"-এ তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ও 'প্রশ্নউত্তরে তাসাওফ' নামক নিজের বইয়ে মীলাদের কেয়াম ও লা-কেয়াম প্রশ্নে তাঁর একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুগ-যুগ ধরে যেসব বিষয় নিয়ে এদেশে আলেমদের মাঝে বিরোধ চলে আসছে, মযহাব, লা মযহাব ও মীলাদের কেয়াম লা-কেয়াম ছিল ঐগুলোর অন্যতম। বাহাছে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের সারমর্ম ছিল এই যে, "মযহাব একটি দুটি নয় একাধিক প্রচলিত এবং মযহাবের অনুসারী সকলেই আমরা এক আল্লাহ্‌র বান্দা এবং শেষ নবীর উম্মত। যেমন, মাঠের পাশে ঐ যে বিরাট আমগাছটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মনে করুন ঐ গাছটিতে মোট চারটি শাখা আছে এবং প্রত্যেকটি শাখায় অতি সুস্বাদু আম পেকে রয়েছে। এখন আমাদের সকলের মনই চাচ্ছে আম খেতে। এমতাবস্থায় যেমন আমরা যার যেই শাখায় ইচ্ছা উঠে গিয়ে আম খেতে পারি, তাতে কারুর আম মিষ্টি, কারুর আম টকের প্রশ্ন নেই, তেমনি মযহাবের ব্যাপারটিও অনুরূপ। ব্যাখ্যার সামান্য তারতম্য থাকলেও মূলতঃ প্রত্যেকটির উৎসই হচেছ কোর-আন ও হাদীস। সকল মযহাবীদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন।"

তদ্রূপ মীলাদের কেয়াম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন,— "কেয়াম জিনিসটা আসলে ফেকাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা তাছাওফের

অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মহব্বত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হযরত রসূলুল্লাহ্‌র তারিফের কছিদা পড়া হয়। তাহা দ্বারা মহব্বত বাড়ে এবং লোক মহব্বতের জোশে খাড়া হইয়া যায়। মহব্বতের জোশে খাড়া হইলে তাহাকে বেদায়ত বলা যায়না। তাছাড়া হযরতকে ছালাম করার সময় বসিয়া বসিয়া ছালাম করা শরীফ তবীয়তের লোকের কাছে বড়ই বেআদবি লাগে, সেজন্যে রওজা শরীফের সামনে নিজেকে হাজির ধ্যান করিয়া খাড়া হইয়া ছালাম করাতে কোনই দোষ হইতে পারেনা। যেমন, মদীনা শরীফের রওজা শরীফের সামনে ছালাম করার সময় সকলেই দাঁড়াইয়া ছালাম করিয়া থাকেন। অবশ্য কেয়ামকে শরীয়তের হুকুম মনে করা অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ্‌র হুকুম মনে করা অত্যন্ত সাংঘাতিক পাপ, অন্যায় এবং বেদয়াত! হযরত রসূল্লাহ্ কখনো তাঁহার নিজের জন্যে এমন হুকুম তাঁহার জীবিতাবস্থায়ও দেন নাই।"

"তরিকতের মজলিসে সেরূপ যদি একজনের হাল গালেব হইয়া সে দাঁড়াইয়া পড়ে, তবে তরিকত অনুসারে সকলেরই দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত। এই রূপে "জেকের-এ-রসূলের মজলিসে" (নবীস্মৃতি মাহফিল) মহব্বতের জোশে একজন দাঁড়াইয়া গেলে সকলেরই দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত। অর্থাৎ ইহা একটি উত্তম আদব, ইহার বিপরীত বেআদবী। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত বাড়াতে হইবে। সেজন্যে জিকরুল্লাহ্‌র মজলিসে 'জিক্‌রে রছুলের' মজলিসের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়ান যাইবে, ততই ইহ-পরকালের মঙ্গল হইবে। খবরদার, কেহ বেআদবীর মধ্যে পতিত হইয়া নিজের রুহানিয়তের ও পার্থিব ক্ষতির মধ্যে পড়িবেননা।"

[প্রশ্ন উত্তরে তাছাওফ। পৃষ্ঠা ৫১, ৫২ পাকিস্তানী সংস্করণ]

আলেম সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মওলানা ফরিদপুরী খুটিনাটি বিষয় উপেক্ষা করলেও যেসব আলেম স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে ইসলাম ও গোটা আলেম সমাজের সর্বসম্মত মতের বিরোধী কাজের সহায়তা করতেন, তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। দেশী বিদেশী যেকোনো মহলের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে আলেমদের এক করার জন্যে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। তিনি বলতেন, আলেমদের মধ্যে অনৈক্য বা এখতেলাফ থাকলে তাতে বাতিলপন্থীদেরই সুযোগ হয়ে যায়। অপরদিকে আলেমদেরও

দুর্নাম হয়। বিশেষ করে আইয়ুব শাসনামলে যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আলেমদের ইসলামী দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে এক থাকা দরকার এবং ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বিষয়সমূহের বিরোধিতাও সকলের এক সাথেই করা উচিত; তখন ১৯৬৪ সালে "ইত্তেহাদুল ওলামা" নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন খোদ্ মওলানা ফরিদপুরী ও সেক্রেটারী মওলানা নূরমোহাম্মদ আজমী। তিনি এ সংগঠনের শাখা সারা পূর্ব পাকিস্তানে খোলার চেষ্টা করলেও তাতে পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। কারণ, ইতিমধ্যেই দেশের কিছু কিছু আলেম ও পীর নামধারী ব্যক্তি নিজেদের হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে গিয়ে হাত মিলিয়ে ছিলেন। মূলত এই শ্রেণীর আলেম ও পীর-মাশায়েখ হাতে পেয়েই তৎকালীন সরকার শেষে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তথাকথিত মুসলিম পারিবারিক আইন ও পরিবার পরিকল্পনা আইন বাতিলসহ বিভিন্ন ইসলামী দাবী-দাওয়ার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করেন। মুসলিম সমাজকে এ ধরনের আলেম ও পীরদের ধোকাবাজির হাত থেকে রক্ষার জন্যে তিনি একাধিক বই লিখেছেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচেছ "ওলামা-এ-ছু"।—এ বইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি দলিল প্রমানাদি দ্বারা অর্থলোভী, স্বার্থপর ও বাতিল সরকারের ক্রিড়ণক আলেম ও পীরদের পরিচয় এবং তাদের কাজের ইহ-পরকালীন মারাত্মক পরিণতি সবিস্তারে আলোচনা করেন।

মওলানা ফরিদপুরী একশ্রেণীর ওলামা ও পীরের এহেন ভূমিকায় দারুণ ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আলেমদের এহেন স্বার্থপরতার রাজনীতি তাদের নিজেদের জন্যেই কেবল অপমানকর নয়, তাতে গোটা আলেম সমাজের উপর থেকেও জনগণের আস্থা উঠে যেতে বাধ্য। ফলে মাদ্রাসা, খানকা, তাবলীগ এবং ওয়াজের মাধ্যমে যা কিছু দ্বীনের খেদমত হচেছ, তাও বন্ধ হবার উপক্রম হবে। বস্তুত এ বিরক্তিবোধ থেকেই তিনি ইনতেকালের ৩/৪ বছর পূর্বে (১৯৬৫ ইং) রাজনৈতিক তৎপরতা ও এজাতীয় কোনোরূপ বক্তব্য রাখা থেকে বিরত হয়ে যান এবং তাঁর গঠিত অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের মাধ্যমে দ্বীনী খেদমত

চালিয়ে যান। সকলকে মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসার খেদমতের আদেশ দেন। তিনি নিজেও এ খেদমতের সাথে সাথে মানুষের আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইসলামী কাজে অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা

"তাকওয়া এবং কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করো" এ খোদায়ী বাণীর প্রতি মহৎপ্রাণ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী অকুণ্ঠচিত্তে আমল করে গেছেন। যে বা যারাই ইসলামের কাজ করতো তাদের প্রতি কেবল তিনি সহযোগিতার হস্তই প্রসারিত করতেননা, কোনো দ্বীনী কাজ হতে দেখে তিনি অপরিসীম মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। অন্যান্যদেরকেও ইসলামী কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর সংস্পর্শে যে-ই আসতো, তার থেকে তিনি এটাই প্রত্যাশা করতেন, সে যেন কোনো না কোনো ইসলামী কাজে জড়িত থাকে। সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র দ্বীনের উন্নতির জন্যে চিন্তা এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে খোদায়ী জীবনবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা মুসলিম সমাজকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার ফিকির যাঁর মনমস্তিষ্ককে সর্বক্ষণ আচছন্ন করে রাখে, একমাত্র তাঁর মধ্যেই শুধু এহেন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

তাবলীগী জামায়াতের সাথে সহযোগিতা

আজ সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তাবলীগী জামায়াতের কাজ ছড়িয়ে আছে। এ দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছেই তাবলীগে জামায়াতের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু একদিন এদেশবাসীর কাছে এ জামায়াত তার কার্যপ্রণালী ও সংগঠন কাঠামো, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যের সম্পূর্ণ অভিনবত্ব নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। ফলে অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল। বিশেষ করে, দ্বীনী কাজের ক্ষেত্রে অর্থকরী বিষয় যেখানে যেখানে প্রাধান্য পাচ্ছিল, তাবলীগী জামায়াতের আর্থিক সম্পর্ক বিবর্জিত দ্বীনী কাজে সে সকল মহল থেকে বিরাট প্রতিবাদ উঠেছিল। তাবলীগী জামায়াতের বিনা পারিশ্রমিকের তালীমের ফলে যখন বহু অশিক্ষিত মানুষও অল্প দিনে ইসলামের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করলো, বেনামাজী নামাজী এবং মদখোর পরহেজগার হতে লাগলো, তখন একশ্রে পীরণী সাহেবের মুরীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে

চললো। কারণ তারা দেখলো, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীন-শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে তারা যার কাছে মুরীদ হয়েছিলেন, তিনি শুধু বছরকে বছর তাদের হাদিয়া তোহ্‌ফা নিয়ে নিজের অবস্থাই ভালো করেছেন, মুরীদগণ কলমা, সূরা, কেরাত ও নামাজ পর্যন্ত শুদ্ধ করে পড়তে পারেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য হক্কানী পীরেরা তাবলীগ জামায়াতকে "চলতিফিরতি মাদ্রাসা" আখ্যা দিয়ে নিজেদের মুরীদানকে তাঁদের কাজে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুরুতে এ তাবলীগী জামায়াতের কাজে সহযোগিতায় মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীই প্রথম এগিয়ে আসেন। তাঁর নিকটতম শিষ্যদের বর্ণনা মতে, তিনিই প্রথম এদেশে তাবলীগী জামায়াতের প্রসারদানে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী। নিজের পরম ভক্ত খুলনার মওলানা আবদুল আজীজ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মওলানা আলী আকবর প্রমুখকে এই জামায়াতের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

সমাজকে আল্লাহ্‌ওয়ালা বানাবার জন্য দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাবলীগী জামায়াতের কর্মসূচীতে তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও এ জামায়াতের দ্বারা আংশিকভাবে দ্বীনের কিছু খেদমত হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাবলীগের ফলে এমন বহু আধুনিক শিক্ষিত যুবক যারা হয়তো সমাজে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাই ছড়াতো, এখন পূর্ণ খোদাভক্ত হয়ে জীবনযাপন করছেন এবং অন্যদেরকেও দ্বীনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। বাংলাদেশের কৃতিসন্তান ইসলামী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা ও এদেশের জননন্দিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমও সর্বপ্রথম তাবলীগী জামায়াতের দাওয়াতেই ইসলামী কাজে অধিক অনুরাগী হন। অধ্যাপক আজম রংপুর জেলার তাবলীগী জামায়াতের আমীর থাকাবস্থায়ই বহু আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিয়ে এনেছেন। তাবলীগী জামায়াতের দাওয়াত না পেলে তিনিও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো কোনো অধ্যাপক ও রাজনৈতিক নেতার ন্যায় ইসলামের স্বার্থবিরোধী কাজেই হয়তো নিয়োজিত থাকতেন। এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক তৎপরতা, বিভিন্ন আন্দোলন ও

সাংগঠনিক কার্যক্রম ইত্যাদির সাথে তাকওয়া, খোদাভীতি, দ্বীন, ধর্ম, ইসলাম, নবী, রসূল প্রভৃতি বিষয়ের সংযোগ সাধনে ও যুব সমাজে ইসলামী জাগরণ আনয়নে অধ্যাপক আযম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর অতীব প্রিয়পাত্র অধ্যাপক গোলাম আযম এবং দেশ-বিদেশে খ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মুকীত সাহেবসহ যেসব ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি তাবলীগী জামায়াতের অছিলায় দ্বীনের কাজে অনুরাগী হয়ে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, মওলানা ফরিদপুরীর মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় বুজর্গ আলেমগণ শুরুতেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা না দেখালে এ জামায়াতের বর্তমান বিস্তৃতি কিছুতেই সম্ভব হতো না।

জামায়াতে ইসলামী, মওলানা মওদূদী ও মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে জামায়াতে ইসলামী ও মওলানা মওদূদী বিশ্বময় অতীব পরিচিত দুটি নাম। এ জামায়াত পঞ্চাশের দশক থেকে এদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন আন্দোলন ও উত্থানপতনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একসময় যেখানে আধুনিক শিক্ষিত সার্কেলে ইসলামের পক্ষে কোনো কথা বলা গর্বের বদলে "সেকেলে" খেতাব পাবার কারণ ছিল, দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখ দিয়ে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী ছিল অকল্পনীয়, আজ অন্যান্য ইসলামী সংস্থা বিশেষ করে, এই জামায়াতের প্রচেষ্টায় দেশের অভ্যন্তরেই নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইসলামী আন্দোলন এক দুর্বার গতিবেগে অগ্রসরমান। জামায়াতে ইসলামীর এই সফলতার পশ্চাদ্ভূমি অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, তাতে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীরও অসামান্য দান রয়েছে। "অসামান্য" বললাম এজন্য যে, তাবলীগী জামায়াত একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার কাজে যেসব প্রতিকূলতা ছিল, জামায়াতে ইসলামী একাধারে একটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন হিসাবে তাকে সে তুলনায় আরও বহুগুণ বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাবলীগী জামায়াতের কাজ বিশেষ একটি সার্কেলের বিরোধিতার সম্মুখীনে সীমিত ছিল, কিন্তু জামায়াতে ইসলামী জীবনের সর্বস্তরে পরিবর্তন ও ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসায়, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক,

অর্থনৈতিক, সকল ক্ষেত্র থেকেই প্রথম দিকে এর ব্যাপারে সন্দেহ ও প্রচণ্ড বিরোধিতা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, সকল ময়দানের প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মনে করে, না জানি তারা ক্ষমতায় এসে গেলে আমাদের কর্তৃত্ব চলে যায়। সমাজজীবনে বিভিন্ন স্তরে যেখানে যার অন্যায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, জামায়াত ও এ জাতীয় সংগঠনের বৈপ্লবিক দাওয়াতে কিছুতেই তাদের গাত্রদাহের সৃষ্টি না হয়ে পারে না। নবুওয়তী কাজের বিশেষ করে শেষ নবীর পরিপূর্ণ দ্বীন—ইসলামী দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া তৎকালীন আরব সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের গায়েও এভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে চল্লিশ বছরের নিঃস্বার্থ সমাজ দরদী "আল-আমীন" ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর আরববাসীর কাছে "মিথ্যাবাদী" "যাদুকরই" শুধু খেতাব পাননি, তাঁর মস্তকের জন্যও ঘোষিত হয় মোটা অংকের পুরস্কার। অনুরূপভাবে জামায়াতের আহবানেও সর্বাত্মক বিপ্লবের দাওয়াত থাকায় সরকারী ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে তৎকালীন সরকারী মহল অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মহাপ্রাণ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সেদিন কিভাবে জামায়াতে ইসলামী ও তার নেতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর প্রতি সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে এসেছিলেন, এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। জামায়াত প্রথম দিকে এদেশে তার কর্মী সংখ্যা, কাজ, খ্যাতি ও পরিচিতির দিক থেকে সম্পূর্ণ সীমিত ছিল। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ঠিক ঐ সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখে এটিকে এক মহান দ্বীনী কাজ মনে করে তার সাথে সহযোগিতা করে-ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রসারের ইতিহাসে এ কারণেই তাঁর দান একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে আছে।

কর্মসূচীর বৈচিত্র্যের ও সুষ্ঠুতার দরুন এদেশের জন্য জামায়াতে ইসলা-মীর আন্দোলন একটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াতের কার্যপ্রণালী ও ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুক্তিপূর্ণ বৈপ্লবিক দাওয়াতের সাথে এখানকার ইসলামী মহল ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলনা বললেই চলে। ঐ সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দকারী নেজামে ইসলাম পার্টি সহ যে দু'একটি সংগঠন এদেশে ছিল, তাদের দ্বারা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ

মানুষের সাথে পার্লামেণ্টের তথা ইসলামের সাথে রাজনীতির কি সম্পর্ক, সেই বিভ্রান্তি কিছুটা দূরিভূত হলেও তাঁরা ইসলামী আন্দোলনের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য সুষ্ঠু কর্মসূচী প্রদানে ব্যর্থ হন। এভাবে জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচী ও অন্যান্য ইসলামী দলের কর্মসূচীর পার্থক্য ইসলামপ্রিয় অনেকের কাছেই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ফলে জামায়াতের কাজকর্ম তাদেরকে আকর্ষণ করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এতদসত্বেও বিভিন্ন মতের ওলামা এবং তরীকার অনুসারী পীর-মাশায়েখের দেশ হিসাবে নতুন কোনো ইসলামী দলে যোগদান করার প্রশ্নে এখানকার লোকদের দ্বিধাগ্রস্ত থাকাটা ছিল স্বাভাবিক। তখন দেশের ওলামাকুল শিরোমণি হিসাবে সকলের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর কাছেই অনেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা সম্পর্কে পরামর্শ চাইতেন। তিনি তখন সোৎসাহে এ সংগঠনের সাথে মিশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। এছাড়া, খোদ নিজেও জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর সাথে এক যোগে কাজ করেছেন। তাঁর সাথে মিলিত হয়েই সর্বদলীয় আলেমদের ঐতিহাসিক ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশমালা রচনা করেছেন। পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য, আদর্শ প্রস্তাব পাশ করার জন্য করেছেন আপোষহীন সংগ্রাম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দুজন জামায়াত নেতা মওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আজমকে নিয়ে দেশের বহু স্থানে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে সভাসমিতি করেছেন। আইয়ুবী শাসনামলে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আজমকে প্রায় সময় লালবাগ মাদ্রাসায় মওলানা ফরীদপুরীর সাথে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে পরামর্শরত দেখা যেত। তখনকার সামরিক শাসনামলে ইসলামী আন্দোলনের যৌথ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও ইসলাম-বিরোধী পরিবার আইন ইত্যাদি প্রশ্নে কি কি করণীয় হতে পারে, সেসব সম্পর্কে ফরিদপুরী সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ ও পরিকল্পনা তৈরিই হতো তাঁদের আলোচনার বিষয় বস্তু। সাবেক জামায়াত নেতা মওলানা আবদুর রহীমের সাথে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মওলানা ফরিদপুরীর ছিল গভীর সম্পর্ক। তথাকথিত পবিবার আইনের বিরোধিতার প্রশ্নে উভয়কে সরকার কর্তৃক একত্রে ডেকে পাঠানো থেকেও তাই বুঝা যায়। ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে বর্ণনা গিয়েছে।

মওলানা মওদূদী, জামায়াতে ইসলামী ও এ সংগঠনের অন্যান্য নেতার সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ছাড়াও কাদিয়ানী বিরোধী, 'মুনকেরীনে হাদীস' বিরোধী, যুক্ত নির্বাচন বিরোধী, আপত্তিকর পরিবার আইন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী প্রত্যেক আন্দোলনে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী একযোগে কাজ করেছেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও জামায়াতের প্রতি মওলানা ফরিদপুরীর কিরূপ সমর্থন ও শ্রদ্ধা-বোধ ছিল, সে সম্পর্কিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি মওলানা ফরিদপুরীরই নিকটতম ব্যক্তিদের কাছ থেকে শোনা।

মওলানা মওদূদীর প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরের খবর সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি পেয়ে দু'বছর কারা-নির্যাতন ভোগ করার পর সদ্য জেল থেকে বের হয়েছেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ মহলে জোর প্রচারণা চলে যে, জামায়াত নেতা মওলানা মও-দূদীকে তেজগাঁও বিমান বন্দরে কালো পতাকা দেখাতে হবে। তাঁকে বিমান থেকে নামতে দেয়া হবে না।

এখানকার জামায়াত নেতৃবৃন্দ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সে সময় জামায়াতের কর্মী সংখ্যাও অতি নগণ্য। তাঁরা মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর সাথে যোগাযোগ করলেন। ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক মোজাহিদ, প্রখ্যাত ইস-লামী চিন্তানায়ক মওলানা মওদূদীর প্রতি লীগ মহলের এহেন ধৃষ্টতামূলক আচরণ ও গুণ্ডামির ষড়যন্ত্রের কথা শুনে, মওলানা ফরিদপুরী মুসলিম লীগের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। মুসলিম লীগের মাঝে তখনও তাঁর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি সরাসরি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আকরাম খাঁর কাছে ছুটে গেলেন। খাঁ সাহেবকে বললেন, "মওলানা মওদূদীর মতো একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের মোজাহিদের প্রতি লীগকর্মীদের সম্ভাব্য এই আচরণ যেমন অত্যন্ত অবমানকর তেমনি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের জন্য অধিক ক্ষতিকর হবে।" মওলানা ফরিদপুরী বললেন, মওলানা "মওদূদীর প্রতি কালোপতাকা দেখিয়ে অবমান করা নয় বরং তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা দিয়ে বিমান বন্দর থেকে আনতে হবে। আমি নিজেও অভ্যর্থনা কমিটিতে থাকবো।" মওলানা মওদূদীর প্রতি মওলানা ফরিদপুরীর

এই সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁর প্রশস্তচিত্ততা এবং ইসলামী আন্দোলন ও জ্ঞানী-গুণীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসারই নিদর্শন। তাঁর এ ভূমিকার ফলে বিমান বন্দরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাতো ঘটেইনি বরং অনেক ওলামা-এ-কেরাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, তালাবা, মসজিদের ইমামসহ সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ফাঁসীমঞ্চবিজয়ী এই বীর মোজাহিদকে বিমান বন্দরে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার ইসলামী সমাধানে ও ইসলামবিরোধী কাজের প্রতিবাদে জামায়াত ও মওলানা মওদূদীর সাথে মরহুম ফরিদপুরীর পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক ও সম্প্রীতি সকল সময়ই বিদ্যমান ছিল।

মওলানা মওদূদীর কোনো বক্তব্য বা মতের ব্যাপারে মওলানা ফরিদপুরীর কোনো প্রকার সন্দেহ শোবা দেখা দিলেও তিনি মওদূদী সাহেবের কাছে চিঠিপত্রে যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর সন্দেহ নিরসন করতেন। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যেই বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী নিয়ে কাজ করেছে, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সকল সময়ই জামায়াতের এই ভূমিকাকে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এ জামায়াতের বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করতে অন্যদের উৎসাহিত করতেন। তিনি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের বলতেন, জামায়াত বাইরে কাজ না করলে তোমরা এভাবে ঘরে বসে দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ পাবেনা। জামায়াতের আন্দোলনের ফলে কোনো কোনো মহল যখন নিজেদের স্বার্থহানির আশংকা করছিল, তখন তারা গতানুগতিক নিয়মে জামায়াতে ইসলামী ও মওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ফতোয়াদানে উদ্যত হয়েছিল। সে সময় মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী স্বার্থহীন ভাষায় তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ বিশেষ মহলটি যখনই দেখে যে, কোনো খাঁটি দল কর্তৃক দ্বীনের সঠিক কাজ হওয়াতে তাদের অনুসারীদের সেদিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনই ঐ সকল দল বা জামায়াতের বিরুদ্ধে তাদের ফতোয়ার শাণিত তরবারি উত্তোলিত হয়েছে। কাউকে আহ্‌লে সুন্নাতুল জামায়াতের খারিজ, কাউকে ওহাবী, কাউকে এটা, কাউকে ওটা বলে তারা নিজেদের পরিমণ্ডল ঠিক রাখতে চেষ্টা করে। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ) যখন দেখলেন যে, ওলামা-মাশায়েখ বলে পরিচিত কেউ কেউ একদিকে জামায়াত ও এজাতীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ইসলামের জন্য

নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিচ্ছেন, অপর দিকে লাখ লাখ টাকার সুযোগ পেয়ে ইসলামবিরোধী আইন চালুকারী সরকার প্রধানের নামে হল তৈরি করছেন ও তাদের অবৈধ আইনকে বৈধ বলে ঘোষণাদানের পাঁয়তারা চালাচ্ছেন, তখনই তিনি "ওলামা-এ-সূ" নামক ৬৮ পৃষ্ঠার একখানা বই লিখে জাতিকে বিভ্রান্তি থেকে রেহাই দেন।

শুধু তাই নয়, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী তাঁর 'প্রশ্নোত্তরে তাছাওফ' (৪৬-৪৮ পৃষ্ঠায়) বইতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, জামায়াতে ইসলামী আহ্‌লে সুন্নাতুল জামায়াতভুক্ত একটি দল। তাঁর বইয়ের ভাষাটি হলো এই—

"প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সকলেই ছুন্নাত জামাত, যারা দেওবন্দী তারাও ছুন্নাত জামাত যারা বেরেলবী তারাও ছুন্নাত জামাত, যারা মৌলুদ শরীফ পড়ে, দাঁড়াইয়া দরূদ ও ছালাম পড়ে তারাও ছুন্নাত জামাত, যারা মৌলুদ পড়াকে ব্যবসা রূপে পরিগণিত করিতে মৌলুদের মধ্যে মৌজু রেওয়ায়েত করিতে, শরীয়তবিরুদ্ধ গান, বাদ্য, নাচ করিতে নিষেধ করেন, তারাও ছুন্নাত জামাত, তাবলিগী জামাতও ছুন্নাত জামাত, জামায়াতে ইসলামীও ছুন্নাত জামাত, ফুরফুরী, বাহাদুরপুরী, জৌনপুরী, হাটহাজারী, থানবী ইহারা সকলেই ছুন্নাত জামাত।"

এ প্রসঙ্গে এখানে একটি বিভ্রান্তিকর বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। বিষয়টি হলো, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীকে তাঁর এক শ্রেণীর ভক্ত কর্তৃক জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা। মওলানা ফরিদপুরী সাহেব বিভিন্ন মত ও পথের ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী আন্দোলনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, তাদের সাথে ইসলামী কাজে তাঁর সহযোগিতা এবং তাঁর লিখিত বক্তব্য থেকেই তা সহজে অনুমান করা চলে। বিশেষ করে, ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামী ও তার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে তিনি কিভাবে বিচার করতেন, ইতিপূর্বে উল্লেখিত তাঁর নিজের লেখা থেকেই সেটা বুঝা যায়। তারপরও মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর ইনতেকালের প্রায় ৭/৮ বছর পর তাঁর সাথে মওলানা মওদূদীর মতপার্থক্য দেখিয়ে তাঁর নামে জামায়াত ও মওলানা মওদূদীর কুৎসা প্রচার বা বই লেখা সেটা প্রকারান্তরে মওলানা ফরিদপুরীর

ন্যায় উদার ও মহৎপ্রাণ বুযর্গের আত্মার প্রতিই বেআদবীর শামিল। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী কোনো রূপ লোভ-লালসা কিংবা চক্ষুলজ্জা অথবা ভয়ভীতিকে পরোয়া করে কথা বলার লোক ছিলেন না। তিনি যা ন্যায়, সত্য এবং দীন-শরীয়তের জন্য কল্যাণকর মনে করতেন, নির্ভীক ও দ্বিধাহীনচিত্তে সে ব্যাপারে তাঁর মত ব্যক্ত করতেন।

তাঁর জীবনে এ রকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। মওলানা মওদূদী ও জামায়াতের সাথে তাঁর যদি সত্যিই দ্বিমত থাকতো তাহলে তিনি সেটা তাঁর জীবদ্দশাতেই সুস্পষ্টভাষায় পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে কিংবা কোনো বই-পুস্তক লিখে জানিয়ে যেতেন। জামায়াত ও মওলানা মওদূদীর সাথে দীর্ঘ দু'দশক মওলানা ফরিদপুরী ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী হয়ে কাজ করেছেন। মওলানা মওদূদী কিংবা জামায়াতের মাঝে আপত্তিকর কিছু থাকলে সেটা তিনি চেপে রেখেছিলেন, এমনটি হতেই পারে না। যদি কোনো মতভেদ গোপন রেখেও থাকেন, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সেটা খুটিনাটি ব্যাপার ছিল যদ্বারা মওলানা মওদূদী ও জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না।

অনেক সময় কিছু কিছু অতি উৎসাহী ভক্ত অনুসারীর কারণে অনেক মহৎ আদর্শ ও মহৎ ব্যক্তিত্বকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং পরিণামে দেশ জাতি ও ধর্ম সম্পর্কিত সে আদর্শ ও সংশ্লিষ্ট মহৎ ব্যক্তির পথনির্দেশক উপদেশাবলী মানুষের কাছে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। এদেশের সকল শ্রেণীর ওলামা-মাশায়েখ ইসলামী আন্দোলনের নেতা, কর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন হক্কানী বুযর্গ ও নির্ভীক মোজাহিদ হিসাবে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর প্রতি সকলের অকৃত্রিম ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তাঁর সেই ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। সচেতন কি অবচেতন মনে তাঁর উক্ত অনুসারীদের কারুর পক্ষ থেকে মওলানা ফরিদপুরী সাহেবের নামে তাঁর মৃত্যুর ৭/৮ বছর পর অন্য কোনো ইসলামী দল বা দলীয় নেতার বিরুদ্ধে কোনো বই-পুস্তক প্রচার করা ইসলামপ্রিয় কারুরই অভিপ্রেত হতে পারেনা। তারপরও এরূপ করা হলে সেটাকে "উদ্দেশ্য প্রণোদিত" না বলে উপায় থাকে না। অথচ মওলানা ফরিদপুরী এই উদ্দেশ্য ও মতলবের বিরুদ্ধেই আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

আমার এহেন উক্তিতে অতি উৎসাহী কোনো বন্ধুবান্ধব অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু নিজেকে ধোকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর একজন অকৃত্রিম ভক্ত। তাঁর মহান সংস্পর্শ ও লিখিত বইয়ের দ্বারা আমি জীবনপথের অনেক দিশা পেয়েছি। তাঁর লিখিত বইয়ের অনেক-গুলোই আমার পড়ার সুযোগ ঘটেছে। আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে, "প্রশ্নউত্তরে তাছাওফ" বইখানা পূর্বের সংস্করণে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী যেখানে উক্ত বইয়ের ৪৬ এবং ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছেন যে, "জামাতে ইসলামী ছুন্নাত জামাত।" সে ক্ষেত্রে একই বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে ঐ বাক্যটি সুকৌশলে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। মওলানা মরহুমের ইনতেকালের এতদিন পর বাংলাদেশ আমলে মুদ্রিত উক্ত বই থেকে এ বাক্যটি বাদ দেয়ার কারসাজিতে যারা জড়িত, এই অসাধুতা ও সত্য গোপনের দ্বারা তাঁরা নৈতিক ও চারিত্রিক সকল দিক থেকে নিজেদের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, সে সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এহেন খেয়ানত অসাধুতা ও উদ্দেশ্য-মূলক আচরণ দ্বারা তাঁরা কোন্ সওয়াবের কাজটি করেছেন? এতে কি দ্বীনের সেবা করা হলো? তাদের এহেন আচরণে মরহুম শামসুল হক ফরিদপুরীর জান্নাতী আত্মাও কি শান্তি পাবে? শুধু জামায়াত কেন যে কোন ইসলামী দলের ক্ষেত্রেই এটা অন্যায়।

যারা এভাবে দিনে-দুপুরে পুকুর চুরির ন্যায় মরহুম মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর বইয়ের বক্তব্যকে বিকৃত করেন, তাঁরা যদি তাঁর ইনতেকালের ৮ বছর পর মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী কিংবা তাদের মতের বিরোধী অপর কোনো আলেম, পীর অথবা ইসলামী দলের বিরুদ্ধে তাঁর নামে একটি নয় দশটি বইও লিখে বাজারে প্রচার করেন, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। অবশ্য তাতে অহেতুকভাবে মরহুম মওলানা ফরিদপুরীর প্রতি অবমাননাই দেখানো হবে। ইসলামী নামের আবরণধারী যেসব নেতা এদেশ থেকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে চিরদিনের জন্য উৎখ্যাত করার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেসব নেতা ও তাদের দলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব থেকে বা নিজেরা এ সমাজে দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় না হয়ে যে দল ইসলামের জন্য রক্ত দিচ্ছে, বাতিলের হাতে শহীদ হচ্ছে সে দল বা মওদূদীর বিরুদ্ধে

প্রচারণা চালানো কি করে ইসলামদরদের লক্ষণ হতে পারে ? এতো ইসলাম ও মুসলমানকে পেছন দিক দিয়ে ছোরা মারার নামান্তর। মওলানা ফরিদপুরীর ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাঁরা এহেন অসাধুতায় মেতে উঠেছেন, তাঁদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। তাঁর দূরদর্শী একনিষ্ঠ অনুসারীদের উচিত এসব বিষয়ে নজর দেয়া। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, মওলানা মওদূদী সাহেবের কোন উক্তির সমালোচনা করে মওলানা ফরিদপুরী সাহেব কোনো কিছু লিখে গেছেন, তাতে কি হয়েছে ? মওদূদী সাহেব তো নিজে একথা কোথাও বলে যাননি যে, তিনি সকল ভুলের উর্ধে। তাঁর সত্যিই ভুল হলে সেটার জন্য দায়িত্ব তাঁর। সেটাকে দেখিয়ে ইসলামী ঐক্য ও ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকার বা একে দুর্বল করার ভূমিকা নেয়ার কোনো অবকাশ নেই। কোনো ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করার অর্থ ইসলাম বিরোধীদের শক্তি বাড়ানো। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে বিষয়টি আলোচনায় এনেছি। যে কোনো ইসলামী দলের শক্তি বৃদ্ধি ও ঐক্যই ইমানদারদের কাম্য হওয়া উচিত।

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষা জীবনেই তিনি মওলানা মওদূদী সম্পর্কে জেনেছিলেন। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে দারুল উলূম দেওবন্দের শেখুলহিন্দ, উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত রাজনীতিক মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ)-র চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচারণ করে মওলানা মওদূদী (রহ মাসআলা-এ-কওমিয়াহ্ (জাতীয়তাবাদের সমস্যা) নামক একখানা বই লিখেছিলেন। এ বইটিতে মওলানা মাদানী সাহেবের 'মুত্তাহিদা-এ-কওমিয়াত' যুক্ত জাতীয়তা নামক বইয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা ছিল। তাতে দারুল উলূম দেওবন্দে অখণ্ড ভারত সমর্থক মহলে মওলানা মওদূদী সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা হয়। অবশ্য খণ্ড ভারত তথা পাকিস্তান সমর্থক থানভী গ্রুপ মওদূদীর বইটির বক্তব্য সমর্থন করেন। সেই থেকেই দেওবন্দ পাস কেউ কেউ বিশেষ করে, অখণ্ড ভারতের সমর্থক মওলানা মাদানী সাহেবের শিষ্যদের অনেকে জামায়াতে ইসলামী ও মওলানা মওদূদীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন, যার জের এখনও চলছে। বর্তমানে এই মতপার্থক্যকে আকীদা পর্যায়ে নিয়ে

যাওয়া হলেও আসলে মাদানী ও মওদূদী দুই ইসলামী মনীষীর মতপার্থক্য ছিল রাজনৈতিক। যেমন খোদ্ দেওবন্দেরই প্রধান শিক্ষক মওলানা শাব্বীর আহ্মদ উসমানীর সাথে মওলানা মাদানীর রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। মওলানা উসমানী খণ্ডভারত তথা পাকিস্তানের সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা ছিলেন আর মওলানা মাদানী মরহুম অখণ্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্ব দিতেন। এই মতপার্থক্যের দরুন অনেক সময় দেওবন্দেরই মওলানা উসমানীর বাসভবনের দিকে মাইক ফিট করে প্রতিপক্ষ দলের কর্মীরা মওলানা উসমানীর বিরুদ্ধে বিশেষ শব্দের "ফতোয়া"-টিও উচ্চারণ করতো বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে থাকেন। মওলানা উসমানীতো একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং একই উস্তাদের ছাত্র ছিলেন, রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাঁকে বিশেষ শব্দের ফতোয়ার সম্মুখীন হতে হলে মওলানা মওদূদীর বেলায়তো সেটা আরও সহজ। এসব দেখে যেকোনো জ্ঞানবান মানুষ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য আগ্রহী না হয়ে পারেনা। মওলানা ফরীদপুরীর ন্যায় উদার ও নিরপেক্ষ মনের অধিকারী ব্যক্তিও পারেননি। মওদূদী সাহেব সম্পর্কে দেওবন্দে যত কথা শুনেছেন, সবগুলো প্রত্যক্ষভাবে জানার জন্য তিনি তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সরাসরি পাঞ্জাবের পাঠানকোটে পর্যন্ত গিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী ও মওলানা মওদূদী সম্পর্কে প্রচারিত দোষক্রটি সব কিছুর তিনি মূল্যায়ন করেছেন। মূলত জামায়াতে ইসলামীর প্রতি মওলানা ফরিদপুরীর সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক ভূমিকার এটাও একটি প্রধান কারণ।

সাহিত্যচর্চা ও রচনাবলী

জীবনের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালনের পরও দেশ, জাতি ও ধর্মের কল্যাণে ছোটবড় প্রায় ৯০ খানা বই লিখে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। পূর্ণ সাধনা, অধ্যাবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা থাকলে এমহান কাজও যে সম্ভব, মওলানা ফরিদপুরী তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য কাজে যাই হোক, অন্তত চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণামূলক কাজে এধরনের ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে অতি বিরল। কিন্তু মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী কোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি

বিষয়ের উপর প্রায় ৯০ খানা বই লিখে গেছেন। কতিপয় অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া সবগুলোই তাঁর মৌলিক বই। তিনি অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তি প্রমাণ সহকারে বইগুলো লিখেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি তফসীরও রয়েছে। তফসীরখানার নাম "হক্কানী তফসীর।" "হক্কানী তফসীরের" অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিয়মানুবর্তীতা সহকারে বাংলা ভাষায় এ বিপুল পরিমাণ বই লিখে গেছেন। তাঁর এসব বই বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক মূল্যবান সম্পদ। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই ছিলেন যুক্তিবাদী এবং সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী। তাঁর বিভিন্ন বইতে একারণেই যুক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তবে তাঁর সাহিত্যে তিনি ভাষার পাণ্ডিত্য বেশি দেখাতে চাননি। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু মওলানা মরহুম আশরাফ আলী থানভীর রীতিই নিজের লেখাসমূহে অনুসরণ করে গেছেন। থানভী সাহেব নিজ কিতাবসমূহ উর্দূ ভাষায় এমন সহজবোধ্য করে লিখেছেন যে, স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও অনায়াসে প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে পারে। মওলানা ফরিদপুরীও অনুরূপ ভাষায় নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যাতে সমাজের উচ্চশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত সকলেই তাঁর বইসমূহের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। মওলানা ফরিদপুরীর লিখিত বইগুলোর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। হক্কানী তফসীর
২। ইসলামের অর্থনীতি
৩। মাতৃজাতির মর্যাদা
৪। খেদমতে খালক বা জনসেবা
৫। বিশ্ব কল্যাণ
৬। বৃটিশ শাসনের বিষফল
৭। শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন
৮। তাছাউফ কাহাকে বলে ?
৯। বেদআত ও ইজতেহাদ
১০। ভোটারের দায়িত্ব
১১। ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ
১২। নেতার কর্তব্য
১৩। জীবন্ত মসজিদ
১৪। এ জামানায় ইসলামী নেজাম সম্ভব নয় কি ?
১৫। পাকিস্তানের আদর্শ
১৬। মুক্তির পথ
১৭। জন্ম নিয়ন্ত্রণ
১৮। হাদীস রত্ন

১৯। পতিত পাবন
২০। মানুষের পরিচয়
২১। আল্লাহ্‌র পরিচয়
২২। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ
২৩। তোহ্‌ফা
২৪। আমালে কোরআনী
২৫। আদাবুল মসজিদ
২৬। ওলামা-এ-সূ (অসৎ আলেম)
২৭। কোরআনের তাজিম
২৮। মসজিদ
২৯। কন্যার বিবাহে পিতার উপহার
৩০। যুদ্ধের সময় দেশবাসীর কর্তব্য
৩১। বিদায় হজ্জে বিশ্বমুসলিমের প্রতি রসুল্লাহ্‌র বাণী
৩২। তেজারতের ফজিলত
৩৩। চরিত্রগঠন
৩৪। হালাল হারাম
৩৫। বাংলা ফরায়েজ
৩৬। ছাফাইয়ে মোয়ামালাতি (অনুবাদ)
৩৭। হাদীসে আরবাঈন
৩৮। পাঞ্জে সূরা (অনুবাদ)
৩৯। বেহেশতী জেওর (১—১১ খণ্ড) (অনু)
৪০। হায়াতুল মুসলেমীন (অনু) (অনু)
৪১। পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা
৪২। তিন তালাকের সমস্যা
৪৩। জেহাদের আহবান
৪৪। জামায়াতী জিন্দেগী
৪৫। শত্রু থেকে হুশিয়ার
৪৬। পাদ্রীদের গোমর ফাঁক
৪৭। আল্লাহর প্রেরিত ইনজিল কোথায় ?
৪৮। ইংরেজী পড়িবনা কেন ?
৪৯। নামাজের অর্থ
৫০। ফরুউল ঈমান (অনু)
৫১। হজ্জের মাছায়েল
৫২। মুনাজাতে মকবুল (অনু)
৫৩। সূরা ফাতেহা (অনু)
৫৪। সূরা ইয়াসীনের তফসীর
৫৫। রোজার ফজিলত
৫৬। এছলাহে নফছ (অনু)
৫৭। নামাজের ফজিলত
৫৮। জেকেরের ফজিলত
৫৯। তালীমুদ্দীন (অনু)
৬০। কছদুচ্ছাবীল (অনু)
৬১। প্রশ্নোত্তরে তাছাউফ
৬২। পীরের পরিচয় ও মুরিদের কর্তব্য
৬৩। তওবানামা
৬৪। বায়াত নামা ১ম ছবক
৬৫। বায়াতনামা ২য় ছবক

এগুলো ছাড়াও মওলানা ফরিদপুরীর লিখিত আরও কিছু বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা যায়।

মওলানা ফরিদপুরীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

এখলাছ, খোদা ভীতি, নৈতিক দৃঢ়তা, নিঃস্বার্থতা, বিনয় এসব এমন কতিপয় মহৎগুণ যেগুলোর আজকাল বড় অভাব। বাহ্যত অনেকের মধ্যে এসব গুণ দেখা গেলেও কার্যত এগুলো খুব কমই পাওয়া যায়। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর চরিত্র ছিল এসব মহৎগুণে গুণান্বিত। বাহ্যিক প্রদর্শনী ও ভাষার আলংকারিক চাকচিক্য দিয়ে নয়—বাস্তবজীবনের বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের তাকওয়া, পরহেযগারী, এখলাছ, খোদভীতি ও নৈতিক দৃঢ়তার উজ্জল দৃষ্টান্তসমূহ রেখে গেছেন। তাঁর মতো নিঃস্বার্থ ও যেকোনো লোভ-প্রলোভনের মুখে নিজেকে নীতি-আদর্শের উপর অটল রাখার মতো আলেমের নজির দেশেবিদেশে অতি বিরল। তেমনি আত্মমর্যাদবোধ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি এমন কোনো কাজ করতেন না, যদ্দ্বারা তাঁর জীবনের নীতি-আদশ ও নিজের আলেমসত্তার সামান্যতম অমর্যাদা ঘটে। তিনি অল্প মূল্যের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন, তাঁর খাবার ছিল আড়ম্বর মুক্ত। খোদাভীতি তাঁর দেহমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। যে কেউ একবার তাঁর নামাজ পড়ার ধরন ও একাগ্রচিত্ততা লক্ষ্য করেছে, সে যেমন কোনো দিন তা ভুলতে পারবেন, তেমনি তাঁর নিজের নামাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোও তার সামনে সুস্পষ্টভাবে এসে ধরা দিত। তিনি নামাজে দাঁড়ালে মনে হতো যেন নিজের গোটা অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পন করে আরেক জগতে চলে গেছেন। আল্লাহর কাছে যখন তিনি দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন এবং কাতরকন্ঠে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিজের মনের কথা তুলে ধরতেন, সে বলার ধরণই ছিল আলাদা। তাঁর মধ্যে ছিলনা কোনো প্রকার দাম্ভিকতা। সকলের সাথেই সহাস্যবদনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে কথা বলতেন। সংকীর্ণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃত্রিম গাম্ভীর্য প্রভৃতি থেকে তিনি উর্ধে ছিলেন। আল্লাহ-রসূলের নির্দেশের বরখেলাফ সামান্য কিছুও বরদাশত করা তাঁর ধাতে সইতোনা। তাতে বড় রকমের কোনো ক্ষতি কিংবা অসুবিধা দেখা দিলেও সেটার তিনি আদৌ পরোয়া করতেন না। হালাল-হারামের ব্যাপারে ছিলেন অত্যধিক সতক। বৈষয়িক ভোগ বিলাস, মান-ইজ্জত ও নেতৃত্ব কর্তৃত্বের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিল না। তাঁর মতো দুনিয়ার আকর্ষণহীন আলেম অতি কমই দেখা

যায়। মওলানা ফরিদপুরীর মতো ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছা করলে ঢাকাতে একাধিক বাড়িঘর করা কিছুই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু জ্ঞানের সাধক, খোদাপ্রেমে মশগুল ইসলামের এই নিঃস্বার্থ সেবক এজাতীয় প্রস্তাবকে সকল সময় তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এক ফকীর দরবেশ-সাধকের জীবনই ছিল তাঁর কাছে অতিপ্রিয়। এমনকি তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত কোনো একটি মাদ্রাসাতে সরকারী সাহায্য পর্যন্ত নিতেন না। অর্থের লোভে কখনও কোনো সরকারের দ্বারস্থ হননি। অর্থলোভী, স্বার্থপর এবং বাতিল সরকার ঘেঁষা আলেমদের প্রতি তিনি বিরক্ত ছিলেন। নিজের জন্যেই তিনি এই দুনিয়া নিরসক্তির জীবন বেছে নিয়ে ছিলেন যে তা নয়, তাঁর সন্তানাদিকেও তিনি এলমে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া রোজগারে কড়াভাবে নিষেধ করে গেছেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ ও মৌলিক লেখা বইসমূহ বিক্রি করে কোনো কোনো ব্যবসায়ী যেখানে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি গরিবী হালে চলেও ঐ সকল বইয়ের রয়েলটি বাবত কোনো টাকা পয়সা নিতেন না। এমনকি নিজ ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত তাঁর বইয়ের রয়েল্টি বাবত কোনো অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি নিষেধ করে গিয়েছেন। সাহাবা চরিত্রের এ মহাপুরুষের জীবনের উল্লেখিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিচে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। উল্লেখ্য যে, তাঁর বিভিন্ন ঘনিষ্ট মুরিদ এবং তাঁর সম্পর্কে লিখিত কোনো কোনো বইয়ের সৌজন্যে এসব ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে।

আশি হাজার টাকার দান ফেরত দেওয়া ঃ আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জিনজিরার হাফিজ সাহেব একবার মওলানা ফরিদপুরীকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আশি হাজার টাকা দিবার জন্যে তাঁর কামরায় উপস্থিত হন। টাকাগুলো মওলানা ফরিদপুরীর সামনে রেখে যখন তিনি বললেন, "হুজুর, আমি এ টাকা একমাত্র আপনাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দেবার নিয়ত করে এনেছি। দয়া করে টাকাগুলো গ্রহণ করুন।" মওলানা সাহেব বললেন, "আল্লাহ্‌র কাছে টাকার কোনো কমতি নেই। শুকরিয়া, আপনি এ টাকা নিয়ে নিন।" হাফিজ সাহেব লজ্জিত হয়ে টাকাগুলো ফেরত নিয়ে নিলেন।

শেরে বাংলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ঃ অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে শেরে বাংলা মৌলভী এ কে ফজলুল হক একবার সরকারী সফরে ঢাকা

এসে আশরাফুল উলুম মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন। সে সময় মওলানা ফরিদপুরী হাদীসের দরস দিচ্ছেলেন। ফজলুল হক সাহেব ক্লাশে গিয়ে মওলানা সাহেবের পাশেই বসে পড়লেন। হাদীস পড়ানো শেষ হবার পর মওলানা ফরিদপুরী শেরে বাংলার প্রতি তাকালেন এবং কুশল-বার্তা জিজ্ঞেস করলেন। পরিশেষে হক সাহেব বললেন, "আপনিতো জানেন, মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে এযাবত আমি কিছুই করতে পারিনি। এ সফরে মাদ্রাসাগুলোর আর্থিক সাহায্য দানের চেষ্টা করবো।" শেরে বাংলার কথা শুনে মওলানা ফরিদপুরী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি মাদ্রাসায় যে টাকা দিতে চান, সেটা কি ব্যক্তিগত না সরকারী ?" হক সাহেব বল্লেন, "সরকারী না হলে আমি এত টাকা কোত্থেকে দেবো ?" মওলানা সাহেব বললেন, "আমার সরকার থেকে যদি আপনার সরকার বড় হয়, তাহলে আপনার সাহায্য নিতে রাজি, অন্যাথায় নয়।" এবারে হক সাহেব নিরব হয়ে পরমূহূর্তে মাদ্রাসা থেকে নেমে আসেন। আইয়ুব শাসনামলে দশ লাখ টাকা প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সামান্য কিছু টাকার লোভে অনেক বিরাট খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও যেখানে পদস্খলন ঘটতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে লাখ লাখ টাকা এভাবে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে মওলানা ফরিদপুরী এটাই প্রমাণ করে গেছেন যে, তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল। একমাত্র ওলীয়ে কামেলদের পক্ষেই এরূপ সংযমী হওয়া সম্ভব।

বাড়ী পাকা করে দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

কাশ্মীর থেকে আগত মওলানা ফরিদপুরীর দুই শিষ্য গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে, আমরা একটি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে এসেছি। যদি হুজুরের অনুমতি হয়, আমরা আপনার বসবাসের জন্য একটি পাকা বাড়ী তৈরি করে দিতে চাই। তার জবাবে মহাপ্রাণ খোদাপ্রেমিক মওলানা ফরিদপুরী বললেন, "আমার বসবাসের জন্য পাকা বাড়ীরতো কোনো প্রয়োজন দেখছিনা। আমার টিনের ঘর আছে, তাতেই আমার চলে। অনেকের তো তাও নেই। এমন কি কুড়ে ঘরও অনেকের ভাগ্যে জুটে না। শীত বর্ষায় তারা উন্মুক্ত আকাশের নীচে বহু কষ্টে দিন যাপন করে। তাদের চাইতে আল্লাহ্ আমাকে অনেক বেশি শান্তিতে রেখেছেন।"

নিয়মানুবর্তিতা ঃ ইসলাম পাঁচবেলা নামাজ ও রমজানের রোজা প্রভৃতি কাজের মধ্যদিয়ে মানুষকে নিয়মানুবর্তিতারও অনুসারী করতে চায়। নিয়-

মানুবর্তিতাই জীবনের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। মওলানা শামসুল হক সাহেব সময় ও নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, সাধারণত যা অনেকের মধ্যে থাকেনা। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নির্ধারিত কর্মসূচী তিনি কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলতেন। তিনি যতই অসুস্থ থাকতেন এমনকি পেশাব-পায়খানা ও মসজিদে যেতে পর্যন্ত যখন তাঁকে অপরের সাহায্য নিতে হতো, তখনও তিনি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ও বই লেখা বা লেখানোর কাজ চালু রেখেছেন। হাসপাতালে থাকাবস্থায়ও নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন না। তাহাজ্জুদের পর ও সকাল বেলা তিনি নিয়মিত লেখার কাজ করতেন। এছাড়া অন্যান্য সময় মাদ্রাসায় শিক্ষাদান, মুরিদানের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে আলোচনার জন্য বরাদ্দ ছিল।

তালাবা-এ আরাবিয়ার সাথে সহযোগিতা

এক সময় আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের সমন্বয়ে তালাবা-এ-আরাবিয়া সংস্থাটি গঠিত ছিল। সে সময় মওলানা ফরিদপুরী মাদ্রাসা ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও ইসলামী আন্দোলনমূলক কাজে তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তিনি এক পর্যায়ে তালাবা-এ-আরাবিয়ার সভাপতি পদেও সমাসীন ছিলেন। যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামের ভবিষ্যত খাদেমদেরকে কিরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে, যুগের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে সমাজে ইসলামের শিক্ষা আদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের চরিত্র, খোদাভীতি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া দরকার তিনি তাদের সে ব্যাপারে পথ নির্দেশ করতেন।

মজলিস-এ-তামীরে মিল্লাতের সাথে সহযোগিতা

মজলিস-এ-তামীরে মিল্লাত ১৯৫৮ সালে দেশে আইয়ুবী সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার পর একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামী কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে ইসলামী সেমিনার সিম্পোজিয়াম, সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী ও নিউস্কাটন রোডে মজলিসের উদ্যোগে ইসলামী সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হবার পর সারা দেশে ইসলামী সেমিনারের ধুম পড়ে গিয়েছিল। ঐ সময় ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মপক্ষ সকল রাজনৈতিক দলই নিষিদ্ধ ছিল বলে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে এভাবেই সক্রিয় রাখতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর বিশেষ দান হলো এই যে, যেই মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে রাজধানীতে কোনো প্রকার সভাসমিতি করা সম্ভব ছিল না, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি সিদ্ধেশ্বরীতে ৩ দিন ব্যাপী ইসলামী সেমিনারের উদ্বোধন করেছিলেন। সামরিক শাসন বলে তামীর-এ-মিল্লাত কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি আদৌ দ্বিধাবোধ করেননি বরং অন্যদেরকেও এরূপ ইসলামী তৎপরতার জন্যে অনুপ্রাণিত করতেন।

ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রতি সমর্থন

মুসলীম লীগ সমর্থক মুসলিম ছাত্রলীগ যখন শুধু ছাত্রলীগে পরিণত হয়ে গেল, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ বাদ পড়লে এবংন্যাপের সৃষ্টি হলো, ঠিক সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের কলেজ পর্যায়ে ইসলামী কোনো দাবীদাওয়া তোলার কোনো ছাত্র সংগঠন ছিল না বল্লেই চলে। খেলাফতে রব্বানী সমর্থক ছাত্র শক্তির ভূমিকাও তেমন কার্যকর ছিল না। ঠিক সে দুদিনে দেশের উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে 'ইসলামী ছাত্র সংঘ' ইসলামের কাজ শুরু করে। বিরাট প্রতিকূলতার মাঝে ছাত্রসংঘকে কাজ করতে হতো। ঐ মহলে কাজের জন্যে সবেধন নীলমণি হিসাবে ছাত্র সংঘের ইমানদীপ্ত কর্মীরা ছিল সকলের কাছে অতি আদরনীয়। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেও ছাত্র সংঘ কর্মীদের ইসলামের প্রতি দরদ, তাদের ইসলামী চরিত্র ও কাজ কর্মে আরও দশজন ইসলাম দরদীর ন্যায় মওলানা ফরিদপুরীও অত্যন্ত আনন্দবোধ করতেন। তাদের কাজে তিনি উৎসাহ দিতেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মাদ্রাসার কিছু ছাত্রও ছাত্র সংঘের সাথে জড়িত ছিল।

সুন্নতের উপর দৃঢ়তা: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম দিকে দেশের ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের এক পরামর্শ সভা আহবান করেন। তাতে অংশ গ্রহণকারী পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন আলেমের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। করাচী অবস্থান কালে পাকিস্তানের তৎকালীন উজিরে আজম লেয়াকত আলী খান ঐ পাঁচজন আলেমকে তার বাড়ীতে এক ভোজ সভায় আমন্ত্রণ দেন। জিন্নাহ্ সাহেব, সরদার অব্দুর রব নিস্তার, ইছমাইল চুন্দ্রীগড়, পীরজাদা

আব্দুস সাত্তার সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও সে দাওয়াতে শরিক ছিলেন। যথাসময় খাবারের আয়োজন হলে পরিবেশক ডাইনিং টেবিলে কাটা চামচ, ছুরি, ইত্যাদি এনে হাজির করলে মওলানা ফরিদপুরী প্রধান মন্ত্রী লেয়াকত আলী খানকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ডাইনিং টেবিলেই কি আমাদের খানা খেতে হবে? খান সাহেব বল্লেন, জী হাঁ—এখানেই ব্যবস্থা করেছি। মওলানা সাহেব বল্লেন, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নতকে বিসর্জন দিয়ে আমি এভাবে খানা খেতে অক্ষম। মওলানা সাহেবের কথায় জিন্নাহ্ সাহেব সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার ঐ কক্ষের এক কোণে রেখে দিয়ে কার্পেটের উপর চাদর বিছিয়ে সকলে আহারাদি করেছিলেন। বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ছোট হলেও এঘটনার মধ্য দিয়ে নবী করীমের ও ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপারে যেমন মওলানা ফরিদপুরীর কঠোর আনুগত্যের প্রমাণ মিলে, তেমনি যে ধরনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকই হোকনা কেন কারুর ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি আপন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সতর্ক।

বাদশাহ্ আবদুল আজীজের দরবার

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী জীবনে মোট পাঁচ বার হজ্ব পালন করেন। তাঁর দ্বিতীয় বারের হজ্বের সময় (সন...) তিনি মদীনার মসজিদে সমবেত মুসলমানদের মাঝে ওয়াজ-নছীহত করতেন। অন্য মযহাবের অনুসারীদের সাথেও তাঁর আলোচনা হতো। ঐ সকল মযহাব সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা দেখে তাঁর চাইতেও প্রবীনতর অনেক বিশিষ্ট ওলামা-এ-কেরাম তাঁর চারিপাশে এসে বসতেন। তিনি কোরআন-হাদীসের আহকাম সম্পর্কিত তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তৎকালীন সৌদী আরবের বাদশাহ আবদুল আজীজ বিন সৌদের কাছে এ খবর গিয়ে পৌঁছুলে তিনি মওলানা ফরিদপুরীকে একদিন রাজধানীতে ডেকে পাঠান। তাঁর সাথে বাদশাহ্র বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং এ সম্পর্কিত দু'টি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। সৌদী বাদশাহ আবদুল আজীজ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর উপদেশ মিশ্রিত এ বক্তব্যে অত্যধিক প্রীত হন এবং তাঁকে প্রোশা-

কাদি উপঢৌকন দেন। তারপর বিভিন্ন সমস্যার ইসলামী সমাধানের প্রশ্নে বাদশাহ্‌ তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায়।

ঢাকা থেকে শেষ বিদায়

মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী যখন অনুভব করলেন যে, তাঁর অন্তিম মুহূর্তের আর বেশি দেরি নেই, তখন তাঁর কর্মময় জীবনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ঢাকা থেকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেষ বিদায় নিয়ে তিনি গওহার ডাঙ্গাস্থ নিজ বাড়ীতে চলে যান। বিদায় মুহূর্তে তাঁর আপন হাতে গড়া লালবাগ জামেয়া-এ-কোরআনিয়ার ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, "আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ঢাকায় আর ফিরতে পারি কি না পারি আমার জন্য দোয়া করবেন।" এই বিদায় অনুষ্ঠানে লালবাগ মাদ্রাসার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মওলানা জাফর আহমদ উসমানীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মওলানা উসমানীকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "হুজুর, দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্‌ পাক 'খাতেমা বিলখায়ের' করেন। মওলানা উসমানী সাহেব হেসে বল্লেন, "এত জলদি বিদায়! আমি তো তোমার চেয়ে বেশি বৃদ্ধ।" কিন্তু হলে কি হবে, ইসলামের এ মহা খাদেম মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর ওটাই ছিল ঢাকা থেকে শেষ বিদায়।

সন্তানদের ব্যাপারে স্ববিরোধিতার উর্ধে ছিলেন

আজকাল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দরুনই হোক কিংবা বাস্তবতার তাগিদে অনেক বিশিষ্ট আলেমকেও একটি স্ববিরোধিতার শিকার হতে দেখা যায়। সেটা হলো নিজের সন্তানকে কোরআন-সুন্নাহর তথা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত না করেই বৈষয়িক শিক্ষায় ভর্তি করানো। মনে হয়, তাঁরা নিজেরা একবার মাদ্রাসায় পড়ে ভুল করেছেন, একই ভুল স্নেহের ছেলেমেয়েদের দ্বারাও না হোক এটাই চান। এ শ্রেণীর আলেমের এই স্ববিরোধিতার দরুন সমাজের সচেতন মহল যারা এমনিতেই মাদ্রাসা শিক্ষাবিমুখ, তারাতো দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হচ্ছেই এমনকি যারা চিরদিন আর্থিক, নৈতিক কায়িক বিভিন্ন ভাবে মাদ্রাসার জন্য খেটেছে তারাও এখন নিজ সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়ানোর প্রয়োজন বোধ করছেন না। কিন্তু মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী এ স্ববিরোধিতার উর্ধে ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তান মুহাম্মদ ওমরের উদ্দেশে অন্তিম উপদেশে বলে গেছেন—"তুমি আলেম হবে। তোমার ছোট ভাই রুহুল আমীনকে হাফেজ ও আলেম বানাবে এবং মায়ের খেদমত করবে।"

ইন্তেকাল

শারীরিক অসুস্থতার কারণে মওলানা ফরিদপুরী ঢাকা থেকে নিজ বাড়ী আসার পর ১৩ মাস জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসাতেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন এবং ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধা সমূহ লক্ষ্য করতেন। তিনি শেষ রাতে মাদ্রাসায় এসেই তাহাজ্জুদ আদায় ও যিকির-আযকার করতেন এবং উপস্থিত মুরীদানকে তালীম-তালকীন দিতেন। জীবনের এই প্রান্তে গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার জন্যই তিনি সর্বদা চিন্তা-ফিকিরে থাকতেন।

ইনতেকালের চারদিন পূর্বে এক শুক্রবার থেকে তাঁর শরীরের অবস্থা অধিক খারাপের দিকে যেতে থাকে। তার আগের দিন বৃহস্পতিবার তিনি চিকিৎসককে নিষেধ করে দেন যে, তার আর আসতে হবে না— অসুখ ভালো হয়ে গেছে। কবিরাজ শনিবার দিবাগত রাত এক স্বপ্ন দেখে তার ব্যাখ্যা জানার জন্যে মওলানা সাহেবের নিকট আসলে তিনি তার ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলে দেন যে, মঙ্গলবার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে। এভাবে সাড়ে তিন দিন অতিবাহিত হয়! তিনি এর মধ্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন ও মাদ্রাসা সম্পর্কে যাকে যা ওছিয়ত করার ছিল, তা সম্পন্ন করেন।

চতুর্থ দিন মঙ্গলবার দুপুরে ছেলে মুহাম্মদ ওমরের প্রতি ওছিয়ত সমাধার পর সবাইকে বিদায় দিয়ে বলেন যে, "আপনারা নামাজ পড়তে যান।" তিনি যোহরের নামাজের জন্যে কিবলার দিকে চৌকি ঘুরাতে বলেন। মিছ্ওয়াক চেয়ে নিলেন। অন্যের সাহায্যে মিছ্ওয়াক ও অজু করলেন। শোয়া বস্থাতেই নামাজ আদায় করলেন। যোহরের নামাজান্তে মওলানা সাহেব কলমা-এ-শাহাদাত পড়তে শুরু করেন। কলমা পড়ার পর নিম্নলিখিত দোয়া পড়তে থাকেন এবং পরিবারের উপস্থিত সকলকেও ইঙ্গিতে পড়তে বল্লেন— আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আলহিক্নী বিররাফীকিল আলা— হে॥ আল্লাহ্। আমার সব গুনাহ্খাতা মাফ করে দিন। আপনার রহমতের কোলে আমাকে স্থানদিন। মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলি দিন। মহা নবী (সাঃ) অন্তিমমুহূর্তে এ দোয়া পড়েছিলেন। মহান আধ্যাত্মিক সাধক, দেশ,

ধর্ম, সমাজের একনিষ্ঠ সেবক মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীও একই দোয়া উচ্চারণ করেন এবং মওলার দরবারে গিয়ে হাজির হন। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইং মঙ্গলবার বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় উপমহাদেশের এই মহান ব্যক্তি এদেশকে এতীম করে ইহজগত ত্যাগ করেন। —ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ টেলিগ্রাম যুগে সাথে সাথে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করা হয়। পাকিস্তানের মুফতী-এ-আজম মওলানা মুহাম্মদ শফী, আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী, আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী, মওলানা ইহ্‌তেশামুল হক থানভী, মওলানা ইদ্রিস কান্দলভী বাংলার এই কৃতী সন্তান মুমিন-এ-কামেল মওলানা ফরিদপুরীর ইনতেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বিভিন্নস্থান থেকে শোকবাণী আসতে থাকে। পরদিন (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইং) দুপুর ১১টায় গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহ্‌তামিম মওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজীজ সাহেবের ইমামতীতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার পাশেই পূর্ব ওছিয়ত মাফিক তাঁর কবর দেয়া হয়। মওলানা মরহুমের জানাজায় হাজার হাজার আলেম সহ প্রায় ৬০ হাজার লোক উপস্থিত হয়।

কেরামত : শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, মোহাদ্দেস, বহু গ্রন্থ প্রণেতা মহান আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর জীবনে অনেক কারামত বা অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। তবে আমার মতে, তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত ও লোভলালসার মধ্যে কোনো প্রকার নীতিভ্রষ্টতা ছাড়া একাধারে জীবনের এতগুলো বছর কামেল ঈমানদার হিসাবে আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অটল থাকা এবং দ্বীনের কাজের চিন্তা ও আল্লাহ্‌র নাম মুখে উচ্চারণ করতে করতে তাঁর সান্নিধ্যে চলে যেতে পারাটাই হচ্ছে তাঁর জীবনের বড় কারামত। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সমাজ থেকে এ মহৎ পুরুষের শূন্যতা কবে দূর করবেন ?

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ

[জঃ ১৯০০ - মৃঃ ১৯৭৪ খৃঃ ২ রাঃ ডিঃ]

মুসলিম আধিপত্যের অবসানের পর বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডে ইসলামী শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা ইত্যাদি বজায় রাখার দায়িত্ব এককভাবে সমাজের নিঃস্বার্থ ওলামা-এ-কেরামই পালন করে আসছেন। তন্মধ্যে সামগ্রিকভাবে ওলামা সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে একই মহৎ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং কোরআন-হাদীসে বিচক্ষণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আত্মমর্যাদা-শীল আলেম তৈরি করা, ইসলামের শিক্ষা আদর্শকে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে সমা-জের সামনে তুলে ধরা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে। সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে কোনো দুর্দিন দেখা দিলে কিংবা ইসলামের উপর সমসাময়িক ক্ষমতাসীন সরকার বা কোনো মহল ও সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোনোরূপ হামলা আসলে নির্ভীকতা ও সাহসিকতার সাথে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকা-বিলা করা অনেক আলেমের পক্ষেই সম্ভবপর হয়না। বাংলার ওলামা-কুল শিরোমণী হযরত মওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর মধ্যে এ প্রত্যেকটি গুণই সমভাবে বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিশাল ভূভাগে যেকয়-জন বিশিষ্ট আলেম ও খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটেছে, ঢাকা তথা গোটা বাংলার কৃতি সন্তান আলহাজ্জ মওলানা মুফতী দ্বীন মুহা-ম্মদ খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলামী শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্ব, অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়চেতা এই মনীষী শিক্ষা জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে আমরণ ইসলামের সেবায় নানাভাবে জড়িত ছিলেন। একজন বাগ্মী ও যুক্তিবাদী মোফাস্সির-এ-কোরআন হিসাবে সর্বপ্রথম তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একাধারে মোফাস্সির, মোহাদ্দিস ও অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। রাজধানী ঢাকায় সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর আলাদা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। গোটা ঢাকাবাসী তাঁকে এতই আপন

জন মনে করতো যে, তাঁর আকস্মিক তিরোধানের খবর স্বল্প সময়ের মাঝে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কর্মচঞ্চল ঢাকা নগরীর সকল কর্ম কোলাহল মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর নামাজ-এ-জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন হাজার হাজার ওলামা ও তালাবা যা সাধারণ ভাবে অন্য কোনো নামাজ-এ-জানাযায় খুব বিরলই দেখা যায়। বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাসে কোনো জানাযায় এত অধিক লোকের সমাগম হয়নি। তিনি যে অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন এবং সমাজের প্রতিটি মুসলমানের মনের মণিকোঠায় তাঁর স্থান ছিল, এ সমাবেশ ছিল তারই প্রমাণ।

বাংলা ভাষাভাষী একজন শিক্ষিতের পক্ষে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উর্দূ-আরবী ভাষা সাহিত্যের উপর যতই দখল থাকনা কেন, ঐসকল ভাষায় পাণ্ডিত্ব অর্জন ও সে সব ভাষায় অরর্গল বক্তৃতা দান কিংবা গ্রন্থ রচনা সহজ কথা নয়। কিন্তু মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁর নিকট ঐ দু'টি ভাষা মাতৃভাষার মতই ছিল। তাঁর ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব ছাড়াও ঐ সকল বিদেশী ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতাও তাঁকে দেশবিদেশে অধিক খ্যাত করেছে। বাংলাদেশের আলেম সমাজের স্তম্ভ হিসাবে যে কয়জন ব্যক্তিত্বশালী আলেম ছিলেন, তাঁদের অনেকের সাথে মুফতী সাহেবেরও তিরোধান, এদেশে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে গেছে, তা সহজে পূরণ হবার নয়।

বংশ পরিচিতি ও জন্ম

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ১৯০০ খৃ. জানুয়ারী মাসে ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ গণের আদি অধিবাস ছিল সীমান্ত প্রদেশের বাজুড় এলাকায়। তাঁর পিতা নূরুল্লাহ্ খাঁ বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর একজন ক্যাপটেন ছিলেন। মনিপুরের যুদ্ধ উপলক্ষে নূরুল্লাহ্ খাঁ বাংলাদেশে আগমন করেন এবং চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি মোমেন শাহীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। সেই ঘরেই মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনাব হাজী নূর মোহাম্মদ খাঁ ও এক বোন জন্ম গ্রহণ করেন। মুফতী সাহেবের ভাই ও একমাত্র বোন তাঁর ইনতেকালের পূর্বেই এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

আজকালকের মতো তৎকালীন সময় যেখানে সেখানে নিয়মিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিলনা। মুসলিম সমাজে শিক্ষার ঐতিহ্যগত ধারা হিসাবে প্রতিটি মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাতেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতো। কোনো কোনো মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এজাতীয় শিক্ষা অধিকাংশই হতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট মসজিদের সাথে জড়িত ওলামা-এ-কেরামই ঐ সকল মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসাসমূহে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করতেন। রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসজিদ চকবাজারের জামে মসজিদটি ঐধরনেরই একটি মসজিদ ছিল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভেরও সুযোগ ছিল। মওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ উক্ত চকবাজার মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসাতেই সেখানে অবস্থান-রত মওলানা ইবরাহীম পেশোয়ারীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চস্তরের কিতাবাদি পড়াশোনা করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান গমন করেন এবং ১৯১৫ খৃঃ উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণের পাদপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ দেওবন্দে ৫ বছর ধরে ফিকাহ, হাদীস, তফসীর, ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এক পর্যায়ে তিনি সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা থেকে 'মোল্লা ফাজেলের' পরীক্ষায়ও অংশ নেন। মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ বিশ্ববিখ্যাত দিল্লীর মুফতী কেফায়াতুল্লাহ্ সাহেবের হাদীস শিক্ষা কোর্সেও যোগদান করেছিলেন এবং দিল্লীর আমিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেছেন। তিনি দারুল উলূল দেওবন্দে অধ্যয়নকালে প্রখ্যাত মোহাদ্দেস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরীর নিকটও হাদীস অধ্যয়ন করেন। হাদীস শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করার পর মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ১৯২১ খৃঃ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

বৈবাহিক জীবন

ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পর মুফতী সাহেব তাঁর কর্মজীবন শুরুকরার কিছুকাল পর ১৯২৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে ঢাকার জনাব

হাকীম মুহাম্মদ আরশাদ আলী সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ কোরায়শা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ঘরে তাঁর এক পুত্র এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে আহমদ আবদুহু এবং আহমদী বেগম ওরফে হোমায়রা খাতুন। শিশু বয়সেই উভয় সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাতে মুফতী সাহেব তাঁর নিঃসন্তান অবস্থায় মানসিক শূন্যতা উপলব্ধি করতে থাকেন। এ শূন্যতা দূর করার জন্যে অবশেষে স্ত্রীর জেষ্ঠ ভগ্নির শিশুপুত্র এসরার আহ্মদকে দুগ্ধ পোষ্য সন্তান (রেজায়ী আওলাদ) হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেন। মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ আমরণ পোষ্য সন্তান এসরার আহ্মদ ও তাঁর সন্তান সন্ততি নিয়েই জীবন যাপন করেছেন।

কর্মজীবন ঃ বার্মায় ইসলাম প্রচার

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর কর্মজীবন অর্ধ শতাব্দী কাল। এ বিস্তৃত সময়ের মধ্যে তিনি অধ্যাপনা, তফসীরের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষা আদর্শের বিস্তার ও সমাজ সেবার মধ্যে কাটিয়েছেন।

শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করে তিনি সর্বপ্রথম ঢাকার প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে তাঁর জীবনের প্রায় এক যুগকাল অতিবাহিত হয়। সাথে সাথে তিনি সর্বত্র একজন সুবক্তা হিসাবেও সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। ঢাকা শহরে সাধারণত উর্দূভাষারই প্রচলন অধিক ছিল বলে মুফতী সাহেব এখানকার সভাসমিতিতে প্রায় উর্দূতেই বক্তৃতা দিতেন। তাঁর উর্দূ বক্তৃতা একজন দক্ষ উর্দূ ভাষাভাষী বক্তার মাতোই গতিশীল ও আকর্ষণীয় ছিল। সুদূর বার্মাতেও তিনি বক্তৃতা সফরে যেতেন। তিনি কয়েক বছরের শিক্ষকতার বিরতি দিয়ে বার্মায় ওয়াজ-নসীহত, কোরআন তফসীর, রোশ্দ ও হেদায়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। বার্মা সফর তাঁর কর্মজীবনের এক নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। বার্মায় ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়ে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

কার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ কোন্ বান্দার হেদায়াতের ব্যবস্থা রেখেছেন, সেটা তিনিই জানেন। বার্মার পথহারা মানুষেরা বাংলার কৃতি সন্তান

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর ওসীলায় আল্লাহ্‌র পথের অনুসারী হবার সুযোগ পাবেন, এটা কেউ পূর্বে ভাবতেও পারেনি। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁর এই প্রিয় বান্দা দ্বীনের হাদীর জন্য বার্মা যাবার উপলক্ষ করে দেন। বাংলা-দেশের প্রতিটি মুসলমানের কাছে অতি সুপরিচিত আওলাদ-এ-রসূল মওলানা আবদুল করীম মাদানীর সাথে একবার তাঁর পরিচয় ঘটে। মওলানা আব-দুল করীম মাদানী তখন সারা বাংলায় বিভিন্ন সভাসমিতি ও ধর্মীয় মাহ্‌ফিলে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান জানাতেন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর সাথে মওলানা মাদানীর পরিচয় ঘটার পর উভয়ের মধ্যে অধিক হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। মুফতী সাহেব মাদানী সাহেবের আরবী বক্তৃতাসমূহ বাংলায় তরজমা করে দিতেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজ পরিহার করে মুফতী সাহেব এখন মওলানা মাদানীর সাথেই ইসলামের তাবলীগে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। ঠিক ঐ সময় মওলানা সাইয়েদ আবদুল করীম মাদানী ইসলাম প্রচারের গরজে বার্মা সফরের সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং ইসলামের উভয় খাদেম ১৯১১ সালের গোড়ার দিকে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছেন। মুফতী সাহেব আগের মতোই মওলানা আবদুল করীম মাদানীর আরবী বক্তৃতার উর্দু তরজমা করে বার্মার জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আহবান জানাতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বার্মার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অধিবাসীই উর্দু ভাষা জানে। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর মওলানা মাদানী ও মুফতী সাহেবের কাজের ধরন আলাদা হয়ে যায়। মুফতী সাহেব রেঙ্গুনের বাঙ্গালী জামে মসজিদের মুফতী ও খতীব নিযুক্ত হন এবং ঐ মসজিদকে কেন্দ্র করে তাফসীর এবং ওয়াজ-নছীহতের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। বার্মার অধিবাসী মুসলমানরা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর মতো একজন বিচক্ষণ আলেমকে পেয়ে অপরিসীম আনন্দিত হয়ে উঠলো। তারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও মসলা-মাসা-য়েলের সম্মুখীন হলে মুফতী সাহেবের নিকট এসেই তার ইসলামী সমাধান জেনে নিত। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার গৌরব মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খানের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুফতী সাহেব প্রায় বার বছর ধরে বার্মায় ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। এক পর্যায়ে তিনি পরিবার-পরিজন সব নিয়ে বার্মায় চলে যান।

বার্মা থেকে প্রত্যাবর্তন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯৪১ খৃঃ মুফতী সাহেব বার্মা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ১৯৪৬ সালে প্রথমে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বড় কাটারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার সাথেও জড়িত ছিলেন। অতঃপর ১৯৫০ খৃঃ লালবাগ জামেয়া-এ-কোরানিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি সেখানে হাদীস ও তাফসীরের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মুফতী সাহেব লালবাগ মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আমরণ এদ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির ছিলেন সেক্রেটারী।

তাফসীর মাহফিলের প্রতি গুরুত্ব দান

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঢাকাতে কোরআনের তাফসীরের মধ্য দিয়েই মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর প্রসিদ্ধি ঘটে। একজন দক্ষ মোফাসসির-এ-কোর-আন হিসাবেই দেশ-বিদেশে তিনি অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। বার্মাতে বাঙ্গালী জামে মসজিদে মুফতী ও খতীব হিসাবে নিয়োজিত হবার পর একাধিকবার গোটা কোরআন মজিদের তিনি তফসীর বয়ান শেষ করেন। ১৯৪১ সালে ঢাকায় এসেও পুনঃরায় ঢাকা নগরীর মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র চক বাজার মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনি বাদে এশা প্রত্যহ নিয়মিত কোর-আনের তাফসীর বয়ান শুরু করেন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ সাহেবের তাফসীরের মাহফিলে যেমন বার্মাতে তেমনি ঢাকাতেও হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল-মানের সমাগম ঘটতো। ইতিপূর্বে গতানুগতিক মীলাদ, দ্বীনী ওয়াজ ও যিকির আযকারের হালকা-মাহফিলেরই শুধু এদেশে রেওয়াজ ছিল। যেখানে অনেক অযৌক্তিক ও অপ্রামাণ্য কেচ্ছা-কাহিনীও বর্ণিত হতো এবং সরাসরি আল্লাহ্‌র কালামের মর্মবাণীর সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানোর কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। মুফতী সাহেব কর্তৃক তাফসীর বয়ানের উপর অধিক গুরুত্ব আরো-পিত হওয়ায় সাধারণ মুসলমানগণ সরাসরি কোরআন মজিদ বুঝার সুযোগ পাওয়ায় সর্বত্র এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। মুফতী সাহেবের তাফসীর মাহফিলের জনপ্রিয়তা ঢাকাতে এতই বৃদ্ধি পেলো যে, চক থেকে নবাববাড়ীর আহসান মঞ্জিল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাস্থলে শ্রোতাদের সুবিধার্থে সবসময়ের জন্যে মাইক্রোফোন স্থাপিত থাকতো। চক বাজারে বহুবার তিনি ৩০ পারা কোরআন মজিদের তাফসীর বয়ান সমাপ্ত করেছেন।

ঢাকা রেডিও ষ্টেশন থেকে "কোরআন-এ-হাকীম ও হামারী জিন্দেগী" এ পর্যায়ে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ কোরআন মজিদের দীর্ঘ দিন যাবত তাফসীর বয়ান করেন। তাঁর সেই বর্ণনা এতই যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, যে কোনো শ্রোতা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ভুলতে পারতোনা।

কোরআন মজিদের সাথে মুসলমানাদর সম্পর্ককে নিবিড় করার জন্য তাফসীর মাহফিলকে ব্যাপকতা দানের উদ্দেশ্যে মুফতী সাহেব সদা সচেষ্ট ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অধিক মোফাস্‌সির সৃষ্টির পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তিনি প্রতি বছর রমজান মাসে মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষা সমাপ্তকারী ফাজেল, কামেল ও দাওরা-এ-হাদীস পাস ছাত্রদের জন্যে এক মাসের একটি তাফসীর শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তন করেছিলেন। সরাসরি কোরআনের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপনকে তিনি এতই গুরুত্ব দিতেন যে, এজন্যে তিনি নিজ পকেট থেকে তাফসীর কোর্সে অংশ গ্রহণকারীদেরকে ভাতা দিতেন। (এখানে উল্লেখ্য যে, মুফতী সাহেব একজন স্বাবলম্বী বিত্তশালী আলেম ছিলেন। কোনো আলেমের হাত "দাতার হাত" না হয়ে "গ্রহিতার হাত' হোক এটা তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর এই আত্মসম্মানবোধই তাঁকে একটি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঢাকা মৌলভী বাজারে তাঁর ব্যবসায় ছিল।) রমজান মাসে যে তাফসীর কোর্স চালু ছিল, তার ক্লাস মৌলভী বাজার এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো। তাঁর এ তাফসীর ক্লাসের দ্বারা সমাজে তাফসীর শাস্ত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বহু নবীন আলেম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ তাফসীর মাহফিল ও বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে কোরআনের খেদমতের যেই রীতি প্রচলন করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি তার সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর সেই রীতির অনুসরণে এখন ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে তাফসীরের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সংস্কারমূলক কাজ

ধর্মের নামে আমাদের সমাজে কুসংস্কারের অন্ত নেই। আজকের চাইতে অতীতে শির্ক, বেদআত, বিজাতীয় আচার-প্রথা আরও অধিক ছিল। বিশেষ করে মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ সাহেব যে সময় কর্মজীবনে পদার্পণ করেন,

সে যুগে বেদআত ও যাবতীয় কুপ্রথার অধিক প্রাবল্য ছিল। পীরপূজা, কবর পূজা, রবিউল আওয়াল ও শবেবরাত উপলক্ষে আতশবাজী পোড়ানো, মীলাদের মাহফিলের মধ্য দিয়ে বেদআতী কাজ-কর্মের অনেক দৌরাত্ম্য ছিল। মীলাদ মাহফিলের নামে যা কিছু হতো, তাতে মহানবীর জীবনের মূল শিক্ষা, আদর্শ নবীজীবনের লক্ষ্য বর্ণনার চাইতে অনেক অপ্রামাণ্য বিষয় বর্ণিত হতো অথবা শুধুমাত্র দরুদ সালাম ও কিছু কাসীদা পাঠ কিংবা কাওয়ালী অনুষ্ঠান দ্বারা "সওয়াব হাসিলের" মহৎ কাজ সম্পন্ন করা হতো। কিন্তু মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ধর্মীয় পোশাকে মুসলিম জীবন ধারায় যেসব কুপ্রথা অনুপ্রবেশ করেছিল, ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে সেগুলোর উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। তিনি সীরাতুন্নবী জলসার প্রবর্তন করে সমাজে সার্থক মৌলুদ পদ্ধতির প্রচলন করলেন। সীরাতুন্নবী জলসা এখন শুধু ঢাকা নগরীতেই নয় দেশের সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলমান জনসাধারণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নবীজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ওয়াকিফ হবার সুযোগ লাভ করেন। একদিকে তাঁর তাফসীর মাহফিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে সীরাত জলসার প্রবর্তন এখানকার ধর্মীয় জীবন ধারায় নুতন প্রাণের সঞ্চার করে।

ঢাকার শহরজীবনের অসংখ্য কুপ্রথার মাঝে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জুয়া পদ্ধতি ছিল একটি। এমনিতে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো আপত্তি না থাকলেও বাজী ধরে ঘোড়দৌড় প্রথা চালু হওয়ায় তাতে বহু স্বচ্ছল ও বিত্তবান পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছিল। এ ঘৃণ্য জুয়া থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেও কোনো ফল লাভ হচ্ছিল না। অতঃপর মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ সাহেব একবার চক মসজিদে জুয়া সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীর বর্ণনার সময় জনগণকে ঘোড়দৌড় বাজীর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করলে তা যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। সে থেকে জুয়াড়ীরা তাদের জুয়ার ঘোড়া বিক্রি করে দেয়। রেইস কোর্স ময়দানে জুয়ার ঘোড়ার রেইস বন্ধ হবার ব্যাপারে মুফতী সাহেবের এটা ছিল বিরাট কীর্তি।

রাজনীতিতে মুফতী সাহেব ও গ্রেফতারী

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর দীর্ঘ কর্ম জীবনে দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক ওলট পালট ঘটেছে। বহু আন্দোলন বিক্ষোভের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। রাজনৈতিক

নৈতিক বহু পরিবর্তন দেশে-বিদেশে সাধিত হয়েছে। একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি এবং ইসলাম ও মুসলমানের খাদেম হিসাবে এসব থেকে তাঁর দূরে অবস্থানের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাঁর ভরা যৌবনেই হিমালয়ান উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। মুসলিম মিল্লাতের এককালের রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র তুর্কী খেলাফত ধ্বংসের জন্যে ইংরেজ শক্তির ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছিল। বৃটিশ ভারতের মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। মুফতী সাহেব তখন কোন্ উপলক্ষে আসামে ছিলেন। এই উপমহাদেশের অন্যান্য সচেতন ওলামা-এ-কেরামের ন্যায় তিনিও খেলাফত আন্দোলনে যোগদেন এবং অন্যান্যদের মতো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ একজন ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক ব্যাপারেও অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এদেশের মুসলমানদেরকে ঐ সকল পরিস্থিতিতে কি ভূমিকা নিতে হবে এবং তাদের কর্মপন্থা কি হবে, সে ব্যাপারে তিনি সময়মত নেতৃত্ব দিতে কসুর করেন নি। মুফতী সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের সনদ প্রাপ্ত ছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সেই হিসাবে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালনকারী দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক সমর্থনপুষ্ট জমীয়তে ওলামা-এ-হিন্দের অখণ্ড ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সমর্থন করার কথা ছিল। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের ওলামাকুল শিরোমণী তা করেননি। তিনি দেওবন্দেরই এককালের প্রধান শিক্ষক মওলানা শাব্বীর আহ্মদ উসমানীর নেতৃত্বে খণ্ড ভারত তথা পাকিস্তান আন্দোলনেই অংশ গ্রহণ করেন। এটা ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই ফল। মুফতী সাহেবের এ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সমাজে তাঁর মর্যাদাকে অধিক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ তৎকালীন বাংলা-আসাম জমিয়তে ওলামা-এ ইসলামের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। পূর্বাঞ্চলীয় আলেম সমাজের এটা ছিল একক একটি বলিষ্ঠ সংগঠন।

শুধু ৪৭-এর স্বাধীনতা আন্দোলনেই নয় মুফতী সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সহ প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে সংক্রিয় ছিলেন। তাঁর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায়ই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ১৯৫৩ এবং ৫৫ সালে যথাক্রমে দু'দিন ও একদিন ব্যাপী বিরাট ইসলামী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে ঢাকার বুকে তখন এজাতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠান মুফতী সাহেবের উদ্যোগ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতোনা। সে সকল সম্মেলনে সারা বাংলাদেশের ওলামা, পীর-মাশায়েক ও ইসলামী বুদ্ধিজীবিরাই কেবল অংশ গ্রহণ করতেননা, পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও বিখ্যাত ওলামা ও বুদ্ধিজীবিরা তাতে শরিক হতেন। আজ সারা বাংলায় ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার বইছে। প্রথম স্বাধীনতার পর মুফতী সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঢাকার বুকে ঐ সকল বড় বড় ইসলামী সম্মেলনই মূলতঃ এদেশের ওলামা সমাজকে রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে অধিক সচেতন করে তোলে। অন্যথায় দীর্ঘ দিনের স্থবিরতার ফলে সাধারণ ভাবে আলেম সমাজ রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেকটা অসচেতনই ছিলেন। বরং রাজনীতি করাকে তাদের অনেকেই দুনিয়াবী কাজ বলে মনে করতেন।

এছাড়া জাতীয় ও ধর্মীয় যেসব সংকট মাঝে মধ্যে দেখা দিত, সেসব পরিস্থিতিতেও মুফতী সাহেবকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। যেমন, ফিৎনা-এ-ইনকারে হাদীস, আইয়ুবী শাসন আমলে ডক্টর ফজলুর রহমানের মাধ্যমে ইসলামকে আধুনিকীকরণ ও কোরআন বিরোধী পরিবার আইনের প্রচলনের পাশাপাশি হাদীস অস্বীকৃতির ধৃষ্টতামূলক এই ফিৎনাও জোরদার ছিল। মুফতী সাহেব এ প্রত্যেকটির বিশেষ করে 'ইনকারে হাদীসে'র বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ঢাকাতে অনেক প্রতিবাদ সভা ও ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুফতী সাহেব রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ থাকলেও এদেশের ইসলামী আন্দোলনের বলিষ্ঠ সংগঠন জামায়াতে ইসলামী এবং মওলানা আতহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করে গেছেন।

ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা

১৯৬৯ সালে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির আন্দোলনেই আয়ুব শাসনের পতন ঘটে। এ কমিটি গঠনের শর্ত অনুযায়ী এর অঙ্গদলসমূহ নিজ নিজ কর্মসূচী ত্যাগ করে শুধু গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ফলে ঐ প্লাট ফরম থেকে জামায়তে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামা, পিডিপি প্রভৃতি ইসলামী রাজনৈতিক দলের পক্ষে ইসলামী দাবি-দাওয়া সমূহের উত্থাপনে সাময়িক ভাবে অসুবিধা দেখা দেয়। অথচ তখন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহল ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর তৎপরতায় মেতে উঠে। তারা পোষ্টারিং করে যে, "ধর্মকে শিখায় তুলে রাখো, সমাজ জীবনে এর কোনো স্থান নেই।" তখন মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসূমকে সভাপতি এবং এই বইয়ের লেখককে সেক্রেটারী করে যে কেন্দ্রীয় ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ। তাঁর সহযোগিতায় সেদিন ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অন্যান্য আন্দোলনের পাশাপাশি এক বলিষ্ঠ ইসলামী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল।

এদেশের সমাজজীবনে ঘাপটি মেরে থাকা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত শত্রুদের চিনিয়ে দেয়া এবং যাবতীয় মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য সেদিন ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ দেশময় জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের সেই তৎ পরতা এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে থাকবে। '৬৯-এর বিক্ষুব্ধ দিনগুলোতে ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের মিটিং প্রায় প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হতো। তাতে বহু কর্মীর সমাবেশ ঘটতো। এজন্যে এর অলুবাজারস্থ অফিসে স্থান সংকুলান হতোনা দেখে মুফতী সাহেব তার বাসভবন সংলগ্ন মসজিদের দোতলায় সভা-সমিতি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্পষ্টবাদিতা

মওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ। শুধু একজন ইসলামী জ্ঞান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আলেমই ছিলেননা, আধুনিক রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতাও ছিল তাঁর

মধ্যে অনেক। তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতে সক্ষম ছিলেন। মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ সাধারণ রাজনৈতিক বক্তব্য বেশি রাখতেননা এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে শেষের দিকে তেমন সক্রিয়ভাবে জড়িতও ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি মনে করতেন যে, জাতীয় পর্যায়ে কোনো বড় রকমের ওলট-পালট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন তিনি জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে কোনো রাজনৈতিক বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করতেন কিংবা অনুরূপ মতামতের সমর্থনে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে আসতেন। তিনি যেটা ন্যায় ও সত্য বলে মনে করতেন, দ্বিধাহীন চিত্তে জনসমক্ষে তাই প্রকাশ করতেন। অপর কারও রক্তচক্ষুর পরোয়া তিনি করতেননা কিংবা অন্ধ ভক্তি বশতঃ কোনো ভ্রান্ত পথেরও তিনি অনুসরণ করতেন না। তাঁর এই বলিষ্ঠ নীতি যেমন দেখা যায় ভারতবিভক্তির মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের অখণ্ডতায় আঘাত আসার কোনো লক্ষণ দেখেও তিনি সে ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রাখতে ইতঃস্ত করতেন না। একারণেই দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যেখানে এদেশের প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোক পাকিস্তানের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এদেশের মুষ্টিমেয় আলেম সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে নিছক উস্তাদভক্তির কারণে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত সমর্থক হিন্দুস্তানের কিছু আলেমকে খুশি করার জন্যে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন, সে ক্ষেত্রে মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ নির্ভীক কণ্ঠে পাকিস্তান-দাবীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। কারণ, তাঁর দূরদৃষ্টি দ্বারা তিনি দেখতে পেরেছিলেন যে, এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠিত না হলে পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদেরকে হিন্দু ভারতেরই গোলামী করতে হবে। বলাবাহুল্য, আজকের হিন্দুভারতে মুসলমান-দের চরম দুঃখ-দুর্দশা মূলতঃ মরহুম মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁর সেই দূরদর্শি-তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পূর্বপাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উদ্যোগে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে দু'দিন ব্যাপী ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান নেজামে ইসলাম কনফারেন্সে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণটিই তার বড় প্রমাণ। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির

ভাষণ হিসাবে প্রদত্ত তাঁর সেই ঐতিহাসিক উর্দু বক্তৃতাটির অনুবাদ হচ্ছে এই—

"মহান আল্লাহ্র প্রশংসা এবং মহানবী (সা:)-এর প্রতি দরূদ অন্তে প্রথমেই আমি সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দের শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, এই মহান সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মনোনীত করে আমাকে যে বিশেষ ভাবে সম্মাণিত করা হয়েছে, এজন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত। কারণ, আমি এর উপযুক্ত নই। তবে সম্মানিতদের নির্দেশও আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। আপনারা দোয়া করুন যেন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমি এ গুরু দায়িত্ব সমাধা করতে পারি।

মোতারামত শ্রোতৃমণ্ডলি? এ বাস্তবতাকে কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাকিস্তান দাবীর পেছনে সক্রিয় ছিল এক সুমহান লক্ষ্য। সেটি হলো ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্যে এমন একটি স্বাধীন ভূখণ্ড সৃষ্টি করা, যেখানে মুসলমানগণ ইসলামী শাসনতন্ত্র চালু করে নিজেদের জীবনকে পূর্ণ ইসলামী রূপে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে এমন এক আদর্শ সরকার, যারা বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার সৌন্দর্যসমূহ তুলে ধরবে আর স্টালিনের সেই উক্তির জবাব দেবে, যা মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছিল। ষ্টালিনের সাথে মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর কথোপকথোনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন:

> "যখন আমি স্টালিনের সামনে ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরে বললাম যে, ইসলাম যেভাবে মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করে, তা কম্যুনিজম থেকে উত্তম, তখন তিনি কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলেছিলেন, "মওলানা! আপনি যা বলেছেন, তা সত্য হতে পারে, কিন্তু আপনি আমাকে এযুগে এমন কোনো একটি ভূখণ্ড দেখাতে পারবেনকি যেখানে কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?" মওলানা সিন্ধী তখন অশ্রুসজল নয়নে বলেছিলেন, এপ্রশ্নের জবাবে আমাকে নিরব থাকতে হয়েছিল।"

এপ্রসঙ্গে মওলানা মুহাম্মদ আলী "বলেন, স্টালিনের প্রশ্ন মূলতঃই সম্পূর্ণ যথার্থ ছিল। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ আবেগের স্রোতে ভেসে গেছেন। যদ্দরুন এ প্রশ্নের জবাব স্টালিনকে শুনাতে পারেন

নি। নতুবা তিনি বলতে পারতেন—এটা ঠিক যে, বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা চালু নেই। তবে মার্ক্সের প্রস্তাবিত সমাজ ব্যবস্তাও কি পৃথিবীতে পূর্বে কোথাও চালু ছিল বা এখনও আছে? লেনীন কি সর্বপ্রথম সোভিয়েট রাশিয়ায় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন নি?"

"এই পাল্টা উত্তরের পর মওলানা সিন্ধী একথাও বলতে পারতেন যে, আপনারা এমন এক ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, যা ইতিপূর্বে কোথাও চালু ছিল না অথচ আমরা আপনাদের এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণের আহ-বান জানাচ্ছি, যা বাস্তবে এ পৃথিবীতে একবার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এর উত্তম ফলাফলও প্রত্যক্ষ করা গেছে। আপনারা এমন এক আহবায়কের আহবানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, যার আহবানের দর্শনগত মূল ভিত্তিই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। কার্লমার্ক্স বলেছিলেন, তাঁর প্রস্তাবিত বিপ্লব সংঘটিত হবে শিল্পোন্নত দেশসমূহে অথচ তা সংঘটিত হয়েছে চাষাবাদের জন্য অনু-র্বর একটি দেশে। নিছক ঘটনাচক্রেই এটি ঘটে গেছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে এ বিপ্লব সংঘটিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আপনাদেরকে আমরা সেই জীবন ব্যবস্থার প্রতি আহবান জানাচ্ছি—ইতিহাস সাক্ষী, যার কোনো কথা বা মতবাদ কখনও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং এটি সম্ভাবনা হিসাবেও যে কথা বলেছে, তাই অক্ষরে অক্ষরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজ দীর্ঘ তেরশ বছর অতীত হয়ে যাবার পরও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ঐ কোরআনী জীবন ব্যবস্থার নজির পেশ করতে পারেনি। আমাদের জীবনাদর্শের আহবায়ক (সাঃ) বিশ্ববাসীর সামনে যা যে-ভাবে উপস্থা-পন করেছিলেন, আজও সেটি হুবাহু সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে, এর নজির কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারবে না।"

এতদসত্বেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্টালিনের জবাব মুসলমান-দের হতাশ চিত্তে একটা অনুভূতির সঞ্চার করেছে। তাদেরকে নিজেদের কর্তব্যের ব্যাপারে এমর্মে অনুভূতিশীল করছে যে—এহেন অতুলনীয় জীবন ব্যবস্থার ধারক হওয়া সত্বেও একটি সামান্য ভূখণ্ডও বর্তমানে এমন নেই, যেখানে কোরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশিত ব্যবস্থা চালু আছে।

শ্রোতৃ মণ্ডলি। মূলত: পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যই হলো এ দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করা এবং কোরআন-সুন্নাহ্ মোতাবেক জীবন ব্যবস্থা চালু করা। সুতরাং সর্বপ্রথম ১৯৪৯ সালে শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাব পাশ হয়। তাতে গোটা মুসলিম দুনিয়ায় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। মুসলমান দৃঢ়ভাবে আশান্বিত ছিল যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কোরআন-সুন্না-হ্র আলোকে রচিত হবে। অতঃপর ১৯৫০ সালে এক শাসনতান্ত্রিক রিপোর্ট পাকিস্তান এসেম্বলীতে উপস্থাপিত হয়, যা ছিল সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। জাতি সম্পূর্ণরূপে তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে উজিরে আজম লেয়াকত আলী খান পেশোয়ারে বক্তৃতা দান কালে বলেন, জনসাধারণ "ইসলামী শাসনতন্ত্র" "ইসলামী শাসনতন্ত্র" করে শ্লোগান দিয়ে থাকে, কিন্তু ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা কি হবে, তা তৈরি করে দেখাতে পারছেনা যে, এই হচ্ছে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র'।"

লেয়াকত আলী খানের এ আহবানের জবাবে জানুয়ারী ১৯৫১ সালে দেশের সর্বদলীয় ৩১ জন খ্যাতনামা বিজ্ঞ আলেম করাচীতে এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং ২২ দফা সম্বলিত একটি শাসনতান্ত্রিক খসরা প্রস্তুত করে সরকারের সামনে পেশ করেন। অতঃপর লেয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে শাহাদত বরণ করেন। এ ঘটনায় পাকিস্তানকে এক কঠিন ঝক্কি সামলাতে হয় এবং শাসনতন্ত্র রচনার কাজেও বিলম্ব ঘটে। অবশেষে ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে আলহাজ খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের প্রধান মন্ত্রীত্বের সময় আরেকটি শাসনতান্ত্রিক খসরা এসেম্বলিতে পেশ করা হয়। এ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি ঘোষণা করেন যে, শাসনতান্ত্রিক এ খসরা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে কোনো আলেম কোনো রূপ মন্তব্য ব্যক্ত করবেন না বরং সেই ৩১ জন ওলামাই পুনঃরায় মিলিত হয়ে এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সিদ্ধান্ত নেবেন, যারা ২২ দফা সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক খসরা রচনা করেছিলেন।

আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, ওলামা সমাজ ছাড়া উক্ত শাসনতান্ত্রিক খসরার উপর সকল শ্রেণীর লোক নানান ভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আলেমদের কেউ নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেনি।

অতঃপর ১৯৫৩ সালে দলমত নির্বিশেষে ৩৩ জন ওলামার পুনঃরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা খসরাটি গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর কতিপয় সংশোধনী সহকারে অনুমোদন করেন এবং তা ঘোষণা করেন। এমনিভাবে ঐ সকল ব্যক্তির মুখ বন্ধ হয়, যারা ওলামা সমাজকে এই বলে অপবাদ দিত যে, 'তারা কোনো কিছুতেই একমত হতে পারে না।' বিশ্ববাসী উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে যে, ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশের ব্যাপারে সকল মতের আলেমই ঐক্যবদ্ধ। ১৯৫২ সালের শাসনতান্ত্রিক রিপোর্টেও কোনো আলেম দ্বিমত পোষণ করে কোনো মন্তব্য করেননি। বরং সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে কতিপয় সংশোধনী সহকারে তা অনুমোদন করে নেন। অতঃপর পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় এক বড় রকমের রদবদল ঘটে যায়। আলহাজ খাজা নাজিমুদ্দীনের স্থলে (বগুড়ার) মিষ্টার মুহাম্মদ আলীকে প্রধান মন্ত্রী বানানো হয়। উজিরে আজম মুহাম্মদ আলী প্রধান মন্ত্রীত্বের আসনে বসার সাথে সাথেই ভাষণ-বক্তৃতার এক ধারাবাহিকতার সূত্রপাত ঘটান। তিনি প্রায় সকল বক্তৃতায়ই বিভিন্নভাবে শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করেন, যাতে সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। একথাও জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে যে, একটি অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে, যার সাথে না কোরআন-সুন্নাহ্‌র কোনো সম্পর্ক থাকবে, না আদর্শ প্রস্তাবের।

এ পটভূমিতেই জমীয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি ২৫শে জুলাই ১৯৫৩ সালে এক যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিটি উর্দু, ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করে এসেম্বলীর সদস্যদের হাতে হাতে পৌঁছানো হয়। আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া যে, শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যগণ এতে প্রভাবিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা কিছুতেই অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র মেনে নিবেন না। বরং সেই শাসনতান্ত্রিক খসড়াটিই আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে জোর চাপ সৃষ্টি করবেন, যা সর্বদলীয় ওলামা-এ-কেরাম কতিপয় সংশোধনী সহকারে অনুমোদন করেছিলেন। এটা অকৃতজ্ঞতা হবে যদি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের প্রতি মোবারকবাদ জ্ঞাপন করা না হয়। বস্তুতঃ তাঁরা ঐ সময় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ডুবন্ত তরীর হাল ধরেছিলেন। কোনো প্রকারে সেই শাসনতান্ত্রিক খসড়া ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে এসেম্বলীতে উপস্থাপিত হয়। সেটি উপস্থাপনকালে উজিরে আজম মুহাম্মদ

আলী স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, "পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কোরআন ও সুন্নাহ্র মোতাবেক-ই হবে।"

উজিরে আজম মুহাম্মাদ আলীর উক্ত ঘোষণায় মুসলমানদের উদ্বেগ দূরী ভূত হয়। অতঃপর কতিপয় ইসলামী দফা শাসনতন্ত্র পরিষদ অনুমোদন করে। এতে দৃঢ়ভাবে আশার সঞ্চার হয় যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেকই হতে যাচ্ছে।

তবে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন তৎপরতা সামনে আসায় শাসনতন্ত্র রচনার কাজ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারেনি। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ময়দানে আসাতে এই আশংকা দেখা দিয়েছে যে, না জানি ঐ সকল লোক ক্ষমতায় এসে যায়, যারা না পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকাকে পছন্দ করে, না তারা ইসলামী শাসনতন্ত্র চায়।

এ কারণেই নিখিল পাকিস্তান নেজামে ইসলাম কনফারেন্স (ইসলামী শাসন তন্ত্র সম্মেলন) আহবান করা হয়। এ সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতনামা ওলামা ও মাশায়েখ-এ-কেরাম আপনাদের সামনে উপস্থিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁরা জাতির সামনে এমন কর্মসূচী পেশ করবেন, যে অনুসারে কাজ করে জাতি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করবে এবং পাকিস্তান ও ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধীদের সকল অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলি! আমার যা বলার ছিল, আমি বলে দিয়েছি। আমি মনে করি যে, এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আপনারা ভালভাবেই অনুধাবন করে থাকবেন। পরিশেষে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, কোনো কোনো লোকের মধ্যে এরূপ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে যে, এসময় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে, তাতে তো কিছু ওলামা-এ-কেরামও রয়েছেন- (তাদের তো আর পাকিস্তান ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাবাপন্ন হবার প্রশ্ন উঠে না?)

স্মরণ রাখা উচিত যে, পূর্ব বাংলায় এক কোটির মতো হিন্দু বাস করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় এখানে কংগ্রেস মৃত নয় বরং সজীব। আপনারা

ভুলে যাননি যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কতিপয় ওলামা কংগ্রেসের সাথে ছিলেন। তাঁরা সিলেটের গণভোটের সময় পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। বস্তুত: বর্তমানে ঠিক অনুরূপ একটি পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। এই যুক্তফ্রন্টের পেছনে কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্টদের সমর্থন রয়েছে। তার বড় প্রমাণ হলো, কলকাতা এবং পূর্ব বাংলার হিন্দুরা যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হওয়ায় অধিক উল্লসিত। তারা তলে তলে এর পূর্ণ সাহায্য করে। কারণ, তারা মনে করে, যুক্তফ্রন্টের দ্বারা তাদের যুক্ত বাংলা গঠনের স্বপ্নসাদ পূর্ণ হবার দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে। যেসকল ওলামা ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সাথে ছিলেন, আজ আবার তারা তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতীতে যেমন পাকিস্তানের প্রতি তাদের কোনো দরদ ছিলনা তেমনি আজও নেই। পাকিস্তান থাক বা যাক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা শুধু এটা প্রমাণ করার জন্যেই ব্যস্ত যে, পাকিস্তান দ্বি-জাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি ভুল ছিল আর হিন্দু মুসলমান একজাতি।

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলি! আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যদি এই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়, তাহলে পূর্ববাংলার কল্যাণ হওয়াতো দূরের কথা বরং এটির একদিন না একদিন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের শামিল হবার পথ উন্মুক্ত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। ঐসময় চরমপন্থী হিন্দু সংগঠন জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার কর্মীদের হাতে মুসলমানদের যে কি 'হাশর' হবে, তা ইউ পি, সি পি এবং পূর্বপাঞ্জাবের মুসলমানদের অবস্থা থেকে অনুমেয়। আল্লাহ্‌র কাছে এমর্মে দোয়া করুন, তিনি যেন সকলকে সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলার তওফীক দান করেন। দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

অবশেষে আমি সে সকল সম্মানিত অতিথি ওলামা-এ-কেরামের শুকরিয়া আদায় করছি, যারা দূরদূরান্তের পথ সফর করে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া স্থানীয় ওলামা-এ-কেরাম, দ্বীনী ভাইগণ এবং সকল কর্মীরও আমি শুক্‌রিয়া আদায় করছি, যারা এই সম্মেলনকে সফল করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।" আল্লাহুম্মা আরিনলান হাক্বা হাক্কান..........রাব্বিল আলামীন ।

স্বাবলম্বিতা

মুফতী সাহেব ওয়াজ, নসীহত, তফসীর বয়ান কিংবা পীরী-মুরিদী এগুলোকে জীবিকার মাধ্যম করার পক্ষপাতি ছিলেন না। জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বা অপর কিছু করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী জীবনের অধিকারী দের ধর্মীয় বক্তব্যই শ্রোতাদের মনকে বেশি প্রভাবিত করে। নিজের জন্যে পর-মুখাপেক্ষিতা ও প্রচলিত দাওয়াতখোরী ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তেমন কার্যকর নয়— এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবলম্বন তাঁর এ চিন্তাধারারই ফসল। স্বাবলম্বী ধর্মীয় খাদেম হিসাবে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ সাহেবের জীবন আলেম সমাজের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইখতেলাফের প্রতি ঘৃণা

আলেম সমাজের কারও কারও মধ্যে সাধারণ খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ইখতেলাফ, দলাদলি ফতোয়াবাজীর প্রবণতা আমাদের দেশে চিরন্তন। মুফতী সাহেব এসব ইখতেলাফ পসন্দ করতেন না। জাতি-ধর্মের বৃহত্তর কাজে সকল আলেমকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার তিনি আহবান জানাতেন। তিনি ইসলামের কাজে দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে আর্থিক ও নৈতিক সকল প্রকার সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাতে ইসলামী আন্দোলনের যেসব যৌথ কর্মসূচী গৃহীত হতো, তাতে কারুর মধ্যে দলীয় কোনো সংকীর্ণতা দেখলে তিনি তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। যতবড় লোকই হোক কারুর মধ্যে কোনো একটি ত্রুটি দেখলে অকপটে তিনি তার সামনে ঐত্রুটির প্রতি অঙ্গুলী সংকেত করতেন।

নির্ভীকতা

মুফতী সাহেব শারীরিক গঠন, কণ্ঠস্বর ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সকল দিক থেকেই এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ঢাকাতে অনেক সময় ইসলামী রাজনৈতিক সম্মেলন ইত্যাদিতে পূর্বাহ্নে শোনা যেতো আজ সভায় বিরুদ্ধ পার্টি গোলযোগ করবে। কিন্তু মুফতী সাহেবকে ব্যাঘ্রতুল্য অবস্থায় সভা-মঞ্চে দেখলে কারুরই কোনো গোলযোগ করার সাহস থাকতোনা। তিনি ইসলামের প্রশ্নে কোনো মানুষের রক্তচক্ষুকে ভয় করে কথা বলতেন

না। কথিত আছে, ইসলামবিরোধী পরিবার আইন সবেমাত্র যে সময় তৈরী হবার কথা চলছে, সেসময় পাকিস্তানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক আইয়ুব খান ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি তখন এক ওলামা প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"আপনি ক্ষমতায় এসে দুর্নীতি দমনসহ প্রথম দিকে যাকিছু করছিলেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম কিন্তু বর্তমানে যা কিছু করছেন, আপনার বিরোধিতা আমাদের কণ্ঠ নালি পর্যন্ত এসে গেছে।" ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর জাতীয় অনেক জটিল ব্যাপারে মুফতী সাহেব শাসক মহলকে ব্যাক্তিগত চিঠিপত্র দিয়েও সতর্ক করে দিতেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে তার অনুসরণের অহবান জানা-তেন। মুফতী সাহেবকে, কর্তৃপক্ষ ঢাকার সর্ববৃহৎ ইদগাহ্ জামায়াত পল্টন ময়দানেও ইমামত করার সুযোগ দিতেন। কিন্তু এবিরাট সমাবেশেও তিনি কর্তৃপক্ষের অন্যায় পদক্ষেপের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করতে দ্বিধা কর-তেন না, যার কারণে কোনো কোনো কর্তৃপক্ষ শেষে আর তাঁকে তাঁর এ যোগ্য দায়িত্ব পালনে আহবান জানাতেন না।

... .বক্তা

মরহুম মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ স্বভাববাগ্মী ছিলেন। তিনি বক্তৃতা কালে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করতেন। তাঁর ভাষা ছিল ওজস্বিনী এবং বাচনভঙ্গি ছিল গণমুখী। তাঁর বক্তৃতার এই আকষণই তাঁকে সভা-সমিতিতে এবং ঢাকা রেডিও সেণ্টারের কোরআন তাফসীরের কথিকা তৈরিতে ব্যস্ত রাখতো। একারণে বয়সের গুরুত্বপূর্ণ সময় একজন লেখক, গবেষকের মতো ধীরস্থির ভাবে বসে গ্রন্থ রচনার সময় তাঁর হাতে বড় একটা থাকতোনা বললেই চলে। তথাপি তিনি গ্রন্থ রচনায় কিছু মূল্য-বান অবদান রেখে গেছেন। "তফসীরে সূরা ইউসুফ" তাঁর এক খানা মূল্যবান গ্রন্থ। এছাড়া "আহসানুল কাসাস" নামে কোরআনের বিভিন্ন কাহিনী সম্পর্কেও তাঁর একখানা কিতাব আছে। ১৯৮৩ খৃঃ কেন্দ্রীয় তাফসীর কমিটি কর্তৃক "কোরআনের সুন্দরতম কাহিনী" নামে কিতাবখানার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। "মুশকিল আসান" নামেও তাঁর অপর একখানা জন-প্রিয় কিতাব রয়েছে। মুফতী সাহেবের জীবনের অমূল্য অবদান হিসাবে

এখন তাঁর পরিবারবর্গের হাতে ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত তাঁর জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতামালা—"কোরআনে হাকীম ও হামারী জিন্দেগী"-র পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করে। প্রকাশ করা হলে ইসলামী জ্ঞান-সাহিত্য ভাণ্ডারের মূল্যবান পুঁজি হিসাবে বিবেচিত হবে।

শেষ জীবনের অবদান

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে সারা দেশে যেই অশান্তি, মারামারি, খুনাখুনি ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, সেই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ অবস্থায় তখন কিছুটা ভাটা দেখা দিয়েছে। ওলামা-এ-কেরাম ও ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে একশ্রেণীর দুশমনরা যেসব মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিল, সেই ভুল বুঝাবুঝি ক্রমশ দূরিভূত হতে লাগলো। মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা দেখা দিতে শুরু করলো। ঠিক সে সময় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। জাতির আদর্শিক তথা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতে নেয়ার মতো তখন তেমন কোনো নির্ভীক ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছিল না। মুফতী সাহেবকে এ গুরু দায়িত্ব হাতে নেয়ার জন্য সকল মহল থেকে দাবি আসতে লাগলো। ইসলামের ত্যাগী পুরুষ অকুতভয় মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ সে দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। বাতিলপন্থীদের সকল ভ্রুটিকে উপেক্ষা করে তিনি এদেশের ইসলামী জনতার আন্তরিক ডাকে সাড়া দিলেন। মুফতী সাহেবের নেতৃত্বে নতুনভাবে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় সীরাত কমিটি গঠিত হয়। এর দেখাদেখি সারা দেশের জেলা মহকুমা, থানা হেড কোয়ার্টার সহ প্রত্যন্ত এলাকায় পর্যন্ত সীরাত কমিটি গঠিত হতে থাকে এবং ঐ সকল কমিটির মাধ্যমে বিরাট বিরাট সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে এসব সীরাত সম্মেলনই নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। মুফতী সাহেবের এ উদ্যোগের ফলে সারা দেশে ইসলামী জাগরণের সৃষ্টি হয়। মৃতপ্রায় জাতি হঠাৎ নতুন করে নিজের পরিচয় খুঁজে পায়।

যাবতীয় বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলাদেশে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন বেশ অগ্রগতির পথে। মুফতী সাহেবের উদ্যোগে নবপর্যায়ে

উদ্বুদ্ধ সীরাত আন্দোলনের কাছে এই অগ্রগতি বহুলাংশে ঋণী। বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতিতে যারা অস্বস্তি বোধ করছে, তারা এখনও নানা প্রকার মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুন বহু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে অতীতের ন্যায় জনমনে ভুলবুঝাবুঝির প্রয়াস চালাচ্ছে। মরহুম মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর মতো নির্ভীক মনোবল এবং বার্ধক্যেও তিনি যে কর্মচঞ্চলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সেই মনোবল, দৃঢ়তা এবং কর্মপ্রেরণাই যাবতীয় প্রতিকূলতার মুখেও ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিচ্ছে।

ইনতেকাল

বাংলার মুসলমানের চরম দুঃসময় ইসলামী আন্দোলনের মহান সেবক মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ তাদের চলার পথের নির্দেশ দিয়ে আর অধিক দেরী করেননি। তার কিছুকাল পরেই মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যাবার জন্যে তাঁর ডাক এসে যায়। মুফতী সাহেব ২রা ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন।

———

মুফতী সাইদে মুহাম্মদ আমীমুল এহসান

[জ: ১৯১১—মৃ: ৮ই ডি: ১৯৭৪ ইং]

হিমালয়ান উপমহাদেশে যে কয়জন মুসলিম মনীষী নিজস্ব ভাষায় পাণ্ডিত্ব অর্জন করার সাথে সাথে আরবী ভাষা সাহিত্য ও কোরআন-হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অধিক পাণ্ডিত্ব অর্জন করে ঐ ভাষায় ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ বিস্তারে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, তন্মধ্যে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রধান শিক্ষক আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। কোরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান চর্চার এমন কোনো বিভাগ নেই যাতে মুফতী আমীমুল এহসানের পদচারণা ঘটেনি। একাধারে ইসলামী শিক্ষাদান কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে আরবী ও উর্দু ভাষায় তিনি ইসলামের উপর যেসব জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, খুব কম শিক্ষাবিদ পণ্ডিতের জীবনেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। তিনি একাধারে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস মুফতী অধ্যাপক, গবেষক লেখক এবং মহান আধ্যা-ত্মিক বুজর্গসাধক। বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী এই মহান জ্ঞানসাধক জীবনের প্রতিটি অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করে মুসলিম সমাজের নিকট তাঁর যে অক্ষয় কীর্তিসমূহ রেখে গেছেন, তা আরব-আজম সর্বত্র উজ্জ্বল অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লামা মুফতী সাইয়েদ আমীমুল এহসানের মতো বিরল ব্যক্তিত্ব একদিকে যেমন বিস্ময়কর পাণ্ডিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, অপর দিকে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক সাধনায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। জীবনের শুরু থেকে আমর ইসলামী জ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জিত এ মহান জ্ঞানসাধকের কর্মময় জীবন যে কোনো ইসলামী জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্যে এক বিরাট প্রেরণার উৎস।

বংশ পরিচয় ও জন্ম

মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান মোজাদ্দেদী বরকতী (রহ:) ১৩২৯ হি: মোতাবেক ১৯১১ খৃ: ভারতের মুঙ্গির জিলার অন্তর্গত পাচনা গ্রামে তাঁর মাতামহের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাকীম

সাইয়েদ আবুল আজীম মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কলকাতায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। মুফতী আমীমুল এহসানের পূর্ব পুরুষগণ কোন্ যুগে আরব দেশ থেকে এই উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন, তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে মুফতী সাহেবের প্রদত্ত বংশ পরিচয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের আদি যুগে সাইয়েদ বংশের কোনো বুজর্গ ব্যক্তি অবিভক্ত ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন, তিনি তাঁরই বংশধর। তিনি 'আত্তা-শারুফ লে-আদাবিত্তাওফ" গ্রন্থে নিজের বংশ পরিচয় এভাবে বর্ণনা করেছেন :

হযরত সাইয়েদ বিন আলী বিন হোসাইন (শহীদে কারবালা) বিন আলী (কার্রামাল্লাহু) ও হযরত ফাতেমা বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। তাঁর বিভিন্ন আরবী উর্দূ রচনা থেকেও এ বংশ পরিচয়ের সমর্থন মিলে। তাঁর পূর্বপুরুষগণ একারণেই নামের পূর্বে "সাইয়েদ" শব্দ ব্যবহার করে আসছেন। মওলানা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসানের পিতামহ সাইয়েদ নূরুল হাফিজ কাদেরী (মৃতঃ ১৩২৮ হিঃ) একজন কামেল ও হক্কানী আলেম ছিলেন। কোরআন সম্পর্কে তাঁর বিরাট ব্যুৎপত্তি ছিল। সাইয়েদ নূরুল হাফিজ আরেফ বিল্লাহ্ মওলানা মুহম্মদ আলী আলকাদেরী মোজাদ্দেদীর একজন প্রধান শিষ্য (খলীফা) ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিল হিন্দুস্তানের বারাগিয়ানের বিখ্যাত অভিজাত আবাসকেন্দ্র চুড়িহারীতে। অতঃপর তিনি মুঙ্গের জেলায় চলে যান। মুফতী সাহেবের পিতা হাকীম সাইয়েদ আবুল আজীম মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৩০২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পিতা নূরুল হাফিজ কাদেরীর নিকট যাবতীয় পাঠ্য-পুস্তক সমাপ্ত করেন। জনাব আব্দুল মান্নান বহু বিজ্ঞ ইউনানী চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের নিকট 'তিব্ব শাস্ত্র' অধ্যয়ন করেছিলেন, যার কারণে নিজের সুযোগ্য পুত্র সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসানকেও তিব্ব শাস্ত্রে শিক্ষিত করার প্রেরণা বোধ করেছেন। মুফতী সাহেবের পিতা কলকাতা জালি-য়াটুলি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম ছিলেন। তাঁর একখানা ইউনানী চিকিৎসা কেন্দ্রও ছিল। তাঁর ছিল বহু ভক্ত অনুক্ত। সাইয়্যেদ আবদুল মান্নান চিশতিয়া তরীকায় সাইয়েদ আবুল মুহাম্মদ আহমদ আশরাফ ও নকশবন্দীয়া তরীকায় সাইয়দে বরকত আলী শাহ মোজাদ্দেদীর কাছে বয়াত গ্রহণ করেন। সমগ্র জীবন তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সাধনায় ও ইসলামের সেবায় কাটান।

মুফতী সাহেবের মাতা ছিলেন সাইয়েদ আবদুল বারীর কন্যা। তিনি বারাগিয়ানের এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন। ১৩৬০ হিজরীতে মুফতী সাহেবের মাতার ইনতেকাল হয়।

নামকরণের তাৎপর্য: মুফতী সাহেবের রচিত গ্রন্থ "আত্তাশররুফ লে আদাবিত্তাসাওফ" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তাঁর প্রকৃত নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং বাবার বর্ণনা মতে, তাঁর পিতামহ সাইয়েদ নূরুল হাফীজ আল-কাদেরী মোজাদ্দেদী বরকতী তাঁকে আমীমুল এহসান" লকব দেন। তাঁর পিতামহ স্বপ্নযোগে নাকি এ লকবের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। পিতামহ সাইয়েদ নূরুল হাফেজ কাদেরী কর্তৃক প্রদত্ত নাম ও লকব যে যথার্থ ছিল মুফতী সাহেবের পবিত্র কর্মময় জীবনের প্রতিটি স্তরেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে যে, "দিনটি কেমন যাবে প্রাতকালীন অবস্থাই তা বলে দেয়।" মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসানের শৈশব ও কৈশোর জীবনের অবস্থাসমূহ থেকেও তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। বাল্যাবস্থায় তাঁর স্বভাব-চরিত্র, ধ্যান-ধারণা, চালচলন ও আচার-ব্যবহারে অন্যান্য ছেলের তুলনায় আলাদা বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। সকল সময় খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকা কিংবা অযথা সময় নষ্ট করার প্রতি তিনি ছিলেন অনাসক্ত। এছাড়া জন্মের পর থেকে তিনি যেই পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছিলেন, তা ছিল পবিত্র, শালীন, মার্জিত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ। অসৎ সংসর্গের স্পর্শে যাবার সুযোগও তাঁর তেমন একটা ছিলনা। সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান তাঁর বুজর্গ পিতা-মাতার নিকট লালিত পালিত হন। তিনি ৫ বছর বয়সের সময় তাঁর চাচা সাইয়েদ আবদুদ্দাইয়ানের নিকট মাত্র ৩ মাসে কোরআন মজিদ খতম করেছিলেন; তিনি ফারসী, উর্দূর প্রাথমিক কিতাবসমূহ একাধিক উস্তাদের কাছে অধ্যয়ন করেন। একই সাথে ইংরেজী, আরবী শিক্ষার অনুশীলনও তিনি করতে থাকেন। ঐ সময় পাঞ্জাবের বিশিষ্ট বুজর্গ আলেম আরেফবিল্লাহ আবু মুহাম্মদ বরকত আলী শাহ মোজাদ্দেদী কলকাতায় বাস করতেন। এই আধ্যাত্মিক সাধকের একটি খানকাহ্ ছিল। তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ।

বরকত আলী শাহ একজন মোহাদ্দেস, ফকীহ ও সূফী সাধক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁকে সবাই একজন আল্লাহ্‌র ওলী মনে করে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। এই মহান বুজর্গ ছিলেন সাইয়েদ ইয়ার শাহ আলকাদেরীর বংশধর। ১৩৪৫ হিজরী সালে তিনি ইনতেকাল করেন। সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসানের তখন ১০ বছর বয়স। তাঁর অশেষ সৌভাগ্য যে, তিনি এ বিখ্যাত ইসলামী জ্ঞান-সাধকের সংশ্রব লাভ করেন। সাইয়েদ আমীমুল এহসান এই বরকতুল্লাহ শাহ্‌র পবিত্র সংশ্রবে থেকে তাঁর নিকট কোরআন মজিদের তরজমা, হিছনেহাছীন এবং বিভিন্ন উঁচু স্তরের ফারসী গ্রন্থ ও ছরফ (আরবী- ব্যাকরণ), ও তাসাওফ শাস্ত্রের অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেন। মুফতী সাহেব তখনই বরকত আলী শাহের নিকট বয়াত হন। মুফতী সাহেব নিজের নামের সাথে একারণেই বরকতী লিখতেন।

মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসানের বয়স যখন ১৪ বছর, তখন তিনি ইলমে নাহু (ব্যাকরণ) মুনিয়াতুল মুছাল্লী, হাদিয়াতুননাহিদিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ শামসুল ওলামা মওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী মৃঃ ১৩৫৫ হিঃ -এর নিকট অধ্যয়ন করেন। তখন তিনি আরবী সাহিত্যের কিছু কিতাব মওলানা আবদুল মজিদ মুরাদাবাদীর নিকট, মাকূলাত ও অসূল-এর কিছু কিতাব মওলানা আবদুর রহমান কাবুলীর নিকট ও ফেকাহ, মানতেক প্রভৃতি বিষয় আল্লামা সাইয়েদ কারামত আলী শাহ পাঞ্জাবীর নিকট অধ্যয়ন করেন। মুফতী সাহেবের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা এভাবে সমাপ্ত হবার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে মনযোগী হন।

উচ্চ শিক্ষা ও কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা

মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান উচ্চ শিক্ষা লাভের মানসে ১৯২৬ খৃঃ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ওলামা-এ-কেরামের নিকট ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। মুফতী সাহেব প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষা অত্যন্ত সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হতে থাকলেন। ১৯২৮ সালে তিনি আলেম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ খৃঃ যথাক্রমে ফাজেল ও কামেল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি সিহাহ্‌সিত্তার সকল হাদীস গ্রন্থ

আলীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দেস ও উস্তাদগণের নিকট নিয়মিত পড়েন। তফসীর, এ-কবীর, কাশশাফ এবং বায়জাভীরও শিক্ষা লাভ করেন। কলকাতা মাদ্রাসা এ-আলীয়ার উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মুফতী সাহেব শামসুল ওলামা মওলানা ইয়াহ্ইয়ার নিকট জ্যোতির্বিদ্যা, মওলানা মোশ্তাক আহমদ কানপুরীর নিকট যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ইলমুল মাওয়াকীত বা সময় নির্ধারণী বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার উচ্চ স্তরের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। বাংলাদেশের সর্বত্র বিরাজমান মুফতী সাহেবের সময়নির্দেশক চিরস্থায়ী ক্যালেণ্ডার তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা-সঞ্জাত জ্ঞানেরই ফসল। ইলমে কেরাত ও তাজবীদ শাস্ত্রেও তিনি সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। মুফতী মোশতাক আহমদের নিকটই তিনি ফতোয়া প্রদান অনুশীলন করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে ফতোয়া দিতে থাকেন। ১৯৩৪ খৃঃ মওলানা ইয়াহ্ইয়া কানপুরী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসানের দস্তারবন্দী করেন এবং সমাবর্তনী ফাতেহা পাঠ করেন।

১৯৪৬ সালে মুফতী সাহেবের পিতার ইনতেকালের পর তিনি তাঁর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন এবং সাংসারিক ঝামেলা সত্ত্বেও নিজের জ্ঞানচর্চার কাজ অব্যাহত রাখেন। মুফতী সাহেব মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরীর নিকট তিব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং চাচা শাহ আবদুদ্দাইয়ান, সাইয়েদ ফজলুর রহমান ও মাজেদ আলী কাতেবের নিকট তিনি কিতাবাৎ শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেন। কেরাত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব লাভ করেছিলেন কারী আবদুস্ সামী এবং অন্যান্যদের নিকট। মোহাদ্দেস ডিগ্রি লাভ করার পরও মুফতী সাহেব হিন্দুস্তান ও আরবের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও মোহাদ্দেসীনের নিকট থেকে হাদীসের কিতাবসমূহ পড়াবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এভাবে তিনি মোহাদ্দেস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি এক হিসাবে তাঁর পিতার ইন্তেকালের পূর্বেই পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং নিজের প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিক্‌হুসসুনান ওয়াল আছার'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, "আমার পিতা আমাকে তাঁর জামা পরিধান করান, নিজের তাবারুকাত দান করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।" তাঁর পিতা ইন্তেকালের মাত্র দুমাস পূর্বে তিনি তা করেছিলেন। মুফতী সাহেব কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে যাদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের কারও কারও নাম তিনি কৃতজ্ঞতা

সহকারে নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এসকল ওলামায়ে কেরাম হলেন—(১) শামসুল ওলামা ডঃ হেদায়াত হোসেন (মৃত ১৩৬১ হিঃ) (২) শামসুল ওলামা মওলানা শাহ সূফী ছফিউল্লাহ (মৃত ১৩৬৬ হিঃ) (৩) শামসুল ওলামা মওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (মৃত ১৩৭৭ হিঃ) (৪) শামসুল ওলামা মওলানা ওয়াছিউদ্দীন (৫) শামসুল ওলামা মওলানা মুহাম্মদ মাযহার (৬) শামসুল ওলামা মওলানা মুফতী মোশতাক আহমদ কানপুরী (মৃত ১৩৫৯ হিঃ) (৭) শামসুল ওলামা মওলানা বেলায়েত হোসাইন (৮) মওলানা সিদ্দীক আহমদ (৯) মুহাম্মদ হোসাইন (১০) মুফতী মওলানা মুহাম্মদ জামিল আনসারী। মোজাদ্দেদী (মৃত ১৩৬৭ হিঃ) (১১) ফখরুল মুহাদ্দেসীন মওলানা মমতাজুদ্দীন (মৃত ১৯৭৪ হিঃ) (১২) ফখরুল মুহাদ্দেসীন মওলানা নূরুল্লাহ সন্দীপী (মৃত ১৩৬৭ হিঃ) (১৩) শাহ সূফী মওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল বিহারী সোহরাওয়ার্দী (মৃত ১৩৫৫ হিঃ) (১৪) কারী মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সুম্বুলী শাজলী (মৃত ১৩৬৫ হিঃ) (১৫) মওলানা নাজিরুদ্দীন (১৬) মওলানা মুহাম্মদ মুজাফ্ফর (মৃত ১৩৬৬ হিঃ) (১৭) আবুল হোফফাজ মুহাম্মদ ফকীহ আজহারী (১৮) ফখরুল মুহাদ্দেসীন মওলানা হাবীবুল্লাহ (১৯) মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল (২) মওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম (২১) মওলানা সূফী ওসমান।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা : মুফতী সাহেবের নির্ভরযোগ্য ছাত্রদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুফতী সাহেব বলেছেন, তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাশ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় অধিক ডিগ্রী লাভে তাঁর অনুরাগ না থাকায় তিনি উক্ত সার্টিফিকেট ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে ফেলেছিলেন। এই টুকুন ইংরেজী ভাষার পুঁজি নিয়ে তিনি এভাষায় এতদূর পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, জমি জমার ব্যাপারে নিজেই ইংরেজীতে দলীলপত্র সম্পাদনা করতেন। তাতে কোনো উকিলের সাহায্য নেয়ার তাঁর প্রয়োজন হতো না। আরবী লেখার ন্যায় তাঁর ইংরেজী লেখাও অতি চমৎকার ছিল।

কর্মজীবনঃ কলকাতার নাখোদা মসজিদ ও মাদ্রাসা

এ উপমহাদেশের বিজ্ঞ ইসলামী পণ্ডিত ও বুজর্গ ওলামা-এ-কেরামের নিকট সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করার পর পিতার স্বলাভিষিক্ত হন এবং নিজ বাসভবনকে কেন্দ্র করেই ইসলামী

শিক্ষা-আদর্শ বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান প্রতিভার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অতঃপর কলকাতা নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের জন্যে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রস্তাব আসলো। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৯৩৪ খৃঃ কলকাতা নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন কওমী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এ সময় মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত জ্ঞানপীপাসু ছাত্রেরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষও ইসলামী জ্ঞান ও মসলা-মাসায়েল জানার জন্যে তাঁর দরবারে ভিড় করতো। মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণের একবছর পরেই ১৯৩৫ সালে ঐতিহাসিক নাখোদা মসজিদের ইমাম ও মুফতী পদেও তাঁকে বরণ করা হয়। কলকাতা নাখোদা মসজিদ ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান ইসলামী শিক্ষা আদর্শ বিস্তারের যে উন্মুক্ত অঙ্গণ পেয়ে গেলেন, ধীরে ধীরে তার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকলো। মূলতঃ এ সময়ই মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান মুফতী আমীমুল এহসান হিসাবে অধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। যোগ্য মুফতী হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নাখোদা মসজিদের ইমাম থাকাবস্থায় ১৯৩৭ খৃঃ সরকার মুফতী সাহেবকে মধ্য কলকাতার কাজী পদও প্রদান করেছিলেন। মুফতী সাহেব আরবী ও উর্দু ভাষায় ইসলামী তথ্যজ্ঞানসমৃদ্ধ যেসকল গ্রন্থ রচনা করেছেন এজন্যে নাখোদা মসজিদের হুজরাহ কক্ষই তার প্রথম গবেষণাগার ছিল। উল্লেখ্য যে, কলকাতার নাখোদা মসজিদ ও মাদ্রাসা তৎকালীন সমগ্র কলকাতা নগরীর ধর্মীয় বিষয়ের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় সরকারের অবৈতনিক ধর্মীয় উপদেষ্টা মনোনীত হন। ১৯৪০ সালে মুফতী সাহেব 'আঞ্জুমনে কোরআন—বাংলা'র সভাপতি নিযুক্ত হন। এভাবে তিনি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামের খেদমত ও জনসেবা কার্যে লিপ্ত থেকে মুসলমানদের বিরাট কল্যাণ সাধন করেন।

মাদ্রাসা-এ-আলীয়া হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পর মুফতী সাহেব প্রায় এক যুগ ধরে যেভাবে দ্বীন-ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, এর পূর্ণ ইতিহাস রচিত হলে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ পাবে। পরবর্তীকালে তাঁর কলকাতা ও ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষকতা, বায়তুল

মোকাররাম মসজিদের ইমামত এবং অবসর জীবন সম্পর্কীয় কাহিনী তাঁর জীবনের আর একটি বড় অধ্যায়ের উন্মোচন করবে। মরহুম মওলানা আবুলকালাম আজাদ ও শেখুল ইসলাম হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী কিছু দিন নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় অধ্যাপনার খেদমত আনজাম দিয়েছিলেন। মুফতী সাহেব আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার একথা বলেছেন। নাখোদা মসজিদে থাকাকালীন মুফতী সাহেব এক লাখেরও বেশি ফতোয়া প্রদান করেন। নও মুসলিমদের শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। বিভিন্ন ধর্মের প্রায় চারি হাজারেরও অধিক অমুসলিম মুফতী সাহেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত তিনি নাখোদা মসজিদ ও 'দারুল ইফতা'র দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা

মুফতী সাহেব কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং এলমে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত টাইটেল জামায়াতে তফসীর, ফেকাহ্ এবং ফাজেল জামায়াতে উর্দু ও ফারসী পড়াতেন।

ভারত বিভাগের পর কলকাতা আলীয়া মাদ্রাস সাবেক পূর্ব পাকিস্তা-নের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন মুফতী আমীমুল এহসা সাহেবও অন্যান্য অধ্যাপকের সাথে ঢাকায় চলে আসেন এবং মাদ্রাসা-এ আলীয়া ঢাকাতে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ঢাকা এসেই তিনি পূর্ব পাকি স্তানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। মুফতী সাহেব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৪৯ খৃঃ 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদে'র সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন।

মাদ্রাসা-এ-আলীয়া ঢাকার হেড মোদাররেস হিসাবে উপমহাদেশের অন্য-তম প্রখ্যাত আলেম মওলানা জাফর আহমদ ওসমানীও দায়িত্ব পালন করে-ছিলেন। মওলানা ওসমানী এ পদ থেকে অবসর নেয়ার পর ১৯৫৫ সালে মুফতী সাহেব আলীয়া মাদ্রাসার হেড মোদার্রেস নিয়োজিত হন। ১৯৬৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মুফতী আমীমুল এহ্সান মাদ্রাসা-এ-আলীয়া ঢাকায় এ পদে বহাল থাকেন।

বায়তুল মোকাররামে খতীব পদে

মুফতী সাহেবের ১৯৫৫ সালে মাদ্রাসা-এ-আলীয়াতে হেড মোদাররেস হিসাবে পদোন্নতি হবার সাথে সাথে রাজধানী ঢাকার প্রধান ঈদগাহের ইমামতের দায়িত্বভারও কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর অর্পণ করেন। ১৯৬৪ খৃঃ নবনির্মিত বায়তুল মোকারাম মসজিদের খতীব ও ইমাম হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। মুফতী সাহেবের ওফাত পর্যন্ত তিনি এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যান।

মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান বায়তুল মোকাররাম মসজিদে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিতেন। তিনি প্রতি জুমার দিন স্বরচিত নতুন আরবী খুৎবা (ভাষণ) প্রদান করতেন। সমসাময়িক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বক্তব্য পেশই ছিল তাঁ খুৎবার বৈশিষ্ট্য। মুফতী সাহেব আরবী ভাষায় মুখস্থ ভাষণ দানের পূর্বে তার সারাংশের অনুবাদ মোছল্লীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হতো।

এদেশের জন্য অনর্গল আরবী ভাষায় স্বরচিত খোৎবা প্রদান করার এ নজীর বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। আরবী ভাষা ও কোরআন-হাদীস সম্পর্কে কতবেশি পারদর্শীতা থাকলে এরূপ আরবী ভাষণ দান করা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর এসকল ভাষণ আরবী ও ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। অনুবাদ সহ এগুলি প্রকাশিত হলে মুসলিম সমাজের বিরাট কল্যাণ সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

পবিত্র হজব্রত পালন

মুফতী সাহেব সমগ্র জীবনে তিন বার হজ্জ পালন করেন। ১ম বার ১৯৫৪ দ্বিতীয় বার ১৯৬৮ এবং তৃতীয়বার ১৯৭১ সালে। সর্ব শেষবার ৭ই মার্চ তারিখে তিনি দেশে ফিরেন। প্রথমবার তিনি হারামাইন শরী-ফাইন জেয়ারত করে আসার পর 'তরীকায়ে হজ্জ নামক' উর্দু ভাষায় এক খানা পুস্তক রচনা করেন এবং তাতে হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় আহ্‌কাম মাছায়েল বর্ণনা ছাড়াও মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মোনাওয়ারার বিভিন্ন দর্শ-নীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত করে একে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেন। পুস্তক খানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন

মুফতী সাহেবের নিজস্ব বাসভবনটি কলুটোলায় অবস্থিত। বাসভবন সংলগ্ন তাঁর একখানা জুমা মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদ ১২৩২সালে সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ কর্তৃক স্থাপিত হয়। হযরত মুফতী সাহেব হিজরী ১৩১০ সালে এটি পুণঃনির্মাণ করেন। মসজিদ সংলগ্ন বামপার্শ্বে প্রবেশ পথের সাথে তিনি একখানা মাদ্রাসাও স্থাপন করেন। মাদ্রাসা-এ-আ'লীয়া থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইন্তেকালের দিন পর্যন্ত এ মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করে যান। তাঁর গ্রন্থাবলীসহ জীবনের এদু'টি পবিত্র কীর্তি যুগ যুগ ধরে তাঁর দ্বীনী সেবার সাক্ষী থাকবে। সাদকায়ে জারিয়ার এ কাজের সওয়াব তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি পৌঁছুতে থাকবে।

গ্রন্থাবলীর তালিকা

বহু গ্রন্থ প্রণেতা মুফতী আমীমুল এহসান উর্দূ, আরবী ও ফারসী ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর যেমন গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর সংখ্যা প্রায় আড়াই শত হবে বলে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত প্রকাশিত অপ্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার একটি অপূর্ণ তালিক এখানে আগ্রহী পাঠকদের খেদমতে উপহার দিচ্ছি। এ তালিকা তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, তাঁর জীবনী সংক্রান্ত লেখা, অন্যান্যদের রচনা ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত নানা সূত্র হতে সংগৃহীত। মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থে মুফতী সাহেবের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর হাদীসের কিতাব সমূহের যে তালিকা পেশ করেছেন, প্রথমে তাই এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

গ্রন্থাবলী

(১) ফেক্‌হুস্‌সুনান ওয়াল আছার
(২) মানাহিজুস্ সুআদা
(৩) আহ্‌সানুল খিতাব
(৪) ওমদাতুল মাজানী
(৫) তাখরীজে আহাদীস
(৬) তাখরীজে আহাদীস রদ্দে বাওয়াফেজ
(৭) আলআশারাতুল মাহ্‌দিয়া
(৮) আল-আরবাঈন ফিলমাওয়াকিত
(৯) আল আরবাঈন ফিস্‌সালাত
(১০) তাখলীছুল আযহার
(১১) জামে জাওয়ামিউল কালাম
(১২) ফেহ্‌রাস্তে কানুযুল ওম্মাল

(১৩) মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবু দাউদ

(১৪) মুকাদ্দামায়ে মারাসীল

অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত গ্রন্থাবলী

(১৫) কলেমায়ে তাইয়্যেবা

(১৬) মীযানুল আখবার

(১৭) হাওয়াশী আস্সুআদা

(১৮) তালীকাতুল বরকতী

(১৯) মিয়ারুল আছার

(২০) তোহ্ফাতুল আখবার

(২১) আওজাযুস্ সিয়ার

(২২) আনফাউস সিয়ার

(২৩) আল-ইস্তেবশার

(২৪) তাখরীজে মাদাসীলে ইবনে আবি হাতেম

(২৫) ফেহ্রাস্তে আস্মায়ে মোদালেসীন

(২৬) মিন্নাতুল বারী

(২৭) আত্তাশাররুফ লে আদাবিত্তাছাওউফ

(২৮) রেসালায়ে তরীকত

(২৯) হাকীকতে ইসলাম

(৩০) এজহারে হক

(৩১) ফতাবী বরকতিয়া (২৭ খণ্ডে বিভক্ত)

(৩২) আলইফছাহ

(৩৩) কিতাবে মওকুফ

(৩৪) আলইজান

(৩৫) আলমোছহেলা

(৩৬) রাফউল সালসালা

(৩৭) আলকোরাহ

(৩৮) তাখরীজে মাসায়েল

(৩৯) তরীকায়ে হজ্জ

(৪০) মশকে ফরায়েজ

(৪১) হেদায়াতুল মোসাল্লীন

(৪২) কাওয়ায়েদুল ফিক্হে

(৪৩) লববুল উসূল

(৪৪) মালাবুদ্দা লিল ফকীহ

(৪৫) রসমুল মুফতী

(৪৬) তোহ্ফাতুল বরকতী

(৪৭) তারিখে ইসলাম

(৪৮) তারিখে আদবে উর্দূ

(৪৯) মেরআতুল মোছান্নেফীন

(৫০) আলহাভী

(৫১) তারিখে ইলমে হাদীস

(৫২) তারিখে ইলমে ফিকাহ

(৫৩) তারিফুল কোরআন

(৫৪) ইলমে হাদীস কে মাবাদিয়াত

(৫) শরহে শিকওয়া জাওয়াবে শিকওয়া

(৫৬) বাজাআতুল ফকীর

(৫৭) নাফয়ে আমীম

(৫৮) মুয়াল্লিমুল মীকাত

(৫৯) দস্তরুল মীকাত

(৬০) জিলুল ফাফলা

(১৩) মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবু দাউদ
(১৪) মুকাদ্দামায়ে মারাসীল
(৩৭) আলকোরাহ
(৩৮) তাখরীজে মাসায়েল

অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত গ্রন্থাবলী

(১৫) কলেমায়ে তাইয়েবা
(১৬) মীযানুল আখবার
(১৭) হাওয়াশী আস্ সুআদা
(১৮) তালীকাতুল বরকতী
(১৯) মিয়ারুল আছার
(২০) তোহ্ফাতুল আখবার
(২১) আওজাযুস্ সিয়ার
(২২) আনফাউস সিয়ার
(২৩) আল-ইস্তেবশার
(২৪) তাখরীজে মাদাসীলে ইবনে আবি হাতেম
(২৫) ফেহ্রাস্তে আস্মায়ে মোদালেসীন
(২৬) মিন্নাতুল বারী
(২৭) আততাশাররুফ লে আদাবিত্তাছাওউফ
(২৮) রেসালায়ে তরীকত
(২৯) হাকীকতে ইসলাম
(৩০) এজহারে হক
(৩১) ফতাবী বরকতিয়া (২৭ খণ্ডে বিভক্ত)
(৩২) আলইফছাহ
(৩৩) কিতাবে মওকুফ
(৩৪) আলইজান
(৩৫) আলমোছহেলা
(৩৬) রাফউল সালসালা
(৩৯) তরীকায়ে হজ্জ
(৪০) মশকে ফরায়েজ
(৪১) হেদায়াতুল মোসাল্লীন
(৪২) কাওয়ায়েদুল ফিক্হে
(৪৩) লববুল উসূল
(৪৪) মালাবুদ্দা লিল ফকীহ
(৪৫) রসমুল মুফতী
(৪৬) তোহ্ফাতুল বরকতী
(৪৭) তারিখে ইসলাম
(৪৮) তারিখে আদবে উর্দূ
(৪৯) মেরআতুল মোছান্নেফীন
(৫০) আলহাভী
(৫১) তারিখে ইলমে হাদীস
(৫২) তারিখে ইলমে ফিকাহ
(৫৩) তারিফুল কোরআন
(৫৪) ইলমে হাদীস কে মাবাদিয়াত
(৫) শরহে শিকওয় জাওয়াবে শিকওয়া
(৫৬) বাজাআতুল ফকীর
(৫৭) নাফয়ে আমীম
(৫৮) মুয়াল্লিমুল মীকাত
(৫৯) দস্তুরুল মীকাত
(৬০) জিলুল ফাফলা

বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলী

১। নামাজের সময় নির্ধারক চিরস্থায়ী ক্যালেণ্ডার (প্রকাশিত) ২। তরিকায়ে হজ্জ ৩। তারীখে ইসলাম ৪। তারিখে ইলমে হাদিস ৫। হাদিয়াতুল মোছাল্লীন

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুফতী সাহেবের সমুদয় রচনা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি ওয়াকৃফ করে গেছেন। কোনো পুস্তকই তিনি নিজের স্বত্ব হিসাবে সংরক্ষিত রাখেননি। যেকেউ তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করে উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

মুফতী সাহেবের যেসমস্ত ফতোয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে তার ২৭ খণ্ডে বিভক্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ ফতোয়ায়ে বরকতিয়ার অংশ হিসাবে সংযোজন করে পূর্ণ গ্রন্থখানা প্রকাশ করা হলে তা মুসলিম সমাজের জন্য বিরাট উপকার সাধন করবে। মুফতী সাহেবের ফেকহুস্ সুনান, ফাওয়ায়েদুল ফিক্হ্, তারীখে ইসলাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাঁর কিছু গ্রন্থ পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ভুক্ত আছে বলে জানা যায়। তাঁর ফেক্হুস্ সুনানের গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। মাদানী সাহেবের ইন্তেকালের ছয় মাস পূর্বে তিনি মুফতী সাহেবের নিকট এক পত্রে লিখ ছিলেন:

"আমি আজ পর্যন্ত" ফিক্হুস্ সুনান ওয়াল আছারে'র ন্যায় গ্রন্থ দেখিনি। হানাফী মযহাবের এটি একটি অতুলনীয় যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ।" মহান জ্ঞান সাধক মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহ্সান ১৯৭৪ সালের ২৭শে অক্টোবর মোতাবেক ১০ই শাওয়াল ১৩৯৪ হিঃ রোজ রবিবার ইন্তেকাল করেন। নারিন্দা কলুটোলা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁর মাজার অবস্থিত। মুফতী সাহেব সাদকা-এ-জারিয়া স্বরূপ ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান ভাণ্ডারে যা অবদান রেখে গেছেন, এগুলোর বদৌলতে মহান আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং তাঁর জীবনের সকল ত্রুটিবিচ্ছুতি ক্ষমা করুণ, তাঁর শুভাকাঙ্খী, ভক্ত, অনুরক্ত, ছাত্র সকলের এই একই কামনা।

মওলানা আলাউদ্দী আল-আযহারী

[জ: ৩১শে মার্চ ১৯৩৫ খৃ: —মৃ: ২৭শে মার্চ ১৯৭৫ খৃ:]

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, মওলানা আলাউদ্দিন আল-আযহারী ১৯৩৫ সনের ৩১শে মার্চ ফরিদপুর জেলার কালকিনি থানার সাহেব রাম-পুর গ্রামে এক সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আল-হাজ্জ মুনশী আবদুল করিম।

বাল্যকাল হতে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীন অনুষ্ঠিত ১৯৪৭ সালে 'আলিম ও ১৯৪৯ সনে ফাজিল পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর উক্ত বোর্ডের অধীন ১৯৫১ সনে ১ম শ্রেণীতে কামিল (হাদিছ) পাশ করেন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কায়রোর আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে উলূমুদ্দীন অনুষদ থেকে ১৯৫৩ সালে প্রথম বিভাগে আলা-মিয়া ডিপ্লোমা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কায়রোস্থ আমেরিকেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজে' ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ সনে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আলআযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফেকালটি অব শরইয়াহ (ইসলামী আইন) বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সনে ঐ বিষয়ে অনার্স (তাখাস্ সুস) সহ আলামিয়া ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা শেষে মওলানা আযহারী আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস ইনষ্টিটিউশনে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসাবে দুই বৎসর চাকুরী করার পর ১৯৫৮ সনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সহকারী অনুবাদ অধ্যক্ষ হিসাবে বাংলা একাডেমীতে (ঢাকা) যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫৯ সনে ঢাকার সর-কারী মাদরাসা-এ-'আলীয়া-য় আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আরবী সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত মাদরাসার এডিশনাল হেড মওলানার পদে উন্নীত হন। ইন্তেকালের (১৯৭৮ ইং) পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে তিনি বহাল ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক ভাষা ইনস্টটিউটের খণ্ডকালীন লেকচারার পদে নিয়োজিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত কর্ম জীবনে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। প্রথক পুস্তক The theory and sourecs of Islamic law for non-Muslem (১৯৬১ সনে মাদরাসা-এ-আলীয়া কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।) এছাড়া বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর গ্রন্হসমূহের মধ্যে রয়েছে : (১) 'আরবী বাংলা অভিধান ৮০ হাজার শব্দ সম্বলিত ৫ খণ্ডে সমাপ্ত) (২) 'বাংলা আরবী অভিধান। (২ খণ্ড) (৩) তাজরীদ আলবুখারী (২য় খণ্ড) (৪) আল-আয হারের ইতিহাস (৫) কোরআন ও বিজ্ঞান (৬) ইসলামের ইতিহাস (৭ খণ্ড) (৭) উর্দু বাংলা অভিধান (৮) তাফসীরে আযহারী (৯) আলআদাবুল আসরী (১০) আল-ইনশাউল আসরী (১১) সহজ আরবী শিক্ষা। তিনি অধুনালুপ্ত ফ্রাংলিন পাবলিকেশন্স-এর উদ্যোগে রচিত বাংলা বিশ্বকোষেরও অন্যতম লেখক ছিলেন।

বাংলাদেশে আরবী সাংবাদিকতার তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি এদেশে সর্বপ্রথম "আলছাকাফা" নামে একটি মাসিক আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে আরব জাহানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তিনি ১৯৭৬ সনের শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার তাশখন্দে অনুষ্ঠিত বিশ্বমুসলিম শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে যোগদান করেন এবং লেনিন গ্রাডের চাবি উপহার লাভ করেন।

তিনি কর্মময় জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। তদোপরি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, বাংলাদেশ লিবিয়া ভ্রাতৃসমিতি ও বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি মজলিসের সভাপতি ছিলেন।

রেডিও বাংলাদেশের বহিঃবিশ্ব কার্যক্রম বিভাগ পরিচালনায় তাঁর উপস্থাপনায় সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আরবী অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে।

তিনি সৌদী আরব, মিসর, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, আরব আমীরাত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের বহু দেশ সফর করেন। তিনি ১৯৭৮ সনের ২৭শে মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ স্বীয় বাসভবনের পার্শ্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মওলানা আযহারী ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার সম্ভাষণ যেকোনো ব্যক্তির কাছে তাঁর খোলা মনটিকে সহজেই তুলে ধরতো। তাঁর আচার-আচরণে বন্ধুবান্ধবরা থাকতেন মুগ্ধ। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সদাজ্ঞানচর্চা ও লেখালেখিতেই ডুবে থাকতেন। এ জ্ঞানসাধক অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন বলেই মাদ্রাসা-এ-আলীয়ার স্থায়ী অধ্যাপনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক ভাষা ইনষ্টিটিউটের খণ্ডকালীন লেকচারারের দায়িত্ব পালন সত্বেও বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। মওলানা আযহারী গবেষণা, অধ্যাপনায়, গ্রন্থ রচনা এবং পত্রপত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন ও সভাসমিতিতে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী ছাপা হতো। তিনি রেডিও বাংলাদেশের 'পথ ও পাথেয়' অনুষ্ঠানেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাঝে মধ্যে জ্ঞানগর্ভ কথিকা আকারে বক্তব্য রাখতেন।

প্রখ্যাত আলেম, অভিধান প্রণেতা, গবেষক, গ্রন্থকার, সুবক্তা মওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী আরবীতে অনর্গল বক্তৃতা করতেন। আরবী ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রীয় কোনো অতিথির আগমন ঘটলে তাঁর বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করার জন্যে মওলানা আযহারীরই ডাক পড়তো। ষাটের দশকের শুরুতে আইয়ুব শাসনামলে যখন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে মিসরের পরলোগত প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে ঢাকা সফরে আসেন এবং ষ্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাইরের লক্ষ জনতার মাঝে আরবীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, জামাল নাসিরের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার হৃদয়গ্রাহী বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, মওলানা আযহারীই।

মওলানা আযহারীর মৃত্যুতে দৈনিক সংগ্রামে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রকাশিত ও আমার লিখিত একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"আমাদের জ্ঞান-আকাশের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়লো। বিভিন্ন ভাষা ও জ্ঞানের এক দীপ্ত মশাল থেকে বঞ্চিত হলো মানুষ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ ও ইসলামের আজীবন খাদেম মওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী আর আমাদের মধ্যে নেই। ২৭শে মার্চ (৭৮)

সকাল সাতটায় পিজি হাসপাতালে তিনি ইনতেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। রেডিও বাংলাদেশের বহিবিশ্ব কার্যক্রম থেকে প্রতিদিন সোয়া এগারটায় আযহারীর কন্ঠ থেকে আর কোনো দিন আরবীতে উচ্চারিত হবেনা—"হা-যা ইযাআতু বাংলাদেশ, উকাদ্দেমু ইলাইকুম বারামেজানাল ইয়াওম আখুকুম আলাউদ্দীন আল-আযহারী"...। আরব অনারব বিশ্বের আরবী ভাষা জানা শ্রোতা ও তাঁর বহু গুণগ্রাহী তাদের প্রিয় সেই 'আল-আখুল আযহারী'র কণ্ঠস্বরটি থেকে চিরদিন বঞ্চিত হলো। সাদা পায়জামা, চকলেট রংয়ের শিরওয়ানী ও জিন্নাহ ক্যাপ পরিহিত এই ইসলামী চিন্তাবিদকে টেলিভিশনের "জীবনের আলো" ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর কোনো দিন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে কোরআন-হাদীসের অমূল্য বাণী বর্ণনা করতে দেখা যাবে না। তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য আরবী শিক্ষাকেন্দ্র ও আলীয়া মাদ্রাসার যে সকল ছাত্র তাঁর নিকট কোরআন-হাদীস ও আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতো, সে সকল ভক্ত ছাত্রকুলও তাদের এই প্রিয় দরদী শিক্ষকটির জ্ঞান ও স্নেহস্পর্শ আর কোনো দিন পাবে না। দেখা যাবে না আযহারীকে আরবদেশ থেকে আগত কোনো আরবী ভাষাভাষী বিশিষ্ট অতিথির জ্ঞানগর্ভ ভাষণের প্রাঞ্জল ও সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করতে। ইসলামী ফাউণ্ডেশন, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ পরিষদসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানচর্চামূলক কোনো আলোচনা সভা- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে তিনি আর ভাষণ দেবেন না। দেখা যাবে না তাঁর নতুন কোনো লেখা বই, প্রবন্ধ এদেশের পত্র-পত্রিকায়। আধুনিক আরবী গ্রন্থ বা সংবাদপত্রের কোনো শব্দের ব্যবহার অথবা ভাবার্থ উদ্ধারের জন্য তাঁর মাগবাজারস্থ সেই বাসগৃহটিতে হয়তো কেউ আর ছুটে যাবে না। মওলানা আযহারীকে হারিয়ে বাংলাদেশ হারালো নিজের এক কৃতি সন্তানকে। হারালো আরব-আজমের সংযোগ রক্ষাকারী একজন ইসলামী দূতকে। মওলানা আযহারীই বাংলাদেশের প্রথম কৃতি সন্তান, যিনি সর্বপ্রথম এদেশে আধুনিক আরবী ভাষা প্রচলনের পথিকৃৎরূপে কাজ করেছেন এদেশে অসংখ্য আলেম থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর রেডিও বাংলাদেশ ঢাকার বহিবিশ্ব কার্যক্রমের আরবী বিভাগ চালাবার মতো লোক আর কেউই ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্র যেমন আকরাম ফারুক, হাফেজ জাকারিয়া, শেখ শামসুজ্জামান,

খালেদ সাই-ফুল্লাহ সিদ্দিকী প্রমুখকে নিয়ে ঢাকা বেতারে আরবী অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেন। বাংলাদেশে যে মুহূর্তে কোনো আরবী সংবাদপত্র ছিল না, সে মুহূর্তে এখান থেকে আরবীতে বেতার প্রোগ্রাম করা ছিল যেমনি কষ্টকর, তেমনি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এদেশের জন্য এটি ছিল এক ইতিহাস। মরহুম আযহারীর যোগ্য পরিচালনা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের আরবী সংবাদ তৈরি, পাঠ, কথিকা ও সংবাদ পর্যালোচনায় উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। আজ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে যারা সুনামের সঙ্গে ইংরেজী থেকে আরবী অনুবাদ বা আরবী ভাষার অন্য ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মরহুম মওলানা আযহারী থেকে উপকৃত।

জীবনে হয়তো যাদের আধুনিক আরবী ভাষার পত্রপত্রিকা দেখার সুযোগ খুব কমই হয়েছে, স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে রেডিওর আরবী অনুষ্ঠান পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং সে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদেশের আরবী ভাষাভাষী মানুষদের মন থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের চেষ্টা কম কথা নয়। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে তৎকালীন পাকিস্তানী প্রচার যন্ত্রসমূহ বাংলাদেশ সম্পর্কে ভ্রাতৃপ্রতিম আরব দেশসমূহে নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়েছিল, যদ্দরুন আরবের মুসলিম ভাইয়েরা এদেশ ও এখানকার ধর্মপ্রাণ জনগণের ব্যাপারে অনেকটা অন্ধকারেই ছিলেন। মওলানা মরহুম আজহারী রেডিও বাংলাদেশের আরবী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন আরবী প্রোগ্রামের দ্বারা সেসব ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহু আরবী বই-পুস্তক লিখে বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমান, তাদের ধর্মপ্রীতি, তাদের সামাজিক, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে এদেশের সরকারী প্রকাশনা বিভাগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে আরববাসীদের সামনে ইচ্ছাকৃত হোক কি অনিচ্ছাকৃত এদেশের যথার্থ পরিচিতি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, মরহুম মওলানা আযহারী স্বার্থকভাবে তাঁর আরবী বই ও পত্র-পত্রিকা মারফত সেগুলো তুলে ধরেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ; স্বাধীনতার পর পর তৎকালীন শাসনামলে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা বিভাগ থেকে This is Bangladesh

নামক এদেশ সম্পর্কিত একটি পরিচিতি পুস্তক বের করা হয়েছিল। উক্ত পুস্তকে অর্ধ নগ্ন নারীর ছবিসহ অনেক কিছু থাকলেও এদেশে যে ইসলামী শিক্ষার জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এখানে ইসলামী শিক্ষাবিদ, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী সংস্কৃতির অনেক কিছু নিদর্শন আছে, এ কথাটি কোথাও ছিলনা। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের নিকট বাংলাদেশের পরিচয় দানকালে এ পরিচয়টিরই ছিল তখন বিরাট প্রয়োজন। সেদিন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, একমাত্র মরহুম মওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় "যাহা বাংলাদেশ" নামক তাঁর আরবী পুস্তকটির মধ্য দিয়ে এদেশের মুসলমান, তাদের ধর্মবোধ, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, মসজিদের সংখ্যা ও বাংলাদেশে কবে ইসলামের আগমন ঘটে প্রভৃতি বিষয় বড় চমৎকার-ভাবে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের মুসলিম জীবনধারা ও এখানকার জনগণের ইসলামপ্রীতি এবং তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশেষ করে আরববাসীদের পরিচয় করাণোর জন্যে মরহুম মওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী সাহেবই প্রথম 'আস্সকাফা' নামক একটি মাসিক আরবী পত্রিকা একক প্রচেষ্টায় বের করতেন। তাতে দেশে আরবী ভাষার পণ্ডিতগণ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখতেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে বহু নতুন লেখক আরবী ভাষায় প্রবন্ধ লেখা রপ্ত করেন। এদেশের ইতিহাসে মরহুমের আর একটি যে অবদান চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সেটা হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যখন এদেশের মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করার জন্য এক শ্রেণীর লোক সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছিল, এবং মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক আবুল ফজল ছাড়া মাদ্রাসার পক্ষে কেউ কথা বলার ছিল না, সে সময় ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক, ডঃ এনামুল হক, মওলানা তর্কবাগীশ, মওলানা মুহিউদ্দীন শামী এবং মওলানা খন্দকার নাসিরুদ্দীন ও মওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ প্রমুখের সহযোগীতায় দেশের মাদ্রাসাসমূহ পুনঃরায় চালু করার চেষ্টা করেন। তখন মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিকল্পে গঠিত "বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সমিতির" মাধ্যমে মরহুম বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

"মরহুম মওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল দিক থেকে উন্নতি

অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার মহাপরিকল্পনা হিসেবে অন্য যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে হাত দিয়েছিলেন, সেটা হলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত" "বাংলাদেশ মসজিদ মিশন।" তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশের মসজিদসমূহকে কেন্দ্র করে ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ বিস্তারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেয়া হলে, আমাদের সমাজকে যেমন বহু সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে, তেমনি দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অন্যান্যদিক থেকে ও সমাজ উন্নয়নের করার ব্যাপারে এ পন্থা বিরাট ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

একটি ভ্রম সংশোধন

[এ বইটি দ্বিতীয়ার্ধের ২১১ পৃষ্ঠা থেকে ২২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রন প্রমাদ বশতঃ যথাক্রমে ১১১—১২৪ হয়েছে—লেখক।]

———

মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী

[জ: ১৯০০ খৃ: —মৃ: ১৫-১০-৮৪ খৃ:]

মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান "জমিয়াতুল মোদাররেসীনের স্থপতি ফেনী আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সবজন শ্রদ্ধেয় আলেম অধ্যক্ষ মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহ:) ছিলেন বহুমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন এক বুজর্গ আলেম। মরহুম মওলানা সাহেব মুসলিম সমাজের সেসব যোগ্য, খোদাপ্রেমিক, ও জাতির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ওলামা এ-কেরামেরই একজন ছিলেন, যেসব আলেমের সান্নিধ্যে এলে একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, যাদের চেহারার প্রতি তাকালে নিজেদের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আমলে চরিত্রে এলেম এবং আমলের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই একজন মানুষের জীবন মহত্বের আদর্শে অলঙ্কৃত হয়ে উঠে। মরহুম মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদীর জীবনেও এ দুয়ের আশ্চর্য রকম সমন্বয় সাধিত হয়ে ছিল। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনে যে সব মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, তার দৃষ্টান্ত আজকাল অতি বিরল। তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ, ইসলামী শিক্ষার প্রসারদাতা, সূফী প্রকৃতির বিচক্ষণ আলেম, মোহাদ্দেস, পীর, লেখক, সংবাদপত্র সেবী, সাহিত্যামোদী এবং দূরদর্শী সংগঠক ও সমাজসেবক। এদেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন বলে তাঁকে একজন রাজনীতিকও বলতে হয়। তিনি নেজামে ইসলামের পক্ষ থেকে একবার সংসদ সদস্য নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করেন।

দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শিক্ষার উন্নতি ও বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন মতের আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করণের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর রয়েছে উজ্জ্বল অবদান। স্বল্পভাষী, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী অথচ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন দ্বীনের এই মহান সেবক কথার চাইতে কাজকেই অধিক প্রাধান্য দিতেন। সময়ানুবর্তিতা, খোদাভীরুতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক মরহুম মওলানা ওবায়দুল হক ইসলা-

মাবাদী খোদাপ্রেমিক বহু ওলীয়ে কামেলের পদধূলি ধন্য চট্টগ্রামের সাত কানিয়ার কেরানির হাটের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০০ খৃঃ জন্ম লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দেশের বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিক্ষা লাভ করার পর তিনি এই উপমহাদেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে স্বর্ণপদক নিয়ে টাইটেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা ছিল ইসলামী জ্ঞানবিশেষজ্ঞ এবং উপমহাদেশের খ্যাতনামা বড় বড় পণ্ডিত আলেম মোহাদ্দেসদের বিরাট সমাবেশস্থল। মরহুম মওলানা ওবা দুল হক ইসলামাবাদী (রহঃ) সে সব জ্ঞানীগুণী ওলামা এ-কেরামের কাছে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাওয়াটাও তাঁর জীবন তাৎপর্যপূর্ণ হবার অন্যতম কারণ। কোরআন-হাদীসের জ্ঞানে আপন অন্তরকে আলোকিত করা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও তাঁর দ্বীনের প্রচার ও সেবা করার প্রবল আগ্রহ নিয়েই মওলানা মরহুম মাদ্রাসা শিক্ষা লাভে ব্রতী হয়েছিলেন। অন্যথায় তাঁর মতো অসাধারণ মেধাশক্তিসম্পন্ন ছাত্র নিছক বৈষয়িক ধারার শিক্ষা-র্জনে মনোনিবেশ করলে যেমন সুখ্যাতির উত্তুঙ্গে উঠতে সমর্থ হতেন, তেমনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অধীন বড় ধরনের সরকারী চাকুরী লাভেরও সুযোগ পেতেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামের সেবা, তাই তিনি প্রথমে মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ অতঃপর উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম আগমনের মূল উৎস নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হন। আওলিয়া-এ-বাঙ্গাল সম্পর্কে লিখিত তাঁর বিরাট ভলিউমের গ্রন্থখানা সেই গবেষণারই ফল-শ্রুতি। উল্লেখ্য যে, যেসব মহান অলি-আওলিয়ার অক্লান্ত শ্রম-সাধনা, আপোষহীন সংগ্রাম ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা উপমহাদেশে বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলা এবং আসাম ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে সব মহান খোদাপ্রেমিকের জীবনকাহিনী তাতে স্থান পেয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থে অনেক অপ্রসিদ্ধ সূফী-দরবেশের পরিচয়ও পাওয়া যায়। পরাধীন ভারতে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর অধিকাংশ ওলামা-এ-কেরাম যেমন ইসলামী শিক্ষা বিস্তারকেই জীবনের প্রধান দ্বীনী খেদমত হিসাবে

বেছে নিয়েছিলেন, মরহুম মওলানা ওবায়দুল হকও আপন পুর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম ও দেশ-জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনারই সরব সাক্ষী হচ্ছে আজকের ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা। দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের এই মহান কেন্দ্রটি থেকে এ যাবত বহু ছাত্র আলেম হয়ে বের হয়েছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এই মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগীদের সংসর্গ লাভ করে তারা দেশে-বিদেশে জাতি-ধর্মের বিরাট সেবা করে যাচ্ছেন। মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহঃ) যেমন আদর্শ পুরুষ ছিলেন তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় নিয়োগকালেও তিনি খোদাভীরু আদর্শ শিক্ষক নিয়োগেরই চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি বেছে বেছে দেশের উন্নত চরিত্রের খোদাভীরু বিজ্ঞ আমলী শিক্ষকদেরকেই ফেনী মাদ্রাসায় জড়ো করেছিলেন। কেননা তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, শিক্ষক খোদাভীরু আমলী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী না হলে তিনি যত বড় শিক্ষিত ব্যক্তিই হোন না কেন তাঁর শিক্ষায় খোদাভীরু আলেম সৃষ্টি হবে না, যাদের দ্বারা দ্বীনের ও দ্বীনী শিক্ষার কল্যাণ সাধিত হতে পারে। বরং বিরূপ চরিত্রের আলেম সৃষ্টি হলে তাতে তারা ইসলামী শিক্ষারই ভাবমূর্তী নষ্ট করে। ফেনী মাদ্রাসার এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁর আমলে দেখা গেছে যে, অনেক ছাত্র বহু দূর-দূরান্ত থেকে এসে এখানে ভর্তি হতো এবং এলেম ও আমলের প্রশিক্ষণ লাভ করে এখান থেকে বিদায় নিত। তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ছিলেন এলেম ও আমলে বিরাট সমন্বয়ের অধিকারী খোদাভীরু বিজ্ঞ উস্তাদ এদের মধ্যে যেমন, মরহুম মোহাদ্দেসে আওয়াল মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাহেব, মরহুম মওলানা মহিব্বুর রহমান সাহেব, মরহুম আওয়াল সাহেব হুজুর, মোহাদ্দেস আবদুল মান্নান সাহেব প্রমুখ। তাঁদের পবিত্র স্মৃতি আজও তাদের ছাত্রদের জন্য প্রেরণার বস্তু। এই অধমও একই আকর্ষণে কুমিল্লা থেকে গিয়ে 'টাইটেলের' দু'টি বছর এই মহান ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অন্যান্য বুজুর্গ সহযোগীদের নিকট শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। অনেক ছাত্রই কামেল পড়া শেষ করে ফেনীতে সবচাইতে পরিচিত শব্দ 'প্রিন্সিপ্যাল সাব হুজুরে'র নিকট মুরীদ হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতো।

মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহঃ) ছাত্র জীবনেই ইসলামের আমলী অনুশীলনে সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর আওলীয়া জীবন কাহিনীর

চর্চা ও এ নিয়ে গবেষণা তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের আগ্রহকে আরও বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত: এ কারণেই কলকাতায় অবস্থান কালে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ বহু বুজর্গ ওলামা ও পীর-মাশায়েখের সান্নিধ্যে যাতায়াত করতেন। অবিভক্ত বাংলা বরং উপমহাদেশের খ্যাতনামা বুজর্গ পীর কলকাতার হযরত মওলানা সফিউল্লাহ সাহেব (রহ:) তাঁর রুহানী ওস্তাদ ছিলেন। মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহ:) আমলী ও রুহানী প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হবার পরই তিনি স্বীয় পীরের খেলাফত লাভে সমর্থ হন। মরহুম মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহ:) সূফী সাধক প্রকৃতির আলেম হলেও যুগজিজ্ঞাসা ও যুগচাহিদার ব্যাপারে ছিলেন অতি সচেতন। তিনি ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, যা দ্বারা মাদ্রাসাপাস ছাত্রেরা যেমন একদিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুগজিজ্ঞার জবাব দানে সক্ষম হয়, তেমনি তারা সমাজ জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনেও অবদান রাখতে পারে। আলীয়া পদ্ধতির মাদ্রাসাসমূহে সর্বপ্রথম বাংলা পাঠ্যভুক্ত করণের দাবী উত্থাপনকারী মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর সাথে মরহুম মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদীও এজন্যে বিরাট চেষ্টা করেন। যেহেতু কোনো মহৎ কিছুই একার দ্বারা সম্ভব নয়, সেজন্যে সমন্বিত চেষ্টার প্রয়োজন। বাংলা-আসামের বিশাল এলাকায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে ও এর উন্নতিকল্পে যা করণীয়, সেটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের দ্বারা সম্ভব ছিল না। তাই অবিভক্ত বাংলা এবং আসামের সকল মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি সংগঠন কায়েম করার প্রয়োজনীয়তা মওলানা ওবায়দুল হক সাহেবও তীব্রভাবে অনুভব করলেন। তাঁর সেই দূরদর্শিতারই ফলশ্রুতি হলো মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেসীন। এই জমিয়ত গঠন এবং দলমত নির্বিশেষে সকল মাদ্রাসা শিক্ষককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আজ যেখানে বহু চেষ্টা সত্বেও নানামতের নানা ইসলামী 'মুনী'কে এক করা যাচ্ছে না, মরহুম মওলানা ওবায়দুল হকের উদারতা, সততা নিষ্ঠা, আন্তরিকতা খোদাভীরুতা, ও সাংগঠনিক যোগ্যতার অমলিন স্পর্শে মাদ্রাসার সকল ওলামা দ্বিধাহীন চিত্তে একই প্লাটফর্মে এসে সমবেত হয়েছিলেন। আজকের জমিয়াতুল মোদাররেসীন সংগঠনটি মওলানা ওবায়দুল হক সাহেবেরই এক উজ্জ্বলতর অবদানের সাক্ষী স্বরূপ বিরাজমান।

এই জমিয়তকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, মাদ্রাসা শিক্ষক, ছাত্র এবং মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলী সরকার ও জাতির কাছে তুলে ধরার প্রেরণা নিয়েই নিজের তত্ত্বাবধানে এবং মরহুম মওলানা নূর মুহম্মদ আজমীর সম্পাদনায় জমিয়তের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক 'তালীম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার সুযোগদান এবং ইসলামের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাকে এ ভাষায় তুলে ধরার মহৎ উদ্দেশ্যও 'তালীম' পত্রিকা প্রকাশ করার পেছনে তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। যেখানে অধিকাংশ আলেম বাংলা ভাষা থেকে বিমুখ এবং এক শ্রেণীর মাদ্রাসায় বাংলা ভাষা চর্চার কথা কল্পনারও বাইরে, সে সময় মরহুমের উদ্যোগে তালীম পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারটি মাদ্রাসা শিক্ষকদের উন্নত করে তোলার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক গভীর প্রয়াসের একটি মহান অভিব্যক্তি। জানি না, তাঁর স্থলাভিষিক্তরা সেই মহৎ প্রয়াসটি এখনও অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট কিনা। কারণ, ঐ সময়কার তুলনায় এখন এর প্রয়োজনীয়তা যে আরও অধিক এবং ব্যাপক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহঃ)-এর সক্রিয় প্রেরণা ও উৎসাহ দানে এই অধমসহ উক্ত মাদ্রাসার অনেক ছাত্রই সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত। কারণ, তিনি ঐ যুগকে কলম যুদ্ধের যুগ মনে করতেন। যারা নিজেদের মতাদর্শকে এই কলম যুদ্ধে জয়ী করতে ব্যর্থ হবে, তাদের আদর্শকে শত্রুর ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হবে। ছাত্রদের লেখক হিসাবে গড়ে তোলার প্রেরণার অংশ হিসেবেই এক সময় ফেনী আলীয়া মাদ্রাসায় বাংলা, আরবী, উর্দু ভাষায় লিখিত দেয়াল পত্রিকা শোভা পেতে দেখা যেতো। মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে যথার্থ অর্থে আলেমে দীন হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি এতই সতর্ক ছিলেন যে, আধুনিক বিষয় সমূহের চর্চা যাতে ছাত্রদের চিন্তা-কর্মের ভারসাম্য নষ্ট করতে না পারে, সে জন্যে তিনি বড় বড় মুসলিম মণীষী যেমন, ইমাম গাজ্জালী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী প্রমুখের গ্রন্থাবলী ছাত্রদের পড়তে উপদেশ দিতেন। ছাত্রদের আমল-আখলাক ও আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রতি তাঁর সতর্কতা যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তার একটি ঘটনা আজও আমার স্মৃতি পটে অম্লান হয়ে আছে। ১৯৫৭ সালে আমি কামেল প্রথম বর্ষের ছাত্র। ফেনীতে নবাগত, ঐ সময় কোন একদিন ফেনী মহকুমা তালাবা-এ আরাবিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ছাত্রদের

মধ্যে কিছুটা কানাঘুষা চলছে যে, এ নির্বাচনে ফাজেল প্রথম বর্ষের এমন একজন প্রভাব শালী ছাত্র প্রার্থী হবে, যে বক্তা হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতা রাখে কিন্তু নানা কারণে সে ছিল রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে অনেকটা বিতর্কিত ইসলামী মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক মতের দ্বারা প্রভাবিত। তার ব্যক্তিগত আমলও মাদ্রাসা ছাত্র সুলভ ছিল না। "প্রিন্সিপাল সাব হুজুর" এ কথা জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কেননা, তাঁর ধারণা, ছাত্রটি নির্বাচনে জয়ী হলে কেবল ফেনী আলীয়া মাদ্রাসাই নয় গোটা মহকুমার মাদ্রাসা ছাত্রদের উপর তার ভ্রান্ত রাজনৈতিক মতার্দশ ও ব্যক্তিগত অন্যান্য চিন্তার প্রভাব পড়তে পারে। এ জন্যে তিনি নিজেই মোহাদ্দেস উস্তাদ মোহতারাম মওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের মাধ্যমে আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমাকেই নির্বাচনে সেক্রেটারী পদে দাঁড়াতে হবে। আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। মাদ্রাসার ছাত্ররা সকল কূপমণ্ডূকতার উর্ধে থাকুক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থাকুক তাদের নখ দর্পনে মরহুম এটা চাইতেন। এই জন্যে তিনি মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকে বহু জ্ঞানগর্ভ কিতাবপত্র ষ্টাডি করা এবং মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পাঠেও উদ্বুদ্ধ করতেন। তবে নিজেদের পাঠ্য কিতাবের পড়া ক্লাশে তাক-রারে'র মাধ্যমে আয়ত্বে আনার পরই এসব করার অনুমতি ছিল। মাদ্রাসার মূল শিক্ষা কিতাবের গভীরে না ঢুকে দৈনন্দিন পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীন থেকে এক শ্রেণীর ছাত্রের রাজনীতি ও সংগঠন নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততাকে তিনি খারাপ চোখে দেখতেন। তবে যারা উভয় দিক বজায় রাখতো তাদের তিনি অধিক পেয়ার করতেন। আমার আজও মনে পড়ে, একদিন ডাকযোগে ইউ এস, আই, এস. অফিস থেকে তাঁর ঠিকানায় আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় কতিপয় ম্যাগাজিন এসেছে। তিনি অফিস কক্ষে এসে সেগুলোতে কিছুটা চোখ বুলিয়ে আমাকে ডেকে বললেন, "ধরো তোমার খোরাক এসেছে।" তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আমি কিতাব বাদ দিয়ে কেবল এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকি না।

মরহুম সকল সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন। এ অমুক দলের, সে তমুক দলের এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি কাউকে হেয় নজরে দেখতেন না। ইসলামের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করে—এমন সকল দলের প্রতিই তিনি সহযোগিতামূলক মনোভাব রাখতেন। এ জন্যই দেখা যায়, তিনি নেজামে ইসলামের সাথে জড়িত

থাকলেও তাঁর আমলে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা হবে আলোচনা করার অনুমতি পেত। শুধু তাই নয়, "প্রিন্সিপাল সাব হুজুরে"র রুম হিসাবে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী কামরাটিতে সভা-সমিতি উপলক্ষে আগত অন্যান্য দলের বিশিষ্ট নেতারাও তাঁর দ্বারা চা পানে আপ্যায়িত হতেন। বস্তুত: মরহুমের এই ভদ্রতা এবং উদারতা ও স্বভাবসুলভ ভারসাম্যপূর্ণ সদাচরণের দরুনই তিনি ফেনী শহরের সরকারী উচ্চ কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কলেজ শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই পরম-শ্রদ্ধেয় এবং খোদাতর্স বুজর্গ হিসাবে বরিত ও সমাদ্রিত ছিলেন। সকলেই তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থী হতো। মরহুম নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গুণে মাদ্রাসা পরিচালনা ও এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বিরাট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর এখলাছ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর সহযোগী যোগ্য শিক্ষকবৃন্দ এবং মাদ্রাসা ছাত্র মহল সকলকেই তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধভাবে আকৃষ্ট রাখতো। যদ্দরুন কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় তাঁর ব্যবস্থাপনা কালে কোনো সময় মাদ্রাসায় মতানৈক্য দেখা যায়নি বা শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়নি। (অন্তত: পাকিস্তান আমলে তাই লক্ষ্য করা গেছে) একই কারণে তৎকালীন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিও তাঁর সাথে ফেনী মাদ্রাসাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর ব্যাপারে সকল সময় সহযোগিতা প্রদান করে গেছেন। ফেনী আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক সেক্রেটারী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মওলানা ইবরাহীম সাহেব এবং মওলানা মরহুম নূরমুহাম্মদ আজমী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ফেনী মাদ্রাসার উন্নয়ন কর্মে মরহুমকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন।

মওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহঃ) কর্তৃক জমিয়াতুল মোদাররেসীনের নেতৃত্ব দান, ফেনী আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও তাঁর ব্যবস্থাপনা এবং নিজস্ব একটি প্রেস ও প্রকাশনা কেন্দ্রের পরিচালনা ইত্যাদি কাজে জড়িত থাকা সত্বেও তিনি জ্ঞান-গবেষণামূলক কাজ থেকে বিরত থাকেননি। বাংলা, উর্দু ও আরবীতে তাঁর লিখিত একাধিক মূল্যবান পুস্তক তিনি রেখে গেছেন। ফেনী আলীয়া মাদ্রাসার দায়িত্ব ত্যাগ করার পর এই মহান বুজর্গ ব্যক্তি নিজ গ্রামের বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। সে সময় তিনি একটি তফসির লেখার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। জানা যায়, যেই মুহূর্তে তাঁর পরম প্রভুর

সান্নিধ্যে যাওয়ার ডাক এসে পড়ে, সে সময় তফসীর লেখার কলমটি তাঁর হাতেই থেকে গিয়েছিল।

মরহুম একজন খোদাতর্স আধ্যাত্মিক পীর হিসাবে, আদর্শ শিক্ষক হিসাবে, উপযুক্ত সমাজ সেবক, সংগঠক, রাজনীতিক, সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবী হিসাবে, ধর্ম, দেশ ও জাতির জন্য এক কর্মঠ দূরদর্শী আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সারা দেশে তাঁর হাজার হাজার ছাত্র মুরিদান ও ভক্ত অনুরক্ত রয়েছে। তিনি বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছিলেন পৃষ্ঠপোষক ও ভিত্তিস্থাপনকারী। তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের হাতে গড়া ওলামা, ভক্ত, অনুরক্তরা তাঁর জীবনের শিক্ষা-আদর্শের বাস্তব অনুসরণের মধ্য দিয়েই তাঁর স্মৃতিকে অম্লান রাখতে পারেন। তাঁর স্বার্থে নয় বরং যারা জীবিত তাদের কল্যাণেই এটা করা উচিত। একই লক্ষ্যে এই আদর্শ পুরুষের জীবনের খুঁটিনাটি শিক্ষনীয় বিষয় সহ তাঁর একটি জীবনী গ্রন্থ রচিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মওলানা ওবায়দুল হক (রহঃ)-এর তিরোধান মওতুল আলেমে মওতুল আলাম—"একজন খাঁটি আলেমের মৃত্যু জগতের মৃত্যু"-রই নামান্তর।

মরহুম বিদআত, শিরকের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। একবার ফেনীতে জনৈক বেদআতী পীরের আগমন ঘটলে তিনি তার গোমরাহী থেকে জনগণকে সতর্ক করেছিলেন। দ্বীন-ধর্ম ও সমাজের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এই নিষ্ঠাবান খোদাভীরু আদর্শবাদী আলেমের ইনতেকাল বাংলাদেশের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

———

মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ

[জঃ   —মৃঃ ২৭শে মার্চ ১৯৭৮ খৃঃ]

মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম, লেখক এবং রাজনীতিক। তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের সদস্য ছিলেন। যে মুহূর্তে রাজধানী ঢাকার জনগণ বাংলাদেশের কৃতি সন্তান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী জ্ঞানবিশেষজ্ঞ, শিক্ষা-সংস্কৃতির সেবক ও বিভিন্ন ভাষাবিদ মরহুম মওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীর অকাল মৃত্যু সংবাদে শোকে মুহ্যমান, ঠিক একই সময়ই মাত্র দুই-আড়াই ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের একনিষ্ঠ ত্যাগী সমাজসেবক, রাজনীতিক, বিশিষ্ট আলেম মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ সকলকে শোকাভিভূত করে চির বিদায় গ্রহণ করেন। মরহুম মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন কষ্ট ভোগের পর ২৭শে মার্চ ('৭৮) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। একই দিন আছরের নামাজান্তে মরহুম আযহারীর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মাকাররম প্রাঙ্গনে, অপর দিকে মরহুম মওলানা আবদুল মজিদ খাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় লালবাগ শাহী মসজিদের সামনে। মরহুম খানের মত্যু সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় বন্ধুবান্ধব ভক্ত ও সহকর্মীদের অনেকেই তাঁর নামাজে জানাজায় শরীক হতে না পারায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ বাংলাদেশের আলেম সমাজ এমনকি লেখক ও রাজনৈতিক মহলেও একটি পরিচিত নাম। জীবনে কোনো দিন মাদ্রাসা ছাড়া আধুনিক স্কুল-কলেজের ধারে কাছে লাগিয়েও বাংলা ভাষায় তিনি দক্ষ ছিলেন। এদেশে যেসব আলেম বাংলাভাষার চর্চা এবং এ ভাষায় বই পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখে সমাজের সামনে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শকে তুলে ধরার ব্যাপারে ব্রতী ছিলেন, তাদের মধ্যে মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ একজন। তিনি ছিলেন এ দেশের অন্যতম ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্রের বিচক্ষণ আলেম। মরহুম ছিলেন সমাজগতপ্রাণ। তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

মরহুম আবদুল মজিদ খাঁ মোমেনশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মাদ্রাসা লাইনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর হিমালয়ান উপ মহাদেশের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্রে উচ্চতার জ্ঞানলাভ করেন। শিক্ষা জীবনেই তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

মরহুম যে সময় দেওবন্দে অধ্যয়নের শেষ পর্বে, তখন এ উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত। ঐসময় দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাদীসবিশারদ, রাজনীতিবিদ্ আজাদী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা শেখুল হিন্দ মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী। মরহুম মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ তাঁর নিকটই হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্র জীবন থেকেই এ যোগ্য উস্তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন। মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপ্তির পর জমীয়তে ও লামা-এ-হিন্দের সদস্যভুক্ত হন। এ সময় ভারত-বিভাগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভারত বিভাগের সমর্থক তথা পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সংগঠন জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম ছিল মরহুম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বাধীন। আজাদী হাসিলের পর এ সংগঠন যখন পাকিস্তানকে এর নেতাদের প্রতিশ্রুতি মাফিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী তোলেন, সেসময় মরহুম খাঁ তাঁর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক গুরু মওলানা মাদানীর অনুমতিক্রমে দেশে এসে জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেন। এসময় থেকে মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ আড়াই যুগ ধরে আমরণ ইসলামী আন্দোলনের একজন নিরলস সেবক হিসাবে কাজ করেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কোনো সময় ইসলামী আন্দোলনের নীরব কর্মী, কোনো সময় নেতা হিসেবে কাজ করে গেছেন।

সাবেক পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৫৩ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে যে সর্বদলীয় ওলামা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়

মরহুম তার ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ই দেশের আলেমদের নিকট তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতা, অফিস পরিচালনা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের বিশেষভাবে পরিচয় ঘটে। এ উপ-মহাদেশের অতীত ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, আজাদী আন্দোলনে এখানকার আলেম সমাজের অপরিসীম দান, কোন্ সময় এদেশের কোন্ রাজনৈতিক নেতার কি ভূমিকা ছিল—এসব বিষয় মরহুম মওলানা আবদুল মজিদ খাঁর নখ-দর্পণে ছিল। তিনি বক্তা হিসেবে তেমন প্রসিদ্ধ না হলেও একজন ভাল লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম রয়েছে। কোরআন হাদীস, অসূল, ফেকাহ তথা ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানপরিধি ছিল বিস্তৃত। আমাদের দেশে আলেমের সংখ্যা অধিক হলেও কোরআন-হাদীসের একাডেমিক জ্ঞান, বাংলা ভাষা, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্নমুখী প্রতিভা একযোগে অনেকের মধ্যেই অনুপস্থিত। কিন্তু মওলানা আবদুল মজিদ খাঁর মধ্যে এ প্রত্যেকটি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। মূলতঃ তাঁর এসব গুণই তাঁকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নেতৃবৃন্দের আস্থা-ভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল।

মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ প্রথমে জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির অফিস সেক্রেটারী এবং ধীরে ধীরে ঐ পার্টির অন্যতম তাত্ত্বিক ও নীতিনির্ধারক সদস্যরূপে গণ্য হন। জীবনের শেষপ্রান্তে বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমক্রেটিক লীগের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের শুরুর দিকে দেশের আলেম সমাজকে রাজনৈতিক ময়দানে নামানো সহজ ব্যাপার ছিল না। কেননা রাজনীতি মাত্রই ছিল প্রায় আলেমের নিকট 'নিষিদ্ধ ফলস্বরূপ। সে সময় জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে যে দু'চারখানা বই বা সাময়িক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, ঐগুলো পাঠে রাজনীতির ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত অনেক আলেমই বিভ্রান্তিমুক্ত হয়ে ছিলেন। ঐসকল বই লেখা ও প্রকাশনায় মরহুমের যথেষ্ট অবদান ছিল। মরহুম মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখার ব্যাপারে অপর আলেমদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ

করতেন। মরহুম জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির প্রচার বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন দেশে ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য ছড়াবার উদ্দেশ্যে পার্টির প্রকাশনা বিভাগের সঙ্গে একটি ইসলামী গবেষণাগার স্থাপনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু অর্থাভাব বা অন্য কোনো বাস্তব অসুবিধার পার্টি নেতৃবৃন্দের এদিকে আগ্রহ না থাকায় তিনি বিরক্তি বোধ করতেন। মরহুম আবদুল মজিদ খাঁ আফসোস করে বলতেন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনে যেসকল প্রশ্ন দানাবেঁধে উঠে, সেসকল প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দানে আলেমগণ ব্যর্থ হলে ঐসকল যুবক আলেমদের প্রতি আস্থাহারা হয়ে পড়বে এবং তারা ইসলামী বাদ দিয়ে অন্য তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে। একারণেই মওলানা আবদুল মজিদ খাঁ সকল সময় ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও তাঁর দলের কর্মীদের হাতে ইসলামী সাহিত্য তুলে দেবার কথা চিন্তা করতেন।

— —

মওলানা আবদুল আলী ফরিদপুরী

[জঃ ১৯০৩ খৃঃ—মৃঃ ১৯৭৪ খৃঃ]

ফরিদপুরের মওলানা আবদুল আলী (রহ) ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রান একজন সুযোগ্য নেতা। তিনি যেমনি ছিলেন একজন বড় আলেম, লেখক তেমনি রাজনীতিক। তাঁর জীবনের বড় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তিনি একজন অতীব খোদাভক্ত লোক ছিলেন। মওলানা আবদুল আলী ফরিদ-পুরীর অন্যতম যোগ্যতা ছিল এই যে, তিনি ইউনানী চিকিৎসার একজন দক্ষ চিকিৎসক তথা হাকিম ছিলেন। মওলানা আবদুল আলী ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন এবং ফরিদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য নিবাচিত হন। ১৯৬৩ সালে তিতি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। এদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয়। মওলানা আবদুল আলী কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাশ করার পর দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজ থেকে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।

মওলানা আবদুল আলী ফরিদপুরের অধিবাসী রূপে পরিচিত হলেও মূলতঃ তিনি বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার বহলাতলী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এখানে তাঁর জন্ম।

মওলানা আবদুল আলী ফরীদপুরী (রহ)-এর শৈশব শিক্ষা স্থানীয় প্রাথ-মিক মকতব-মাদ্রাসায় সম্পন্ন হবার পর তাঁর লেখাপড়ার সুবিধার্থে দূরবর্তী এলাকায় যাবার তাগিদ আসে। কারণ তখনকার দিনে মকতব-মাদ্রাসা ছাড়া নিকটে উচ্চ দ্বীনী বা বৈষয়িক কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। এক কথায় সে সময় উচ্চ জীবনবোধ ও উচ্চ ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন কোনো জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যাক্তির সাহচর্য শৈশব কালে তিনি ঐ এলাকায় পাননি। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞানপীপাসু এবং লেখাপড়ার প্রতি খুব অনুরাগী। ফলে পারিবারিক মায়া-মমতাকে উপেক্ষা করেই তিনি জ্ঞান

চর্চার উদ্দেশ্যে ১২/১৩ বছর বয়সে কলকাতা চলে যান। তিনি পারিবারিক পরিবেশেই মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। কলকাতা আলীয়া থেকে তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই লেটার মার্ক নিয়ে পাশ করেন।

তিব্বি কলেজে ভর্তি

তাঁর তিব্বিশাস্ত্র শিক্ষা লাভের মূল প্রেরণা ছিল পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচা এবং স্বাবলম্বী জীবন যাপন করা। দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজে ইউনানী চিকিৎসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করে তিনি চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তখনকার মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দুরাবস্থা তাঁকে অধিক ব্যথিত করে তুলত। এ বাস্তবতার আলোকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইসলামের ব্যাপারে সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাবই মুসলমানদের অধপতনের মূল। মওলানা আবদুল আলী অত্যাধিক পড়াশোনা করতেন। তিনি মনে করতেন যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া উন্নতি অসম্ভব। এজন্যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে গ্রাম পরিবেশে না থেকে শহরে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ঢাকা জেলার নিজ বাড়ীতে না থেকে ফরিদপুর শহরে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি ফরিদপুর শহরে হেকীমি পেশাকে একমাত্র জীবিকার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ না করে স্বাবলম্বীতা এবং দ্বীনের প্রচার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

সমাজ সেবা

মসজিদ, মকতব, মাদ্রাসা, স্কুল, প্রতিষ্ঠায় তাঁর বড় অবদান রয়েছে। ফরিদপুর কোর্ট মসজিদ, কোর্ট মসজিদ, টেপাখানা মসজিদ আদর্শ ইসলামী স্কুল, কালীগঞ্জ সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর জীবনের কতিপয় বৈশিষ্ট হলো :

(ক) নিজের খাবারের চাল কেনার টাকাও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা দিতেন।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালে ত্রাণ সমিতি গঠন করে দুঃস্থ মানুষের সাহায্য করতেন।

(গ) এসব ক্ষেত্রে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও আত্মপ্রচার করতেন না।

(ঘ) ১৯৬৩ সালে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ হবার পর অন্যান্য নেতারা গ্রেফতার হলেও তিনি প্রদেশিক পরিষদের সদস্য হবার দরুন গ্রেফতার হননি। ঐ সময় তিনি তাঁকে প্রদত্ত সদস্য ভাতার টাকা দুঃস্থ পরিবারদের মধ্যে বিনামে পাঠিয়ে দিতেন। এসকল পরিবারের কেউ কোনো সময় তা জানতোনা। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সমাজের কাজেই ব্যয় করে গেছেন।

পারিবারিক জীবন

দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য দিনের সাথী কিন্তু দারিদ্রের প্রতিক্রিয়া তাঁর বাইরের জীবনে ছিলনা। কিন্তু তিনি পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সচেতন ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। নিজ সন্তানদেরকে তিনি খাটি মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বানানোর জন্য পরিকল্পিত ভাবে কাজ করেছেন। যেমন কোরআন হাদীস শিক্ষা, স্টাডি সার্কেল গঠন ইত্যাদি। তাঁর মোট ৭ ছেলে মেয়ের মধ্যে মেঝো ছেলে ৩০ বছর আগে মারা যায়। তাঁর সকল ছেলেমেয়েই শিক্ষিত এবং কম বেশি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়। তাঁর এক ছেলে এম. এ. এবং ৪ জন বি.এ. পাস। মহানগরী ঢাকার জামায়াতে ইসলামীর আমীর আলী আহ্সান মুহাম্মদ মোজাহিদ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র।

রাজনৈতিক জীবন

তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনৈতিক ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তিনি পরাধীন বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্যে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে তিনি সিলেট গণভোটের প্রাক্কালে সিলেট সফর করেন এবং দ্বিজাতিত্বের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ

প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন।

পাকিস্তান গঠিত হবার পর তিনি তাবলীগ জামায়াতে যোগদান করেন। তিনি কৃষক শ্রমিক প্রজাপার্টির সদস্য ছিলেন। এরপর ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী মোহন মিঞা (ইউসুফ আলী)-এর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের নমিনী হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর মুসলিম লীগ কর্তৃক জাতির প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা খেলাফীর প্রেক্ষিতে তিনি নেজামে ইসলামে যোগদান করেন। কিন্তু যথার্থ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে যে সুষ্ঠু কর্মসূচী দরকার ছিল, নেজামে ইসলাম পার্টিতে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে অন্য আরও অনেকের মতো তিনিও নেজামে ইসলাম পার্টি ত্যাগ করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্যে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু কর্মসূচী দ্বারা পরিচালিত সংগঠন জামায়াতে ইসলামীতে ১৯৫৬ সালে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি জামায়াতের সদস্য হন এবং ফরিদপুর জেলা জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি জেলা আমীর ছিলেন। এ সময়কালের মধ্যে তিনি জামায়াতের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হওয়া ছাড়াও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ইত্তেয়াদুল ওলামার সভাপতি ছিলেন।

১৯৬৫ সালে জামায়াত নিষিদ্ধ থাকাবস্থায় তিনি পূর্ব-পাক আণ্ডারগ্রাউণ্ড জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর ছিলেন। আইয়ুব শাসনকালে—১৯৬২ সালে তিনি আইয়ুব প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি আবদাল্লাহ জহিরুদ্দীনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। সামান্য কিছু ভোটের অভাবে তিনি ফেল করেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিপক্ষ থেকে তাঁর জীবন নাশের একাধিকবার চেষ্টা চলে। রাজনৈতিক বহু লোভ-প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও তিনি কোনো সময় নীতিভ্রস্ট-তার পরিচয় দেননি। ১৯৬৯ এবং ৭০ এ ফরিদপুর আইয়ুব বিরোধী সর্বদলীয় গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁর হাতেই ছিল—তার পূর্বে আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টিকারী তথাকথিত মুসলিম পরিবার আইন ও ডঃ ফজলুর রহমানের ইসলামকে আধুনিকী করণের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন।

৭১ সালে ভীত সন্ত্রস্থ জনগণকে তিনি সাহস প্রদান করেন এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরোধিতায় জনগণের পাশে থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ গঠিত হবার পর তিনি নিরাপদেই বাড়ী ঘরে থাকেন। কিন্তু আধিপত্যবাদী এবং তাদের ক্রিড়নকদের কারসাজিতে ১৯৭২ সালে কারারুদ্ধ হন। নির্মল চরিত্রের অধিকারী ত্যাগী পুরুষ মওলানা আবদুল আলী ফরিদপুরীর ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন। তিনি ১৯৭৪ সালে পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব করতে গেলে সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এ আল্লাহ্‌প্রেমিক সংগ্রামী আলেমের লাশ জান্নাতুমাহ্‌লায় সমাহিত করা হয়।

———

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

[জ. ২রা মার্চ, ১৯১৮ খৃ.—মৃ. ১লা অক্টোবর ১৯৮৭ খৃ.]

বাংলাদেশ, পাক-ভারত উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম বীর সেনানী, বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশে ইসলামী গণবিপ্লবের প্রবক্তা হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ১৯৮৭ সালের ১লা অক্টোবর ইহজগত ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইসলামের এক যোগ্য ও নিষ্ঠাবান সেবক। যুগ যুগের ওরাসাতুল আম্বিয়া নিষ্ঠাবান সংগ্রামী মোজাহিদ ওলামা-মাশায়েখ যেভাবে মহানবী (সাঃ)-এর দ্বীনী দাওয়াতের প্রসার দান ও তা সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যান এবং সকলপ্রকার প্রতি-কূলতার মাঝেও ত্যাগ ও নিষ্ঠা সহকারে আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অটল অবিচ ভূমিকা পালন করেন, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমও সে ধরনেরই একজন উচুঁ দরের বিচক্ষণ ও সংগ্রামী আলেম ছিলেন। একজন আলেম-এ-দ্বীনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট মুসলিম সমাজ তাদের জীবনের সার্বিক নেতৃত্ব পায়। নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনাতেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও তাঁকে দিতে হয়, যাতে ঐ সকল ক্ষেত্রের নেতৃত্বের জন্যে মুসলমানদের ভিন্নদিকে হাত-পাততে না হয়। মূলত মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ছিলেন তেমনি ধরনের নেতৃত্ব সৃষ্টিকারী একজন আলেম। প্রচলিত অর্থে আলেম বলতে আমাদের সমাজের সামনে যে ভাবমূর্তি ও পরিচিতি বিদ্যমান, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম টাইটেল পাশ একজন মওলানা হলেও সমাজে তাঁর ভাবমূর্তি আরও অতিরিক্ত গুণবৈশিষ্ট্যে ছিল প্রোজ্জ্বল। তিনি একাধারে ছিলেন আলেম-এ-দ্বীনী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, অর্থনীতিক ও সমাজতত্ত্ববিদ, রাজ-নীতিক, বাগ্মী, বহু উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি বাংলা সাহিত্যে উর্দু, আরবী, ফারসী থেকে অনুবাদের রাজা ছিলেন। তাঁর অনুবাদ সাহিত্যও নিজের

মৌলিক লেখার মতোই বলিষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের আলঙ্কারিক গুণাবলী দ্বারা বিমণ্ডিত। তাঁর লিখিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ইসলামী বিষয়াদিতে এত বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁকে সকলে এদেশে অদ্বিতীয় না বলে পারেন নি। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ন্যায় সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শের কথা তুলে ধরার মতো লোক সংখ্যায় কম হলেও অতীতে এদেশে ছিলেন না যে তা নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদানটি অধিক বিমূর্ত হয়ে ধরা পড়ে, সেটি হলো তিনি বাংলা ভাষা-ভাষী প্রায় বিশকোটি মানুষের জন্যে মাতৃ ভাষায় ইসলামী জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গ-রূপে বুঝবার ও জানবার যা কিছু প্রয়োজন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি তা উপহার দিয়ে গেছেন এবং তার বৈপ্লবিক কর্মপন্থাও নির্ধারণ করে গেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট হলো বাংলা ভাষায় ইসলামী পরিভাষা তৈরিতে তিনি আধুনিক মনমানসিকতার সামনে আকর্ষনীয় বহু নতুন শব্দ প্রবর্তনে বিরাট সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদ্ভাবিত এসব শব্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাঠকদের সামনে ইসলাম ও তার দাবীকে অধিক সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে দিয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী জীবন পদ্ধতি, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, জীবন দর্শন, ইসলামী সংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দাবলী বাংলা সাহিত্যে পাঠকদের কাছে চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এসকল ইসলামী পরিভাষা ইতিপূর্বেকার ইসলামী গ্রন্থাবলীতে ছিলনা বল্লেই চলে। দ্বীনের সংস্কার তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর অনুসারী।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের পূর্বে আমাদের যেসব অতীব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সাহিত্য, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও সংগঠক হিসাবে অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের সেসব অবদান যথাস্থানে ইতিহাসের বিরাট কীর্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-কর্মের ফলে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাইয়েদ মওদূদীর যুগান্তকারী উক্তি—"ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধান"—কথাটি সমাজের শিক্ষিত মহল বিশেষ করে যুবকদের মনে ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবধারাকে জাগিয়ে তুলতে যে সাহায্য করেছে, এটিকে অভূতপূর্ব বলতে হয়।

আজ এই উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে চায়। এজন্যে তারা আন্দোলনেও রত। বলাবাহুল্য, অন্যান্য বিষয়সহ বাংলা ভাষায় মওলানা আবদুর রহীমের লিখিত বই-পুস্তক এ ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে এ ভাবধারা সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম এই উপমহাদেশে একজন সাহিত্যিক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক হিসাবে যতনা খ্যাত তার চাইতে তিনি একজন আলেম-এ-দ্বীন ও রাজনীতিক হিসাবে বেশি খ্যাত। তবে আলেম বলতে আমাদের দেশে যে চিত্র আমাদের সমাজ মানসে ভেসে উঠে, এর সাথে তাঁর পার্থক্য ছিল। খোদ্ মওলানা আবদুর রহীমও এ শব্দের সংজ্ঞায় ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে শুধু মাদ্রাসায় দাওরা-এ-হাদীস বা টাইটেল পাস করলেই কাউকে আলেম পদবাচ্যের অধিকারী বলা যাবে না —বরং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবার সাথে সাথে সে অনুসারে তাকে ব্যক্তি চরিত্র গঠনকারী এবং ইসলামী জ্ঞানকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তব প্রয়োগের যোগ্যতা সৃষ্টিকারী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অধিকারী হতে হবে।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম শুধু একজন রাজনীতিকই ছিলেন না, বরং বলাচলে তিনি রাজনীতিক নির্মাতা ছিলেন। তাঁর পূর্বাপর রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রশিক্ষণে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠনের কোর্স আছে, তেমনি আধুনিকযুগের কোনো রাষ্ট্র ও সমাজের কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি অধিকার নিশ্চিত করে কি ভাবে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়, তারও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

এমন মহৎ পুরুষের সন্ধান কমই দেখা যায়, যিনি জাতির সামনে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের চিন্তাগত উপায়-উপকরণ ও এ জন্যে দর্শন পেশ করার সাথে সাথে নিজেও এ জন্যে প্রত্যক্ষভাবে ময়দানে কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম একদিকে এ উদ্দেশ্যে কলমের জেহাদ চালিয়ে গেছেন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার

জন্যে যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতেন, অপর দিকে কর্মীদের সাথে সরাসরি ময়দানে নেমেও কাজ করেছেন। এরশাদ সরকারের আমলে ৮৭ সালের মার্চ মাসে শুক্রবার দিন তিনি তাঁর সহকর্মী মওলানা আজীজুল হক, মওলানা পীর ফজলুর রহমান, মওলানা পীর আবদুল জব্বার, ব্যারিষ্টার কোরবান প্রমুখকে নিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের দাবীতে রাজপথে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বার্ধক্যকাতর শরীর নিয়ে মওলানা আবদুর রহীম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবনকার সংগ্রামের শেষ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, এদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে লিপ্ত মোজাহিদরা চিরকাল তা থেকে প্রেরণা লাভ করবে। শুধু কেবল এই একটি ঘটনাই নয়। তিনি পাকিস্তান আমলেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একই কারণে কারাবরণ করেছেন।

প্রত্যেক নবীর যুগে যে বিষয়ের প্রাধান্য থাকে, তাকে খর্ব করার মতো যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা তার পয়গম্বরদের পাঠিয়েছেন। যেমন হযরত মূসা (আ:)-এর যুগ ছিল যাদুর, হযরত দাউদ (আ:)–এর যুগ ছিল সুরের, এমনিভাবে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর যুগ ছিল সাহিত্যের। মূসা (আ:)-কে আল্লাহ শ্রেষ্ঠতর যাদুর মু'জেযা দিয়ে সে যুগের যাদুকে পরাভূত করেছেন। দাউদ (আ:)-কে শ্রেষ্ঠ সুর দিয়ে সে যুগের সুরের প্রাধান্য খর্ব করেছেন, তেমনি উম্মী নবীকে অনন্য পাণ্ডিত্বের যোগ্যতা ও তুলনাহীন ভাষা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কোরআন দিয়ে আরব পণ্ডিতদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। আমাদের এই উপমহাদেশেও বিশেষ করে উভয় বাংলাভাষাভাষী এলাকায় ৪০–৬০ এর দশকে ইসলামের উপর যত আঘাত এসেছে বা এখনও আসছে, তার অধিকাংশই সাহিত্যনির্ভর। এ সময় 'জেহাদ বিস্‌সাইফ' তথা তরবারীর যুদ্ধের চাইতে 'জেহাদ বিল কলম' অর্থাৎ কলম যুদ্ধের যোগ্যতারই তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। মওলানা আবদুর রহীম নি:সন্দেহে কলম যুদ্ধের একজন সফল সিপাহ্‌সালার। যত প্রতিকূলতাই আসুক কলম যুদ্ধে তাঁর বিজয়ের এ প্রভাব মুছে ফেলা সহজে সম্ভবতো নয়ই, বরং তাঁর জেহাদের এই সংগ্রামী নজির এ রণাঙ্গনে আরও বহু সৈনিক ও সিপাহ্‌সালার তৈরিরই অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে।

আমাদের এই উপমহাদেশে বরং সারা মুসলিম বিশ্বে মওলানা সাইয়েদ
আবুল আলা মওদূদী আলকোরআন এবং মহানবী (সাঃ) ও সাহাবা-জীবনের
আলোকে ইসলামের যেই বিপ্লবী দর্শন ও ভাবধারা উপস্থাপন করে গেছেন,
তা সারা বিশ্বের বস্তুবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সেই ইসলামী রেনেসাঁর ঢেউ আমাদের দেশেও অনুভূত
হচ্ছে। আর মওলানা আবদুর রহীমই জীবনের প্রথম দিকে মওলানা মওদূদীর
সে সব জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ অনুবাদ করে এবং শেষে নিজে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা
করে এ ভূখণ্ডে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ
অবস্থার এবং বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির চিন্তা-দর্শন ও বিভিন্ন জিজ্ঞাসার পাশাপাশি
ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে আধুনিক মনা মানুষের সামনে তুলে ধরা একটি কষ্টসাধ্য
কাজ বৈ কি। সময়ের পরিক্রমায় অনেক সময় যুক্তির তারতম্য ঘটে।
মওলানা মওদূদীর ইনতেকালের পরও সময়ের এ শূন্যতায় চিন্তার যে সব
ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক জবাবের প্রয়োজন দেখা দেয় কিংবা যে সব ব্যাপারে
পূর্ব যুক্তির চাইতেও আরও বলিষ্ঠতর যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল,
মওলানা আবদুর রহীম তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমৃদ্ধ কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ
লিখে গিয়ে সে শূন্যতা দূরিকরণ বা সমৃদ্ধির কাজ সমাধা করে গেছেন।
আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় এ পদ্ধতিতে ইসলামী আদর্শের উপস্থাপনা
ইতিপূর্বে খুব কমই হয়েছে। মওলানা আবদুর রহীমের "মহাসত্যের সন্ধান"
গ্রন্থটি এধরনের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এটি একটি
ব্যতিক্রম ধর্মী রচনা। অনেকের মতে এ বইটি এবং মওলানা আবদুর রহীমের
আরও কয়েকটি গ্রন্থ এত উচ্চ মানের ও অনান্য যে, আরবী, উর্দু, ফারসী
কোনো ভাষাতেই এপর্যন্ত এরূপ যুগান্তকারী বই পাওয়া যায় না। যুগ-
জিজ্ঞাসা ও বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মতবাদ থেকে মুসলিম যুবসমাজকে
রক্ষা করার জন্যে মওলানা অবিশ্রান্ত ভাবে লেখনী চালিয়ে গেছেন। তাঁর
লিখিত 'কমিউনিজম ও ইসলাম' 'আজকের চিন্তাধারা' 'বিবর্তন ও সৃষ্টি তত্ব'
প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি কেবল যুগজিজ্ঞাসার জবাবই দেননি, তার পাশাপাশি ইসলামী
বিধানের শ্রেষ্ঠত্বও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে
'হাদীসের ইতিহাস' এবং 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন'। আরেকখানি গ্রন্থ
হলো 'আলকোরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ'। এ সমস্ত গ্রন্থ
একটি উন্নত সমাজ গঠনে বিরাট সহায়তা করবে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর সাথে সাথে ইসলামী অর্থনীতির প্রশ্নটি যখন প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং এ একটি কারণ দেখিয়েই এযুগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতাকে উড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস চলে, তখন মওলানা আবদুর রহীম এর দাঁতভাঙ্গা জবাব হিসাবে 'ইসলামী অর্থনীতি' গ্রন্থ খানা রচনা করেন। তাতে তিনি কোরআনের অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থনীতির প্রাচীন ও আধুনিক সংজ্ঞা এবং এগুলোর বিভিন্ন মতবাদের সাথে তুলনা করে ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তাঁর ইসলামী অর্থনীতি এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কজে বিরাট সহায়তা করেছে। ইসলামী অর্থনীতির উপর গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা" হিসাবে মওলানা আবদুর রহীম মহানবীর দ্বীন ও তাঁর কর্মজীবনের সকল কিছুকে একটি সবাত্মক বিপ্লবী আন্দোলন বলে মনে করতেন। তাই সমাজ জীবনের কোনো স্তর ও বিভাগই মওলানা আবদুর রহীমের নজর এড়ায়নি। জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের অধীন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, সে সম্পর্কে তিনি পথ নির্দেশনা রখে গেছেন। তাঁর সাহিত্যে যেমন রয়েছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি তেমনি রয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা ব্যবস্থা, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, পরিবার সবকিছু। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যাপারেও মরহুম কলম ধরে গেছেন। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম নিছক একজন মাদ্রাসা শিক্ষিত হয়েও তাঁর বাংলা, উর্দু, আরবী এবং ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে আনা ও এগুলো থেকে আহরিত জ্ঞানরস দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে তিনি আজীবন কষ্ট করে গেছেন। তা যেমন খোদ্ আমাদের জন্যে একটি শিক্ষনীয় ব্যাপার, তেমনি তাঁর এসবের পেছনে যে সুমহান লক্ষ্য সক্রিয় ছিল, সে লক্ষ্য অর্জনে তৎপর হওয়াও সকলের কর্তব্য। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম এদেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে অসমাপ্ত কাজ রেখে গেছেন, এ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব এদেশের মুসলিম যুব সমাজের,—ওলামা-এ-কেরামের। একাজের দ্বারা যেমন তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে তেমনি নিজেদের মুক্তির পথও এটিই।

একনজরে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের জীবন-পঞ্জী

জন্ম : ২রা মার্চ, ১৯১৮। মৃত্যু ১লা অক্টোবর ১৯৮৭ খৃ.।

শিক্ষা : ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হতে মমতাজুল মোহাদ্দেসীন ডিগ্রী লাভ। অতঃপর সেখানেই গবেষণায় আত্মনিয়োগ।

কর্ম : বরিশালের নাজিরপুর ও কেউন্দিয়া কাউখালী মাদ্রাসার প্রধান মওলানা হিসাবে চার বছর নিয়োজিত ছিলেন। গতানুগতিক কোনো ধরা-বাঁধার চাকুরী তিনি পছন্দ করতেন না বলে জীবনে আর কোনো চাকুরিতে যাননি।

লেখক ও গবেষক : পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাল্য-কাল হতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করে আমৃত্যু জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ ও অনূদিত গ্রন্থ মিলিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা ১২০ খানা। 'আল-কুরআনের অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ইতিহাস' শীর্ষক দু'টি গবেষণা প্রকল্পে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআন' অনুবাদের কাজ লিখতে লিখতেই তাঁকে ক্লিনিকে যেতে হয়েছিল। তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮—৭১ পর্যন্ত ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর (পুরানা পল্টন) পরিচালক, ১৯৭১—৭৬ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বি আই সি)-এর চেয়ারম্যান, একই সময় ইসলামী অর্থনীতি গবেষণা ব্যুরোর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ হতে একমাত্র সদস্য হিসাবে রাবেতা-এ-আলম আল ইসলামী এবং ওআইসি,র ফিকৃহ কমিটির সদস্য ছিলেন। অবশ্য ১৯৮১ সালে রাবেতার কতিপয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দ্বিমতের কারণে তিনি পরবর্তীতে কোন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেননি বলে জানা যায়।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক : ১৯৪৯—৫০ সালে বরিশালে 'তানজীম' সম্পাদনা ; ১৯৫৯-৬০ সালে দৈনিক নাজাতের জেনারেল ম্যানেজার ; সাপ্তা-হিক 'জাহানে নও'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ; ১৯৪৫ সাল থেকে যে সকল পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন: সাপ্তাহিক নকীব, মাসিক মোহাম্মদী (কলিকাতা ও ঢাকা) মাসিক হেদায়েত, মাসিক সুন্নাত আল-জামাত, ইসলামী একা-ডেমী পত্রিকা, ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মাসিক পৃথিবী, দৈনিক আজাদ,

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ডাইজেষ্ট, মাসিক মদীনা, মাসিক তাহজীব, ত্রৈমাসিক কলম, সাপ্তাহিক মিজান (কলিকাতা) মাসিক মঞ্জিল, দৈনিক পূর্বদেশ, মাসিক কুরআনুল হুদা (করাচী), মাসিক চেরাগে রাহ (করাচী), সন্ধান (ইসলামাবাদ), সাপ্তাহিক নাজাত, দৈনিক সংগ্রাম, মাসিক তাওহীদ প্রভৃতি। এক কথায় তিনি ছিলেন ইসলামী সাহিত্যাঙ্গনে এক জ্ঞানবান স্রোতধারা।

রাজনৈতিক জীবন ঃ তিনি ছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সওগাত। ১৯৪৫ সালে মওলানা মওদূদীর বিপ্লবী পুস্তকসমূহের সাথে পরিচিত হবার পর জামাতে ইসলামী হিন্দে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে ইসলামী সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাথে সাথে উর্দূ থেকে অনুবাদ চলতে থাকে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমানে তা ছাপা হতে থাকে। পাকিস্তান হবার পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আন্দোলনের কাজে মনোযোগী হন। কিছুকালের ব্যবধানে এখানে সাংগঠনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী হিসাবে ১৯৫১—৫৫ সাল, ১৯৫৬—৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর, ১৯৬৮—৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ের মধ্যে ১৯৪৮—৪৯ পাকিস্তানের আদর্শ প্রস্তাব, ১৯৫১—৫৬ ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা, ১৯৬০—৬২ সালে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামী নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪ জন জামাত নেতা সহ তিনি কারাবরণ করেন। জামাতকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১-এর শেষ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত নেপালের কাঠমণ্ডুতে অবস্থান করে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশের সকল ইসলামী দল ও শক্তিকে একটিমাত্র দলে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করে তিনি তার সহ-সভাপতি হন। পরের বছর তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে তিনি সহ ৬ জন দল থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন গঠন করেন। তিনি সর্বদাই ইসলামী আন্দোলনকামীদের জোট সৃষ্টির মাধ্যমে গণ-

আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন বলে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়েকেরাম, পীর মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ', 'খেলাফত সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' আত্মপ্রকাশ করে। তার কয়েক মাসের মধ্যে দেশের সর্বত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এক ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলনের প্রতিটি প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করতেন। এজন্যে পুলিশের নির্যাতন সহ নানাভাবে হয়রানীর সম্মুখীন হয়েও তা' তিনি হাসিমুখে বরণ করে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল থাকেন।

পুরস্কার : নিরহংকার ও নির্লোভ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর নাম সর্বাগ্রে। ১৯৭৭ সালে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গবেষণা কর্ম পুরস্কার; ১৯৮৩ সালে অনুবাদের জন্য পুরস্কার।

সফর ও সম্মেলন : প্রথম বিশ্ব-মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন মক্কা, ১৯৭৭ সাল, প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন ১৯৭৮ করাচী, প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন ১৯৭৮ কুয়ালালামপুর, ইসলামী ওলীফন সম্মেলন, ১৩ শত হিজরী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন রিয়াদ, ইসলামী ফিকহ কমিটির সম্মেলন মক্কা, ইসলামী বিপ্লবের ৪র্থ বিজয় বার্ষিকী ও ইমাম খোমেনীর সাথে সাক্ষাৎ ১৯৮২ তেহরান, ৭ই নভেম্বর, ১৯৮৭ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে সেমিনারে ভাষণ দেবার কথা ছিল। এছাড়াও তিনি নেপাল, আরব-আমিরাত, ভারত, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

ইন্তেকাল : দুপুর ১২ টা ২০ মিনিট, ১লা অক্টোবর, ১৯৮৭ রোজ বৃহস্পতিবার, রাশমনো হাসপাতাল, ঢাকা।

মৌলিক গ্রন্থ : কালেমায়ে তাইয়েবা (১৯৫০), ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা (১৯৫২), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১৯৫৩), কমিউনিজম ও ইসলাম (১৯৫৪), ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার (১৯৫৪), ইসলামের অর্থনীতি (১৯৫৬), সমাজতন্ত্র ও ইসলাম (১৯৬২), সূরা ফাতিহার তাফসীর (১৯৬৩), পাকচীন বন্ধুত্বের স্বরূপ (১৯৬৬), তওহীদের তত্ত্ব কথা (১৯৬৭), সুন্নাত

ও বিলায়াত (১৯৬৭), হাদীস শরীফ ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৬৭), হাদীস সংকলনের ইতিহাস (১৯৬৯), ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা (১৯৬০), পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ (১৯৬৯), অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (১৯৭০), হযরত মুহাম্মদের অর্থনৈতিক আদর্শ (১৯৭১), ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (১৯৭১), খিলাফতে রাশেদা (১৯৭৪), হাদীস শরীফ ২য় ও ৩য় খণ্ড (১৯৭৫), মহাসত্যের সন্ধানে (১৯৭৭), নারী (১৯৭৮), ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন (১৯৭৯), ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান (১৯৭৯), খোদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন? (১৯৮০), আজকের চিন্তাধারা (১৯৮০), আলকোরানের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ (১৯৮০), অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম (১৯৬৬), চরিত্র গঠনে ইসলাম (১৯৭৭), বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ব (১৯৭৭), ওমর ইবনে আব্দুর আজিজ (১৯৭৭), জিহাদের তাৎপর্য (১৯৭৮), ইসলামে জিহাদ (১৯৮৬), পরিবার ও পারিবারিক জীবন (১৯৮৪, সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষণা), পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি (১৯৮৫), ইসলাম ও বীমা (১৯৮৫), হাদীস শরীফ ৫ম খণ্ড (১৯৮৬), আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা (১৯৭৬)।

অনুবাদ গ্রন্থ: ইসলামের জীবন পদ্ধতি (১৯৪৯), ঈমানের হাকিকত (১৯৩০), ইসলামের হাকিকত (১৯৫০), নামাজ রোজার হাকিকত (১৯৫১), জাকাতের হাকিকত (১৯৫১), হজ্জের হাকিকত, (১৯৫০), ইসলামের দাওয়াত ও কর্মনীতি (১৯৩৪), আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা (১৯৫৪), মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী (১৯৫৪), আল্লাহর পথে জেহাদ (১৯৩৫), অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান (১৯৫২), ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি (১৯৫৩), ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন (১৯৩৪), একমাত্র ধর্ম (১৯৫৩), ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ (১৯৫৫), ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি (১৯৫৫), কাদিয়ানী সমস্যা (১৯৫৪), ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (১৯৬০), তাফহীমুল কোরআন (১৯ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ১ম পারা (১৯৫৮), সমাজ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা (১৯৭৭), ইসলাম ও জাহেলিয়াত (১৯৫৫), ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ (১৯৫৭)। হযরত মুহাম্মদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা; দীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মুসলিম জাতির উত্থান পতন

ও পুনরুত্থান (অপ্রকাশিত) ; কিতাবুত তাওহীদ (অপ্রকাশিত), ইসলামে যাকাত বিধান ১ম খণ্ড (১৯৮২), ২য় খণ্ড (১৯৮৩) ইসলামে হালাল হারামের বিধান (১৯৮৪), বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত, ইমাম খোমেনীর আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া ও আল জিহাদুল আকবর।

পাণ্ডুলিপি : শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জাতি ও জাতীয়তাবাদ, অপরাধ দমনে ইসলাম, ইসলামী আইনের উৎস, সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, শ্রম ও শাস্তি, দাস প্রথা ও ইসলাম, উপ-মহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর সমাজ দর্শন। এছাড়া অন্যান্য আরও ১০/১২টি পাণ্ডুলীপি রয়েছে যার মধ্যে দুটো উপন্যাসও আছে।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের মন্তব্য :

মওলানা আবদুর রহীমের ইনতেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা তার কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এখানে কয়েকটি সংবাদ পত্রের মন্তব্য উল্লেখিত হলো :

দৈনিক ইত্তেফাক [৪।১০।৮৭ ইং]

"বিশিষ্ট আলেম, চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক ও রাজনীতিক মওলানা আবদুর রহীম গত বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ---- রাজেউন)। গত শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মোকাররমে বিপুল জনসমাগমের মাধ্যমে তাঁহার নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয় এবং আজিমপুর গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বৃহত্তর বরিশালের এই কৃতী সন্তান শুধু এই উপমহাদেশে নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ হইতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ফেকাহ বোর্ডের একমাত্র সদস্য।

বস্তুত: একই সঙ্গে সুগভীর ইসলামী জ্ঞান ও মণীষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের দুর্লভ সমন্বয় মওলানা আবদুর রহীমকে দেশে-বিদেশে একজন পরিশীলিত গবেষক ও যুগোপযোগী দার্শনিক চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইসলামকে তিনি কোন সময়ই গতানুগতিক 'ধর্ম' হিসাবে মনে করেন নাই। তা' ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞান যে আধুনিক সভ্যতা ও

প্রগতির পরিপন্থী নয়, সে কথাও তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। সে কারণেই তাঁহার মৌলিক রচনা কিংবা অনূদিত গ্রন্থাবলী— মত ওপথ নির্বিশেষে সকল মহলের নিকট গ্রহণীয় হইয়াছিল।

মওলানা আবদুর রহীমের রাজনীতি সম্পর্কে অনেকের মতপার্থক্য থাকিতে পারে। থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি যে সকল রকম গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠিয়া গণতান্ত্রিক চেতনায় এ দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করিবার সাধনায় নিরলস ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল ব্যাপক। সে কারণে সেই সুগভীর দার্শনিকতা ও পাণ্ডিত্য তাঁহার বাগ্মিতার মধ্যেও ছিল সুপরিস্ফুট। আধুনিক যুগের বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসার জওয়াব ও জটিলতার সমাধান তিনি এতটাই বাস্তবসম্মতভাবে দিতে পারিতেন যে, তাহা একাধারে আদর্শিক মন ও আধুনিক মানসিকতার নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিতে পারিত। তাঁহার অসংখ্য গবেষণা ধর্মী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় ইহারই পতিফলন ও প্রতিচ্ছবি দেদীপ্যমান।

যাহা হউক, মওলানা আবদুর রহীমের মৃত্যুতে দেশ শুধু একজন নিষ্ঠাবান নাগরিককে হারায় নাই; জাতিও হারাইয়াছে তাহাদের আদর্শিক ধ্যান-ধারণা ও মানসিক আশাআকাংক্ষার এক মূর্ত প্রতীককে। তাঁহার মৃত্যুতে এই দিক হইতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নয়। আমরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি জানাইতেছি আমাদের গভীর সমবেদনা"।

দৈনিক আজাদ [৯। ১০। ৮৭]

"মুনশি মেহেরুল্লাহ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, যে ছিলছিলা কায়েম করে গিয়েছেন, মওলানা আবদুর রহিম ছিলেন সেই রাহেরই এক রাহ্‌গীর। তিনি ছিলেন একাধারে আলেম, চিন্তানায়ক, লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক নেতা। মহা সত্যের সন্ধানে, আজকের চিন্তাধারা, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি জ্ঞান-চর্চা ও জ্ঞান-গবেষণার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার নজির ফিলহাল বড় বিরল হইয়া আসিতেছে। তিনি ইসলামকে জানিতেন এবং জানাইতে কোশেশ করিতেন। ইহা যে অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয় বরং যুক্তিসঙ্গত এবং ক্রমশ আবিষ্কৃত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন

নূতন তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা তিনি সহজ ভাষায় সরল ভঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আল কুরানের যে বিরাট বিশাল তরজমা মাওলানা আবুল আলা মওদূদী উর্দু জবানে করিয়াছিলেন, তিনি তাহা বাংলা তরজমা করেন। ভাষার উপরে তাঁহার যে কি অসাধারণ দখল ছিল তাহা ঐ তাফহীমুল কুরআন পড়িলে বুঝা যায়।

কখনই মনে হয় না যে, তরজমা পড়িতেছি। আল-কুরানের জ্ঞান বিজ্ঞান ও গুঢ়তত্ত্ব তিনি এমন সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, একজন সাধারাণ মানুষের পক্ষেও উহা মালুম করিতে কোনই তকলিফ হয় না। পয়লা খণ্ড পড়িতে শুরু করিয়া এমন এক আকর্ষণ অনুভব করি যাহা বর্ণনা করিয়া সমঝাইতে পারিব না। তাহার পর কখন যে উনিশ খণ্ড পড়া খতম হইয়া গেল, তাহা কেমন যেন বুঝিতেই পারিলাম না।

মওলানা আবদুর রহীম ছেরেফ বাংলাদেশেই নহে, এমন কি এই উপমহাদেশেও নহে, তামাম মুসলিম দুনিয়াতেই তাঁহার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মণিষা ও পাণ্ডিত্যের জন্য মশহুর ছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার যে ফেকাহ বোর্ড আছে, তাহাতে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একমাত্র সদস্য। লেকিন তাহার সব চেয়ে বড় তারিফ শায়েদ এই যে, তিনি যাহা সত্য ও সঠিক বলিয়া জানিতেন, তাহা নির্ভয়ে ঘোষণা করিতেন এবং ব্যক্তিগত জিন্দেগীতেও তাহা কঠোরভাবে পালন করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি কখনও কোন ব্যাক্তি বা পরিস্থিতির সহিত আপোষ করিতেন না। আজ আমাদের চারিদিকে যখন আপোষকামিতার ছয়লাব বহিয়া যাইতেছে, তখন তাহার সেই দৃঢ় চেতা ব্যক্তিত্বের নজির নওযোয়ানদের জীবনে নূতন আলোকের রাহা দেখাইতে পারে। সত্য দর্শন, আদর্শবাদিতা মানসিক দৃঢ়তা ও আপোষহীনতার এক বেমিছাল নজির তিনি কওমের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন।" [উপ-সম্পাদকীয় থেকে]

দৈনিক সংগ্রাম [৩। ১০। ৮৭ ইং]

"মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম আর ইহজগতে নেই। ১লা অক্টোবর বেলা ১২টা ২০ মিনিটের সময় মগবাজারস্থ একটি ক্লিনিকে তিনি ইনতেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের

বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সহ জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও বহু লোক তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর লাশ দেখার জন্যে ক্লিনিকে ও পরে তাঁর বাসভবনে ছুটে যান। পরদিন শুক্রবার বায়তুল মোকাররমে বাদ জুমা তাঁর নামায-এ-জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার লোক তাঁর নামাযে জানাযায় শরীক হন।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের এক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, দার্শনিক, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। একাধারে তিনি ছিলেন রাজনীতিক, আলেমে দ্বীন, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, সুবক্তা, দার্শনিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও গবেষক। অন্যদিকে অনুবাদ সাহিত্যের তিনি ছিলেন এক সফল দিকপাল। চল্লিশের দশকে একদিকে যেখানে বাংলা ভাষায় ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবধারা সম্বলিত কোনো বই-পুস্তক ছিল না, তেমনি অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কেও ওলামা ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছিল অনেকটা বিভ্রান্তিকর ধারণা। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কারণে ইসলামকে গতানুগতিক অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্ম বলে ধারণা করা হতো। নির্ধারিত কিছু ইবাদত, আচার-অনুষ্ঠান এবং মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকাতেই এর কর্মকাণ্ড ছিল সীমিত। সমাজ জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের আইন-কানুন, নিয়মবিধিও ইসলামী আইন-কানুনই হতে হবে, যা করা না হলে কোরআন-সুন্নাহ্‌র দাবী পূরণ হবে না,—এমন ধারণা ছিল না বললেই চলে। যদ্দরুন একশ্রেণীর আলেমসহ মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের দাবীর কথা শুনলেই বলতেন, ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে এর পবিত্রতা নষ্ট করা ঠিক নয়। তাদের অনেকেই এজন্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সপক্ষে কথা বলতেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা পাল্টাতে থাকে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত ইসলামী বই পুস্তক পড়ে। এই উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ)-এর উচ্চাঙ্গের ভাবধারা বিশিষ্ট

উর্দু বই-সমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক মহান খেদমতের সূচনা করেন। অতঃপর সময় এবং প্রেক্ষাপটের আলোকে তিনি তাঁর নিজস্ব অনেক উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করেন। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের এবং সেসব ক্ষেত্রের আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব সম্বলিত ৬০ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর লেখা বহু পাণ্ডুলিপি স্তুপ হয়ে পড়ে আছে। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে, মহাসত্যের সন্ধানে। গ্রন্থটিতে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, বিবর্তন ও সৃষ্টিতত্ব এসব গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মওলানা মওদূদীর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কোরআনসহ অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ বইয়ের অনুবাদ করে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলী এবং বিশাল অনুবাদ সাহিত্য এদেশের জনগণের উজ্জ্বল অবদান হিসেবে অম্লান হয়ে থাকবে।

পাকিস্তান আমলে তিনি ১৩ বছর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ আমলে তিনি গবেষণা ও লেখালেখির পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আই ডি এল-এর সংসদ নেতা ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সক্রিয়।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইন্তেকালে দেশ ইসলামের এক মহান খাদেমকে হারালো এবং এক বিরাট ব্যক্তিত্ব থেকে জাতি হলো বঞ্চিত। তাঁর এ তিরোধানে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী আন্দোলনে তাঁর বিরাট অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে মওলানা আবদুর রহীমের নাম চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা

করি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা জানাই আন্তরিক সমবেদনা। আল্লাহ তাঁদের ধৈর্য ধারণের তওফীক দিন।

দৈনিক ইনকেলাব [৩।১০।৮৭]

"দেশের একজন প্রখ্যাত আলেম বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও সুসাহিত্যিক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহীম গত বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মওলানা আব্দুর রহীম দেশবাসীর কাছে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। দেশে ইসলামী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তিনি কর্মবহুল জীবনে বহু ঘাত ও প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষরফা করেননি বা নতি স্বীকার করেননি। তিনি নীতিতে ছিলেন অনড়-অটল।

মওলানা আবদুর রহীম পিরোজপুর জেলার বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামিয়া-এ ইসলমিয়া থেকে আলিম পরীক্ষা সম্মানের সাথে পাস করেন। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পবিত্র কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় থেকেই তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। অতঃপর মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর সাথে পরিচয় হলে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর তিনিই ছিলেন প্রথম আমীর।

স্বাধীনতা উত্তর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) গঠিত হলে তিনিই দলীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আইডিএল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে আইডিএল-এর নাম পরিবর্তন করে ইসলামী

ঐক্য আন্দোলন রাখা হয় এবং মাওলানা আবদুর রহীমকেই দলীয় প্রধান নির্বাচন করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি দেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ইসলামী দর্শন ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। বাংলাদেশ থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ্ একাডেমীর তিনি ছিলেন একমাত্র সদস্য। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের ২টি গবেষণা প্রকল্পের সদস্য হিসেবেও তিনি কর্মরত ছিলেন।

এছাড়াও তিনি ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ খানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এসব গ্রন্থের মধ্যে বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টি তত্ত্ব, মহাসত্যের সন্ধানে, ইসলামের অর্থনীতি, তাওহীদের তত্ত্ব কথা প্রভৃতি গ্রন্থ সুধী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় অর্ধশতাধিক। জীবদ্দশায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি এরূপ অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও তাঁর অনেক রয়েছে। এসব গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। মাওলানা আবদুর রহীমের মৃত্যুতে যে বিরাট ক্ষতি হল, তা পূরণ হবার নয়। আমরা মাওলানা আবদুর রহীমের পবিত্র রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

দৈনিক দেশ [৩। ১০। ৮৭]

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের চেয়ারম্যান এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর সদস্য, বহু ইসলামী গ্রন্থের প্রণেতা ও সফল অনুবাদক মওলানা আবদুর রহীম আর আমাদের মাঝে নেই।

মৃত্যু অমোঘ আর ৬৯ বছর বয়সে কারো মৃত্যুর ঘটনাকে আমরা স্বাভাবিকই বলবো। কিন্তু তবুও এই বয়সে সুগঠিত দেহ-সৌষ্ঠব, প্রখর বাক চাতুর্য, নিরলস লেখনীধারা এবং রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে তিনি যেভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাতে তাঁর কাছ থেকে জাতি আরো কিছু প্রত্যাশা করেছিলো।

সে হিসাবে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন, ইসলামী আন্দোলন এবং চিন্তার জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি করলো তা অপূরণীয়। আর সেজন্যে তাঁর মৃত্যুও আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাবহ।

জাতির জন্যে মওলানা আবদুর রহীমের সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে—ইসলামী সাহিত্য রচনা ও অনুবাদকর্ম। ইসলামী জীবন দর্শনের ওপর বাংলা ভাষায় তিনি ৬০টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০-এর ওপরে। এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত বহু পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ হচ্ছে বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ব' মহাসত্যের সন্ধানে' 'ইসলামের অর্থনীতি' এবং 'তাওহীদের তত্বকথা'। মওলানা মওদূদীর 'তাফহীমুল কোরআন'ও তিনি সম্পূর্ন অনুবাদ করেন। এক কথায় ইসলামী বই পুস্তক রচনা ও অনুবাদে এদেশে তাঁর তুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই। শুধু পুস্তক রচনা এবং তাত্বিক আলোচনা করেই তিনি কতব্য শেষ করেননি বরং এদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্য আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার কারারুদ্ধ হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আন্দোলনের সাথে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। মওলানা সাহেব ছিলেন এক অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ। তাঁর মুখনিঃসৃত ঘারাবা ধর্মীয় আলোচনা শ্রোতা-দের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। তাঁর অমায়িক ও মধুর ব্যবহারও সকলকে মুগ্ধ করতো। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের হাসপাতাল ও বাসভবনে গমন এবং বিপুল জনতার জানাজার অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি তাহাদের গভীর ভালোবাসার পরিচয় ফুটে উঠেছ। আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও গুণগ্রাহীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে পরম করুণা-ময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।"

দৈনিক দিনকাল [৩। ১০। ৮৭]

"একে একে ছায়া বিস্তারকারী বনবৃক্ষগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অতি সাম্প্রতিককালে আমরা ক্রমশঃ জাতীয় মণীষী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বদের হারাচ্ছি। মাত্র স্বল্পদিনের ব্যবধানে আমরা হারালাম হাফেজ্জী হুজুরকে, মওলানা তর্ক-বাগীশকে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং মনসুর উদ্দীনকে। হৃদয়-জোড়া শোকের ক্ষত না শুকাতেই ইসলামী সাহিত্যের দিকপাল প্রাজ্ঞ আলেম

মণীষী মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহে ...... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তাঁর এ মৃত্যু পরিণত বয়সের মৃত্যু হলেও জাতি তাঁর মত একজন গবেষক-চিন্তাবিদ লেখকের কাছ থেকে আরও অনেক সৃজনশীল প্রাপ্তির আশা করে ছিল। কিন্তু মৃত্যুর আকস্মিক থাবা আমাদের সে প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ কেড়ে নিল।

তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মাত্র দু'দিন আগে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। তিনি অর্শ রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রয়াস, আত্মীয়-ভক্তদের সকরুণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে তিনি আল্লাহর ডাকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষক-লেখক মনীষীকে হারালো।

মওলানা রহীম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর জীবন ছিল শিশুর সারল্যের দ্যুতিতে উজ্জ্বল এবং একজন যথার্থ মোমেনের হিমালয় সদৃশ চারিত্রিক দৃঢ়তায় ভাস্বর। যে কয়জন গণমুখী ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি, তিনি ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য প্রাণপুরুষ। অনেকেই মাওলানাকে একজন ইসলামী রাজনৈতিক হিসেবে জানেন। কিন্তু তাঁর সৃজনশীল মৌলিক সাহিত্যকর্মের বিশালত্বের সাথে যাদের পরিচয় ঘটবে, তারা শুধু বিস্মিতই হবেন না। মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। একটি জীবনে ৬০ খানা মৌলিক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব এদেশে কেন বিদেশেও দেখা যায় না। ইসলামী জ্ঞানের বিদগ্ধ উপস্থাপনায় তিনি যে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

রাজনৈতিক সংগঠক ও নেতা হিসেবে তিনি কতটা সফল হয়েছেন, সে বিচার আমরা করবো না। তবে রাজনীতি ও লেখনীকে তিনি মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তিনি তাঁর মিশন মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন। এ দেশে তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনেরও অন্যতম স্থপতি। বাংলাদেশ পূর্বকালে তিনিই ছিলেন একটি ইসলামী দলের প্রাণপুরুষ। তবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ঐ দলটির ভূমিকা নিয়ে তিনি আলাদা মত পোষণ করে নিজ গঠিত দলটিকে পুনরুজ্জীবিত

না করে ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সার্বিকভাবে মানুষের মুক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন এদেশে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য ইসলামকেই আদর্শ হিসেবে নিতে হবে এবং আন্দোলনের নীতি-কৌশল গ্রহণে এ দেশের মাটি ও মানুষের গন্ধ থাকতে হবে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশকে রাজনৈতিক সমীকরণের অনিবার্য ফল বলে মনে করতেন।

ক্ষমতাসীনদের বখরা ভোগ করা, রাজনৈতিক চাঁদা কিংবা নজর-নেয়াজের উপর নির্ভর করে জীবন বাঁচানোকে তিনি ঘৃণা করতেন। ঘৃণা করতেন আন্দোলনের জন্য বাইরের অর্থ গ্রহণকে। জীবিকার জন্য তিনি ওই লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, অতিথিবৎসল, উদার, প্রগতিশীল, গোঁড়ামী মুক্ত, প্রচারবিমুখ, অসাম্প্রদায়িক একজন জীবনবাদী মানুষ। জাতি তাঁর মত একজন মণীষীর অভাব দীর্ঘদিন অনুভব করবে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।"

সাপ্তাহিক অগ্রপথিক [৮। ১০। ৮৭]

"অক্টোবরের পহেলা তারিখে (৮৭ইং) আমাদের মাঝ থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন বাংলাদেশের এ যুগের ইসলামী মণীষার উজ্জ্বলতর নক্ষত্র মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মাত্র তিন দিন রোগভোগের পর তাঁর আকস্মিক মৃত্যুবরণ কারো কারো মনে এ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা হয়েছিল কিনা। মুসলিম-বাংলার বহু নেতৃস্থানীয় মণীষী ব্যক্তিত্ব চিকিৎসার চক্রান্তের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই কারণে অকারণে অনেক মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয়া। কিন্তু আমাদের এই বলেই সান্ত্বনা পেতে হবে যে, কার, কোথায়, কিভাবে মৃত্যু হবে—তা পূর্ব নির্ধারিত। যাঁকে আমরা হারিয়েছি তাঁকে যে কিছুতেই আর ফিরে পাচ্ছি না, এটাই নির্মম সত্য।

কারো জন্মগ্রহণের পর মৃত্যুর মত তার জন্য অবধারিত ও অনিবার্য সত্য আর কিছুই হতে পারে না। ১৯১৮ সালের দোসরা মার্চে জন্ম-

গ্রহণের সুবাদে মওলানা আবদুর রহীমের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল সাড়ে উনসত্তর বৎসর। আমাদের দেশের হিসাবে এ মৃত্যুকে কোনক্রমেই অকালমৃত্যু বলা যাবে না। তবুও মনে হয়—জাতির আজকের এ ক্রান্তিকালে তাঁর মতো ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল।

মওলানা আবদুর রহীম ছিলেন মূলত একজন আলেম। কিন্তু দেশের অধিকাংশ আলেমের চেয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল সুস্পষ্ট। মাদ্রাসার ছাত্রজীবন কালেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী' চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সৃষ্ট জামায়াতে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আল্লামা মওদূদীর রচনাবলী ও চিন্তাধারার প্রসারে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। প্রথম দিকে তিনি মূলত মওদুদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে তাঁর রচনাবলীতে মৌলিক চিন্তার আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়। মওলানা আবদুর রহীমের মত একজন মৌলিক ইসলামী চিন্তাবিদের জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক। জীবনের একটি পর্যায়ে তিনি পূর্বকথিত সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগ করেন।

মরহুম মওলানা আবদুর রহীম ইসলামকে একটি বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসাবে বিশ্বাস করতেন বলেই ইসলাম অনুসরণের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনও অপরিহার্য মনে করতেন এবং এই বিচারে তিনি সমগ্র কর্মজীবনে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যদিও তাঁর রাজনীতির ধারা গতানুগতিক রাজনীতি থেকে ছিল পৃথক। রাজনীতির সঙ্গে আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট থাকলেও তিনি মূলত ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক এবং সে হিসাবেই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। তরজমা ও মূল রচনা মিলে তিনি শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, যার কিছু কিছু অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী ছাড়াও আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, সৈয়দ কুতুব, মোহাম্মদ কুতুব প্রমুখের বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষাকে ইসলামী বিষয়াদিতে সমৃদ্ধ করার

ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের সেবায় অনুবাদকর্মে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্যে দুই বৎসর পূর্বে তাঁকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'ইসলামের আর্থিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ', বিংশ 'শতাব্দীর জাহিলিয়াত' প্রভৃতি গ্রন্থ সুধী-মহলে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়াও তিনি আমৃত্যু ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের একাধিক গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক ও উপমহাদেশীয় পরিমণ্ডলে মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থান এবং অমুসলিম শক্তিসমূহের মুসলিমবিরোধী চক্রান্ত সম্বন্ধে মরহুমের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যাশ্চর্যভাবে স্বচ্ছ। তাই দুই পরাশক্তি এবং উপমহাদেশীয় আধিপত্য-বাদী শক্তির মুসলিমবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে মরহুমের কণ্ঠ ছিলো আপোষ-হীনভাবে চির সোচ্চার। সত্য উচ্চারণে এমন নির্ভীক, ইসলামের সেবায় এমন নিরলস সাধক ও মর্দে মুজাহিদ মনীষীর ইন্তিকালে আমরা মর্মাহত, শোক ভিভূত। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি। মরহুমের মৃত্যুতে বাংলাদেশে ইসলামী মনীষার ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো — আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা পূরণ করতে আমাদের তৌফিক দিন।"

সাপ্তাহিক জেহাদ [৯। ১০। ৮৮]

"ভূ-ভাগে মানব বসতির পরই পরমকরুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে এক শ্রেণীর মানব-আত্মা পাঠিয়েছেন, যারা স্বীয় স্বার্থের তুলনায় বড় করে দেখেছেন মানব জাতির স্বার্থ, ধর্ম তথা আদর্শের স্বার্থ। এক সময় এ দায়িত্বটা একান্ত নবী-রসূলদের উপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকলেও শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্তর্ধানের পর নবী-রসূলের আগমনীধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই রসূলুল্লাহ্র বিদায়ের পরও করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে রসূলের আদর্শে টিকে থাকার জন্যে, বিপদগামী হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া কিংবা পথহারাদের নতুন করে রসূলের প্রদর্শিত আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায়েই তিনি যুগে যুগে অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের পাঠিয়েছেন ধরণীর বুকে। এরা এসেছেন যুগে যুগে দেশে দেশে। দায়িত্ব শেষ করে তাঁরাও আবার ফিরে যান খোদার দরবারে—স্বীয় কর্ম ফলকে পুঁজি করে। কেউবা

এখনো অর্পিত খোদায়ী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন পৃথিবীর বুকে। ঠিক এমনিই খোদার পথে নিবেদিত এক প্রাণ মওলানা আবদুর রহীম আমাদের ছেড়ে প্রভুর আহবানে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে। এ দেশ-বাসীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেছেন আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অসাধারণ কীর্তি যা উপমহাদেশে তথা গোটা বিশ্বের তৌহিদী জনতাকে অনুপ্রেরণা দেবে খোদার পথে ন্যায়ের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে চলার হিম্মত জোগাবে।

জাতির দুর্দিনে যারা ইসলামের ঝাণ্ডাকে হাতে নিয়ে দেশবাসীকে পথের দিশা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা আবদুর রহীম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কায়েমের সংগ্রামে নেতৃত্বের মাঝেই তাঁর কর্মকাণ্ডকে ব্যাপ্তিত না রেখে তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন লেখনী—ইসলামকে একটি কালজয়ী আদর্শরূপে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার মানসে। সে ক্ষেত্রে তিনি সফলতারও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর অর্ধ শতাধিক মূল্যবান পুস্তক উপমহাদেশের তথা গোটা মুসলিম বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে আলোর দিশারী হয়ে আছে। বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমেও তিনি বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করে গেছেন। তাঁরই অনুবাদিত তাফহীমুল কোরআন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজকে সরাসরি খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান লাভের সুযোগ জুগিয়েছে। এছাড়া তাঁরই অনূদিত কালজয়ী লেখকদের অর্ধশতাধিক পুস্তক আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার ইসলামপ্রয়াসীদের বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। পরন্তু তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে তাঁর লেখা অসংখ্য মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

কেবল একজন বলিষ্ঠ রাজনীতিক কিংবা একমহান আদর্শের ধারক লেখক হিসেবেই নয়, একজন দার্শনিক, একজন অর্থনীতিবিদ, একজন চিন্তাবিদ হিসেবেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সব কাজই ছিল আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত। স্বীয় জীবনের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, জৌলুস কিংবা নাম-কামের জন্যে তিনি উদগ্রীব ছিলেন না, তাঁর সব কর্মই ছিল আল্লাহ্‌র জন্যে। আর সেই কথাটাই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন চির বিদায়ের মাত্র এক-দেড় ঘণ্টা আগেও। তিনি আফসোস করেছিলেন, তফসীরের যে পাণ্ডুলিপিটায়

হাত দিয়েছেন, সেটা সমাপনের সময় তিনি পাবেন কিনা ? সময় তিনি আর পাননি। হাসপাতাল ছেড়ে যখন বাড়ী ফেরেন তখন আর তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন না, ছিল তাঁর প্রাণহীন দেহ।

ক্ষণজন্মা এ মনীষী আর ফিরে আসবেন না কোনদিনই। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের হৃদয় কন্দরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর অবদানের স্বাক্ষর বয়ে চলবে তাঁর লেখা গ্রন্থরাজি। তাঁর কর্মধারাই হবে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মীদের কর্মপ্রেরণার উৎস।

তাই এদেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর একদিকে যেমন তাঁর লিখিত পুস্তকগুলো প্রকাশের নৈতিক দায়িত্ব এসে বর্তায়, অপর দিকে তেমনি মওলানা রহীম সারাটি জীবন ধরে এদেশের বুকে ইসলাম কায়েমের যে স্বপ্ন বুকে ধারণ করে এসে ছিলেন, সে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সব বিবেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ারও তাগিদ যোগায়। সে তাগিদে সাড়া দিতে পারলেই ইনশাল্লাহ আমরা সফলকাম হবো এ মানুষটির স্বপ্নকে বাস্তবায়নে।"

সাপ্তাহিক আরাফাত [৫। ১০। ৮৭]

বাংলাদেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আচম্বিৎ খসিয়া পড়িল। বিগত ১লা অক্টোবর '৮৭ দেশের প্রখ্যাত আলিম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ, গবেষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা মর্দে মুজাহিদ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ৬৯ বৎসর বয়সে মহান আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়ে দিয়া এই নশ্বর জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহি...... রাজেউন)

সাবেক বরিশাল এবং বর্তমান ফিরোজপুর জিলার অধিবাসী মওলানা আবদুর রহীম কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা হইতে কৃতিত্বের সহিত কামিল (টাইটেল) পাশ করিয়া উক্ত মাদ্‌রাসায় বিশিষ্ট উস্তাদদের তত্ত্বাবধানে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তেজনাকর মুহূর্তে ইসলামী বিধিবিধান পাকিস্তানে কি ভাবে কার্যকররূপ দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে

উর্দ্ বই-সমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক মহান খেদমতের সূচনা করেন। অতঃপর সময় এবং প্রেক্ষাপটের আলোকে তিনি তাঁর নিজস্ব অনেক উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করেন। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের এবং সেসব ক্ষেত্রের আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব সম্বলিত ৬০ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর লেখা বহু পাণ্ডুলিপি স্তুপ হয়ে পড়ে আছে। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে, মহাসত্যের সন্ধানে। গ্রন্থটিতে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, বিবর্তন ও সৃষ্টিতত্ত্ব এসব গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মওলানা মওদূদীর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কোরআনসহ অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ বইয়ের অনুবাদ করে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলী এবং বিশাল অনুবাদ সাহিত্য এদেশের জনগণের উজ্জ্বল অবদান হিসেবে অম্লান হয়ে থাকবে।

পাকিস্তান আমলে তিনি ১৩ বছর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ আমলে তিনি গবেষণা ও লেখালেখির পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আই ডি এল-এর সংসদ নেতা ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সক্রিয়।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইন্তেকালে দেশ ইসলামের এক মহান খাদেমকে হারালো এবং এক বিরাট ব্যক্তিত্ব থেকে জাতি হলো বঞ্চিত। তাঁর এ তিরোধানে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী আন্দোলনে তাঁর বিরাট অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে মওলানা আবদুর রহীমের নাম চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা

ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী চালনার সুযোগ ও অবসর করিয়া লইতেন। ইসলামী গ্রন্থরাজির লেখকদের মধ্যে গ্রন্থ সংখ্যার দিক দিয়া তাঁহার নামই শীর্ষে অবস্থান করিবে। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে ৩৬টি বইয়ের তালিকা এই লেখকের সম্মুখে মওজুদ রহিয়াছে— তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অনুবাদ : হাদীস শরীফ, ১ম ও ৩য় খণ্ড, ইসলামে যাকাত বিধান, ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, ইসলাম পরিচিতি এবং ইসলাম, ঈমান, জিহাদ, নামায, রোযা প্রভৃতির হাকীকত সিরিজ।

মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে— ইমাম ইবনে তাই মিয়া, ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামের অর্থনীতি, খেলাফতে রাশেদা, আজকের চিন্তাধারা, মহা সত্যের সন্ধানে, হাদীস সঙ্কলনের ইতিহাস, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ব, আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের ভিত্তি, পরিবার ও পারিবারিক জীবন এবং সুন্নত ও বিদআত। এই সব মৌলিক গ্রন্থে তাঁহার জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা এবং বিপুল অধ্যয়ন, গবেষণা ও উচ্চ চিন্তাধারার স্বাক্ষর বিধৃত।

তাঁহার বহু গ্রন্থে একদিকে যেমন আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তেমনি উহা পাঠক মনের রুদ্ধ দুয়ারে তকলীদের অর্গল ভাঙ্গিয়া স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা জাগ্রত করিয়া দেয়। মওলানা আবদুর রহীম তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ করিয়া "সুন্নত ও বিদয়াত" গ্রন্থটির মাধ্যমে অত্যন্ত সাহসদৃপ্ত মনে ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে মর্দে মুজাহিদের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অন্যসব ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ও শ্রম অপেক্ষা এই সবিশেষ খেদমতের জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

আল্লাহ্ তাঁহাকে 'জাযায়ে খাইর' প্রদান করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন! আমরা তাঁহার ইন্তিকালে অত্যন্ত মর্মাহত। আমরা মরহুমের স্ত্রীপুত্রকন্যা ও অন্যান্য আপন জনকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। পাঠকবর্গের খেদমতে জানাই তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দোওয়ার আবেদন।

আমাদের শেষ কথা মরহুম মওলানা মুহাম্ম আবদুর রহীম হয়ত অনন্ত সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেননা কিন্তু প্রতিভার সহিত সাধনার এবং সততার সহিত আদর্শ নিষ্ঠার সংমিশ্রণে একটা জীবন কতটা উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ হইতে পারে তাহার অনন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মরহুম মওলানা আবদুর রহীম। আজিকার দিনে অনেকের জন্যই তিনি প্রেরণার উৎস রূপে বিবেচিত হইতে পারেন। আমরা এমন একটি উজ্জ্বল ও মহৎ চরিত্রের জীবনালেখ্য শিঘ্র তাঁহার উত্তর সুরীদের নিকট পাওয়ার আশা রাখি।"

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা [৯। ১০। ৮৭]

"উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। শুধু এখানেই নয়, ইসলামী বিশ্বেও তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। একদিকে তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধানে বিশ্বাসী একজন আলেম, অপরদিকে ছিলেন এই জীবন বিধান স্বদেশে ও সারা বিশ্বে বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার এক নিরলস যোদ্ধা। এ জন্যে তিনি বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (র:) সান্নিধ্য গ্রহণ করিয়া একই কাতারে শামিল হন এবং কর্মময় জীবনের বিরাট একটি অংশ এই কাজের নেতৃত্ব দানে ব্যয় করেন। ইসলামী আন্দোলনের শুরু হইতেই তিনি একটি জিনিস ভালোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই বস্তুটি হইল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও চর্চা। এই কাজ করিতে গিয়া তিনি আরও একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মাতৃভাষা বাংলায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তকের স্বল্পতা এবং অভাব তাঁহার জ্ঞানপিপাসু মনকে পীড়া দিয়াছিল। এই মানসিক পীড়ার দহনে তিনি কর্ম জীবনের প্রথম হইতে ইসলামী সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র:)-এর সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলিয়া নেন। এই কাজে তাঁহার কৃতিত্ব ও গৌরব অনন্য। তিনি শুধু অনুবাদ সাহিত্যই রচনা করেননি, তাঁহার মৌলিক সাহিত্য কর্মও বিপুল। এই মৌলিক সাহিত্যও ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকসুলভ বিশ্লেষণ সম্বলিত পুস্ত-

কাদি মনকে নাড়া না দিয়া পারে না। জ্ঞানের সমুদ্র মওলানা আব্দুর রহীমের এই সকল গ্রন্থ আমাদের এই প্রাণপ্রিয় ভূখণ্ডের শিক্ষিত সমাজকে যেমন চিরকালের জন্য সত্য পথের নির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে, তেমনি তাঁহার লিখনী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বুকে ধারণ করিয়া অনাগত কালের দিকে অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে।

মওলানা আব্দুর রহীম আরও একটি অনন্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। বর্তমান যুগের সবচাইতে আলোচিত বিষয় মার্কসিজম, কম্যুনিজম, সোশ্যালিজম, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ইসলামের রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়াদি ছিল তাঁহার নখদর্পণে। তিনি এই সকল বিষয়ে কোন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা এবং প্রশিক্ষণ শিবিরে যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী নির্দ্বিধায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, মওলানা মরহুমের মত দার্শনিক বাংলা ভূখণ্ডে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষিত মানুষকে আকর্ষণ করিবার মত যাদুকরী শক্তি তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পাইত। এই সকল জটিল বিষয়বস্তু যখন তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রকাশ করিতেন তখন এক মোহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইত। তাঁহার কর্মময় জীবনের বিশেষ করিয়া ৬০-এর দশকে যাহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মরহুম মওলানার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা হইতে সমূহ উপকৃত হইয়াছেন। মওলানা মরহুম ৬৯ বৎসর বয়সে দুনিয়ার সকল মায়া কাটাইয়া আল্লাহর সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। "প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে"—এই প্রেক্ষিতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয় মওলানা মরহুম যেন একটু আগেই চলিয়া গেলেন। তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন। এক হিসাবে জানা যায়, তিনি ৬০টির মত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। ৬০টির মত মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার বহু পাণ্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এত কিছুর পরও আমাদের মনে হয়, তিনি যদি আমাদের মধ্যে আরও কিছু দিন থাকিতেন, তাহা হইলে সমাজকে আরও অনেক কিছুই দিতে পারিতেন। আমাদের এই আকুতির কারণ হইল, মওলানার ইন্তেকালে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবার নহে। বর্তমানে মও-

লানা মরহুমের সমকক্ষ আর কেহ নাই। বলিতে গেলে তিনি আমাদের সমাজে এক—অদ্বিতীয় প্রতিভা ছিলেন। মওলানা মরহুমের ইন্তিকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। শোক বিহ্বল চিত্তে আমরা রহমানুর রাহিমের দরবারে আকুলভাবে মুনাজাত করি, হে আল্লাহ! তুমি মওলানা আবদুর রহীমকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করাও। তিনি ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে যতটুকুন দিয়াছেন তাহার কারণেই জান্নাতের উচ্চতর মর্যাদায় তাঁহাকে আসীন কর। সেই সঙ্গে তাঁহার শোকাতুর পরিবার, পরিজন এবং ভক্ত অনুরক্তদেরকে এই শোক কাটাইয়া উঠিবার শক্তিদান কর। আমীন!"

মাসিক মদীনা [অক্টোবর-৮৭ ইং]

একটি নক্ষত্রের পতন : সমকালীন ইসলামী বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব জনাব মওলানা আবদুর রহীম ১লা অক্টোঃ দ্বিপ্রহরে ইন্তেকাল করেছেন। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বিগত প্রায় অর্ধ শতাধিককাল ধরে এদেশের ইসলামী চিন্তা চেতনায় একজন নেতৃপুরুষ রূপে বিরাজিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত ও অনূদিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা শতাধিক। এ বিরাট কর্মী পুরুষের মহা প্রয়াণ নিঃসন্দেহে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করবে।

মুহাম্মদ আবদুর রহীমের বিপুলায়তন কর্মজীবনের যথার্থ মূল্যায়ন করার সময় এখনও আসেনি। যারা তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে পারেননি, তাঁরাও একথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, মওলানা আবদুর রহীম সমকালীন ইসলামী মণীষার জগতে এক দীপ্তিমান নক্ষত্র রূপে বিরাজিত ছিলেন এবং দেশে বিদেশে তাঁর এ অনন্য মর্যাদা বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমাদের অন্তরনিঃসৃত দোয়া' মরহুমকে আল্লাহ্ পাক উচ্চ মর্তবা এবং সাধনা জীবনের পূর্ণ প্রতিফল দান করুন।"

নেতৃবৃন্দের শোক : আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান ও সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, তাঁর ইন্তেকালে দেশ একজন জ্ঞান-গবেষক, অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক এবং প্রবীণ রাজনীতিককে হারালো। ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ এবং রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, তার জন্য তিনি এদেশের জনগণের কাছে পরম শ্রদ্ধার আসনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর ইন্তেকালে ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা সহজে পূরণ হবার নয়।

তাঁরা বলেন, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম কেবলমাত্র একজন আলেম-এ-দ্বীন-ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তিনি সারা জীবন ইসলামের যে খেদমত করে গেছেন, আল্লাহ্ পাক তা কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরি-জনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ফ্রীডম পার্টি : কর্ণেল রশিদ

ফ্রীডম পার্টির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কো-চেয়ারম্যান কর্ণেল (অবঃ) আবদুর রশিদ এক শোক বাণীতে বলেন, "মওলানা আবদুর রহীমের আকস্মিক ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। মৌলিক চিন্তাবিদ, আলেম, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত, সুলেখক, রাজনীতিবিদ নানাবিধ গুণের সমাবেশে অনন্য এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের অকাল মৃত্যুতে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাপ্তি অনেকেই এখন অনুধাবন না করলেও ক্রমান্বয়ে তা অনুভূত হবে।

তিনি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে তাঁর বিয়োগ ব্যথা সহ্য করার মত ধৈর্য, শক্তি ও সাহস প্রদান করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন।

মওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

বিশিষ্ট বক্তা মওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী এক শোক বার্তায় বলেন, "মওলানা আবদুর রহীম নিজেই একটি ইতিহাস ও ইনষ্টিটিউট। তিনি একাধারে চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁকে হারিয়ে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হল তা সহজে পূরণ হবার নয়।"

"মওলানা সাঈদী বলেন,' এ ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দায়ী 'বা আহবায়ক ছিলেন মওলানা আবদুর রহীম।"

মওলানা আজিজুল হক ও চরমোনাইর পীর সাহেব

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সংস্থার মুখপাত্র মওলানা আজিজুল হক ও সাদারাত সদস্য চরমোনাইর পীর মওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম তাঁদের শোকবার্তায় বলেন, "মওলানা আবদুর রহীমের ইন্তেকালে জাতি ইসলামী আন্দোলনের শুধু একজন বীর মুজাহিদকেই হারালোনা একজন ইসলামী দার্শনিককেও হারালো।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক জরুরী সভা এ উপলক্ষে মওলানা ইসহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মওলানা আবদুর রহীমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান হয়।

ইসলামী ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম এবং সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আমিনুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তা-বিদ মওলানা আবদুর রহীমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, "তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন বিশিষ্ট আলেম, চিন্তাবিদ ও শিক্ষককে হারালো। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে ইসলামী আন্দোলন ও লিখনীর মাধ্যমে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" তাঁরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

খেলাফত আন্দোলন ও অন্যান্য সংগঠন

খেলাফত আন্দোলনের প্রধান কারী আহমদুল্লাহ আশরাফ ও মওলানা জাফরুল্লাহ, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের আহ্বায়ক মওলানা আবদুল মতিন, সীরাত মিশনের আহ্বায়ক মওলানা শাহ আবদুল সাত্তার ও অধ্যাপক আবদুল ওয়াহিদ, ইসলামী জনকল্যাণ-সংস্থার সভাপতি মওলানা বুরহান উদ্দীন ও সেক্রেটারী জনাব আবদুল আহাদ, ইসলামী দাওয়াত সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মঈনুল ইসলাম ও সেক্রেটারী জনাব আইনুল ইসলাম, আল্লামা ইকবাল সংসদের সভাপতি মওলানা আবদুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাফর আহমদ ভূঁইয়া, লেখক সমাজ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক

জনাব রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, নেজাম পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল মতিন— মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইনতেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের আকস্মিক ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতি দেন। এ ছাড়া তিনি এক বক্তৃতায় বলেন, মওলানা আবদুর রহীম ছিলেন দ্বীনের মহান খাদেম। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন। লেখক, গবেষক, দার্শনিক মওলানা আবদুর রহীম অমর হয়ে থাকবেন।"

আল-ফালাহ মিলনায়তনে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে বক্তৃতাদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "মওলানা আব্দুর রহীম ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখক ও একজন বড় আলেম। এসব ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব দেশে আমার চোখে পড়ে না।"

তিনি বলেন, "তাঁকে আমি পেয়েছি একজন সিরিয়াস সাধক হিসেবে। সব সময় তিনি নিয়োজিত থাকতেন লেখাপড়ার মাঝে। বইয়ের পাগল ছিলেন তিনি। বই যোগাড় করা আর পড়া এটাই ছিল তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁর তিরোধানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।"

অধ্যাপক আযম বলেন, "সংগঠক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে মওলানা আবদুর রহীম দুনিয়াতে নেই কিন্তু ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, দার্শনিক হিসেবে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন। অন্যেরা ভুলে গেলেও আমরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাঁর সাহিত্যকে কখনও ভুলবো না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাই তাঁর সাহিত্য বেশী কাজে লাগাবে।"

আব্বাস আলী খান

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, অনেক বেদাআত যা আমাদের সমাজে সওয়াবের কাজ হিসেবে চলে আসছে তার বিরুদ্ধে তিনি কোরআন হাদীসের আলোকে বলিষ্ঠভাবে লেখনী ধরেন। তাঁর মূল চিন্তাধারা ছিল মওলানা মওদূদী (র:)-এর চিন্তাধারা।" তিনি বলেন, "চিন্তা মতানৈক্য থাকা অস্বাভাবিক

নয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতপার্থক্য ছিলো। মওলানা আবদুর রহীমের সাথে আমাদের মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না।"

শামসুর রহমান

জামায়াতের নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান বলেন, "বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আমার ৩ বছরের কনিষ্ঠ কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়ে উস্তাদ। সংগঠন কিভাবে করতে হয়, সে ট্রেনিং তাঁর কাছেই পেয়েছি।" তিনি মরহুম মওলানার সাথে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি যদি আরো কিছুদিন হায়াত পেতেন, তাহলে হয়তো তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারতেন।"

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বলেন, "মওলানা আবদুর রহীমের প্রতিভা ছিল, মেধা ছিল। মওলানা মওদূদী (রঃ)-এর লেখনীর সংস্পর্শে এসে তাঁর লেখনী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মওলানা মরহুম যে এলমী খেদমত করে গেছেন, তার দ্বারা বাংলার মানুষ সব সময় উপকৃত হবে। ইসলামকে আধুনিক যুক্তি ভিত্তিকভাবে পেশ করার জন্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি যে গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন, বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি।"

মতিউর রহমান নিজামী

জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "তিনি তাঁর জীবনকে ইলমে দীনের কাজে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন মওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তা সোনায় সোহাগায় পরিণত হয়। মওলানা মওদূদীর গ্রন্থরাজির অনুবাদ তাঁকে মৌলিক গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।" মরহুম মওলানার স্মৃতিচারণ করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "ওলামায়ে কেরাম যদি মওলানা মরহুমের মত মওলানা মওদূদীর গ্রন্থরাজির প্রতি এগিয়ে আসেন তবে তাঁরাও বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। মওলানা মওদূদী (রহঃ) থেকে মওলানা আবদুর রহীমকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।"

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

জনাব মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ বলেন, "তিনি যেসব বই প্রণয়ন করেছেন, সেগুলোর আমাদের সমাজে খুবই অভাব ছিল। বাংলাভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি এক

অমূল্য সম্পদ। তিনি আধুনিক মতবাদের উপর সুপণ্ডিত, দার্শনিক ছিলেন। তাঁর রচিত 'মহাসত্যের সন্ধানে' বইটি এর প্রমাণ।"

মওলানা আব্দুস সোবহান

মওলানা আব্দুস সোবহান বলেন, "তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় যে দিকটি আমাকে আকর্ষণ করতো, তাহলো পড়া ও লেখা অব্যাহত রাখা। তিনি যে কোন অবস্থায় লিখতে পারতেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দ্বীনি খেদমতকে কবুল করুন।"

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, "ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ কথা আজ যতো লোক উপলব্ধি করেন এক বা দু যুগ আগে অবস্থা তেমন ছিল না। কারণ, তা বোঝার জন্যে তেমন কোন পুস্তক ছিল না। এক্ষেত্রে মরহুম মওলানা আবদুর রহীম বিরাট ভূমিকা পালন করে গেছেন।"

মীম ফজলুর রহমান

জনাব মীম ফজলুর রহমান বলেন, "রসূল (সাঃ)-এর হাদীসের আমল তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছি। তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। যে প্রতিভা আমরা হারালাম তা অপূরণীয়। ইসলামী হুকুমাত কায়েমের যে চেষ্টা তিনি করে গেছেন তা বাস্তবায়নে আমরা চেষ্টা করে যাবো।"

মওলানা আবদুল্লাহ

বিশিষ্ট আলেম মওলানা আবদুল্লাহ বলেন, "মরহুম মওলানা আবদুর রহীম যে কতবড় আলেম ছিলেন এর প্রমাণ হলো তাঁর লিখিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী।"

আবদুল কাদের মোল্লা

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, "আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি এমন জ্ঞান রাখতেন যাতে, যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে মত ব্যক্ত করতে পারতেন। বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয়ে এমন জ্ঞানের অধিকারী মানুষ খুব একটা দেখা যায় না।" আলোচনা সভার আগে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে কোরআনখানি করা হয়। সভা শেষে দোয়া করেন মওলানা আবদুর রহীমের এককালীন ঘনিষ্ট সহকর্মী অধ্যাপক গোলাম আযম।

বিদেশে মওলানা আবদুর রহীমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃৎ, দার্শনিক, চিন্তাবিদ মওলানা

আব্দুর রহীমের ইন্তেকালে গত ১০ই অক্টোবর রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী ছাত্রদের উদ্যোগে মওলানা আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে এক কোরআনখানি এবং শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করেন ডাক্তার শাহাদাৎ হোসেন খান ইসলামী ছাত্রশক্তির প্রাক্তন সভাপতি মো: শওকত হোসেন, জমিয়তে তালাবা এ-আরাবিয়ার প্রাক্তন নেতা এ, বি, এম সালেহউদ্দিন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ। মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন অধ্যয়নরত বাংলাদেশের কৃতি ছাত্র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

তেহরানে শোকসভা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইন্তে-কালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে বসবাসরত বাংলাদেশী লোকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এ উপলক্ষে ৮ই অক্টোবর তেহরান শহরের আমীর আতাবাকের বানেহ পড়কের ৪নং বাড়ীতে এক শোকসভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং কুরআন খতমসহ মরহুম মওলানার রুহের মাগফে-রাতের জন্যে দোয়া করা হয়। এ শোক সভা ও দোয়ার মাহফিলে প্রবাসী বাংলাদেশী লোকজন ছাড়াও ইরান, ইরাক, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার কয়েকজন মুসলিম অংশ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ শোকসভা ও দোয়ার মাহফিলে বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাবেক চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স জনাব মাহমুদ সা'দাত মাদারশাহী, জনাব মুহাম্মদ নূর হুসাইন, জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ও জনাব ফিরোজ মাহবুব কামাল মরহুম মওলানার দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী কালীন সংগ্রামী জীবন, তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশে ইস-লামের বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর অবদানের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ তাঁর ইন্তেকালকে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে আখ্যায়তি করেন।

———

খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহ্মদ

[জ: ১৯০৫ — মৃ: ১৯৮৭ খৃ: ১৮ই মে]

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে যে সব নিষ্ঠাবান খোদাভীরু পণ্ডিত আলেম ইসলামী শিক্ষা আদর্শের বিস্তার ও এর স্থায়িত্ব বিধানকল্পে কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন এবং অসংখ্য ওলামা তৈরি করে গেছেন, খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ ছিলেন সে সব মহান ব্যক্তিত্বেরই একজন। তাঁরা যেমন এক দিকে কোরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মশালকে প্রজ্জ্বলিত করা এবং ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন ও মূল্যবোধকে উপমহাদেশে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন, ইলমে-দ্বীনের সেবার সাথে সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ বাস্তবায়নকল্পে আপোষহীন সংগ্রামে ছিলেন লিপ্ত, খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ তাঁদের কাতারেরই একজন নিষ্ঠাবান শ্রেষ্ঠ আলেম ও সংগ্রামী নেতা ছিলেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু ঘটলেও তাঁর তিরোধানের মধ্য দিয়ে দেশের হাজার হাজার ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী জনতা ইলমেদ্বীন ও ইসলামী নেতৃত্বের জগতে এক বিরাট শূন্যতা উপলব্ধি করে আসছেন। তিনি ছিলেন এদেশে ওলামা-ঐক্যের সর্বশেষ মাধ্যম, যার যুক্তি-আহবানের প্রতি আলেম সমাজ ও দেশের ইসলামী জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। খতীবে আজম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যেমন ছিলেন কোরআন-সুন্নাহ্ এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানে সুপণ্ডিত, তেমনি ছিলেন আধ্যাত্মিক আকর্ষণযুক্ত এক অনলবর্ষী বক্তা, দার্শনিক, দেশ বিখ্যাত বাগ্মী, উপমহাদেশখ্যাত মোহাক্কেক ও সুপণ্ডিত আলেম। ইসলামিক অনুশাসনের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকারিতাকে তিনি এতই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যুক্তিতর্ক দিয়ে উপস্থাপনে সক্ষম ছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতার অংশ বিশেষ শোনার পর তা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো শ্রোতা স্থান ত্যাগ করতে পারতেননা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও লেখক মওলানা নূর মোহম্মদ আজমী লিখেন,—"৬৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে

অনুষ্ঠিত এক জনসভার পক্ষ থেকে তাঁকে খতীবে আযম উপাধি প্রদান
করা যায়।" তাঁর শিক্ষা জীবনে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা না থাকলেও তিনি
পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলাভাষায় লাখো জনতার সামনে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে উদ্বেলিত
করে তুলতেন। বাংলাদেশের গৌরব এ দার্শনিক আলেম উপমহাদেশস্থ তাঁর
বহু খ্যাতনামা পূর্বসূরীর মতো তিনিও ছিলেন শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দিস ও মুফাস্সির।
পূর্বসূরীদের মতোই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ৪৭-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে
স্বাধীনতা সংহত করণে ও দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে
রাজনীতিতে তিনি বিরাট অবদান রাখেন। মওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব
১৯০৫ সালে কক্সবাজার জেলার কেন্দ্রীয় উপজেলার অন্তর্গত বরইতলী গ্রামে
জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম শায়েখ ওয়াজিউল্লাহ। শৈশব ও
কৈশোর থেকে আধুনিক শিক্ষা লাভ করার পর তিনি স্থানীয় শাহারবিল আনওয়ারুল
উলুম মাদ্রাসায় প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম হাটহাজারী
মাদ্রাসায় মেশকাত জালালাইন জামাত সমাপ্ত করে দাওরা-এ-হাদীস পড়ার জন্যে
দারুল উলূম দেওবন্দ গিয়ে ভর্তি হন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষক
ছিলেন, মওলানা সাঈদ সাহেব, উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
দারুলউলূম দেওবন্দ থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সেখানকার
তাঁর উস্তাদগণ ছিলেন একেকজন বিশ্ববিখ্যাত। যেমন, মওলানা এজাজ
আলী, মওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বিলইয়াবী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, মওলানা
কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব, ছাহারানপুরের মওলানা আবদুল লতীফ, মওলানা
আবদুর রহমান কামেলপুরী, মওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ মণীষীবৃন্দ।

খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ ২৭ বছর মোহাদ্দিস হিসাবে
ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং সমাজকে সঠিক নেতৃত্বদানের উপযোগী আলেম
তৈরিতে অতিবাহিত করেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির
অধিকারী ছিলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ ছিলেন হাটহাজারীর অধিবাসী মুফতী
এ-আজম বাংলাদেশ মওলানা মুফতী ফয়েজুল্লাহ সাহেব।

খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত
থাকাবস্থায়ই এদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র
আন্দোলনের ডাক আসে। পাকিস্তানের এ অংশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের

সংগ্রামী নেতা জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেজাম ইসলাম পার্টি প্রধান মওলানা আতহার আলী সাহেবের আহবানে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। রাজনীতিতে আসার পর খতীবে আজমের নামটি অধিক খ্যাতির অধিকারী হলেও তিনি তাঁর হাদীস অধ্যাপনার যুগেও কম খ্যাতির অধিকারী ছিলেন না। তিনি একজন ইসলামী দার্শনিক বক্তা ও বাগ্মী হিসাবে পূর্বেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কারণ, খতীবে আজম তখন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন বেদআত শির্ক, কবরপূজা ও পীরপূজা ইত্যাদি কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ মুফতী এ-আযম ফয়েজুল্লাহ সাহেবের শুরু করা সংস্কার আন্দোলন খতীবে আজমের দ্বারাই জোরদার হয়ে উঠে। সুবিধাবাদী ও বেদআৎ-শির্কে লিপ্ত পীর-ফকীরদের দ্বারা ইসলামের মূল শিক্ষা-আদর্শ মুছে যাবার উপক্রম হলে, মুফতী এ-আজম এ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং তিনি তা বেশ সফলতার সাথে এগিয়ে নেন।

ইসলামী শিক্ষার নিরলস খেদমত এবং কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও খতীবে আজম আধুনিক সভ্যতা, জীবনবোধ ও আধুনিক জাহিলিয়াত থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী চ্যালেঞ্জের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় বিরাট অবদান রাখেন। দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছরের বৈদেশিক শাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জড়বাদী জীবন দর্শনের প্রভাবে এদেশের মুসলিম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

৪০/৫০-এর দশকে তা অনেক আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরই ঈমান-আকীদা হরণ করে নিচ্ছিল। এখন সেগুলোর জবাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকারী ইসলামী সাহিত্য, ওলামা, ও ইসলামী চিন্তাবিদের অভাব না থাকলেও সে সময় এর অভাব ছিল সারাদেশে প্রকট। মওলানা সিদ্দীক আহমদ ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা সে সব আধুনিক জিজ্ঞাসা-চ্যালেঞ্জের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। সে দিন তাঁর মতো যুক্তিবাদী আলেম না থাকলে আধুনিক জাহিলিয়াতের ভিত এদেশে আরও বহু মজবুত হতো। মওলানা সিদ্দীক আহমদের দ্বারা বহু পথহারা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল পুনঃরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসেনি, দেশের ওলামা-এ-কেরামও তাঁর আন্দোলনে নতুন ভাবে আত্মচেতনা ফিরে পান। কারণ খতীবে আজম যেসময় একজন দার্শনিক বক্তা এবং বেদআত,

শির্ক ইত্যাদি কুসংস্কারের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে, তখন সাধারণভাবে সারা দেশে বিশুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতাদাতা আলেমের সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মতো। দেশে তখনও দারুল উলুম দেওবন্দ সহ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন বড় বড় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভকারী বহু আলেমের অস্তিত্ব থাকলেও অনেকেই বাংলা চর্চা করতেন না। শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে আসার পর অনেককে বাংলাভাষায় স্বদেশীয় শ্রোতাদেরকে 'মোতারজেম' রেখে উর্দূতে বক্তৃতা শোনাতেও দেখা গেছে। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম ছিল উর্দূ। মওলানা সিদ্দীক আহমদ আরবী এবং উর্দূ ভাষার একজন সুপণ্ডিত বক্তা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের বাণী তুলে ধরার জন্যে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন। অন্যান্য আলেমদেরকে তিনি বাংলা বলায় উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর এই দূর দৃষ্টির ফলে আলেম সমাজ বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসার ওলামা-তালাবার অনেকেই বর্তমানে বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক মনযোগী দেখা যাচ্ছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে এবং ভারত বিভাগের পর অবিভক্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন করেন। ১৯৫৪ সালে খতীবে আজম যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইসলামী শাসন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি এসেম্বলির ভিতর এবং বাইরে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আইয়ুব খানের দীর্ঘ দশবছরের শাসনামলে হৃত মৌলিক অধিকার, বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন এবং ডক্টর ফজলুর রহমান কর্তৃক তৈরীকরা অনৈসলামিক পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। পাকিস্তান আমলে মওলানা আতহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে যে সময় জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি সারা দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন জোরদার করে তোলে, সে সময় তাঁর দক্ষিণ হস্ত বরং অন্যতম নেতা হিসাবে মওলানা সিদ্দীক আহমদ দায়িত্ব পালন করেন। মওলানা আতহার

বার্ধক্যজনিত কারণে জমিয়ত ও নেজামে ইসলামের নেতৃত্ব ত্যাগ করার পর খতীবে আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ তাঁর অপর সহকর্মী মওলানা সাইয়েদ মোছলেহুদ্দীন সাহেবকে নিয়ে এ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।

খতীবে আজম বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক বিপ্লবের পর নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী প্রভৃতি ৫টি সংগঠনের লোকদের উদ্যোগে ইসলামী ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে খতীবে আজমকে নেতা করে ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আই ডি এল) গঠিত হয়। খতীবে আজমের নেতৃত্বে আই ডি এল-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করা হয়। অবশ্য তার পূর্বে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সীরাতুন্নবী সম্মেলন সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর পটভূমি রচিত হয়ে আসে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে আই ডি এল-এর নামে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ১৯৭৮ সালে একটি সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তখন এ সংগঠন থেকে ৬জন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁরা ছিলেন (১) মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (২) মাষ্টার শফীকুল্লাহ (৩) মুহাম্মদ সিরাজুল হক (৪) মওলানা আবদুস সোবহান (৫) মওলানা গোলাম সামদানী—(৬) মওলানা ফকীর আবদুর রহমান।

নানা কারণে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই ডি এল)-এর অঙ্গদল সমূহ পরে নিজ নিজ সংগঠন পুনঃর্বহালে মনযোগী হলে নেজামে ইসলাম পার্টিও পুনঃর্জীবিত হয় এবং তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান মোরব্বী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলাম ও মুসলিম জাতির এ মহান খাদেম ইলমে দ্বীনের প্রসার দানে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে এবং বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতাদর্শের যুক্তি খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাতে যে অবদান রেখে গেছেন, এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে, ভবিষ্যত কর্মীদের জন্যে তা চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ইসলামের নিঃস্বার্থ প্রেমিক মহান সংগ্রামী তোর সিদ্দীক আহ্‌মদের মনোবলকে বার্ধক্যের পীড়াদায়ক দুর্বলতা দ্বীনী কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।

ইনতেকালের পূর্ব পর্যন্ত পটিয়া মাদ্রাসায় হাদীসের অধ্যাপনায় রত থাকাই হচ্ছে তার বড় প্রমাণ। খতীবে আজম হযরত মওলানা সিদ্দীক আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ) ৮৭ সালের ১৮ই মে মোতাবেক ১৯শে রমজান এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। নিজগ্রামেই তাঁর ইনতেকাল ঘটে। মওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেবের ইনতেকালে যে শূনত্যার সৃষ্টি হয়, আল্লাহ সে শূন্যতা দূর করুন, সকলের এ দোয়া করা উচিত।

দৈনিক সংগ্রাম [২১।৫ ৮৭]

"এ দেশের ধর্মীয় আকাশের আরেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি ঘটলো। বিশিষ্ট আলেম ও রাজনীতিক মওলানা হাফেজ্জীর ইনেতকালের তিনসপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতে তাঁরই সমসাময়িক বাংলাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত আলেম, সুবিখ্যাত বক্তা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, হাদীসশাস্ত্র বিশারদ মওলানা সিদ্দীক আহমদ ইহকাল ত্যাগ করলেন। তিনি ১৯শে মে, ২০শে রমযান সোমবার পৌনে ১২টার সময় চকোরিয়া থানাস্থ আপন গ্রাম বরইতলীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর। মরহুম ৭ ছেলে ও ৬ মেয়ে রেখে যান। তিনি তিন বছর যাবত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে যে, মওতুল আলেম মওতুল আলাম— "কোনো বিশেষ আলেমের মৃত্যু একটি পৃথিবীর মৃত্যু।" মওলানা সিদ্দীক আহমদ আহমদ (রহঃ)-এর ন্যায় বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এ বাক্যটি অনেকাংশে প্রযোজ্য। গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী এই ইসলামী জ্ঞানবিশেষজ্ঞ আলেম যেমন ছিলেন একজন যুক্তিবাদী দক্ষ মুহাদ্দেস, বক্তা, তেমনি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। ১৯৫৪ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশে যে কয়জন আলেম অক্লান্ত পরিশ্রম করে ৫০-এর দশকে ইসলামী রাজনীতি ও গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে কাজ করেন, তন্মধ্যে মওলানা সিদ্দীক আহমদ ছিলেন অন্যতম। মওলানা সিদ্দীক আহমদ একজন জনপ্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। নিজ এলাকা থেকে তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সুফী রাজনীতিক এবং

জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাবেক সভাপতি মরহুম মওলানা আতহার আলীর অনুপ্রেরণায়ই মওলানা সিদ্দীক আহমদ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর শায়খুল হাদীস হিসাবে হাটহাজারী ও পটিয়া মাদ্রাসার হাদীসের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাঁরই নেতৃত্বে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠিত হয়। মওলানা সিদ্দীক আহমদ ছিলেন এদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সারাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ওলামা-মাশায়েখেরই তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরাধীনতার অক্টোপাশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ওলামা-ই-কেরামের ভূমিকা মুখ্য হলেও পরবর্তী পর্যায়ে আলেম সমাজের বিরাট অংশ রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়েছিল। সেদিন যারা রাজনীতিবিমুখ আলেমদেরকে রাজনীতির ময়দানে এসে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে ছিলেন এবং খানকাহ ও মাদ্রাসার পাশাপাশি রাজনীতির ময়দানে ও কাজ করেছিলেন, মরহুম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশ আমলে আইডিএল ছাড়াও ইত্তেহাদুল উম্মাহ গঠনকালে খতীব-এ-আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদ ইসলামী ঐক্যের জন্যে যে কাজ ও যেসব বক্তব্য রেখে গেছেন, তা এ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে ওলামা-এ-কেরামের জন্যে বিরাট পথ-নির্দেশনার কাজ করবে সন্দেহ নেই। ইসলামী চিন্তাবিদ ও জননেতা মওলানা সিদ্দীক আহমদ ছিলেন দেশ ও জাতির এক নিঃস্বার্থ সেবক। নিজের রাজনৈতিক পরিচিতি ও ক্ষমতাকে কোনো সময় তিনি স্বজনপ্রীতি বা অর্থোপার্জনের লোভ দ্বারা কলুষিত করেননি, যে গুণগুলো আজকাল অতীব বিরল।

ধর্মীয় জ্ঞান-গভীরতা আধুনিক জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, নিস্বার্থতা, আমলদার আলেম হওয়া এসব গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকের সংখ্যা আজকাল খুবই কম। এদিক থেকে খতীব-এ-আজম মওলানা সিদ্দীক আহমদের ইন্তেকাল বাংলাদেশের জন্যে সত্যিই এক অপূরণীয় ক্ষতি। মওলানা সিদ্দীক আহমদের ইন্তেকাল পরিণত বয়সে হলেও ইসলামী ঐক্যের পুরোধা এ মহান ব্যক্তিত্বের মতো সার্বিক গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তিরোধানে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।"

কেঁদেও পাবেনা যারে

"মৃত্যু জীবনের চাইতেও স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু আছে যা স্বাভাবিক বলে ভাবতে কষ্ট হয়, অমোঘ বিধান বলে মেনে নিতে বেদনা বোধ হয়। বয়সের প্রেক্ষিতে বিচার করলে খতীবে আজমের মৃত্যু অনেকটা পরিণত বলা চলে, তারপরও 'কিন্তু' থেকে যায়, থেকে যায় অনেক অনেক 'প্রশ্ন'।

হযরত মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মতো বহুমাত্রিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন জন্ম গ্রহণ করেন না; প্রতি মাসেও নয়; প্রতি বছরেও নয়। হয়তো শতাব্দীর প্রান্তিক সীমায় জন্ম নেন একজন 'খতীবে আজম'। পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে অগণিত বার প্রদক্ষিণ করতে হয় একজন মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সৃষ্টি করতে।

শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর ইন্তে-কালে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহ্‌তামিম হযরত মওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহঃ) আল্লামা ইকবালের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন—

"বড়ে মুশকিল সে হোতা হ্যায় চমন মে উয়হ্ দীদা ও পয়দাহ"

তেমনি বাগানে হয়তো অনেক ফুলই আছে। দৈনন্দিন অনেক ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে আবার ঝরেও যাচ্ছে। কিন্তু মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মতো ফুল ইলমে নববীর বাগানে প্রতি দিন ফোটে না, কালে ভদ্রে অনেক চেষ্টা চরিত্রে হয়তো দেখা দেয়।

মননশীল ব্যক্তিরা সাধারণত জ্ঞানের দু'একটি শাখায় আপন সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে থাকেন কিন্তু মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মতো এমন সৃষ্টি-ধর্মী প্রতিভা বিরল, যাঁরা জ্ঞানের প্রায় সব ক'টি শাখায় মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছেন। হাদীস শাস্ত্রে, তাফসীরে, ইসলামী আইনে (ফিক্‌হায়), উচ্চতর যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও বাংলা সাহিত্যে, হিকমত ও বালাগতে, মুসলিম উত্তরাধীকার আইনে (ফরায়েজ), ফতোয়া প্রদানে বিতর্ক প্রতিযোগিতায়, আবেগময়ী ওয়াজে, জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, তাকওয়া ও পরহেজগারীতে পরিশীলিত আচার-আচরণে এবং মার্জিত সৌজন্যবোধে খতীবে আজম ছিলেন সূর্যের পরিচিতির মতো নিজেই নিজের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক, দায়িত্বশীল শিক্ষক, সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং পারিবারিক পরিসরে স্নেহ বৎসল পিতা। এক কথায় তিনি ছিলেন একটি **Institution** বা **Academy.**

বিদায় মুহূর্তে খতীবে আজম অনেকটা অভিমান নিয়ে চলে গেলেন। কারণ জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য ও অনুসারিগণ তাঁকে যথার্থ কদর করেননি। জীবনের শেষ সাড়ে ৩টি বছর তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে নির্বাক ছিলেন। অনুভূতি ছিল অথচ কথা বলতে পারতেন না, শারীরিক অবয়ব ঠিকই ছিল অথচ হাটতে পারতেন না। ঢাকার পি, জি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় হাসপাতালের পরিচালক তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাবে মন্তব্য করেন "মওলানাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্রাম ও স্বস্তি ব্যাতিরেকে তাঁর মেধার যথেচ্ছা অপচয় হয়েছে। অতএব বিদেশে পাঠিয়ে খুব বেশী লাভ হবেনা।" প্রশ্ন থেকে যায়, কারা আকাশের মতো উদার এ 'বৃদ্ধ শিশুটি'কে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন?

দেশের বিভিন্ন জেলার বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগের এমন কওমী ও সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসার সংখ্যা কম যেখানকার বার্ষিক রিপোর্টে মওলানার সত্যায়িত বাণী নেয়া হয়নি এবং মাদ্রাসার উপদেষ্টা কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি। বার্ষিক সভার তো তিনি ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশে দেওবন্দধারার ওলামাদের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। কাদিয়ানী মতবাদের মোকাবেলায়, আইয়ূবী দুঃশাসনের প্রতিবাদে ও বিদআৎ-শিরকের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মওলানাই ছিলেন অগ্রবর্তী সেনানী। বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামাদের মধ্যে খতীবে আজম ছাড়া সর্বাধিক যোগ্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্ব ছিলনা তাঁর সমসাময়িক কালে, একথা বললে খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবেনা।

অসুস্থ হয়ে যাবার পর মওলানাকে হয়তো অনেকেই দেখতে গেছেন তবে তাঁর সংখ্যা ছিল নগণ্য। অনেকে হয়তো আর্থিক সাহায্য করেছেন তবে তার পরিমাণও ছিল অনুল্লেখ্য। আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ ভেঙ্গে ফেলে যিনি দুঃসাহসিক নাবিক সিন্দবাদের মতো পাল তুলে ছিলেন

জাহাজে, যাত্রা করেছিলেন ইসলামী আন্দোলনের মহাসমুদ্রে। শয়নে স্বপনে নিদ্রা-তন্দ্রায় বাংলার জমিনে দ্বীনি শিক্ষার বিস্তার ও দ্বীনি আহকাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরীরকে যিনি আরাম দেননি, বিশ্রাম দেননি মেধাকে। জীবনের শেষ মুহূর্তে অনেকটা নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনতে হয়েছে তাঁকে। নিজের আপন স্বতীর্থদের এ উপেক্ষা দেখে হয়তো তিনি কথা বলেননি। বাংলার অবহেলিত আরেক বিদ্রোহী কণ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামও অন্তিম মুহূর্তে স্বধর্মাবলম্বীদের অবজ্ঞা দেখে বলে ছিলেন—

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু
আমি আর জাগিবনা
কোলাহল করি সারা দিনমান
কারো ধ্যান ভাঙ্গিবনা
নিশ্চল নিশ্চুপ,
আপন মনে একাকী পুড়িব
গন্ধ বিধুর ধূপ।"

মওলানাও আপন মনে একাকী বেদনা বিধুর ধূপ পুড়েছেন, কারো ধ্যান ভাঙ্গেনি। রাজনীতির সুযোগে এবং দ্বীনি খিদমতের বিনিময়ে যেহেতু তিনি কালো টাকার পাগাড় গড়েননি, অতএব সঙ্গত কারণে তাঁর আর্থিক অনটন ছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর পুষ্টিকর খাদ্যের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল আরো অধিকতর সেবার। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সেবার পরিসর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সীমিত স্বচ্ছলতা সত্বে সেবার ক্ষেত্রে কোন অবহেলা করেননি।

যে দেশে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করলে পেনশন পাওয়া যায়, সে দেশের সর্বোচ্চ দীনি শিক্ষায়তন পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ায় ১৭ বছর হাদীস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের (শায়খুল হাদীস) দায়িত্ব পালন শেষে পক্ষাঘাত জনিত কারণে অবসর নেয়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাসিক ভাতা মনজুর করে এ মনীষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নি। লেখক ১৯৮৬ সালে আল-জামেয়াতুল ইসলামীয়া পটিয়ার দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মওলানার

সাহায্যার্থে একটি মাসিক ভাতা মনজুর করার আবেদন জানালে তিনি মাদ্রাসায় এরূপ কোন তহবিল না থাকার কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য জামেয়া প্রধানের সাথে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার আশ্বাস দেন। জানিনা, সিদ্ধান্ত আদৌ নেয়া হয়েছিল কি না। হযরত খতিবে আজম তাঁর প্রিয়তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক ভাতা না নিয়েই পরপারে মেহমান হয়ে গেলেন। অবজ্ঞা ও অবহেলার এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই ; উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের এ বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই।

ইতালীর রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী বলেছেন "মানুষকে যত পার ব্যবহার করো, যে মুহূর্তে সে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে, তাকে ছুড়ে মারো ডাষ্টবিন।" হযরত মওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের প্রতি তাঁর অনুসারীগণ, সহকর্মীগণ ও অনুরক্তগণ ম্যাকিয়াভেলীয়ান আচরণ করে হৃদয় হীনতার ও মানবিক দৈন্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। দেশের প্রধান মন্ত্রী শোক প্রকাশ করলেও রাষ্ট্র প্রধান শোকবাণী দিয়ে জাতীয় এ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে কার্পণ্য করেছেন।

বন্দুকের নল থেকে গুলী ছেড়া হলে তা যেমন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, হারানো মওলানা সিদ্দীককেও এ সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। আল্লামা ইকবালের ভাষায়—

সরূদ রপ্তা বায আয়েদ কেহ্ না আয়েদ।

নাসীম আয হেজায আয়েদ কেহ নাহ্ আয়েদ।

অনুশোচনার গ্লানী আজীবন এ জাতিকে বহন করতে হবে ; কপালে ধারণ করতে হবে দুর্ভাগ্যের তিলক রেখা।

দুর্ভাগ্য এ দেশের দেওবন্দী ওলামাদের, দুর্ভাগ্য এ জাতির—খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছেন। খতিবে আজম যদি সউদী আরবের মাটিতে জন্ম নিতেন, নিঃসন্দেহে তিনি হতেন শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ, শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, যদি মিসরে জন্ম নিতেন তিনি হতেন সাইয়েদ কুতুব ও হাসানুল বান্না, যদি আফগানিস্তানে জন্ম নিতেন তিনি হতেন জামালুদ্দীন আফগানী, যদি ভারতে জন্ম নিতেন তিনি হতেন

শায়েখুল ইসলাম মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী যদি পাকিস্তানে জন্ম নিতেন তিনি হতেন মুফতীয়ে আযম আল্লামা মোহাম্মদ শফী ও মওলানা মুফতী মাহ্‌মুদ আহমদ, যদি তিনি ইউরোপে জন্ম নিতেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল হতেন আর যদি কিউবার মাটিতে জন্ম নিতেন, তা হলে হতেন ফিডেল কেষ্ট্রো। [নাজাত পত্রিকা সম্পাদক—আ ফ ম খালেদ হোসেন]

মওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক মাসিক মদীনা).

"খতীবে আযম হযরত মওলানা সিদ্দীক আহ্‌মদ (রহঃ) ছিলেন এদেশে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যের বিমূর্ত প্রতীক। খতীবে আযমের আজীবনকার সাধনা ছিল কলেমাপন্থী সব মুসলমানদের এক প্লাটফরমে সমবেত করা। বাংলার তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে দেশের আনাচে কানাচে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন, আজও তা ইথারে ইথারে ভাসছে। মওলানা সিদ্দীক আহমদের মতো সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি ও বুজর্গ এদেশে খুব কমই জন্ম নিয়েছেন।"—('নাজাত' ২৫শে জুলাই '৮৭)

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (আমীর জামায়াতে ইসলামী, মহানগীর ঢাকা,)

"হযরত মওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহঃ। ছিলেন, এই উপমহাদেশের বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে যে কয়জনের নাম শীর্ষ ভাগে থাকবে, খতীবে আযম তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন।"—(নাজাত ২৫শে জুলাই '৮৭)

আল্লামা সোলতান যওক (আরবী ভাষাবিদ ও চট্টগ্রাম দারুল মায়া রিফ আল-ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক।)

"খতীবে আযম মওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেবের হৃদয়ে আজীবন আমরা আল্লাহ্‌র এজমিনে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আগুণ দেখেছি। খতীবে আযম আজীবন রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার, সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ও লেখনী শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন এবং ইসলামী আদর্শের উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি কোনো শক্তির সামনে মাথা নত করেননি— আপোষ করেননি কোনো প্রলোভনের লোভনীয় মোহে।" —(নাজাত-ঐ)

মওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী

"হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলামী আদর্শের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে যে সমস্ত মহামণীষীর নাম যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, মুসলিম

জাহানের খ্যাতনামা আলেমেদ্বীন, ইসলামী আন্দোলনের বীরসেনানী খতীবে আযম হযরত আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ইসলাম ও মুসলমানদের সংকট দেখা দিত, মওলানা সাহেব তাতে বিচলিত হয়ে উঠতেন।''

খতীবে আযমের বিশিষ্ট ছাত্র-শিষ্যগণ

মওলানা আ ফ ম খালেদ হোসেন কর্তৃক তাঁর স্মরণে প্রচারিত বুলেটিনে লিখিত "কালের অক্ষয় বক্ষে লেখা রবে যে নাম" শীর্ষক এক প্রবন্ধের তথ্য অনুযায়ী খতীবে আযমের বিশিষ্ট ছাত্র-শিষ্যদের নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়,—প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী হযরত খতীবে আযমের শিক্ষকতা জীবন মোট ৪৩ বছর। দেশ-বিদেশে মওলানার অসংখ্য ছাত্র ইসলামী আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার ও দ্বীনি খিদমতে রয়েছেন। সমসাময়িক কালে বিভিন্ন মাদ্রাসায় যে সব মুহাদ্দিস ও মুফতী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কম বেশী অনেকেই খতীবে আযমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিষ্য।

মরহুম মওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে যারা ইল্‌ম, শিক্ষকতা, রাজনীতি, সাংবাদিকতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন, তাঁদের সংখ্যা অনেক। উল্লেখযোগ্যদের কয়েক-জন হচ্ছেন যেমন, মওলানা আবদুল আযীয সাহেব শায়েখুল হাদীস হাট-হাজারী মাদ্রাসা। হযরত মওলানা আবদুল কাইয়ুম সাহেব (রহ) শায়েখুল হাদীস ওয়াল ফনূন, (মাদ্রাসা ঐ), হযরত মওলানা মুফতী আহ্‌মাদুল হক সাহেব, (মাদ্রাসা ঐ) মওলানা আহমদ শফী সাহেব (মোহ্‌তামিম, মাদ্রাসা ঐ) হযরত মওলানা হাফেজুর রহমান, পীর সাহেব (মাদ্রাসা ঐ), মওলানা মুহাম্মদ হারুন সাহেব সাবেক মুহতামিম (ছারীয়া মাদ্রাসা), মওলানা জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতি, সহকারী সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। হযরত শাহ মওলানা মোহাম্মদ উইনুছ সাহেব, মুহতামিম—পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া। হযরত মওলানা আবদুল হালিম বোখারী, মুহাদ্দিস—পটিয়া মাদ্রাসা। হযরত মওলানা মোহাম্মদ আইয়ুব সাহেব, মুহাদ্দিস—পটিয়া মাদ্রাসা। হযরত মওলানা মুহাম্মদ রফীক সাহেব, মোহাদ্দেস—পাটিয়া মাদ্রাসা। হাফেয মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেব, সম্পাদক—মাসিক আত্তাওহীদ। হযরত মওলানা মোহাম্মদ মোযহের

আহমদ সাহেব, রেক্টর—হাশেমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার। হযরত মওলানা আবদুল মান্নান সাহেব, শায়েখুল হাদীস, মাহমূদীয়া মাদ্রাসা, বরিশাল। হযরত মওলানা মোতাহেরুল হক সাহেব, ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস—কেশবপুর আলীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া। হযরত মওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব, প্রিন্সিপাল—সাতকানিয়া আলীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। মওলানা মুহাম্মদ ফুজাইলুল্লাহ সাহেব, মুহাদ্দিস, কৈয়গ্রাম মাদ্রাসা। হযরত মওলানা মোহাম্মদ ফোরকান সাহেব, লিবিয়ায় উচ্চতর আরবীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক, দারুল মায়া'রিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

এ ছাড়া কুমিল্লা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস ও মুফতী রয়েছেন। প্রামাণিক তথ্যের ঘাটতির কারণে তাঁদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলোনা। (ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা যোগাড় করা হবে।)

দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামী আন্দোলনের স্থায়ী দুর্গ গড়ে তোলার লক্ষ্যে হযরত খতীবে আযম দেশের আনাচে-কানাচে অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ সালে স্থাপিত চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ফয়জুল মাদ্রাসার ভিত্তি তাঁর নিজহাতে স্থাপিত, যার প্রাঙ্গণে তিনি অন্তিম শয়নে শায়িত।

আধ্যাত্মিক জীবন

মুফতীয়ে আযম হযরত মওলানা মুফতী ফয়েজুল্লাহ্ সাহেব (রহঃ)-র সাহচর্যে এসে তিনি সর্বপ্রথম রুহানিয়তের সবক লাভ করেন। আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে তিনি খিলাফত লাভ করেন। মুফতিয়ে আযম সাহেবের তিনি হচ্ছেন প্রথম খলীফা।

সংস্কার আন্দোলন

হযরত বড় মুফতী সাহেব তাঁর প্রিয়তম ছাত্রকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, তাঁর নিজ সংস্কার আন্দোলনকে মওলানা সিদ্দীক আহ্‌মদ সাহেব যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিলেন। শির্‌ক, বিদআত ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খতীবে আযম ছিলেন এক চিরপ্রতিবাদী কণ্ঠ। প্রতিপক্ষের অনেকের সাথে তিনি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় (মুনাযেরা)-এ অংশ নিয়ে নির্ভেজাল তওহীদ ও সুন্নতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখেন। কাদিয়ানী মতবাদের স্বার্থক মোকাবেলায় তিনি দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে

ওজস্বীনি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে এর অসারতা খণ্ডন করেন। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক জারীকৃত মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধেও তিনি সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় তুলেন।

মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগের চাহিদার প্রতি সঙ্গতি রেখে তিনি একটি সিলেবাস প্রণয়ন করেছিলেন, যা পুস্তিকা আকারে বেরিয়েছে। বাংলা ভাষার চর্চা, কথ্য ও লিখিত আধুনিক আরবী সাহিত্যের উৎকষ সাধন সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাধারা ইদানিং বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এ চিন্তাধারার ভিত্তিতে নতুন মাদ্রাসাও গড়ে উঠছে। আইয়ুব আমলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন, গঠন প্রণালী, পাঠ্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে ৪০টি প্রশ্ন রেখেছিলেন মওলানার কাছে। হযরত খতীবে আযম লিখিত আকারে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরে ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আরও অনেকের ন্যায় মওলানারও চিন্তাধারার ফসল ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

হযরত মওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহঃ) তাঁর ইলম, যুক্তি, বিতর্ক, রুহানিয়াত ও রাজনীতির মাধ্যমে চেয়েছিলেন এদেশে তন্দ্রাবিভোর মুসলমান বিশেষতঃ ওলামাদের হৃদয়ে ইসলামী বিপ্লবের অগ্নিশিখা জাগাতে; চেয়েছিলেন কলেমা পন্থী সব মুসলমানদের এক পতাকাতলে সমবেত করতে। অকাট্য যুক্তি দিয়ে তেজোদৃপ্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি এদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো দ্বীনে মোহাম্মদীর (সঃ) আলোকে চেয়েছিলেন নতুন করে বিনির্মাণ করতে।

হায়াতের অভাবে মওলানা এদেশে দ্বীন-এ-হককে বিজয়ী বেশে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি, তবে তিনি আন্দোলনের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন, হয়তো তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন, এদেশের মসজিদের মিনার হতে আবার ধ্বনিত হবে নওবেলালের আযানের সুর।"

হযরত খতীবে-এ-আযম মূলতঃ ছিলেন বক্তা, তবে লেখার হাতও ছিল চমৎকার। সীমাহীন ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সংস্কারধর্মী যে সব পুস্তিকা লিখেছেন তার সাবলীল ভাষা, শব্দের গাঁথুনী, ছন্দের প্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব রীতিমত বিস্ময়কর। মওলানার পুস্তকাবলীর মধ্যে রয়েছে—

১। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশ ধারা ২। আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩। খতমে নবুওয়ত, ৪। শানে নবুয়ত ৮ খণ্ড, ৫। মেরাজুন্নবী (সঃ), ৬। মাওয়াজে খতীবে আযম ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, ৭। শিক্ষা কমিশনের প্রশ্ন মালার উত্তর ৮। সাংবাদিক সাক্ষাৎকার।

খতীবে আযম অর্থ শ্রেষ্ঠ বক্তা। বলাবাহুল্য, মওলানা সিদ্দীক আহ্‌মদ সাহেব আক্ষরিক অর্থেই খতীবে আযম ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা সরাসরি যারা শুনেছেন, বা তাঁর রেকর্ডকৃত ও পরে প্রকাশিত বক্তৃতা পড়েছেন, তারা তা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি ইসলাম ও জাতির বৃহত্তর জনগণের উদ্দেশে এখানে তাঁর ২ ৩টি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেসব বক্তৃতা কেবল দ্বীনের খেদমতেই আসবেনা এই মহান নেতার স্মৃতিকেও অমর করে রাখার উপযোগী। হাদীস, কোরআন তথা এগুলোর মূল লক্ষ্য এবং প্রতি-পাদ্য বিষয় ও মর্মবাণীর ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানগভীরতা যে কি রূপ, এথেকেই সহজে অনুমেয়। এখানে "আমাদের নৈতিক দায়িত্ব" শীর্ষক তাঁর উদ্ধৃত একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হলো :

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া কাফা, ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনাস্তাফা। আম্মা বা'দ—ক্বালা রাসূলুল্লাহি(সা) জুয়িলাতিল আরদু কুল্লুহা তহূরান ওয়া মাসাজি-দান।—অর্থাৎ : হুযুর (সা) ফরমাইয়াছেন, "আমার জন্য সমস্ত ভূমণ্ডলকে তহুর এবং মসজিদ করা হইয়াছে।"— (হাদীস)

"জনাব সভাপতি ও শ্রোতামণ্ডলী যে হাদীসটি আপনাদের সম্মুখে তেলা-ওয়াত করলাম, এ একটি দীর্ঘ হাদীসের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। উক্ত হাদীসটিতে মসজিদের সহিত সংশ্লিষ্ট আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি আপনাদের চাহিদার পরিপূরক হিসাবে হাদীসটির অংশ বিশেষ আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করলাম। উপরোল্লেখিত হাদীসটির মোটামুটি ব্যাখ্যা এই—বিশ্ব নবী বলেন, আল্লাহতায়ালা, আমি ও আমার সমস্ত উম্মতের জন্য এ ভূমণ্ডলকে পবিত্র মস্‌জিদে পরিণত করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিস্‌সালাম ও তাঁদের অনুগামীদের ইবাদতখানা ছিল তাঁদের মসজিদ, সেই স্থানছাড়া অন্য কোথাও নামায আদায় করার আদেশ গ্রহীর মাত্রই ছিলনা। তাই প্রত্যেককে নামাযের সময় আপন স্থল ত্যাগ করে ইবাদতগাহে গিয়ে নামায আদায় করতে হতো।

কিন্তু আমাদের তো একাদশে বৃহস্পতি। খোদার নিকটতম নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বদৌলতে এই বিশ্বজাহান আমাদের মসজিদরূপে পরিণত হয়েছে, যার যেখানে ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারেন। উকিল লাইব্রেরীতে, গবেষক-পরীক্ষক গবেষণাগারে, পরীক্ষার হলে, কৃষক মাঠে, শ্রমিক তার কর্মস্থলে, যার যেখানে সুযোগ-সুবিধা, সে সেখানে প্রভুর একত্ব প্রকাশের নিমিত্ত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেষ্ঠতম আসনে উপবিষ্ট স্রষ্টা, আইনদাতা, বিধানদাতা পালনকর্তা ইত্যাদি সর্বান্তকরণে সমর্থনে নিজের সর্বাঙ্গ নোয়াইয়া দৈনিক পাঁচবার মহাশক্তি ধরের গোলামীর সম্মতি প্রকাশ করতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ! পানি পাওয়া না গেলে, রুগ্ন ব্যক্তির পানি ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, এ ভূমণ্ডলের যে কোনো স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করতে পারেন। এটা হলো আমাদের মহানবীর মহা বৈশিষ্ট। নবী যে রকম উদার তাঁর দয়াও অনুরূপ। তিনি হলেন সমস্ত নবীদের ইমাম এবং আমার ভাষায় এই বিশ্বজাহানের বড় মসজিদের ইমাম। আমরা সকলে সেই বড় মসজিদের মুসল্লী। তিনি হলেন ইমামুল আম্বিয়া, আমরা হলাম ইমামুল উম্মত। নবীর দায়িত্ব যে রকম, উম্মতের দায়িত্বও তদ্রূপ। রসূল যেরকম শ্রেষ্ঠতম নবী, আমরাও সে রকম শ্রেষ্ঠতম উম্মত। এ হলো উপরোক্ত হাদীসটির সারমর্ম। আমি সংক্ষেপে তিনটি Point-এর উপর এ হাদীসটির আলোচনা করছি। (ক) সহজবোধ্য হবার জন্য বলছি, উক্ত হাদীসে এই ভূমণ্ডলকে যে মসজিদ করা হলো আমার ভাষায় এটা বড় মসজিদ। আর যেখানে নামায আদায় করার মানসে চারটি দেয়াল পরিবেষ্টিত ঘর নির্মাণ করা হয়, আমার ভাষায় তা ছোট মসজিদ। বড় মসজিদের মর্যাদা ছোট মসজিদের চাইতে কম নয়। রসূল (সাঃ) হলেন এ মসজিদের ইমাম, আমরা হলাম তাঁর মুসল্লী। এ মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব অথচ আমরা অবহেলা করছি। স্রষ্টার সমীপে এ অবহেলার হিসাব অবশ্যই দিতে হবে। মনে করুন, একজন লোক বা ইমাম সাহেব কোনো ব্যক্তিকে অন্ধকার রাত্রিতে টাকা কর্জ দিল। ঋণগ্রহীতা পরে তা অস্বীকার করল। ইমাম সাহেব বিচারকের দরবারে উহার নালিশ পেশ করলেন, কিন্তু ইমাম কোন সাক্ষী দিতে পারলেন না। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান মতে বিবাদীকে —'টাকা নেয় নাই' এ মর্মে শপথ করতে হবে। ইমাম সাহেব বললেন, মসজিদে

গিয়ে শপথ করতে হবে, কিন্তু বিবাদী মসজিদে গিয়ে শপথ করতে অস্বীকার করল। কারণটা বুঝা গেল, বিবাদী ছোট মসজিদে গিয়ে শপথ করতে ভয় পাচ্ছে। সে মনে করছে আল্লাহ আমাকে দেখবে আর আমি আল্লাহ্‌র সামনে—কিভাবে মিথ্যা বলব? কথা হলো, ছোট মসজিদে যেরকম আল্লাহ্‌ আছেন, তদ্রূপ এ বড় মসজিদেও আল্লাহ্‌ আছেন।

আল্লাহ সব কিছু দেখেন, কিন্তু আল্লাহ্‌কে কেহ দেখে না—এ ঈমানটা সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকা চাই, নতুবা মোমেন হওয়া যায় না। মদ খাওয়া, মিথ্যা বলা যেমন ছোট মসজিদে হারাম, তেমনি বড় মসজিদে তথা বিশ্বজাহানে নিষিদ্ধ। এ সবের উপর ঈমান না আনলে ঈমানের পূর্ণতা বিধান সম্ভব নয়। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ ছোট মসজিদটি নির্মাণের কারণ কি? এমন কি হযরত (সাঃ)-ও ইরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্‌ তার জন্য বেহেস্তে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" প্রত্যুত্তরে আমি বলি, এ ছোট মসজিদ হলো একটা আদর্শ ট্রেনিং সেন্টার, এটাকে আমি ২নং Point হিসাবে আলোচনা করছি। (খ) ছোট মসজিদে এসে দৈনিক পাঁচ বার এ ভূমণ্ডলে অর্থাৎ বড় মসজিদে কি ভাবে জীবন-যাপন করতে হবে তার উপযুক্ত শিক্ষা বা ট্রেনিং নিতে হবে। এ ট্রেনিং সেন্টারে খোদার অনুগৃহীতদের ও সিরাতুল মোস্তাকীমের উপযুক্ত শিক্ষা বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র দেওয়া কোরআনের পবিত্র শিক্ষা এখান থেকে লাভ করতে হবে যে, কোথান আমাদেরকে নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যাবতীয় সমস্যা সমাধানে এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন দান করেছেন। মওলানা রুমী বলেন, একদা এক ভিক্ষুক মাথার উপর বিরিয়ানির খাচা নিয়ে ভিক্ষা করতে বের হলে লোকে তাকে দেখে বলল, আরে বেওকুফ! তোমার মাথার উপর বিরিয়ানির খাচা থাকতে তুমি কেন ভিক্ষা চাও? সেখান থেকে কয়েক লোকমা খেয়ে ফেল্লেইতো হয়। প্রত্যুত্তরে সে বলল, সে খেয়ালটা আমার ছিল না।"

অনুরূপভাবে সেই পবিত্র কোরআনকে মাথার উপর রেখে বক্ষে ধারণ করে উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমিরিকা, চীন, জাপান ও রাশিয়ার নিকট আমরা ভিক্ষার হাত পেতে রেখেছি। যতদিন আমাদের আত্মা সম্পূর্ণ জীবন-

বিধান হিসাবে কোরআনের প্রতি রুজু না হবে, ততদিন আমাদেরকে এ হাত পাতা অবস্থায় রাশিয়ার, আমিরিকার ও চীনের মতো দেশের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে হবে। তবে প্রশ্ন হলো, মসজিদে গিয়ে নামায পড়লে, ঘরে বা দোকানে নামায আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ, ১০০, গুণ, ৫০০ গুণ, ৫০,০০০ গুণ, ১,০০০০০ লক্ষ গুণ বেশী সওয়াবের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। ঈদের রাতে, জুময়ার রাতে, শবে কদর, শবে বরাযত বিভিন্ন সময় নামায আদায় করলে বিভিন্ন গুণের সওয়াবের কথা উল্লেখ আছে। তবে সেটা এই জন্য যে, যেমন আপনার একজন মহাজন আপনার কাছে একলক্ষ টাকা পায়, সেই টাকাটা আপনি ডাক মারফত, ড্রাফট মারফত, পিওন মারফত, কর্মচারী মারফত বা যে কোন ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলে টাকাগুলি তার ক্যাশে নিশ্চয় জমা হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি আপনি নিজে গিয়ে সেই টাকাগুলো নিজের হাতে মহাজনের গদিতে বসিয়া আদায় করেন, তা হলে মহাজন যে কত বেশী খুশী হয়, তা স্পষ্ট। আপনাকে মিষ্টি, বিরিয়ানী খাওইয়া এমনকি আপনার সেই টাকার দ্বিগুণ মাল দিতে কর্মচারীদেরকে ফরমায়েশ দিয়ে দেয়। যদি মহাজনের কোনো বিশেষ উৎসবে বা হালখাতার দিন গিয়ে ত আদায় করেন, তাহলে সে আরও বেশী খুশী হয় তা অজানা নয়। আল্লাহ তায়ালাও সেরূপ। নামায আপনি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে আদায় করেন না কেন, আদায় হবে বটে, তবে মহল্লার মসজিদে, জামে মসজিদে মদীনা শরীফে, মক্কা শরীফে নামায আদায় করলে এবং শবে কদর, শবে বরাতে আদায় করলে বহুগুণ ছাওয়াব বাড়িয়ে দেয়। তাই দুই হাদীসের মধ্যে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব বিবাদ থাকে না বলে আমি মনে করি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেটা জানতে পারব ছোট মসজিদে ট্রেনিং নেওয়ার সাথে সাথে। মনে করুন, ছোট মসজিদে যেমন মিথ্যা বলা, শির্ক করা, ঝগড়া করা, আমানতে খেয়ানত করা, আজেবাজে কথা বলা, মদ খাওয়া, ও দুষ্টামি করা হারাম, তেমনি পৃথিবীর এই বড় মসজিদেও উহা নিষিদ্ধ। যদি কেহ ছোট মসজিদে মিথ্যা না বলে, মদপান না করে, গীবত না করে, খারাপ আচরণ না করে, এ বড় মসজিদে এসে সমস্ত কিছুর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সে প্রকৃত মোমেন নয়। সে লোকটি মোনাফেক। সুতরাং বুঝাগেল, নামাযে যেই কেরাত পড়া হয়, সেখানে যে সমাজ নীতি, রাজনীতি

অর্থনীতির কথা উল্লেখ আছে, ঐগুলো সমাজে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম না করলে তথা গোটা দেশের মধ্যে বাস্তবায়িত না করলে প্রকৃত মোমেন হওয়া যাবে না এবং আমাদের জীবনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসবে না। উল্লেখিত ব্যাখ্যা হতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বর্তমান পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম হলো ছোট মসজিদের পরিচালক এবং বড় মসজিদের ঈমাম হলো রাষ্ট্রপ্রধান। আপনারা ছোট মসজিদের ঈমাম নির্বাচিত করার সময় যেরূপ নৈতিক উন্নত, মোত্তাকি পরহেযগার, দীনদার, ন্যায়পরায়ণ ও আরবী ইলমে পারদর্শী লোক নির্বাচিত করেন, তেমনি বড় মসজিদের ঈমাম তথা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার সময় সেইসব গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্যই রাখেননা। এটা বিস্ময়ের ব্যপার নয় কি? এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা রাষ্ট্রপতির উপর ফরয নয় কি? ছোট মসজিদ পরিচালনা করার জন্য যে রকম গুণাবলী বিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন, এর চেয়ে বেশী গুণাবলীর প্রয়োজন বড় মসজিদের ঈমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য। সুতরাং আপনাদের অতীত ভুলভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ও জীবনবিধান আলকোরআনের প্রতি সর্বান্তকরণে ভরসা রেখে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বা অন্যান্য কাজের যিম্মাদারি দেওয়ার সময় উল্লেখিত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। আর ছোট মসজিদের ঈমাম নিয়োগে যেমন আমরা স্তরে স্তরে উন্নতমানের ঈমানের চিন্তা করি যেমন, সাধারণ মসজিদের ইমাম অপেক্ষা চকবাজার মসজিদের ঈমাম আরো যোগ্য, বায়তুল মুকাররম মসজিদের জন্য আরো বিজ্ঞ, মসজিদে নবীর জন্য আরো ভাল পরহেযগার আলেম এবং বায়তুল্লাহ শরীফের জন্যে আরো যোগ্যতম ব্যক্তি তালাশ করি, ঠিক তেমনি সামাজিক নেতা নিয়োগে মহল্লার সরদার অপেক্ষা ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরিচালক আরো যোগ্য, উপজেলার নেতা আরো অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন, জাতীয় পরিষদের জন্যে আরো যোগ্য এবং রাষ্ট্রপতি তথা রাষ্ট্রের পরিচালক নিয়োগে আমাদের যোগ্যতম উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগের চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক নেতা নিয়োগে আমরা যদি যথার্থতার পরিচয় দিতে না পারি, আমাদের অবহেলার জন্যে যদি উন্নত চরিত্র ও মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচিত না হয়ে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি নির্বাচিত হয়, তাহলে সেজন্য জনগণকে তার খেসারত দিতে হবে। আমাদেরকে সহ্য করতে হবে নানারূপ যন্ত্রণা-গঞ্জনা, সম্মুখীন হতে হবে সমস্যার।

অতএব ইসলামী হুকুমত কায়েম তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মানসে আমাদেরকে সামাজিক নেতা নির্বাচনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। তৃতীয় Point এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—যদি ইমাম সাহেব ভুল করেন তাঁর ভুলকে সংশোধন করার জন্য ঠিক তাঁর পিছনে প্রথম কাতারে এমন লোক দাঁড়ান, যারা তার সমসাময়িক বা আরও বেশী যোগ্য। ঐসকল ব্যক্তি তার ভুলের সাথে সাথে লোক্‌মা দিয়ে নামাযের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। আর যদি উপযুক্ত মুসল্লীরা 'লোকমা' না দেন, ঈমামও ভুল করতে থাকেন, তাহলে নামায কাহারও হবেনা। তদ্রূপ বড় মসজিদের ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের ভুল সংশোধনের জন্য একটি বিরোধী দল থাকা বাঞ্চনীয়। এই বিরোধী দলই ইসলামের বা রাষ্ট্র প্রধানের ভুল-ভ্রান্তি, বিবৃতি বা আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করবে। আর যদি তিনি সংশোধন না হন, ছোট মসজি-দের মুসল্লীরা যেরকম ঈমাম বরখাস্ত করেন অনুরূপ ভাবে বড় মসজিদের ঈমাম বা রাষ্ট্র প্রধানকেও অনাস্থা দিতে পারেন। এটা ইসলামী বিধান। যদি ঈমামের ভুল না হয়, তাহলে লোকমার প্রশ্নই আসে না। অনুরূপ রাষ্ট্র-প্রধান যদি ঠিকমত রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তা হলে তাঁর সমালোচনা করা বা উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। বন্ধুগণ, উল্লেখিত গুণাবলীর প্রতি আপনারা যদি লক্ষ্য রাখেন, তা হলে আমাদের দেশ কল্যাণকর রাষ্ট্র, আদর্শ রাষ্ট্র বা ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এটা আমাদের বিশ্বাস।

———o———

মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান

[জঃ ১৯০০—মৃঃ ১৯৭৫ পহেলা আগষ্ট]

কোনো ইমারতের মাটির নিচের অদৃশ্য ভিত্তিপ্রস্তর ও ইট যেমন নিজেকে লুকায়িত রেখে উক্ত ইমারতের অস্তিত্বসৃষ্টি ও এর স্থায়িত্ব রক্ষায় সবার অলক্ষ্যে অবদান রেখে যায়, তদ্রূপ যে সব মহান ব্যক্তির ত্যাগ-সাধনা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ইমারতের অস্তিত্ব সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব রক্ষায় বিভিন্ন সময় দালানের অদৃশ্য ভিত্তির ন্যায় অবদান রেখে এসেছে, তাঁদের কাউকেই আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের ঐ সব মহান ব্যক্তিত্বের ত্যাগ-সাধনাই আমাদেরকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে, করেছে অধিকার সচেতন। তাঁদের অনেককে আমরা কমবেশী বিভিন্ন সময় স্মরণ করি। কিন্তু ঐ ত্যাগী পুরুষদের মধ্যে এমন আরও কিছু লোক রয়ে গেছেন, নানা কারণে তারা আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে যাচ্ছেন, অথচ তাঁদের অবদানও আমাদের স্বাধীনতার ইমারত বিনির্মাণে ও মুক্তি আন্দোলনে কম নয়। বস্তুতঃ সে সব সংগ্রামী ত্যাগীদেরই একজন ছিলেন মরহুম মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান। তিনি আজ ইতিহাসের গুম্‌নাম ব্যক্তিদের কাতারে পড়লেও একসময় এই ত্যাগীপুরুষের নাম উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকলের মুখে মুখে শোনা যেত। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের এই সংগ্রামী মোজাহিদকে ইংরেজ সরকার কয়েকবার কারারুদ্ধ করে রাখে। প্রতিবারই তাঁর মুক্তির জন্যে দাবীদাওয়া উত্থিত হতো। হিন্দু পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা যেই "মৌলভী মুকুলেশ্বরের" মুক্তির দাবী সম্বলিত খবরা-খবর তাদের কাগজে-ছাপতেন, ইনিই সেই সংগ্রামী নেতা মওলানা মোখলেছুর রহমান। ইংরেজ আমলে কুমিল্লার ঐতিহাসিক হাসনাবাদ প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্বদান-কারী হিসাবে যিনি হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ইংরেজবিরোধী প্রজাবিদ্রোহের স্মৃতিকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং এদেশের সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলতে ছিলেন সদা তৎপর, তিনিই সেই মওলানা মোখলেসুর রহমান। নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার কামালপুর

গ্রামে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সংগ্রামী মোজাহিদের পিতার নাম মরহুম মুহাম্মদ ইসমাঈল। মরহুম মোখলেসুর রহমান একটি শিক্ষিত হক্কানি ওলামা পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হবার সাথে সাথে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তরুণ বয়সেই ছিলেন অতি সচেতন।

ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যেহেতু অবিভক্ত ভারতের আলেমরাই সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন এবং এজন্যে রক্তাক্ত যুদ্ধসহ অকথ্য জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে আলেমদেরকেই, তাই একটি আলেম পরিবারের সচেতন সদস্য হিসাবে অল্প বয়সেই কিশোর মোখলেসুর রহমানের মনে ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির এক উদগ্র বাসনা জাগ্রত হতে থাকে। লক্ষ্য করা গেছে, তিনি ছাত্র জীবনেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং খেলাফত আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। মওলানা মোখলেসুর রহমান ছিলেন মজলুম জনসাধারণের অতিপ্রিয় বন্ধু। এদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদেরকে বিদেশী শাসনের গোলামির অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে তিনি এক দিকে আজাদীর জন্যে সংগ্রাম করেছেন, অপরদিকে সংগ্রাম করেছেন দেশীয় শোষক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে। তিনি ঐ সমস্ত শোষক কারুনের সম্পদ ছিনিয়ে এনে গরীব জনগণের মধ্যে বিতরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন, যারা জুলুম-অত্যাচার ও নাহক ভাবে অপরের সম্পদ লুট করে টাকার কুমীর হয়ে বসেছিল অথচ তারা না দিত জাকাত, না ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষের করুণ চাহনি তাদের অন্তরে স্নেহের উদ্রেক করতে পারতো। দেশ, সমাজ ও জাতিধর্মের পথে অর্থ ব্যয় করার বদলে তারা সেগুলো শুধু সঞ্চয়ই করতো আর এ সকল অবৈধ সম্পদের সাহায্যে নিজেদেরকে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দিতো। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ব্যর্থ হয়ে যারা সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার দ্বারা বিদেশী ইংরেজ শাসকদেরকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্যে সংগ্রাম করতো, অকথ্য জুলুম-নিপীড়নের শিকার হতো, সেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষপাতি

ছিলেন। তিনি বিদেশী জবরদখলদার শাসকদের দেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে ছিলেন অতি কঠোর। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুটের প্রধান নায়ক সূর্যসেন 'মাস্টারদাকে' আত্মগোপনে সাহায্য করেছিলেন এই সংগ্রামী আলেমই। আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আজাদী সংগ্রামে আপোষহীন মনোভাবের পরি-চয়দানকারী মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান দেশ ও জাতির স্বার্থে বহুদিন যাবত কারা-নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি কেবল রাজনীতিকই ছিলেন না একজন বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও অসহায়দের সেবায় তাঁর রয়েছে বিরাট অবদান।

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা : বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ছাটখিল উপ জলা-ধীন কামালপুর গ্রামে মওলানা মোখলেসুর রহমানের জন্ম ১৯০০ সালে। পিতার নাম মুহাম্মদ ইসমাঈল। লাকসাম উপজেলার উত্তর হাওলার লাচ্চর নামক গ্রামে বালক মোখলেসুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয় ছিল ওলামা পরিবার। অতঃপর তিনি কুমিল্লা হুসামিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন।

মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমানের কর্মজীবনই শুরু হয় রাজনৈতিক আন্দোলন, জনসেবা ও জনপ্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে। ১৯২১ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে কারারুদ্ধ থাকেন। পুনঃরায় ১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯২৩ সালে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। একই সময় তিনি কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কুমিল্লা ডিস্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। কুমিল্লায় স্থানীয় অভিজাত নবাব ফারুকীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এতদসত্বেও মওলানা মোখলেসুর রহমানের গণমুখী নেতৃত্ব সেখানে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ১৯৩৪ খৃঃ থেকে ১৯৪৫ খৃঃ পর্যন্ত এসংগ্রামী ৭ বার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ খৃঃ নিরপেক্ষ প্রার্থীরূপে তিনি সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাকেন। তিনি ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত কলকাতা বসবাস করেন। সেখানে তাঁর কাঠের বড় ব্যবসায় ছিল। উক্ত ব্যবসায় আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যবসায়ের অর্থলব্ধ টাকার

বিরাট অংশ তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া ও সভা-সমিতির চাঁদা ইত্যাদি বাবতই অধিক ব্যয় করতেন। এই দেশ-প্রেমিক কলকাতার ১৩১ নং প্রিন্সেস স্ট্রীটে অবস্থান করতেন। তাঁর বাসায় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ভিড় সকল সময় লেগেই থাকতো। বলাচলে, কলকাতাস্থ তাঁর বাড়ীটি ছিল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আশ্রয় স্থল। মওলানা মরহুমের পুত্র জনাব মোঃ জাকারিয়ার ভাষায় প্রতিবেলা একমণ/দেড় মণ চাউল তাঁর বাসায় পাক হতো। অনেক কর্মীকে খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও অর্থ সাহায্য এবং কাপড়-চোপড়ও তিনি দিতেন। মওলানা মোখলেসুর রহমান জীবনের সকল কর্মতৎপরতাতেই সৎ সাধু ও পরহেজগারী জীবনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর আপোষহীন ইসলামী চেতনার কারণ সম্পর্কে জন-শ্রুতি আছে যে, তাঁর আম্মা ছিলেন অতীব ধর্মানুসারী দ্বীনদার এক মহিলা। যখন তাঁর এ সন্তান উদরে, তখন তাঁর এ আম্মা তাঁকে আল্লাহ্‌র রাহে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। মওলানা মরহুমের পরিবার ছিল বিখ্যাত সূফী হযরত শেখ কামালের অধঃস্তন বংশধর যার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি হযরত শাহজালালের সঙ্গী-সাথীদের অন্যতম ছিলেন। কামালপুরের নামকরণ মূলতঃ সূফী শেখ কামালের নাম অনুসারেই হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমানের এই আলেম বংশে পরবর্তী পর্যায়ে অনেক আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ও বিশেষ খ্যাতিপূর্ণ লোকও জন্মগ্রহণ করে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে চট্টগ্রামে সামরিক অভ্যুত্থানকারী জেনারেল আবুল মঞ্জুর তাঁরই ভ্রাতুষপুত্র ছিলেন। আবুল মঞ্জুরের পিতা মৌলভী নজীবুল্লাহ্‌ ছিলেন মরহুমের বড় ভাই। চট্টগ্রামের ব্যর্থ সামরিক অভুত্থানে নিহত বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মাহবুব ছিলেন মওলানা মরহুমের ভাতিজীর পুত্র।

রাজনৈতিক দল ও কর্মজীবনের সঙ্গীসাথিগণ

বিপ্লবী নেতা মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান ইংরেজ শাসনের অবসান কল্পে এবং এদেশের অধিকারহারা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্যে একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে মিশে কাজ করেছেন। তিনি শেরে বাংলা মৌলভী এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক প্রজাপার্টির সদস্য ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি অবিভক্ত বাংলার টেরোরিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর অন্যতম

সদস্যও ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনকালে তুরস্কের সুলতান আবদুল হামীদের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণেও তিনি বিরাট অবদান রাখেন।

তৎকালীন যুগে জমিদারদের অত্যাচারে এদেশের সাধারণ কৃষক সমাজ ছিল অতিষ্ট। কুমিল্লা জেলার হাসনাবাদের ঐতিহাসিক প্রজাবিদ্রোহের নায়ক ছিলেন মওলানা মোখলেস সাহেবই। তিনি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং প্রজাদেরকে বাঁচাবার আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এ পর্যায়েই তিনি ক্ষেত্র বিশেষে অত্যাচারী জমিদারদের নিকট থেকে জোর করে অর্থ এনে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

তাঁর ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: মৌলভী আশ্‌রাফ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী, আবদুল মালেক, এয়াকুব আলী, কামিনী দত্ত, ধীরেন দত্ত, ক্যাপ্টিন দত্ত, মুফিজুদ্দীন, আবদুল জলীল, আবু হোসেন সরকার, সূর্যসেন (মাষ্টার দা) যিনি ইংরেজ অমলে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুটের নাম করেন।

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক শেরে বাংলার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। কথিত আছে যে, বাংলার অবিসংবাদিত স্বার্থত্যাগী জনদরদী নেতা শেরে বংলা মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক সাহেব, যার রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণ জনসেবাভিত্তিক, যদ্দরুন নিজের কাছে মোটা অংকের টাকা থাকতো না বল্লেই চলে। এমন কি এ মহান রাজনৈতিক দিকপালের পাশ ধরে বহু লোক বিরাট বিত্তশালী হলেও কোনো কোনো সময় তাঁর হাত থাকতো সম্পূর্ণ রিক্ত। জানা যায়, ঠিক এমন একটি সময়ই ছিল যখন তাঁর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তখন তিনি তাঁর বহুকাংখিত নবজাত পুত্র সন্তানকে দেখতে গেলে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, উপযুক্ত 'এনাম' ছাড়া ছেলেকে দেখানো হবে না। তখন মওলানা মোখলেসুর রহমান সে সময় ঐ এনামের টাকার ব্যবস্থা করে দেন।

আধ্যাত্মিকতার চর্চা

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের দিকে মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান আজমগড় জেলার শেখ মওলানা হাফেজ সাঈদ খাঁর কাছে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে 'বায়আত' হন। এর পর থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিক মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ দিনের রাজ-

নৈতিক সংগ্রামী অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে বিষয়টি উপলব্ধি করে পরে আত্ম-শুদ্ধির সাধনাকে বেশি গুরুত্ব দিলেন তার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আসলে রাজনীতির পূর্বে বা সাথে সাথে যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৎ নেতৃত্বের অনু-পস্থিতি থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে জাতির সকল ত্যাগ-তিতীক্ষাই বিফল যায় না, তাদেরকে অসাধু নেতৃত্বের দরুণ অনেক দুঃখকষ্টেও নিপতিত হতে হয়। এজন্য রাজনীতির আগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বস্তরে সৎ নেতৃত্ব সৃষ্টির কাজ করা একান্ত জরুরী। ১৯৭০ সালে তিনি তাঁর মোরশেদের পক্ষ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন। মওলানা মোখলেসুর রহমান একজন বিজ্ঞ ও সংগ্রামী রাজনীতিক হওয়ার সাথে সাথে মহানবীর সুন্নতেরও বিরাট পায়েবন্দ ছিলেন। তিনি ছিলেন সায়েমুন্নাহার ও কায়েমুল্লাইল—সকল সময় রোজা রাখতেন এবং কখনও তাহাজ্জুদ নামায ছাড়তেন না। 'অযীফা-আওরাদ'-এর সবক যথা-রীতি আদায় করতেন। অধিক মাত্রায় পড়াশোনা করতেন। বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কেও সকল সময় খোঁজখবর রাখতেন, পত্রপত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। তবে এ সময়টিতে তিনি সম্পূর্ণ এক ফকীরী জীবন অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নামের পূর্বে তিনি যখন ফকীর লেখা শুরু করে দেন, তখন ভক্তদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিয়েছিলেন যে,—

"বান্দা ফকীর খোদার গোলাম
রাস্তার ফকীর নয়রে সে,
যার দুয়ারের ফকীর আমি
সারাজাহানের বাদশাহ্ সে।"

উল্লেখ্য যে, মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান অনেক ভক্তিমূলক কবিতাও লিখতেন, যেগুলোর পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। তিনি সহজ সরল জীবনের অধিকারী অতীব খোদাভীরু ছিলেন। তাঁর খাওয়া-পরা ছিল সাধারণ এবং আড়ম্বরতামুক্ত। তিনি আচার-ব্যবহারে ছিলেন অতি বিনয়ী, নম্র এবং স্নেহপরায়ন।

উজ্জ্বলতর কীর্তি

জাতীয় জীবনে বিভিন্ন অবদান রেখে খ্যাতিমান হওয়ার সৌভাগ্য যাদের হয়, তাদের মধ্যে যারা স্থায়ী অবদানের অধিকারী সেসব ব্যক্তিই জনচিত্তে

অধিক স্মরণীয় হয়ে থাকেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী পুরুষ মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমানের কর্ম জীবনে দেশ ও জাতির জন্যে তিনি যা কিছু করে গেছেন তার পাশাপাশি আরও একটি যে বড় অবদান রেখে যান, সেটি তাঁর উজ্জ্বলতর এক অমর কীর্তি হিসাবে দীর্ঘ দিন চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাহলো রহমতে আলম ইসলাম মিশন।

রহমতে আলম ইসলাম মিশন

মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান বাংলার মাটিতে রাজধানী ঢাকার বুকে এমন একটি ইসলামী প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন, যেখানকার ছাত্রেরা দ্বীনী ও আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে জ্ঞানসমৃদ্ধ হবে এবং দেশ-বিদেশে আদর্শ ইসলাম প্রচারক হিসাবে যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় ইসলামের প্রসার দানে হবে সক্ষম। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূরণ করবে সৎ নেতৃত্বের অভাব। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে তিনি এমন সব ব্যক্তি তৈরির উপযোগী করতে চেয়েছেন, যাদের আদর্শে এবং প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সৌন্দর্য ও সেবাকর্মে আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমরা পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে আসবে। এ মহান লক্ষ্যের বাস্তবায়নকল্পে তিনি তেজগাঁও ১নং রেলগেইট সংলগ্ন একটি স্থানে সর্বপ্রথম ৫৬ শতক জমিনের উপর ১৯৬১ সালে 'রহমতে আলম ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটি বিভাগ টঙ্গীতে ৪৩ বিঘা জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে রয়েছে ১২০ হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একতলা একটি ভবন। এ মিশন বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বলিষ্ঠ পরিচালনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত। এর রয়েছে একজন পরিচালক। মিশনের অধীনেই রয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। মওলানা মরহুম তাঁর ইসলাম মিশনের সুদূর প্রসারী কর্মসূচী বাস্তবায়ন কল্পে এ প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিভাগ খোলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়টি, সেগুলো হচ্ছে :—(১) মদীনাতুল উলূম সিনিয়ার ফাজেল মাদ্রাসা (বালক শাখা) (২) মদীনাতুল উলূম সিনেয়ার ফাজেল মাদ্রাসা (মহিলা শাখা)। (৩) একটি এতীমখানা। (৪) হেফ্‌জ খানা।

মদীনাতুল উলূম মহিলা সিনিয়ার মাদ্রাসা

এ মাদ্রাসাটিতে বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০ জন। ৬ তলা বিশিষ্ট এই মহিলা মাদ্রাসাটির ছাত্রীদের মধ্যে ৩০০ ছাত্রীই মাদ্রাসার আবাসিক হোষ্টেলে

থেকে লেখাপড়া করে। এতীম ছাত্রী ছাড়াও অবস্থাসম্পন্ন ঘরের অন্যান্য ছাত্রীরাও টাকা দিয়ে বোর্ডিংয়ে থেকে এখানে লেখাপড়া করে। এ জাতীয় ছাত্রীদের জন্যে নির্ধারিত ইনটার বোর্ডিংয়ের ছাত্রীদের সংখ্যা বর্তমানে অর্ধ-শতাধিক। মদীনাতুল উলূম মহিলা সিনেয়ার মাদ্রাসা থেকে প্রতিবছর যেসব মেয়ে ফাজেল পাশ করে বের হয়, তাদের মধ্যে অনেকে অন্যত্র গিয়ে টাইটেল পরীক্ষা দিয়ে মহিলা মওলানা খেতাব পায়। এ মাদ্রাসার বেশ কিছু মেয়ে টাইটেল পাশ করে এখন অন্য মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করছে কিংবা পরিচালিকা বা অধ্যক্ষা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। রাজধানী ঢাকা শহরে আধুনিক বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও এখানে আর কোনো আবাসিক মহিলা সিনেয়ার মাদ্রাসা এখনও না থাকায় এখানে ভর্তিচ্ছু ছাত্রীদের ভিড় অনেক বেশি। কিন্তু স্থানাভাবে নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত কোনো ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হয় না।

মরহুম শেখ মোখলেসুর রহমানের অবদানসমূহের মধ্যে মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠা দেশ ও জাতি-ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তারই একটি ফসল। যে মুহূর্তে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের আলেমদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে মহিলাদের উচ্চ দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তেমন গুরুত্ব পায়নি, সে সময় রাজধানী ঢাকার বুকে মহিলাদের জন্যে উচ্চ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি সত্যিই আল্লাহ্‌র কাছে এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে মর্যাদার এক আলাদা আসন করে নিয়েছেন।

মদীনাতুল উলূম সিনেয়ার ফাজেল মাদ্রাসা (বালক শাখা)

রহমতে আলম ইসলাম মিশনের পরিচালনাধীন বালক শাখার সিনেয়ার মাদ্রাসাটি চার তলা বিশিষ্ট। মাদ্রাসাটির ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ৪০০ শতের উপরে। এটিও আবাসিক মাদ্রাসা। বালক শাখার ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ ছাত্রাবাসে অবস্থান করে লেখাপড়া করে। মাদ্রাসার বালক শাখাতেও বহু এতীম ছাত্র লেখাপড়া করে। মাদ্রাসার বালক এবং বালিকা শাখা দু'জন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষের অধীন পরিচালিত।

ইসলাম মিশন এতিমখানা

পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় এতীম সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়ানো, তাদের লালন পালন করে বড় করে তোলা, অধিকন্তু শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে

মানুষ করা, উপার্জনক্ষম করা, বিবাহ যোগ্য। এতীম মেয়েদেরকে সুপাত্র দেখে পাত্রস্থ করা ইত্যাদি কাজের চাইতে মানবিক মহান কাজ আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের দেশের কত এতীম গরিব অসহায় শিশুর সেবা ও লালন-পালনের নামে কত শিশু যে এ পর্যন্ত অন্যদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়েছে — বিশেষ করে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা খৃষ্টান হয়ে গেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। জনদরদী ও ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান একারণেই তাঁর বহু আকাংখিত রহমতে আলম ইসলাম মিশনের কাজের সূচনা করেন এতীমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এতীমদের লালন-পালনই খোদ্ একটি বড় দায়িত্ব, এসাথে তাদের উচ্চ শিক্ষা দানের কাজটি যে আরও কত বড় এবং কষ্টসাধ্য কাজ, তা সহজেই অনুমেয়। কোনো হৃদয়বান এবং ধৈর্য্য ও সহনশীল ব্যক্তি ছাড়া এ কাজ অপরের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যেখানে এতীমদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা ইত্যাদি খরচের অর্থ অনিশ্চিত থাকে—অপর মানুষের দানের দিকে সম্পূর্ণ তাকিয়ে থাকতে হয়, সেক্ষেত্রে শত শত এতীম ছেলেমেয়ে লালন-পালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্বটি যে কত বড় এবং জটিল, তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বলতে পারেন। রহমতে আলম ইসলাম মিশন এতীমখানার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খাওয়া-পরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তেল-সাবান, কলম-কালি, খাতাপত্র, এতীমখানার পক্ষ থেকেই দেয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানটির হেফজখানা থেকে প্রতি বছর স্বল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা কোর-আন হেফজ করে বের হয়।

এই বিরাট প্রতিষ্ঠনটির পরিচালনাধীন বিভিন্ন শাখার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা প্রায় শতের কাছাকাছি। পর্যাপ্ত মহিলা মোদার্রেসার অভাবে মহিলা মাদ্রাসায় কিছু পুরুষ শিক্ষকও রয়েছেন। অবশ্য তাঁরা মহিলা মাদ্রাসার উচ্চ ক্লাসসমূহে পড়ানোর সময় ক্লাসের মাঝখানে টানানো পর্দার বিপরীত দিকে থেকেই ছাত্রীদের শিক্ষাদান করে থাকেন।

মরহুমের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ভবন

ইসলাম মিশনের অধীন পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আলাদা আলাদা ভবন ছাড়াও (১) একটি দোতলা জামে মসজিদ রয়েছে (২) মদীনাতুল উলূম বালিকা মাদ্রাসাটি ৬ তলা বিশিষ্ট একটি বিশাল ভবন। এ ভবনের মধ্যে পাঠ কক্ষ ছাড়াও রয়েছে ছাত্রীবাস এবং নীচতলায় গ্যাসের চুলাযুক্ত বাবুর্চিখানা। রয়েছে মহিলা

কর্মচারীদের থাকার স্থান। বালক শাখার মাদ্রাসা ভবনটি ৪ তলা বিশিষ্ট ইমারত। এ ছাড়া ৩টি বিরাট টিনশেড রয়েছে, যেগুলোতে ছাত্র-শিক্ষকগণ ও পুরুষ কর্মচারীরা থাকেন। রহমতে আলমে ইসলাম মিশনের মাসিক ব্যয় কয়েক লাখ টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান হারের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা দ্বয়ের জন্যে হোস্টেলের তীব্র প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য বিভাগ ও কারিগরি শিক্ষাদানের দুটি আলাদা বিভাগও মিশনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো ভবন না থাকায় এ দুটি বিভাগের কাজ এখনও সন্তোষজনকভাবে চালানো যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র ডাইনিং রুমের ব্যবস্থাও একই কারণে করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান বিভাগের জন্যেও স্বতন্ত্র কোনো ভবনের ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি।

এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকারীদের শরীরচর্চার জন্যে কোনো ময়দান নেই। ভবিষ্যতে মাদ্রাসার বালক শাখাটি টঙ্গীর পূর্বোল্লেখিত স্থানে সরিয়ে নেয়া হলে বালক বালিকা উভয় শাখার জন্যেই মঙ্গলজনক হবে বলে আশা করা যায়। মরহূমের কর্মময় সংগ্রামী জীবন, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে, অসহায় মানুষের সেবায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিতদের জন্যে এক বিরাট অনুপ্রেরক। মওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান ১লা আগষ্ট ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

দাম্পত্য জীবন

মওলানা মোখলেসুর রহমান ১৯২০/২১ খৃঃ নোয়াখালী সেনবাগ থানার ঠনার পাড়ের প্রসিদ্ধ আলেম মৌঃ মোহসিনের কন্যা সালেহা খাতুনকে প্রথম বিবাহ করেন। এ ঘরে বর্তমানে তাঁর এক পুত্র সন্তান রয়েছে, যার নাম মৌঃ জাকারিয়া। মরহুমের দ্বিতীয় বিবাহ হয় কলকাতায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লার হাজীগঞ্জ থানার অজাগরা গ্রামের প্রফেসার মওলানা সিরাজুল হক সাহেবের কন্যা জোহরা বেগমের সাথে। পর্দা-পুশিদা সংক্রান্ত বিষয়কেন্দ্রিক বিরোধের ফলে সে বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এ সংসারে তাইয়্যেবা নামে তাঁর এক কন্যা সন্তান ছিল, সে প্রায় বিবাহযোগ্যা হবার পর মারা যায়। এ বিবাহবিচ্ছেদের পরও উক্ত শ্বশুরালয়ের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মরহুম ও তাঁর সন্তানেরবেশ সদ্ভাব ছিল। কারণ, তারা তাঁকে বেশ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

বলাবাহুল্য, পরে জোহরা বেগমের বিবাহ হয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিক পর-লোকগত জনাব তাজুদ্দীনের সাথে, যিনি বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মওলানা মরহুমের তৃতীয় বিবাহ হয় নোয়াখালীর বালুচরে। সে সংসারে আমেনা বেগম নামক তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। কিছুকাল পরে স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫০/৫২ সালে চতুর্থ বিবাহ করেন কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিলাউর গ্রামের কাজী মুজিবুর রহমানের কন্যা জাহিরা বেগমকে। তাঁর সেই স্ত্রীর গর্ভে বর্তমানে মাশহুদা নাম্নী এক কন্যা রয়েছে, যে এখনও শিক্ষার্জনে রত। উল্লেখ্য যে, কুমিল্লার কসবা থানার বিখ্যাত আড়াইবাড়ীর পীর মরহুম মওলানা গোলাম জিলানী এ দাম্পত্য সম্পর্কের দিক থেকে তাঁর ভায়েরাভাই ছিলেন।

———

সংগ্রামী সাধক পীর মওলানা হাফেজ্জী হুজুর

[জঃ ১৯০০খৃঃ—মৃঃ ১৯৮৭ ইং]

মূল্যায়ন

সংগ্রামী সাধক পীর মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর এই উপমহাদেশের সেসব খ্যাতনামা আলেমদেরই একজন, যারা কোরআন, হাদীস, তাফসীর, অসূল, ফেকাহ ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞান বিস্তারকল্পে একদিকে মাদ্রাসার মাধ্যমে আজীবন দ্বীনের সেবা করে গেছেন, অপর দিকে রোশ্‌দ ও হেদায়াত, ওয়ায-নসীহত ও 'তাযকিয়া-এ-কলবে'র সাহায্যে মানুষের চারিত্রিক উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। হাফেজ্জী হুজুর তাঁর কর্মজীবনের বিরাট অংশ বিভিন্ন মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে ব্যয় করেন এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীনী শিক্ষা-প্রশাসনের বাস্তব প্রয়োগের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন অনেক বিলম্বে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর বিলম্ব আগমনের ফলে এদিকের কাজে তিনি যে বিরাট বাস্তব অবদান রাখতে সক্ষম হতেন, তাঁর বার্ধক্য তাঁকে সেটি করার সুযোগ দেয়নি। তথাপিও অশিতিপর এ বুযর্গ ব্যক্তির রাজনীতির ময়দানে ধুম-কেতুর ন্যায় আগমন এবং ১৯৮১ সালে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোট লাভ, এটিও খোদ্ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর একটি অসামান্য দান হিসাবেই ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কারণ, হাফেজ্জী হুজুরের ন্যায় মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত কিংবা পীর-মুরীদীর দ্বারা ওয়ায-নসীহতের সাহায্যে মানুষকে দ্বীনের অনুসারী করার কাজে নিমগ্ন হাজারো ওলামা-মাশায়েখ যারা প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে দুনিয়াবী কাজ ভেবে এ থেকে দূরে ছিলেন, এতে তাঁরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। রাজ-নৈতিক কর্মতৎপরতা ছাড়া কোরআনের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক, অপরাধ দণ্ডবিধি ইত্যাদি আইনসমূহ সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করা যে সম্ভব নয়, এ বাস্তবতা তাঁরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। একটি মুসলিম সমাজে রাজনীতিতে না আসলে, ক্ষমতায় না গেলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইনবিধি এবং হুকুম-আহকামের উপর আমল করা যায় না। সম্ভব হয় না রসূল (সা) ও সাহাবা-এ-কেরামের সুন্নত ও আদর্শের পূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করা। আর তা না হলে একজন মুসলমানের

পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন কতদূর সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা চলে। হযরত (সা) মা আনা আলাইহি ও ওয়া আস্হাবী বলে তাঁর 'প্রকৃত অনুসারী ও জান্নাতী' হিসাবে ঐ সকল ব্যক্তিকেই উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর ও সাহাবীদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগের নীতি আদর্শের উপর অটল। তাঁদের নীতি আদর্শ রাজনীতি নিরপেক্ষ ছিলনা। হযরত (সা) ও সাহাবীরা জানতেন, মদীনার শাসন ক্ষমতাকে ইসলামী নেতৃত্বের আওতায় না আনা হলে কোরআনের রাষ্ট্রীয় আইনসমূহ প্রয়োগ সম্ভব নয়। ইসলামের দুশমন ও মুনাফিকরা ক্ষমতায় বসে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনের অইন জারী করবে কোন দুঃখে? —এসব মোটামোটা কথা তাবলীগে জামায়াতের সাথে সংশিষ্ট অনেককে বুঝাবার চেষ্টা করেও দেখা গেছে কোনো ফায়েদা হয় না। কিন্তু '৮১ সালে দেখা গেল, হাফেজ্জী হুজুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন। এ শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন লোকদের ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যে ত্রুটি ছিল, যার কারণে মুসলিম সমাজকে অনেক দুর্গতি ভোগ করে আসতে হচ্ছে, হাফেজ্জী হুজুরের এটিই অবদান যে, তিনি দেশের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও খেলাফত আন্দোলনের ন্যায় রাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করে এক শ্রেণীর আলেম, পীর ও ইসলামপ্রিয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পর্কীয় এ খণ্ডিত ধারণার অসারতা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েগেছেন। মাদ্রাসায় আজীবন শিক্ষকতার মাধ্যমে এক দিকে দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার এবং অপর দিকে দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসা রীতি অনুসারে খানকাহ্‌র সূফী-সাধকদের অনু-করণে মানুষের তাযকিয়া-এ-নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধির কাজ করার পর হাফিজ্জী হুজুর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় বৃদ্ধকালে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে কেবল আজকের রাজনীতিনিরপেক্ষ এক শ্রেণীর ইসলামী লোকের ধর্মীয় চিন্তার ভ্রান্তি-কেই তুলে ধরেননি বরং যে চিন্তার ধারাবাহিকতা এ দৃষ্টিভঙ্গিকে জন্ম দিয়েছে, সে ব্যাপারেও তাঁর এ ভূমিকা পুনঃর্মল্যায়নের আহ্বান জানায় বৈ কি।

ধর্মীয় চিন্তার দুই স্রোত ধারা

কথাটি আরও খুলে বলতে হয়। মুসলিম ইতিহাসের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার পর ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে দু'টি স্রোতধারার সৃষ্টি হয়। (১) একটি সূফী ভাবধারা, যার

একাংশে রয়েছে জাগতিক বিষয়-আশয়ের চিন্তা-ভাবনার প্রতি অনীহা এবং বৈষয়িক জীবনের প্রতি উপেক্ষা ও অনাসক্তির ভাব নিয়ে ফানাফিল্লাহ্ হবার চেতনা, নিজেকে আল্লাহ্‌তে বিলীন করে দেবার গভীর প্রেরণা। সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সমাসীন বিলাসী, ইন্দ্রীয়পূজারী, দুর্নীতিবাজ, অসাধু, জালিম নেতৃত্ব এবং বাতিল তাগূতী শক্তিকে অপসারণের কোনো জেহাদী চেতনা, এই দৃষ্টিভঙ্গি বা কর্মসূচীতে বড় একটা দেখা যায় না, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় মহানবী (সা) এবং তাঁর ঈমানদীপ্ত সংগ্রামী সাহাবীদের জীবনে। ফলে আজ শত ওয়ায-নসীহত সত্বেও আমাদের সমাজের কর্মক্ষম যে-শ্রেণীটি রয়েছে, তাদের মধ্যে ধর্ম-বিমুখতার ভাব সক্রিয়। বলাবাহুল্য, এ ধারাটির উদ্ভব তখন থেকেই ঘটতে থাকে, যখন ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতার আসন 'খেলাফত আলা মিনহাজিন্নবুওয়াৎ' এর অনুসারীদের বদলে রাজতন্ত্রীদের হাতে চলে যায়। তখন পরাক্রমশালী শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলে জীবনের ঝুঁকি নেয়া কিংবা সমাজে গোলযোগ সৃষ্টির আশংকা করে এক শ্রেণীর আল্লাহ্‌ভক্ত লোক হুজরাতে গোশানিশীনী এখতেয়ার করে নির্ঝন্ঝাটে আল্লাহ্‌বিল্লাহ্ করাটাই শ্রেয় মনে করেন। দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে আবুজেহ্‌ল বসলো কি আবু লাহাব, ফেরাউন না নমরূদ, সে ব্যাপারে তাঁরা কোনোই মাথা ঘামাননি বা তা নিয়ে চিন্তা করলেও কার্যকরভাবে করেন নি। বরং সংঘাত-সংঘর্ষ ও সমালোচনা এড়িয়ে তাঁরা এভাবে আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ্‌প্রাপ্তি এবং জান্নাত লাভ ও খোদার দীদার হাসিলের পথ বেছে নেন। আর এসব শাসক আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর চালিয়েছে অত্যাচার, করেছে শোষণ নিয়ে গেছে তাদের দ্বীনের বদলে গোমরাহীর দিকে।

(২) ধর্মীয় চিন্তার অপর যে ধারাটি চলে আসছে, সে ধারায় রয়েছেন ইসলামী মণীষী, ওলামা, ইমাম-মুজতাহিদ এবং আওলিয়া মাশায়েখের ঐসব মহৎ ব্যক্তিত্ব, যাদেরকে একদিকে যেমন দেখা যায় ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ ও জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গবেষণা করতে, তেমনি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুশাসনকে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সকল স্তরে পথনির্দেশনা দিতে। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা-কর্মের দ্বারা সকল স্তরের সকল বিধি-বিধানসমূহ সুবিন্যস্ত

আকারে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতিটি বিধিবিধানকে তাঁরা পুংখাণুপুংখরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পূর্ণ একটি ইসলামী সমাজের কাঠামো তৈরি করে যান। এ দ্বিতীয় ধারাতেই সেসব মহামণীষী এবং ওলী-আওলিয়া মাশায়েখের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সীরাত-এ-রসূল (সা) ও সীরাত-এ-সাহাবার অনুকরণে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বসহ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ্‌র বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন ভাবে জেহাদ ও সংগ্রাম করেন এবং কোরআনোক্ত ঈমানী পরীক্ষায় উত্তরণের স্বাক্ষর রেখে যান। নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে আবু জেহেলী কিংবা আবু লাহাবী মতাদর্শের কোনো বাতিল ও তাগূতী শক্তিকে বরদাশ্‌ত করাতো দূরের কথা, কোরআন-সুন্নাহ ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শ থেকে বিচ্যুত কোনো মুসলিম শাসক ও নেতৃত্বকে তারা বরদাশ্‌ত করতে রাজী ছিলেন না, যেমন ছিলেন না শহীদ-এ-কারবালা ইমাম হোসাইন (রা) ও তাঁর অনুগামীরা। তাঁরা মহানবী (সা)-এর সেই হাদীসের উপরই পূর্ণ আমল করে গেছেন, যেখানে বলা হয়েছে—"অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও সত্য কথা বলাই উত্তম জেহাদ।" তাঁদের সামনে ছিল আনুগত্যের প্রশ্নে মহানবী (সা)-এর সেই নীতিনির্ধারণী বাণী, যাতে বলা হয়েছে—"যেই আনুগত্যে স্রষ্টার অবাধ্যতা রয়েছে সে আনুগত্য নিষিদ্ধ।" সর্বোপরি তাঁরা আল্লাহ্‌র সেই বাণীকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তব রূপ দেয়াকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন, যেখানে আল্লাহ্‌র অবাধ্যদের বাধা ও অসন্তুষ্টি সত্বেও তাঁর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্বকে মানুষের মনগড়া সকল আইন ও নিয়ম-বিধির উপর প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শ্রেণীর লোকদের এ রূপ দৃষ্টিভঙ্গিকে রাষ্ট্র ও সমাজ-নেতৃত্বের ঐ সকল লোক কি করে বরদাশ্‌ত করতে পারে, যারা মানব সমাজে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ভয় করে এবং জনগণের উপর নিজেদের প্রভুত্বের জন্যেই জন-সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ও জন-জনগণের অর্থ দ্বারা বৈষয়িক ভোগ-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় সমাসীন হয়? এ কারণেই দেখা যায়, ইসলামের যেসব মহান সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের ন্যায় বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে মানুষের প্রভুত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র স্বাধীন বান্দা হিসাবে জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে জেহাদ বা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের উপর রাজদণ্ডের জুলুম-নিপীড়নের নির্মম কষাঘাত নেমে এসেছে। আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে

তাঁদের কেউ কারা-নির্যাতন ভোগ করেছেন, কেউ কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, কেউ চাবুক-তরবারির আঘাতে আঘাতে শাহাদাতের শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন কেউ হয়েছেন দেশান্তরিত। তাঁদের অনেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মহানবী (সা) ও সাহাবা-এ-কেরামের মতো রণাঙ্গনে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছেন। জীবন কোরবান করে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ত্যাগ ও কোরবানীর সুমহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ ধারার ওলী-আওলিয়ার ফিরিস্তি অতি দীর্ঘ। ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শহীদ-এ-বালাকোট সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, ইসমাঈল শহীদ দেহলভী, শহীদ শেখ হাসানুল বান্নাদ, শহীদ কতুব শহীদ প্রমুখ। বাংলা-দেশে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যেও সে ধরনের আওলিয়া-এ-কেরাম কম নেই। হযরত শাহ জালাল (রহ)-এর সাথে কি অত্যাচারী রাজা গৌর গোবিন্দের সংঘাত হয়নি? দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ত্যাগের মূল প্রেরণা ছিল কোরআন-সুন্নাহ্‌, সীরাতে রসূল ও সীরাত-এ-সাহাবা। কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনা, পরবর্তী যুগে অন্যান্য মুসলিম দেশ—বিশেষ করে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত দুটি ধারার প্রথমোক্ত ধারাটির প্রভাব ও অনুসারীর সংখ্যাই বেড়ে যায়।

ইকামত-এ-দ্বীনেরপ্রশ্নে প্রথম ধারার বিরূপ প্রভাব

ফলে, আল-কোরআনের প্রতি সকলের পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এ খোদায়ী গ্রন্থের আইনকে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠার জন্যে ধর্মীয় নেতৃত্বে সাবেক চেতনার অনুপস্থিতি দেখা দেয়। অনেকে নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও এজন্যে ঝুকি নিতে ও ত্যাগ স্বীকারে রাজী নয়। বরং যারা তা করে তাদেরকেও ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। বর্তমানে সে ভাবধারার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এখনও এ ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক, যারা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দ্বীনের তথা শরীয়তে মোহাম্মদী প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামের প্রশ্নে কার্যত সুন্নত-এ-রসূল ও সুন্নত-এ-সাহাবার নীতি মেনে চলেননা। তাদের অনুসৃত নীতি ও কাজে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী সমাজ গঠনের চেষ্টা-তদবীর যেন

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের রাজনীতির মতোই শুধু ক্ষমতা দখলের একটি কাজ। ফলে, বিশাল কোরআন মজিদের আংশিক কিছু বিধানের উপরই উম্মতের আমল চলছে। কোরআনের নির্দেশিত অর্থব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অপরাধ দণ্ডবিধি, সামরিক বিধি, প্রভৃতি আইনের প্রতি কোনোই আমল হচ্ছে না অথচ সে অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় হাত দিলে তখনই ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রশ্ন আসতো। তেমনি দেশোন্নয়ন, দেশ রক্ষার অমোঘ তাগিদে মুসলমানরা কোরআন থেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা পেতো। নিজ দেশের জীবনোপকরণ হিসাবে মহান আল্লাহ্ যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন, সেগুলোর বহুমুখী ব্যবহারের জন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা ভাবতো, যার অভাবে আজ মুসলিম উম্মাহ্ অর্থশক্তি, সম্পদশক্তি, জনশক্তি ভৌগোলিক সহ-অবস্থানের শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর মুখাপেক্ষী এবং অপমানিত, লাঞ্ছিত। তেমনি কোরআনভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের ভাবধারা কোরআন-হাদীসের শিক্ষকদের মধ্যে সমভাবে সক্রিয় হলে, তারা তখন দেশরক্ষা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে কোরআন নির্দেশিত প্রযুক্তিজ্ঞানকে কাজে লাগাতো। এ নিয়ে গবেষণার কথা স্মরণ করতো। এসব না হওয়াতেই দ্বীনী চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ধারার খণ্ডিত ভাবধারা ও খণ্ডিত আমল প্রশ্রয় পেয়েছে।

রসূল ও সাহাবী জীবনের অনুসরণ ছাড়া বুযর্গ হওয়া কি সম্ভব ?

এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত ধারার ইসলামের অনুসরণ দ্বারা 'ওলীউল্লাহ' ও 'বুযর্গ' হবার কথা বলা হয়, কারামত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের কথাও শোনা যায়। এতে কেউ ওলী-বুযর্গ হলেও হতে পারেন, তবে সেটা বেলায়েত-এ-রেসালত ও সুন্নত-এ-রসূলের সাথে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। যদি এরূপ খণ্ডিত চিন্তা ও খণ্ডিত আমল বেলায়াত-এ-রেসালত, সুন্নত-এ-রসূল ও সুন্নত-এ-সাহাবার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে দুনিয়ার জীবনে তার পরিণতি কি হচ্ছে এবং আখেরাতে কি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা চিন্তা করা ঈমানী চেতনারই দাবী। বলাবাহুল্য, আমার ধারণা, মোহতারাম মওলানা হাফেজ্জী হুজুর আমাদের এই উপমহাদেশের ধর্মীয় চিন্তার উল্লেখিত দুটি ধারার প্রথ-

মোক্ত ধারাটির সাথে পবিত্র কোরআন সীরাত-এ-রসূল, সীরাত-এ-সাহাবা এবং যুগ যুগের সংগ্রামী মোজাহিদ আওলিয়া-মাশায়েখের নীতির অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করেই বার্ধক্যের সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে ইসলামী খেলাফত কায়েমের লক্ষ্যে জেহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ্র কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যে লক্ষ্যে এ উপমহাদেশে কাজ করে গেছেন সাইয়েদ আহ্মদ শহীদ বেরলভী, যেপথ দেখিয়ে-গেছেন, ইসমাঈল শহীদ দেহ্লভী, যেপথ দেখিয়ে গেছেন ১৮৫৭ সালের জেহাদে মওলানা কাসেম নানতুবী, দেখিয়ে গেছেন মওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী এবং হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহ) এবং পরে শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ) প্রমুখ সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশয়েখ। ইসলামী সাহিত্যের বহু কথিত 'রোখ্সাৎ' ও 'আযীমৎ' পরিভাষা দুটির মধ্যে আযীমতের উপর আমল করাই শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ঈমানের পরিচায়ক। রোখসাৎ-এর উপর আমল করার 'রোখসৎ' ক্ষেত্র বিশেষে থাকলেও ইকামত-এ-দ্বীনের ন্যায় ফরয কাজে এ প্রশ্রয় যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র অস্তিত্বের জন্যে মস্তবড় হুমকি, তা আজ আর কাউকে বলার অপেক্ষা রাখেনা। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত দুটি ধারার প্রথমোক্তটিকে অনেকে 'রোখসৎ' মনে করেই হয়তো করে থাকে, যা গোটা ইসলামের সৌধকেই নাড়া দিয়ে আসছে। হাফেজ্জী হুজুর জীবনের শেষ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে তথাকথিত সেই রুখসতী ধারাকে নিজের ঈমানী দাবী পূরণকল্পে যথেষ্ট মনে না করেই আযীমতের শেষোক্ত পথে হেটে বিরাট জেহাদী খেদমত আনজাম দিয়ে গেছেন। এটি তাঁর উত্তরসুরীদের জন্যে সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলার এক মস্ত বড় পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। রাজনীতিতে তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনের সময় না পেলেও এটুকুনও হাফিজ্জী হুজুরের কর্মজীবনের এবং এদেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতি মূল্যবান অধ্যায় রূপে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার রাইপুরার অন্তর্গত লুধুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব

মিয়াজী মুহাম্মদ ইদ্রীস সাহেব। নিজগ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কোরআন শিক্ষার জন্যে দূরে উপযুক্ত কোনো স্থানে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেন। বালক মুহাম্মদুল্লাহ্ ভবিষ্যত জীবনে যে একজন সাধু সজ্জন ব্যক্তি হবেন, শৈশব ও কৈশোরে তাঁর চালচলন ও হাবভাবেই তা আঁচ করা গিয়েছিল। তাই দেখা যায়, ৭।৮ বছরের একজন বালকের মধ্যে স্বাভাবিক যেই চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়, তা তাঁর মধ্যে তেমন ছিলনা। খেলাধূলা, আনন্দ, কোলাহল থেকে দূরে সরে থাকা ছিল তাঁর শৈশব জীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনি জন্মগতভাবে ছিলেন শান্ত প্রকৃতির লোক।

যে কোনো মহৎ জীবনের পেছনে কোনো মহৎ আদর্শ ও চিন্তা-চেতনাই মানুষকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা যোগায়। ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ মহান ব্যক্তিত্ব হযরত মওলানা হাফেজ্জী হুজুরের ছাত্র জীবন এবং তাঁর উজ্জ্বল ও পবিত্র কর্মজীবন ধাপে ধাপে গড়ে ওঠার পেছনেও ছিল ইসলামী আদর্শ ও সংগ্রামী ঐতিহ্যমণ্ডিত বংশধারার বিরাট প্রভাব ও অনুপ্রেরণা। হাফেজ্জী হুজুরের দাদা মওলানা মুনশী আকরামুদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদী ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ-এ-বালাকোট মওলানা সাইয়েদ আহ্‌মদ ব্রেলভীর সুযোগ্য খলীফা। নোয়াখালীর রাইপুরার অন্তর্গত লুধুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন মওলানা মুনশী আকরামুদ্দীন। তিনি একই সাথে মোজাহিদ-এ-আযম সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর অন্যতম খলীফা মওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহ)-এরও খলীফা ছিলেন। মওলানা আকরামুদ্দীনের সুযোগ্য সন্তান প্রসিদ্ধ বুযর্গ জনাব মিয়াজী মুহাম্মদ ইদ্রীস সাহেবই হচ্ছেন মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের পিতা।

শিক্ষা জীবন ঃ হাফেজ্জী হুজুরের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের চিন্তা-চেতনা ও গতিপ্রকৃতি তাঁর বুযর্গ পিতা ও পিতামহের অনুসৃত মহান পথ ধরেই অগ্রসর হয়। কিশোর মোহাম্মদুল্লাহ্‌কে এ জন্যেই দেখা যায়, কোরআন শিক্ষা ও এর মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্যে ব্যকুল হয়ে উঠতে। তাঁর এই আগ্রহ ও ব্যকুলতা অবশেষে তাঁকে মনযিলে মকসূদে 'পৌছার সন্ধান দিল। ঐতিহাসিক পানীপথে কালামে মজিদের উপযুক্ত শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানের খবর

পেয়ে তিনি গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেই সেখানে যাবার উদ্যোগ নেন। তাঁর এই উদ্যোগে নিজের পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক কোনো প্রতিকূলতাই তাঁকে বারণ করতে পারেনি। তিনি কাউকে নাজানিয়েই মাত্র তৎকালীন একটাকা বার আনা সম্বল করে বাড়ী হতে বের হয়ে পড়েন। পথের বহু বাধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে চাঁদপুর, বরিশাল ও খুলনা হয়ে যশোহর এসে উপস্থিত হতেই তাঁর সম্বল শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ যার সহায় হন, তার জন্যে মনযিলে মকসুদে পৌছার কোনো না কোনো উপলক্ষ সৃষ্টি করেই দেন। বালক মোহাম্মদুল্লাহ্‌র বেলায়ও এ জাতীয় একটি উপলক্ষ সৃষ্টি করলেন, অবশ্য তা একটি ব্যতিক্রম ধর্মী পন্থায়। তাঁর জীবনের এক তথ্যে জানা যায়, যশোহরে পৌছার পরই তিনি একটি পাগলা কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হন। স্থানীয় সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করলে সেখানকার কর্মকর্তারা তাঁকে কুকুর কামড়ের একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র পানীপথের দিকেই পাঠান। সরকারী হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি রিটার্ন টিকেটসহ পানীপথ থেকে বেশ কিছু দূরে কুকুর কামড়ের চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দেন। ভারতীয় উত্তর প্রদেশে অবস্থিত এ চিকিৎসালয়ে কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ শেষে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা তাঁকে যশোহরের ফেরৎ টিকেটে ট্রেনে তুলে দেন। কিন্তু তিনি যশোহরের পথে যখন পানীপথ ষ্টেশনে পৌছেন, তখন হঠাৎ ট্রেন থেকে সেখানে নেমে পড়েন। সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেই তিনি পথঘাটের যাবতীয় অসুবিধা অতিক্রম করে পানীপথ মাদ্রাসায় এসে উপস্থিত হন এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক প্রখ্যাত বুযর্গ আলেম মওলানা আবদুস সালামের সাথে সাক্ষাত করেন। কিশোর মোহাম্মদুল্লাহ্‌র মুখে তার সকল বক্তব্য শোনার পর বয়সের স্বল্পতা ও সফর জীবনের বিভিন্ন জটিলতার প্রেক্ষিতে মওলানা আবদুস সালাম তাঁকে দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু পরে দ্বীনী ইলম হাসিলের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেন।

পানীপথ মাদ্রাসায় কিশোর মুহাম্মদুল্লাহ্‌র পড়াশোনার কাজ যথারীতি শুরু হয়। তিনি প্রথম কোরআন হেফ্‌জ শুরু করেন। হাফেজ্জী হুজুরের ভাষায় তখন তাঁর অবস্থা ছিল এই যে,—"সারা দিন একটি দুটি রুটি

খেয়ে আমার পড়াশোনা চলতো। প্রথম দিকে নির্জণে একাগ্র চিত্তে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আমি পার্শ্ববর্তী মসজিদের এক কোণে কোরআন পাঠ করতাম। "মোসল্লীদের অনিয়মিত আনাগোনায় হেফজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকায় আমি পার্শ্ববর্তী একটি কবরেস্থানে গিয়ে কুরআন শরীফ পড়তাম—তারপর এক জঙ্গলে। সে জঙ্গলে দিনের বেলায়ও কোনো মানুষ একাকী গমন করতে সাহস পেতনা। কিন্তু আমার কাছে আল্লাহ্‌র কালাম থাকায় আমি ভয় পেতাম না।"

"হাফেজ্জী হুজুর" খেতাব

পূর্ণ মনযোগ ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে কিশোর মুহাম্মদুল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কোরআন মজিদ হেফ্‌জ করে ফেলেন। হেফ্‌জ শেষ করার পরই তিনি 'হাফেজ্জী' বলে সম্বোধিত হতে থাকেন। অতঃপর পাঠ্যজীবন সমাপ্তির পর তিনি যখন ১৩৪৪ হিঃ সালে মরহুম মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীসহ কুমিল্লাহ্‌র ব্রাক্ষণবাড়ীয়া মাদ্রাসায় সর্বপ্রথম অধ্যাপনা শুরু করেন, তখন মওলানা ফরিদপুরী (রহ) হাফেজ্জী নামের সাথে 'হুজুর' শব্দটি যোগ করেন।

পানীপথ মাদ্রাসায় হেফ্‌জ শেষ করার পর হাফেজ্জী হুজুর ভারতের সাহারানপুর মাজাহেরুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি ফেকাহ্‌, তাফসীর, মানতিক সহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ-এ গিয়ে ভর্তি হন এবং মাদ্রাসা লাইনের সর্বোচ্চ শিক্ষা দাওরা-এ-হাদীস কোর্স শেষকরে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।

থানভী দরবারে

শিক্ষাসমাপ্তির পর হাফেজ্জী হুজুর প্রখ্যাত ইসলামী জ্ঞানবিশেষজ্ঞ এবং পীর হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ)-এর নিকট আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ লাভ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় ছয় মাস থানভী (রহ)-এর সংসর্গে থাকার পর তিনি তাঁর খেলাফত প্রাপ্ত হন। হাফেজ্জী হুজুর ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভে এতই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে, তিনি দীর্ঘ ১১ বছর

এ উদ্দেশে বিদেশে অবস্থান করলেও প্রথম ৭ বছর যাবত নিজেকে একরকম অজ্ঞাতই রেখেছিলেন। অতঃপর স্বল্প সময়ের জন্যে একবার বাড়ী যান।

কর্মজীবন

হাফেজ্জী হুজুর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে ফিরে এসে ইংরেজ শাসিত মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আর্থিক দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিচলিত হয়ে উঠেন। জাতির সার্বিক অধঃপতন লক্ষ্য করে তিনি প্রথমেই ব্যাপক কোনো কর্মসূচী হাতে লওয়ার বদলে ইসলামী শিক্ষার আলো বিস্তারকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলন হোক কি অপর কোনো আন্দোলন, মুসলিম সমাজকে ইসলামী জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তুলতে না পারলে সমাজ সংস্কার ও জাতীয় কল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচীকেই সফল করে তোলা সম্ভব নয়। এ জন্যে তিনি সমাজে দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার দানের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে সর্বপ্রথম কুমিল্লাহ্‌র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষাদান কাজের সূচনা করেন। মওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী সহ তাঁর অন্যান্য যোগ্য সহকর্মীদের পারস্পরিক পরামর্শের আলোকে সারা দেশে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েমের এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহরে বসে এ জাতীয় কাজে অবদান রাখার সুবিধা অধিক বিধায় ঢাকাকে কেন্দ্র করেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এ মহৎ উদ্যোগে ব্রতী হন এবং বড় ধরনের একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন। কিন্তু এটি এমন একটি অর্থ ও কষ্টসাধ্য কাজ যা ইচ্ছা করলেই তা হয় না। তাই প্রথমে লালবাগ শাহী মসজিদে তিনি ইমামত গ্রহণ করেন। তাঁর সহকর্মী মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে জিঞ্জিরার বিখ্যাত হাফেজ হোসাইন আহ্‌মদের বাড়ীর জামে মসজিদে তাফসীর মহফিল শুরু করেন। অপর দিকে পীরজী মওলানা আবদুল ওহাব সাহেব শহরেই অন্য একটি মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। এই তিন আল্লাহ্‌র ওলী প্রায় একত্র হয়ে ঢাকাশহরে একটি বড় ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র খোলার তওফীক ও অছিলা সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতেন।

আল্লাহ্ সে দোয়া কবুল করলেন। কিছুদিন পর ঢাকার বড় কাটারা, ছোট কাটারা ও চক বাজার প্রভৃতি এলাকার মালিক জিম্মিরার উক্ত হাফেজ হোসাইন আহ্মদ মোগল যুগে নির্মিত বড় কাটারার একটি পুরাতন দালানে মাদ্রাসা খোলার অনুমতি দিলেন। হযরত মওলানা ফরিদপুরী (রহ), পীরজী হুজুর এবং হাফেজ্জী হুজুর এই তিন মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বড় কাটারায় নিজেদের মোরশিদ মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) এবং হাফেজ সাহেবের নাম মিলিয়ে হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। অতঃপর হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর এক স্বপ্নের ভিত্তিতে হাফেজ্জী হুজুরের ইমামতের স্থল লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আজকের 'জামেয়া-এ-কোরআনিয়া' লালবাগ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়, যেখানে ঐ সময় মওলানা জাফর আহ্মদ উসমানীও অংশগ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এখানে 'দাওরা-এ-হাদীস' পর্যন্ত পড়ানোর কাজ শুরু হয়। হাফেজ্জী হুজুর এ মাদ্রাসার মোহাদ্দিস ছিলেন। ঢাকা শহরে বর্তমানে ৫টির অধিক কওমী মাদ্রাসা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে এক সময় এটাই প্রধান ছিল। হাফেজ্জী ও তাঁর সহকর্মী বুজর্গদের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই লালবাগ মাদ্রাসা খ্যাতির উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। হাফেজ্জী ও তাঁর পীর ভ্রাতা মওলানা ফরিদপুরী (রহ)-এর পরিকল্পনার অধীনই এখানে দ্বীনী শিক্ষা ও তার সম্প্রসারণ কেন্দ্র রূপে লালবাগ মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয়। সারাদেশে কিভাবে মকতব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজের প্রসার দেয়া যায়, সেই পরিকল্পনা ও বাস্তব কর্মপন্থা লালবাগ মাদ্রাসায় বসেই নিরুপিত হতো। হাফেজ্জীর এ পর্যায়ের অবদানসমূহের মধ্যে সর্বশেষ উজ্জ্বল অবদান হলো কামরাঙ্গির-চরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আবাসিক উচ্চ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। কামরাঙ্গীরচরে বর্তমানে শত শত ছাত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছে। তাঁর উদ্যোগে এখানে একটি বড় মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া আরও বহু স্থানে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও তিনি অবদান রাখেন।

হাফেজ্জী ও তাঁর সহকর্মীদের দেশময় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েমের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে যে সব মাদ্রাসা কায়েম হয়, সে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার ওলামা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। অনেকে বিদেশেও দ্বীনী কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে

ইসলাম প্রচার ও এদেশকে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে নিজেদের মতো কাজ করে যাচ্ছেন। হাফেজ্জী হুজুর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী খেলাফত আন্দোলনের কাজ শুরু করায় অনেকের মনে এমর্মে ধারণা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি যে কথা বলছেন, এটা যেহেতু একটি রাজনৈতিক ব্যাপার যার জন্যে রাজনৈতিক কর্মী প্রয়োজন, সে কর্মী তিনি কোথায় পাবেন? কিন্তু ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের পর যারা তাঁকে জয় যুক্ত করার জন্যে বেশ তৎপরতার সাথে কাজ করেছেন এবং পরেও তাঁর আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখছেন, তাঁদের সংখ্যা ও হাফিজ্জীর সমর্থকদের দেখে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসলে হাফেজ্জী যে ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সে ধরনের কর্মী তিনি ঠিকই তৈরি করেছেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি নিরব ভাবে সেই কর্মীবাহিনী গড়ে এসেছেন। তাঁর অঘোষিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামী হকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে যে বিরাট বাহিনী সৃষ্টি করেছেন, তারা আধুনিক জাহিলিয়াতের ইসলাম-বৈরীতার মোকাবেলা করতে কতদূর যোগ্যতার অধিকারী, সেটি আলাদা কথা। এখানে শুধু এটাই লক্ষণীয় যে, হাফেজ্জী হুজুর নিছক দর্শকের ভূমিকা পালনকারী বেহেস্ শিষ্য-শাগরিদ তৈরি করেননি, বরং যারা তাঁর শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাঁরা ও তাঁদের উত্তরসূরীরা অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক কতিপয় ইবাদতকেই অন্যদের মতো খাঁটি মুসলমান হওয়া, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে যথেষ্ট মনে করবেন না, বরং সময় ও পরিস্থিতির দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র জমিনে তাঁরই ন্যায়বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিয়ে তারা এগিয়ে আসবেন এবং নবীজীবন ও সাহাবা-এ-কেরামের জীবনের অনুসরণে 'ফুরসানুন্ ফিন্নাহার ও রুহবানুন্ ফিল্লাইল'-এর মূর্ত প্রতীক রূপে নিজেদেরকে উপস্থাপিত করবেন।

হাফেজ্জী হুজুরের রাজনৈতিক জীবন

এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এটা সত্যিই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যে, হযরত মওলানা হাফিজ্জী হুজুর নিজের পূর্বসূরী মওলানা থানভী (রহ), শায়েখুলহিন্দ মওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান এবং শহীদ-এ-বালাকোট সাইয়েদ আহ্‌মদ শহীদ বেরলভী প্রমুখের পদাংক অনুসরণে খানকাহী কার্যক্রমের মাধ্যমেই

দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছিলেন। তিনি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে মাদ্রাসাহ্ ও খানকাহী পদ্ধতিতে একটি বিরাট ইসলামী কর্মী-বাহিনী গড়ে তোলার পর দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ও সাধারণ গণমানুষেকেও তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক করার কাজে মনোনিবেশ করেন।

বিভিন্ন শাসকের প্রতি হাফেজ্জী হুজুরের আহবান

মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন সময়কার ক্ষমতাসীন শাসকদেরকে ভ্রান্ত পথ পরিহার করে শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশ দ্বিতীয় বৃহত্তর এই মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী হকুমতে পরিণত করার আহবান জানাতেন। তাঁর অনুসৃত এ নীতির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মুরশিদ হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ)-এরই ইত্তেবা করেছেন। হযরত থানভী মরহুমও হিমালয়ান উপমহাদেশে পাকিস্তান নামে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ইসলামী চরিত্র, মনমানসিকতা ও বেশভূষা অনুসরণের আহবান জানিয়েছিলেন। (১) এ উদ্দেশ্যে থানভী মরহুম.

টীকা (১) [থানাভবনের সবচাইতে বিত্তবান ব্যক্তি থানভী দরবারের বিশিষ্ট দূত 'খানকা-এ-এমদাদিয়ার' পরিচালক ও মওলানা থানভীর ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব শাববীর আলী কর্তৃক লিখিত 'কুয়েদাদে তাবলীগ'-এ উল্লেখিত হয়েছে যে,—"১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা। একদিন দ্বি-প্রহরের খানা খেয়ে আমি অফিসে বসে কাজ করছি। হযরত থানভীও দুপুরে খানা খেয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে খানকায় তশরীফ এনেছেন। বারান্দায় এসে আমাকে ডাক দিলেন। আমি দ্রুত হাজির হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। হযরত থানভী মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছিলেন। সে সময় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তবে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃত্বের মনের গতিপ্রকৃতি অনেকটা ধরা পড়ে গেছে। নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ—সকলের মুখে একই কথা যে, হিন্দু নেতৃত্বের মুসলিমবিরোধী মনোভাবের দরুন তাদের সাথে মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক কোনো দিক থেকেই সহাবস্থান সম্ভব নয়। সুতরাং আলাদা মুসলিম

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা শাব্বীর আলী এবং উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত আলেম মওলানা শাব্বীর আহ্মদ উসমানী, মওলানা জাফর আহমদ উসমানী, মওলানা শওকত আলী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের কাছে চিঠি লিখে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র কাছে পাঠাতেন। জিন্নাহ সাহেবও হযরত থানভীর প্রেরিত চিঠি ও প্রতিনিধি দলের প্রতি অতীব সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর পরামর্শ মাফিক কাজ করার চেষ্টা করতেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি আহবান

হাফেজ্জী তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীনের সার্বিক অনুসারী হবার জন্যে ১৯৭৮ সালের মে মাসে আহবান জানান। ১০ সদস্যের একটি ওলামা প্রতিনিধি দলসহ হাফেজ্জী হুজুর প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে সাক্ষাত করেন। প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনা স্থায়ী হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রাণের দাবী ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এব্যাপারে প্রেসিডেন্টের উপর অর্পিত যে কর্তব্য রয়েছে, অবহেলা করে তিনি তা পালন না করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত আযাব সম্পর্কে তিনি তাঁকে অবহিত করেন। হাফেজ্জী হুজুর বলেন ;—"মাননীয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান! ----'মুসলমানগণ ক্ষমতার অধিকারী হইলে তাহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল খোদায়ী বিধান চালু করা।' কিন্তু আজ সীমাহীন পরিতাপের সহিত বলিতে হয় যে, আপনার এবং

রাষ্ট্র পাকিস্তান অবশ্যই গঠন করতে হবে। মওলানা থানভী দু/তিন মিনিট পর মাথা তুল্লেন এবং আমাকে যে সব শব্দ বল্লেন, আমার কানে আজও সেগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাহলো এই—

"মিঞা শাব্বীর আলী! বায়ুর গতিপ্রবাহ বলে দিচ্ছে, মুসলিম লীগই জয়যুক্ত হবে। তারাই শাসনক্ষমতার অধিকারী হবে, যাদেরকে আজ ফাসেক ফাজের বলা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষিত নেতাদের ছাড়া আলেমরা এককভাবে কিছু করতে পারবে না। এ জন্যে আমাদের এ প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন এসব লোককে (মুসলিম লীগ নেতাদের) সংশোধন করা যায়। ---তোমাদের চেষ্টায় যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নেতারা ধার্মিক হয়ে উঠে, সেটাই বরং আমাদের আনন্দের কথা।

আপনার সরকারের ছত্রছায়ায় অগণিত অন্যায়, কুকর্ম, অশ্লীলতা ও আদর্শবিরোধী আচার-আচরণ এবং অনৈসলামিক সংস্কৃতি একের পর এক জাতীয় আদর্শের উপর নগ্ন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। - - -আপনি পর্দাপ্রথার বিলোপ সাধনে এমনভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন যে, উহার ফলে ঈমান ও ও নৈতিকতার সকল সীমা লংঘিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সম্মানিত মাতৃজাতির অবমাননা ও নিরাপত্তাহীনতা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। আল্লাহ পাক এই দেশ পরিচালনার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব আপনাকে দান করিয়াছেন। প্রয়োজন ছিল যে, আপনি একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও জারী করিবেন। খোদা না করুন, যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান মোতাকে অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহর আজাব আপনার সকল শান-শওকত খতম করিয়া দিবে। তখন কেহ আপনার সাহায্যকারী থাকিবেনা।"

পরিতাপের বিষয় যে, হাফেজ্জী হুজুরের এ নসীহতের তেমন প্রভাব রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনে পরিলক্ষিত হয়নি। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গণে সৃষ্ট নৈরাজ্য এবং শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ব্যর্থ এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। এটি এক আশ্চর্য মিল যে, হাফেজ্জী হুজুর যেই তারিখে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে নসীহত করেছিলেন, তার দু' বছর পর সেই একই তারিখে (১৯৮০ খৃঃ) তিনি তাঁর একদল সহকর্মীর গুলীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তারা ইসলাম আনুযায়ী দেশ শাসন করলে তাদের হাতেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-ভার থাকতে অসুবিধা নেই।- - -ইসলামের জন্যেই ক্ষমতায় যাওয়া। তারা সে দায়িত্ব পালন করলে আমরা ক্ষমতার প্রত্যাশা করি না। আমরা এটাই চাই যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। দ্বীনদার খোদাভীরু নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা থাকুক যেন দ্বীনের প্রাধান্যই সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।" আমি একথার জবাবে বল্লাম, তবে হুযূর! এ তাবলীগ কি নিম্ন পর্যায় তথা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু হবে, না উপরস্থ নেতৃবৃন্দ থেকে? থানভী বল্লেন, "উপর থেকে শুরু করতে হবে। কেননা সময় অতি কম। উপরন্তু নেতার সংখ্যাও ততবেশী নয়। আন্নাসু আলা দ্বীনে মুলূকিহিম— "মানুষ সকল সময় নিজেদের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের নিয়ম-রীতি ও

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রূপে হাফেজ্জী হুজুর

হাফেজ্জী হুজুর তাঁর পূর্বসূরীদের অনুকরণে প্রথমে মুসলিম শাসকদের সংশোধনের চেষ্টা করেন। সে ব্যাপারে ব্যর্থতার পর দেশ থেকে যাবতীয় অনৈসলামিক কার্যকলাপ, শোষণ-বঞ্চনা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধ সহ যাবতীয় অশ্লীলতার উৎখাতের জন্যে এবং দেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক পর্যায়ে করণীয় নির্ধারণ করে ১৯৮১ সালের ১৯শে আগষ্ট ঢাকায় শীর্ষ স্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আহবান করেন। ঐ সম্মেলন দেশের বিরাজমান সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। সম্মেলনে ঐ সালেই আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওলামা-এ-কেরামের পক্ষ থেকে একক প্রার্থী দেয়ার বিষয় আলোচনা হয়। অবশেষে সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুরকেই এসম্পর্কে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়। ওলামা সম্মেলনের সমাপ্তির পর হাফেজ্জী হুজুর ২৮শে আগষ্ট ('৮১) শুক্রবার বাদে জুমা লালবাগ শাহী মসজিদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন।

চালচলনেরই অনুসরণ করে। তারা ধার্মিক হলে ইনশা আল্লাহ সাধারণ মানুষও সংশোধন হয়ে যাবে।" — (রুয়েদাদ পৃ: ১,২)

হযরত মওলানা থানভী (রহঃ) কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র কাছে ইসলামী ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ সহকারে যে প্রতিনিধি দল পাঠাতেন, সে দলের সাথে জিন্নাহ্ সাহেবের বিভিন্ন মতবিনিময় হতো। অনেক সময় মতপার্থক্যও ঘটতো, যা হয়তো পরবর্তী বৈঠকে মওলানা থানভী সাহেবের মতামতের আলোকে জিন্নাহ সাহেব স্বেচ্ছায় মেনে নিতেন। ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেব যে সব যুগান্তকারী কথা বলে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে অভূতপূর্ব ইসলামী জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন, তার পেছনে মওলানা থানভীর বিরাট অবদান ছিল।

একবার থানভীর প্রেরিত প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী। তাঁর সাথে জিন্নাহ সাহেবের "ধর্ম ও রাজনীতি" বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা আলোচনার পর প্রতিনিধি

তওবার-আহবান ও জেহাদ ঘোষণা

বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ৮১-এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে শরীক হবার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন "- - - আমি প্রচলিত রাজনীতি করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হইনি। নিছক ক্ষমতা লাভ বা গদী দখল করাও আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য ইসলামী আন্দোলনের পথ সুগম করা। আমার শেষ লক্ষ্য ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করা। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ইংরেজদের কবল হতে (৪৭ সালে) দেশ স্বাধীন করা হয়েছিল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তাব্যক্তিরা এ বিষয়ে শুধু অবহেলাই দেখাননি বরং এর বিরোধিতায়ও ছিলেন তৎপর। - - - দেশে আজ ঘুষ, দুর্নীতি ও জোর-জুলুমের অবাধ রাজত্ব। অশ্লীলতা ও বেহায়পনার প্রবল সয়লাবে দেশ ভেসে যাচ্ছে। অপকর্ম নিজে করা যেমন অপরাধ এর সমর্থন করাও তেমনি অপরাধ। এই অপরাধে আমরা সবাই অপরাধী। এরূপ চলতে থাকলে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসবে। আর এদেশে মুসলমানদের

দলের আলেমগণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সফলকাম এই বিচক্ষণ রাজনীতিককে ধর্মের সীমায় আনতে সক্ষম হন। কায়েদে আজম প্রতিনিধি দলের উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহ স্বীকার করে নিয়ে নিজের নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন :

> "বিশ্বের অন্য কোনো ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা থাক বা না থাক, আমার নিকট এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে রাজনীতি ধর্ম থেকে আলাদা নয়। বরং এখানে রাজনীতি ধর্মের অনুগত।"—(রুয়েদাদ, ৭ম পৃঃ)

এমনকি জিন্নাহ সাহেব যেখানে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় বেশভূষায় চলতেন, সেক্ষেত্রে তাঁর মাথায় টুপী এবং গায়ে শিরওয়ানী ও পায়জমা পরিধানের মতো রাতারাতি পরিবর্তনের পেছনেও থানভী (রহ)-এর পরামর্শ ও নসীহতের প্রভাবই কাজ করেছিল। দ্রঃ —"আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের অবদান"—

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অতএব আসুন, বিগত জীবনের অপরাধ হতে তওবার নিয়তে দেশে এমন শাসন কর্তৃত্বের স্বপক্ষে আমাদের ভোট-ক্ষমতা প্রয়োগ করি, যাদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় যে, তারা দেশে নিশ্চিত ভাবে ইসলামী হকুমত কায়েম করবেন।"

"দেশের আপামর জনসাধারণের ঈমান এবং জীবিকা নিয়ে যে অপশক্তি এতদিন রাষ্ট্র পরিচালনার নামে একটি নির্মম পরিহাস চালাচ্ছে, সেই অপশক্তির বিরুদ্ধেই আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছি।"

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাফেজ্জী হুজুর উল্কার ন্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি বার্ধক্যের কষ্টকে উপেক্ষা করে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ঝটিকা সফর করেন। তাঁর প্রতিটি সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। ক্ষমতাসীন সরকার হাফেজ্জীর এই জনসমর্থন দেখে তাঁকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান। '৮১-এর অক্টোবরের ৭ তারিখ রাত ৯ টায় এবং ৮ তারিখ সকাল ৮ টায় তৎকালীন ঢাকার মেয়র ও অন্যতম মন্ত্রী হাফেজ্জী হুজুরের লালবাগ কিল্লার মোড়স্থ বাড়ীতে এসে তাঁকে নির্বাচন হতে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু হাফেজ্জী হুজুর তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শাহ আজীজুর রহমান ১১ই আগষ্ট রাত ৯টায় হাফেজ্জীর বাসভবনে পৌঁছে তাঁকে বলেন,—"হুজুর আমরাই ইসলামী হকুমত কায়েম করবো, আপনি বসে গিয়ে আমাদের জন্যে দোয়া করতে থাকুন।" হুজুর জবাব দিলেন, "ইসলামের নামে ক্ষমতায় গিয়ে বিগত ৩০ বছরেও আপনারা কোনো কাজ করেননি। আপনাদের আর বিশ্বাস করা যায় না। আমি জেহাদের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি আর মুসলমানদের জন্য জেহাদের ময়দান থেকে পিছপা হওয়া হারাম।"

হাফেজ্জী হুজুর নির্বাচন থেকে সরে না দাঁড়াতে তাঁর কর্মীদের উপর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনায় অনেক জুলুম-নির্যাতনও চলে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জেহাদে হাফেজ্জী হুজুরের দলে বিরাট কর্মীবাহিনীর সমাগম ঘটে। অবশেষে '৮১-এর --- তারিখে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ্জী হুজুর ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৭৪১ ভোট পেয়ে নির্বাচনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

"খেলাফত আন্দোলন" সংগঠন কায়েম

৮৭-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষে হাফেজ্জী হুজুর দেশের ওলামা-মশায়েখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি বৈঠক ডাকেন। নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশের ইসলামী জাগরণকে আরও সক্রিয় ও সাংগঠনিক রূপ দানের উদ্দেশ্যে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে একটি ইসলামী রাজনৈতিক প্লাটফরম গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৈঠকের সুপারিশক্রমে '৮১-এর ২৯শে নভেম্বর লালবাগ শায়েস্তাখান হলে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হলের অভ্যন্তরে লোক সমাগম না হওয়াতে বাইরেও বিপুল সংখ্যক ডেলিগেটকে অবস্থান করতে হয়। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত প্রায় দশ সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও দেশবিদেশের অর্ধশতাধিক সাংবাদিকের জনাকীর্ণ এই সম্মেলনে অপরাহ্ন বেলা ৩টায় ১৫ মিনিটের সময় হাফেজ্জী হুজুর 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন-' এর নাম ঘোষণা করেন। সম্মলনে হাফেজ্জী হুজুরকে এ সংগঠনের আজীবন প্রধান হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সংগঠনের প্রধানকে অভিহিত করা হয় 'আমীরে শরীয়ত' নামে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হাফেজ্জী হুজুর

আজীবন যেই আল্লাহ্‌র ওলী দ্বীনী তালীম ও তরবিয়তের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করে আসছিলেন, যার অগণিত শিষ্য-শাগরেদ ও ভক্ত দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এবং যিনি মাদ্রাসা-মক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানের আলো বিতরণে ছিলেন ব্যস্ত, সর্বজনশ্রদ্ধেয় এমন এক বুযর্গের হঠাৎ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করায় দেশে একবিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেশের সংবাদপত্রও বিষয়টিকে বেশ ফলাও করে প্রচার করে। পরন্তু মাত্র ৫৩ দিনের প্রচারে নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ভোট প্রাপ্তিতে এবং এ উপলক্ষে দেশে-বিদেশে নানাভাবে প্রচারের সুবাদে হাফেজ্জী হুজুর আন্তর্জাতিক জগতে একজন খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। নির্বাচন শেষ হবার পর সৌদী আরব, লিবিয়া, ইরান, ইরাকসহ ইসলামী বিশ্বের কয়েকটি দেশের বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূতগণ হাফেজ্জী হুজুরের সাথে এসে সাক্ষাত করেন। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ হাফেজ্জীর আন্দোলন সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ইসলামী দুনিয়ার

বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁকে দেখার ও জানার আগ্রহ ও আমন্ত্রণ আসে। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের চক্রান্তে সৃষ্ট ইরান-ইরাকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে তখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সফলতা আসেনি। হাফেজ্জী হুজুরও এ যুদ্ধে মর্মাহত হন। ইরান-ইরাকের যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করার জন্যে ১৯৮২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হাফেজ্জী হুজুরের শান্তিমিশন উপসাগরীয় দেশ দুইটিতে সফরে যায়। সর্ব প্রথম তিনি ইরান সফর করেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী সহ বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর ('৮২) ইরানী বিপ্লবের জনক বিংশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে এযাবত কেউ ইরান সরকারকে রাজি করাতে না পারলেও হাফেজ্জী মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে কোরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব পেশ করলে ইরান তাতে সম্মত হয়। ইরান সফর শেষে হাফেজ্জী হুজুর ১২ই সেপ্টেম্বর পবিত্র হজ্জের উদ্দেশে জেদ্দায় রওনা হন। হজ্জ শেষে তিনি ৫ই অক্টোবর ইরাক গমন করেন। ৯ই অক্টোবর হাফেজ্জী হুজুর তাঁর শান্তি মিশন নিয়ে ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। উপসাগরীয় যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে হাফেজ্জী হুজুর তাঁর কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক পূর্বোল্লেখিত প্রস্তাব পেশ করেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হাফেজ্জীর এ প্রস্তাব এবং ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়নে তাঁর বিবিধ অসুবিধার কথা উল্লেখ করে হুজুরকে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, আপনার দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে কি ?" সাদ্দামের এ আকস্মিক প্রশ্নে মিশনের সকল প্রতিনিধি হতভম্ব হয়ে যান। কিন্তু হাফেজ্জী হুজুর তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশ্নের জবাবে অতি শান্তভাবে বল্লেন, **"আমার দেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদ আমার ভাই এবং আপনিও আমার ভাই। আমি উভয়কে ইসলামী হুকুমত কায়েমের দাওয়াত দিয়ে অপেক্ষা করছি, কে আগে তা কায়েম করেন।"**

হাফিজ্জী হুজুরের ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের শান্তি মিশন উভয় দেশের সামনে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের যে প্রস্তাব দিয়েছে,

মুসলিম উম্মাহ্‌ভুক্ত দুটি দেশের কাছে এর চাইতে উত্তম এবং ইসলাম সম্মত প্রস্তাব আর হতে পারেনা। যা হোক, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম ও ইসলাম বৈরিতার যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, তার পটভূমিতে হাফেজ্জী হুজুরের এই প্রস্তাব কোনো পক্ষের কাছে গ্রহীত না হওয়া এবং পরিণতিতে যুদ্ধ অব্যাহত থাকা, প্রাণ ও সম্পদ হানি ঘটা - বিস্ময়কর কিছু নয়। তবে হাফেজ্জী তাঁর শান্তি মিশনের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধের যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন, এটিও খোদ্‌ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহাসিক প্রস্তাব, যা অনেকের পক্ষেই হীনমন্যতা বশত মুখে আনা সম্ভব নয়। এর মধ্য দিয়ে হাফেজ্জী মুসলমানদের বিস্মৃত শিক্ষা ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুমহান উৎসের দিকেই গোটা বিশ্ব মুসলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন।

লণ্ডন সফরে হাফেজ্জী হুজুর

আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৫ সালের ২৯শে জুলাই ১০ জন সফরসঙ্গীসহ লণ্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। শতাধিক দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সে সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশ্বমুসলিম-ঐক্য-সংহতি এবং ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌কে রক্ষার উদ্দেশ্যে হাফেজ্জী হুজুর সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে ৫ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ সব প্রস্তাবের সার সংক্ষেপ হলো :

(১) কোরআনের আয়াত ই'তেসাম বিহাব্‌লিল্লাহ্‌-র ভিত্তিতে সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং জেহাদ অব্যাহত রাখা ধর্মপ্রাণ ওলামা বুদ্ধিজীবি সমন্বয়—আহ্‌লুলহাল্লে ওয়াল আক্‌দ—দ্বারা খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করা। একটি মজলিসে শূরার পরামর্শে খলীফা বা আমীর মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করবেন।

(২) খেলাফতের প্রধান কর্মস্থল হবে মক্কা অথবা মদীনায়।

(৩) একটি ওলামা বোর্ড উপসাগরীয় যুদ্ধ সহ সকল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করবে। কোনো পক্ষ বোর্ডের রায় অমান্য করলে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সে পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে বসে আনবে।

(৪) মুসলিম দুনিয়ার যোগাযোগের ভাষা হবে আরবী এবং খেলাফতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে আরবী আর 'খেলাফতে ইসলামিয়ার' একটি বেতার কেন্দ্র থাকবে।

(৫) বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগা-যোগ রক্ষাকল্পে একটি বিশেষ সমন্বয় কমিটি গঠন করা। ইসলামী আন্দো-লন সংস্থাগুলোকে সহায়তাদান এবং ইহুদীদের কবল থেকে ফিলিস্তীন ও প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি বায়তুলমাল গঠন করা।

হাফেজ্জী হুজুরের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের ঘোষণা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে শত্রুমিত্র সকলের মধ্যে বিরাট অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়।

তওবার আহবান জানিয়ে যেই বুযর্গ রাজনৈতিক অঙ্গনে এসেছিলেন, তিনি যে একটি সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রখেই এ ডাক দিয়েছিলেন, এটা তাঁর পরবর্তী কর্মতৎপরতার দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি চেয়েছিলেন, সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ চরিত্রের মুজাহিদদের দ্বারা সমাজ বিপ্লব ঘটাতে, সেই সমাজ বিপ্লব সমাজজীবনের সকল স্তরের জালিম, শোষক ও প্রতারক নেতৃত্বের জন্যে সকল যুগেই আতঙ্ক হয় বৈ কি।

যেই বিপ্লবী আহবান নিয়ে মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর জীবনের শেষ পর্বে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নিজের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান করণীয় সম্পর্কে পথ-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, তা আজকের বিশ্বইসলামী রেনেসাঁরই দাবী। তাঁর অসমাপ্ত কাজকে 'মনযিলে মকসূদে' পৌঁছানোর মধ্যে যেমন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিচয় সত্তা ও উন্নতি নির্ভরশীল, তেমনি তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা'র সার্থক প্রকাশও একমাত্র ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত থাকার মধ্য দিয়েই সম্ভব।

ইনতেকাল

উপমহাদেশের খ্যাতনামা অন্যতম বুজর্গ এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বল্প সময়ের জন্যে আগত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী বিশ্বে খ্যাত মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৭ সালের ৭ই মে বৃহস্পতিবার পৌনে তিনটার সময় ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ৯৯ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। পরদিন শুক্রবার বেলা পৌনে ৩টার সময় জাতীয় ঈদগাহ্‌ ময়দানে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ্জী হুজুরের জানাজাতে

হাজার হাজার ওলামা এবং বিভিন্ন পীর-মাশায়েখ সহ সমাজের সকল শ্রেণীর প্রায় আড়াই লাখ লোক অংশ গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট ইরশাদ এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ জানাজাতে শরীক ছিলেন।

সংবাদপত্রের অভিমত

"দেশের প্রবীণ ও খ্যাতনামা আলেম মওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর চিরকালের জন্যে দেশবাসী থেকে বিদায় নিয়েছেন। --- বর্ষীয়ান আলেমও ও রাজনৈতিক নেতা হাফেজ্জী পরিণত বয়সে ইনাতেকাল করলেও তাঁর তিরোধানে আমরা শোকাহত। হাফেজ্জী ১৯৮১ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে এলেও এদেশ ও সমাজের সেবাকর্ম করে আসছেন তিনি তাঁর গোটা জীবন ধরে। শেষের কয়টি বছর ছাড়া সাধারণতঃ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজেই তাঁর গোটা জীবনকে তিনি নিয়োজিত রাখেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় অধ্যাপনা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এ কাজ করেন। হাফেজ্জীর গোটা জীবন আধ্যাত্মিক সাধনায়, জ্ঞানচর্চায় ও শিক্ষা বিস্তারে অতিবাহিত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বহু মাদ্রাসা রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাঁরা দেশ-বিদেশে জাতি-ধর্মের সেবা করে চলেছেন। মরহুম মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও পীর মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-এর খেলাফত-প্রাপ্ত ছিলেন। সারাদেশব্যাপী রয়েছে তাঁর বহু শিষ্য-মুরীদান।

হাফেজ্জী ১৯৮১ সালের ২৮শে আগস্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে রাজনীতিতে অবতরণ করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষে তিনি ২৮শে নবেম্বর এক ওলামা সম্মেলনে 'খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁকে ঐ দলের নেতা নির্বাচন করা হয়। তাঁর এই রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রের শাসক-জনগণ সকলকে আপন আপন পূর্ব অপরাধসমূহ থেকে ফিরে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। হাফেজ্জীর অনেক অবদান রয়েছে। তবে তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় অবদান আমরা যেটাকে মনে করি, সেটা হলো তাঁর বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতিতে আগমন করা। হাফেজ্জী যেই দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন করে আলেম হয়েছিলেন, সেই দেওবন্দের ওলামা কেরামের রাজনৈতিক সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। তবে এও ঠিক যে, পরে অনেকে ঐরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির

উপর শেষ পর্যন্ত খুব কমই অটল থেকেছেন, যদ্দরুন এক শ্রেণীর আলেম ও মাশায়েখের মধ্যে রাজনীতি চর্চাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং একে সম্পূর্ণ এক দুনিয়াবী ব্যাপার গণ্য করা হতো। খোদ হাফেজ্জীসহ অনেক বিশিষ্ট ওলামাকে আশির দশকের শুরু পর্যন্ত রাজনীতিতে নামানো যায়নি। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ঠিক এমন একটি প্রেক্ষাপটে খোদ্ হাফেজ্জীর উপলব্ধি এবং রাজনীতিতে আগমন, অনেক ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী ব্যক্তির রাজনীতি সংক্রান্ত গোমরাহী দূরীকরণে বিরাট সহায়ক হয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে দুনিয়াবী কাজ বলে এক শ্রেণীর আলেম মনে করতেন, তারা এ থেকে উপকৃত হন। অতএব হাফেজ্জীর এই অবদানকে নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলতে হয়।

হাফেজ্জী সমাজ থেকে জুলুম নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা এবং দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধসহ যাবতীয় অশ্লীলতাকে উৎখাতের আহবান জানাতেন। তিনি এজন্যে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য বলে মনে করেই দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নামেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই লক্ষ্যে তাঁর সাধ্যমতো তিনি কাজ করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ পরিস্থিতিতে ইসলামী রাজনীতি হাত পেতে পাকা ফলের মতো কোনো রেডিমেড ফল লাভ করতে পারে না। এ কারণেই ইচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব না থাকা সত্বেও তাঁর রাজনৈতিক উদ্যোগসমূহে আকাংখিত সাফল্য তিনি অর্জন করতে পারেননি। তবে সফলতা ব্যর্থতার সত্যিকার বিচার এ ভাবে হয় না। সাধ্য অনুসারে আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা করাই বান্দার দায়িত্ব, ফলাফলের মালিক আল্লাহ্। সুতরাং তিনি চেষ্টা করেছেন, এটাই তাঁর সাফল্য। আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও উদ্যোগের জাযাহ্ দান করুন। তাঁর সকল দ্বীনী খেদমতের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁর জান্নাত নসীব করুন, এই প্রার্থণা আমরা জানাই।" —**দৈনিক সংগ্রাম** [১০।৫।৭৮]

ফখরেবাঙ্গাল মওলানা তাজুল ইসলাম

[জঃ ১৮৯৬—মৃঃ ১৯৭১-২ খৃঃ]

বাংলাদেশের ওলামা-এ-কেরাম সমাজ সেবা, দ্বীনী ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার আলো বিস্তার, সমাজের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন এমনকি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা রক্ষায় চিরকাল যে অবদান রেখে আসছেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক তার যেমন সঠিক মূল্যায়ন এদেশের লেখক বুদ্ধিজীবি মহলে হয়নি, তেমনি এসমাজের কোটি কোটি মুসলমানের ঈমান বিনষ্টের জন্যে একেক সময় ধর্মের আবরণে দেশীয় ও বিদেশী যে সব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আলেম সমাজ এদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় লৌহকঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলে ছিলেন এবং ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছেন, তারও কোনো যথার্থ মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। অথচ তাঁরা যদি যোগ্যতা, সাহসিকতা ও নিষ্ঠা-আন্তরিকতা নিয়ে এদেশের মুসলমানদেরকে ঈমানবিধ্বংসী ঐসকল ফিৎনা থেকে রক্ষা না করতেন, তাহলে আমাদের এই মুসলিম ভূখণ্ডের জাতীয় পরিচিতি বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতো। বৈরুতসহ আরও দু একটি মুসলিম ভূখণ্ডের ন্যায় নিজেদের জাতিসত্তায় যেমন ভাঙ্গন দেখা দিতো, তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে এদেশ অন্যদের মতাদর্শের অনুসারী হয়ে পড়তো, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসজনিত বিভিন্নতার ফলে দ্বন্দ্ব কলহের আগুনে সবকিছু ছাই ভস্মে পরিণত হতো। আজ যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে বস্তুবাদী দর্শন—পুঁজিবাদ সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশে আমাদের জাতীয় রাজ নীতির অঙ্গণে অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুন লেগেই আছে, আলেমদের প্রচেষ্টায় তখন ঐ সব ভ্রান্ত মতাদর্শ উৎখাত না হলে আজকের এ গুলো সহ অবস্থা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো, তা ভাবতেও পীড়া অনুভূত হয়। কোটিকোটি মুসলমানের এই দেশে যে সব বিজ্ঞ আলেম বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় আবরণের ঈমানবিধ্বংসী ফিৎনা সমূহ (যেমন কাদিয়ানী ও খৃষ্টান মতবাদ)-এর হাত থেকে এদেশের মুসলমানদের ঈমানকে রক্ষা করেছেন, তাঁরা অতীব উজ্জ্বল, প্রশংসনীয় ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কাদিয়ানী মতবাদ

খণ্ডনে বৃহত্তর কুমিল্লাহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মওলানা তাজুল ইসলাম এবং খৃষ্টান মতবাদ খণ্ডনে প্রখ্যাত বাগ্মী মুনশী মেহেরুল্লাহর নামশীর্ষে। বাংলাদেশের এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব উল্লেখিত দুটি ঈমানী ফিৎনার প্রতিরোধে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সেই ভূমিকা যথার্থ অর্থেই সংগ্রমী ভূমিকা ছিল। মুনশী মেহেরুল্লাহ্ প্রসঙ্গ গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এখানে ফখরে বাঙ্গাল মওলানা তাজুল ইসলাম সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা আলোচনা করবো।

কাদিয়ানী মতবাদ খণ্ডনে

মওলানা তাজুল ইসলাম কুমিল্লাহ্‌র অন্যতম প্রাচীন মহকুমা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দ্রুত সম্প্রসারণশীল কাদিয়ানী মতবাদ প্রতিরোধে বিরাট অবদান রাখেন। একজন থেকে অন্য জন, এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়ন এভাবে পর্যায়ক্রমে যেভাবে কাদিয়ানী মত দ্রুত ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় বিস্তার লাভ করছিল এবং বহু মুসলমান ঈমান হারা হয়ে কাদিয়ানী বনে যাচ্ছিল, মওলানা তাজুল ইসলামের ন্যায় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংলাভাষী আলেম যদি সেদিন ইল্‌মী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক ভাবে তার প্রতিরোধে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়তো সারা বাংলাদেশে এই সর্বনাশা মতবাদ বহু মানুষকেই ঈমানহারা করে ইসলামের দায়েরা থেকে খারিজ করে ফেলতো। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজ কবলিত এই উপমহাদেশের মুসলমানরা যখন ইংরেজদের হাত থেকে তাদের শাসিত হৃত ভূমি পুনঃরুদ্ধার কল্পে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে এবং ফ্রন্টিয়ারের বালাকোটে ইংরেজ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত হয়, তখন থেকে ইংরেজরা মুসলিম শক্তিতে দ্বিধা-বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামের মীর্জা গোলাম আহ্‌মদকে সুকৌশলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। মীর্জাগোলাম আহ্‌মদ নিজেকে নবী বলে দাবী করে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না। যারা তাকে নবী বলে স্বীকার না করে, এমন সকল মুসলমানই তার মতে কাফের। এই লক্ষ্যে সে কোরআন হাদীসের বিকৃত অর্থ করে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বহু আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানকে বিভ্রান্ত করতেও সক্ষম হয়। মওলানা তাজুল ইসলাম হিন্দুস্তানের দারুল উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করার সময় তখন থেকেই কোরআন-হাদীস ও যুক্তি দ্বারা কাদিয়ানী মতবাদের অসারতা প্রমাণে নিজেকে একজন দক্ষ ও পারঙ্গম

ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বড় বড় আলেমদের প্রশংসা লাভে সক্ষম হন। তিনি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার প্রধান। নিজ মহকুমায় ইসলাম বিরোধী এই মতবাদের ক্রমপ্রসার দেখে তিনি তার বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন স্থানে কাদিয়ানীদের সাথে বাহাস-মোনাজারা করে তিনি তাদের এই মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হন যে, তারা গোমরাহ—মুহাম্মদী ধর্ম ইসলাম থেকে খারিজ। সেদিন যদি ফখরে বাঙ্গাল মওলানা তাজুল ইসলাম কাদিয়ানী মতবাদ খণ্ডনে এভাবে সংগ্রামী ভূমিকা পালন না করতেন, তা হলো আজ বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতো। এদেশের মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষায় মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের কাদিয়ানী বিরোধী অভিযানের উপর পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ তৈরি হতে পারে।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষাজীবন

মওলানা তাজুল ইসলাম ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা জেলার সাবেক মহকুমা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত নাসীরনগর থানাধীন ভুবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আনওয়ারুদ্দীন একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তিনি সিলেটে। সিলেট গভর্ণমেন্ট মাদ্রাসা থেকে তিনি ১ ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ফাজিল পাশ করেন। পরে দারুলউলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা-এ-হাদীস পাশ করেন। তাঁর উস্তাদ বর্গের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন (১) আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মওলানা শাব্বীর আহ্মদ উসমানী, মিঞা সাহেব সৈয়দ আসগর হোসাইন, মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী ও মুফতী আজীজুর রহমান প্রমুখ। বাংলাদেশের যে কয়জন আলেম আরবীবিদ এবং আরবী ভাষা সাহিত্যের উপর পাণ্ডিত্ব অর্জন করে আরবী কবিতা, গদ্য ও গ্রন্থ রচনা করে নিজেদের ইলমী যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে মওলানা তাজুল ইসলামের নামও শীর্ষস্থানীয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আরবীতে ভাবগম্ভীর ও পাণ্ডিত্বপূর্ণ কবিতা রচনা করে দেশ-বিদেশের বহু আরবী সাহিত্যিক পণ্ডিত ব্যক্তিদের তাক লাগিয়ে গেছেন। তাঁর মতো বাংলাভাষী আরও

যেসব আরবীভাষাবিদ, পণ্ডিত ও বিজ্ঞ আলেম এদেশে ছিলেন, তাদের অবদানের উপর বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন।

মওলানা তাজুল ইসলাম দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সময়ই ধর্মীয় ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারকারীদের সাথে বিতর্কে ও তাদের মতবাদ খণ্ডনে বিশেষ নিপুণতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দেওবন্দে অধ্যয়ন-কালে উস্তাদগণ তাঁকে কাদিয়ানী, রাফেজী, মুনকের-এ-হাদীস ও আরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাথে বাহাস-মোনাজারা করার জন্যে পাঠাতেন। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও দ্বীনী জ্ঞানের গভীরতার কাছে তাদেরকে হার মানতে হতো।

পাঞ্জাবে আরবী কবিতার সাহায্যে বিতর্ক

কথিত আছে যে, তিনি একবার দেওবন্দ মাদ্রাসায় পরীক্ষা দিচ্ছেন। এমন-সময় খবর এলো পাঞ্জাবের কাদিয়ানে মুসলমানদের সাথে কাদিয়ানীদের এক বড় বাহাস। সেখানে একজন মোনাজের না গেলেই নয়। উস্তাদগণ মওলানা তাজুল ইসলামকে কাদিয়ানীদের সাথে মোনাজারা করে খৎমে নবুওয়াতের আকীদার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্যে পাঞ্জাবে পাঠান। বিরুদ্ধ পক্ষ বিতর্কের প্রাক্কালে বলে উঠলো যে, তাৎক্ষণিকভাবে রচিত আরবী কবিতার সাহায্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। মওলানা তাজুল ইসলাম তাদের শর্ত মেনে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। তিনি শতাধিক কবিতা শেষ করার পর কাদিয়ানীরা বাহাস-ক্ষান্ত দিয়ে উর্ধশ্বাসে পলায়ন করে। মুসলমানদের খৎমে নবুওয়ত আকীদার শ্রেষ্ঠত্বকে অনেক কাদিয়ানী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও অধ্যাপনার জীবন

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানীর কাছে বয়আত হন। ধর্ম প্রচার, বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও বাতিল মতবাদ খণ্ডনে অবদান রাখার সাথে সাথে তিনি জাতীয় রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম নেতা। তবে তাঁর জীবনের দ্বীনী সেবা-

কর্মের অধিকাংশ সময় মাদ্রাসার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারেই অতিবাহিত হয়েছে। দেওবন্দ থেকে আসার পর তিনি সর্বপ্রথম অধুনা হাইস্কুলে পরিণত গুয়াগাজীর (সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী আশরাফুদ্দীন আহমদ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত) ইসলামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কুমিল্লার সৈয়দবাড়ীর সম্মুখস্থ মাদ্রাসা জামেয়া-এ-মিল্লিয়াতে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি অধ্যাপনা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেবাগঞ্জ ইউনুসিয়া মাদ্রাসায়। এখানে অবস্থান কালেই মওলানা তাজুল ইসলাম কাদিয়ানী ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

মওলানা তাজুল ইসলাম ছিলেন একজন অকুতোভয় শ্রেষ্ঠ আলেম, প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা, ধর্মীয় বক্তা, খ্যাতনামা তার্কিক এবং বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট আরবী কবি ও আরবী সাহিত্যিক। তিনি ১৯৭১ সালে পঁচাত্তর বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনতেকাল করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর অসংখ্য ছাত্র, ভক্তবৃন্দ ও গুণগ্রাহী রয়েছে।

মুফতী-এ-আজম মওলানা ফয়জুল্লাহ (রহঃ)

[জঃ ১৮৯২ খৃঃ—মৃঃ ১৯৭৬ খৃঃ]

কোনো লোহার রং ধরে মাটির আস্তর পড়লে যেমন তার সাথে বৈদ্যুতিক তাড়ের সংযোগ ঘটলেও তাতে বিদ্যুৎ অনুপ্রবিষ্ট হয় না এবং লোহাটিকে বিদ্যুতান্বিত করা যায় না, তেমনি কোনো খোদায়ী ধর্মের মূল শিক্ষার সাথে যখন মনগড়া নিয়ম, রুসম-রেওয়াজ, বেদআত-শির্ক প্রভৃতি কুসংস্কারের আবর্জনা সংমিশ্রিত হয়, তখন সে ধর্মেরও আধ্যাত্মিক প্রাণ-সত্তা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। ধর্মের মূল শিক্ষার বদলে সেখানে ধর্মের নামে অনেক অধর্ম প্রাধান্য পেয়ে যায়। বস্তুতঃ এ ধরনের শির্ক-বেদআত, বিভিন্ন কুসংস্কার ও মানুষের মনগড়া কার্যকলাপই এক সময় ধর্মের মূল শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। স্বার্থপর অজ্ঞ লোকেরা তখন মূল ধর্মকে বাদ দিয়ে আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এমনি ভাবে মূল ধর্মে দেখা দেয় বিকৃতি এবং এর শিক্ষা-আদর্শ অজ্ঞতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। যুগে যুগে আল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন পয়গম্বরের উপর যে সব কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন, সেগুলোও একই

অবস্থার শিকার হয়ে এমনিভাবে আপন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অত:পর মানুষ এর অনুপস্থিতিতে আরও বিভ্রান্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তখন আল্লাহতায়ালা নতুন কোনো নবী পাঠান। কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর উপর তিনি যে কিতাব নাযিল করেন, কেয়ামত পর্যন্ত সেটিকে তিনি বিভিন্ন অছিলায় অবিকৃত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই দেখা যায়, নানা প্রকার কুসংস্কার, অপব্যাখ্যা ও বেদআত-শির্কের আবর্জনা এসে যখন ইসলামের মূল শিক্ষা ও প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করার উপক্রম হয়, তখনই আল্লাহ্ কোনো না কোনো বিজ্ঞ আলেম পাঠিয়ে কোরআনের মূল শিক্ষাকে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। মুফতী-এ আজম বাংলাদেশ মওলানা ফয়েযুল্লাহ সাহেবও সেধরনেরই একজন সংগ্রামী আলেম ছিলেন, যিনি ইসলামকে বিভিন্ন কুসংস্কার, বেদআত-শির্ক ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষায়, দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি নিজের জীবনকে ইসলামের সেবায় করেছিলেন উৎসর্গ। খেলাফে শরা' ও খেলাফে সুন্নাহ্ কাজ দেখে তিনি কোনো অবস্থায় নিরব থাকতে পারতেননা। পরিবেশ পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল থাকনা কেন তিনি ন্যায় এবং সত্য কথা সমাজের সামনে তুলে ধরাকেই তাঁর প্রধান দ্বীনী কর্তব্য মনে করতেন। সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা এবং অন্যায়ের সাথে মিতালির মনোভাব তাঁর কোনোদিনই ছিলনা। শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর নীতিবিচ্যুতি ঘটতোনা। মুফতী-এ-আজম বাংলাদেশ মওলানা ফয়েযুল্লাহ সাহেব, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত আলেম ছিলেন। বহু আরবী, ফারসী ও উর্দু কিতাবের প্রণেতা এবং আরবী ও ফারসী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মুফতী সাহেব একজন অকুতোভয় স্পষ্টভাষী ত্যাগী খোদাভীরু আলেম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন সংগ্রামী তবে তাঁর সংগ্রাম ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যেসব লোক ভণ্ড পীরের মুরীদ হয়ে নামাজ রোজা তথা শরা-শরীয়তকে উপেক্ষা করে মারেফত হাসিলের নামে ভাওতাবাজিতে লিপ্ত হতো, তাদের সংখ্যাধিক্য বা কোনোরূপ তীর্জক দৃষ্টি তাঁকে হকের পথ থেকে একটুও টলাতে পারতো না। ইসলামের মূল বক্তব্য তুলে ধরার কাজে তিনি ছিলেন নিরলস।

ইবাদতের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণের প্রশ্নে

'ইবাদত' শব্দ প্রযোজ্য হয় এমন কোনো কাজ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে তিনি প্রচলিত নিয়ম-বিধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নাজায়েজ হবার ব্যাপারেই দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। এব্যাপারে "রাফেউল ইশকিলাত আলা হুরমাতিল ইস্তীজারাহ্ আলাত্তাআত" নামক কিতাবে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কিতাব-টিতে "মুফতী এ-আজম বাংলাদেশ" এটা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, দোয়া-দরূদ, জানাজার জামায়াতে অংশ গ্রহণ মৃত ব্যক্তির উপর সওয়াব রেসানী ইত্যাদির ন্যায় নিছক ইবাদতের কাজসমূহ সম্পাদন করে অর্থ সম্পদ গ্রহণ অতীত বর্তমান কোনো যুগের ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিকটই জায়েয নয় বরং হারাম। তাঁর মতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ই গুণাহ্গার হবে। অবশ্য তিনি এটাও ব্যক্ত করেন যে, কুরআন শিক্ষা দান, মসজিদে জমায়াতের দায়িত্ব পালন, আজান-ইকামত তথা মুয়াযযিনী বা মসজীদের রক্ষণাবেক্ষণের ন্যায় ইবাদতের পূর্ব শর্ত যদি কেউ পালন করে, তার পক্ষে বিনিময় গ্রহণকে 'মোতাআখেখরীন' তথা শেষ জামানার বিশেষজ্ঞ আলেমগণ জায়েয বলে গেছেন।

প্রথমোক্ত মতে মুফতী সাহেব মূলতঃ ইবাদতকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য খাস্ রাখতে চেয়েছেন। এর সাথে বৈষয়িক ও আর্থিক কোনো উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ দ্বারা দিনের বিশুদ্ধতাকে কলুষিত করা ও এর আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে নষ্ট করার তিনি ছিলেন বিরোধী। মহানবী (সাঃ,-এর হাদীস মাফিক মুফতী-এ-আজম আলেমদের হাতকে নিচে থাকার বদলে উপরে তথা দানের হাত হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। কারণ, জাগতিক দিক থেকে নিচের হাত যিল্লতীর হাত। ইবাদতের অর্থগ্রহণের বিষয়টি বিতর্কিত। "উজরত আলাত্তাআত'কে যারা বৈধ বলতে চান, তাদের যুক্তি হলো কোরআনের সেই আয়াতটি, যেখানে ঐসকল মানুষকে দান করার কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজে আটকা থাকে এবং মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে সাওয়াল করে বেড়ায়না অথচ (তাদের অবস্থা সম্পর্কে) অনবহিত ব্যক্তিরা ধরে নেয় যে, তারা স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছে।"

এ ব্যাপারে মুফতী সাহেবের মত ছিল স্পষ্ট। তাঁর মতে একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে বা দ্বীনের কোনো খাদেমকে যত ইচ্ছা অর্থ দান করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কোনো কিছু পড়া ছাড়া যখন কারুর মুষ্ঠি থেকে কোনো আলেমের উদ্দেশে কোনো টাকা-পয়সা বের হতে না চায়, তখন সেটাকে দোয়া-কালাম পড়ার বিনিময় ও পারিশ্রমিক না বলে শুধু 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে' দান করেছে বলে ধরে নেয়ার কোনো উপায় আছে কি। মোটকথা, "উজরৎ আলাত্তাআত"-এর প্রশ্নে বিখ্যাত হাদীস "নিচের হাত অপেক্ষা উপরের হাত ভাল" এবং কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াত ও মর্যাদাবোধ ইত্যাদির সার্বিক বিচারে মুফতী-এ আজমের মতকেই প্রাধান্য দেয়া নিরাপদ মনে হয়।

বংশ পরিচয়

মুফতী ফয়েযুল্লাহ ১৮৯২ খৃঃ হাটহাজারীর মিখল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী হেদায়াত আলী চৌধুরী তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। আড়াই বছর বয়সে মুফতী সাহেবের মাতৃবিয়োগ ঘটে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মুফতী ফয়েযুল্লাহ্‌র কোনো এক পূর্ব পুরুষ আরব বা পারস্য থেকে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের অতি কাছে এসেছিলেন। তাঁরই বংশ-লতিকার অষ্টম সিঁড়ির উত্তর পুরুষ গফুর খাঁ গৌড় থেকে চট্টগ্রামের হালী শহরের অনতিদূরে চাশখোলায় বসতি স্থাপন করেন। মুফতী সাহেবের প্রপিতামহ মুনশী দীওয়ান আলী হালী শহর থেকে হাটহাজারীর অধীন শ্বশুরালয় মিখলে এসে বসবাস আরম্ভ করেন।

শিক্ষা জীবন

মুফতী ফয়েযুল্লাহ্ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ১৯০২ খৃঃ চট্টগ্রামের বিখ্যাত দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি কাব্য চর্চায় অভ্যস্থ ছিলেন। সাধারণতঃ ঐ সময় তিনি ফারসী ভাষায় কবিতা লিখতেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালেই তিনি 'পান্দে ফয়েয' নামক একখানা ফারসী কাব্য পুস্তক রচনা করেন। ২১ বছর বয়সের সময় মুফতী সাহেব উচ্চ দ্বীনী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। সোয়া দু'বছর সেখানে থেকে তিনি 'সিহাহ

সিত্তা' হাদীস ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন হাটহাজারীতে মওলানা জমির উদ্দীন সাহেব, মওলানা হাবীবুল্লাহ্ সাহেব। দেওবন্দের মওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের খলীফা সাইদ আহমদ সন্দীপী ছিলেন মুফতী সাহেবের তরীকতের পীর। মুফতী সাহেব দেওবন্দে যাদের কাছে হাদীস-তফসীর ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন যেমন, শায়েখুল হিন্দ মওলানা মহমূদুল হাসান, মওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মওলানা আযীযুর রহমান প্রমুখ। মুফতী-এ-আযম পাকিস্তান মওলানা মুফতী শফী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। মুফতী ফয়েজুল্লাহ ১৯১৫ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং দারুল উলূম হাট-হাজারীতে ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেন। হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, মানতিক, হেকমত সহ দ্বীনী জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল। শিক্ষকতা ছাড়াও ফৎওয়া দানের দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। ১৯৭৬ সালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত এই বুযর্গ পণ্ডিত আলেমের ইনতেকাল হয়। শরীয়তকে বেদআত ইত্যাদি থেকে নির্ভেজাল রাখাই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট। তিনি ছিলেন অতীব অল্লাহ্‌ভক্ত - সহজ সরল এক সাধক জীবনের অধিকারী। তাঁর আজী-বনের সাধনা ছিল কোরআন-সুন্নাহ্‌র খাটি শিক্ষা-আদর্শের বিস্তার। তাঁর মতে আল্লাহ যেভাবে যে কাজ যতদূর করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা সেভাবে সে পরিমাণ করার নামই ইবাদত। বস্তুতঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ, আবেগের বসবর্তী হয়ে কেউ শরীয়তে হ্রাসবৃদ্ধি করলে তাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালিত হবে না। তেমনি তার যথার্থ প্রতিদানও আশা করা যায় না। পবিত্র কোরআনে একশ্রেণীর লোক সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী পুণ্যের কাজই করে যাচ্ছে যদিও তা প্রত্যাখ্যাত।"

রচনাবলী

মুফতী-এ-আজম বাংলাদেশ হযরত মওলানা ফয়েযুল্লাহ সাহেব একজন বাংলা ভাষাভাষী লোক হয়েও আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষায় তাঁর কি রূপ পাণ্ডিত্বছিল ঐসকল ভাষায় তাঁর লেখা কিতাবের সংখ্যা দেখেই তা অনুমান করা যায়। যেমন—(১) কন্দেখাকী (ফার্সী) (২) উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দে মা ফী

আহসানিল মাকাল (৩) আররিসালাতুন মানযুমাতু আলাল ফিরকাতিন্নাহারিয়া (৪) আলকালামুলফাছিল বাইনা আহলিলহাক্কে ওয়ালবাতিল (৫) ইরশাদুল উম্মাহ ইলাত্তাফরিকা বাইনাল বিদআতে ওয়াস সুন্নাহ (৬)আন্নাস্সুসাতুল মুখতাসেরাতু ফী হুকমিল উজরাতে আলাত্তাআতে (৭) রাফেউল ইশকালাত আলা হুরমাতিল ইস্তীজার আলাত্তাআহ (৮) আল-ফাযিলাতুল জালীলাহ লিআহকামিসমা ও সাজ-দাতিত্তাহিয়াহ (৯) পান্দেনামা-এ-খাকী (১০) আলকাওলুস সাদীদ ফী হুকমিল আহওয়াল ওয়াল মাওয়াজীদ (১১) মসনভী-এ-খাকী (১২) ফয়েয-এ-সাত্তার (১৩+১৪) ফয়েযে বেবাহা, ফয়েযে বেকারাঁ, ফয়েযে বেপায়া (১৫) তালীমুল মুবতাদী লিল্লিসানিল আরাবী (১৬) সিরাজুত্তাবলীগ (১৮) আলফালাহ ফীমা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিকাহ (১৯) ইযহারুল ইখতিলাল ফী রিসালাতিল ইতিদাল ফী মাসআলাতিল হিলাল (২০) ফয়েযুল কালাম লিসাইয়েদিল আনাম)

এছাড়াও মুফতী সাহেব আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর লিখেছেন (ক) হক কী রাহনুমায়ী (খ) রাহে হক (গ) আলমাসলাকুস সারীহ (ঘ) ইসলাহুন্নাফ্স (ঙ) মসনভী-এ-দেলাভীয ।

লেখক পরিচিতি

জনাব জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী গত ২৬ বছর ধরে বিভিন্ন সংবাদ-পত্র ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। সাংবাদিকতা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ও মূল্যবান বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে তিনি জাতি ও ধর্মের সেবা করে আসছেন। জাতীয় প্রচার মাধ্যম রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করে থাকেন। কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রও তিনি সফর করেন। জনাব জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী এ পর্যন্ত ছোট বড় ১৮ খানা বই লিখেছেন। ঢাকাস্থ নিউইয়র্ক ভিত্তিক অধুনালুপ্ত আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স-এর তত্ত্বাবধানে রচিত ৪ খণ্ড বিশিষ্ট 'বাংলা বিশ্বকোষে'র তিনি অন্যতম লেখক। আরবী, উর্দূ ভাষা থেকে অনূদিত তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৬ খানা। পাকিস্তানের অভিজাত উর্দূ সংবাদপত্রে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত বইগুলোর নাম হচ্ছে (১) আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের অবদান (২) আল-কোরআনের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা (৩) দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও তাঁর চিন্তাধারা (৪) শহীদে কারবালা (৫) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (৬) আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা (৭) ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র (৮) ষড়যন্ত্রের অন্তরালে (৯) চিন্তাধারা (১০) শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী (১১) বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ (১২) শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা (১৩) সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান (১৪) মযহাব সৃষ্টির গোড়ার কথা (১৫) তাব-লীগে দ্বীনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (১৬) মহানবী (আংশিক) (১৭) আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে। শেষোক্ত ৬টি বইয়ের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম ৪টি আরবী ভাষা এবং শেষ দুটি উর্দূ ভাষা থেকে অনূদিত। এছাড়া।—(১৮) "আল-উম্মাতুল মুসলিমাহ ওয়াল্লুগাতুল আরাবিয়া" (যন্ত্রস্থ) নামক একখানা আরবী বইও তিনি রচনা করেছেন।

জন্মস্থান ঃ জনাব জুলফিকার আহমদ কিসমতী কুমিল্লা জেলার চৌদ্দ-গ্রাম উপজেলাধীন মৌজে বাগিগ্রাম (মোক্তার বাড়ী)-এর এক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে লাকসাম উপজেলা-ধীন মৌজে কিসমত (চলুণ্ডা)-এ মামার বাড়ীতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুনশী সেকান্দার আলী মাষ্টার। মরহুম বৃটিশ আমলে ভূমি জরিপ বিভাগে চাকুরি করতেন। শিক্ষানুরাগী ধার্মিক ও সৎসাধু-ব্যক্তি হিসাবে মরহুম নিজ এলাকায় সুপরিচিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। জনাব জুলফিকার আহমদ কিসমতীর পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে উর্দু ফারসী ভাষার চর্চা ছিল এবং তাঁদের কেউ কেউ আইন ব্যবসায় ও রাজস্ব বিভাগীয় চাকুরির সাথে জড়িত ছিলেন।

শিক্ষাজীবন ঃ ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি স্থানীয় হাজাতখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে পিতার অভিপ্রায়ে মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। কাশীনগর এবং বরুড়া (কওমী) মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্য-মিক দ্বীনি শিক্ষা লাভ করার পর তিনি কুমিল্লার বটগ্রাম হামীদিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আলেম ও ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ফাজিল পাশ করেন। তিনি টাইটেল (কামিল) পাশ করেন ১৯৫৮/৫৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা-এ-আলীয়া ফেনী থেকে। জনাব কিসমতী মাঝখানে এক বছর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দীনি শিক্ষাকেন্দ্র চট্টগ্রামের হাটহাজারী কওমী মাদ্রাসায় 'দাওরা-এ-হাদীস' অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবন ঃ সাহিত্য-চর্চার জগতে প্রবেশ করার পূর্বে তিনি দুটি সিনি-য়ার মাদ্রাসায় হেড মোদার্রেস হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একটি কুমিল্লার মন্তলি সিনিয়ার মাদ্রাসা (১৯৫৯ খৃঃ) অপরটি বগুড়ার ঠনঠনিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা (১৯৬০ খৃঃ)। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-কর্মের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ প্রচারের ঐকান্তিক আগ্রহই তাঁকে শিক্ষ-কতা ছেড়ে দেশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় আসতে উদ্বুদ্ধ করে। জনাব কিসমতী সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালে ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা 'এমদাদিয়া'র প্রকাশনা বিভাগের কাজে যোগ দেন। সেখানেই তিনি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মরহুম মওলানা

নূর মোহাম্মদ আজমীর সংসর্গে আসেন ও তাঁর নিকট সাহিত্য চর্চা ও অনুবাদের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের এককালের সংগ্রামী নেতা উপমহাদেশ খ্যাত আলেম মওলানা আতাহার আলী (রঃ)।

লেখার জগতে ঃ ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি অধুনা-লুপ্ত আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স-এর বাংলা বিশ্বকোষ বিভাগে চাকুরি করেন। একাজে থাকতেই তিনি সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত মাসিক 'মদীনা' পত্রিকার সাথে জড়িত থাকেন। ১৯৬৬ সালে ফ্রাংকলিন অফিসের চাকুরি ত্যাগ করে তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত কলামিস্ট সাহিত্যিক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনাধীন সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ'-এর সাব-এডিটর হিসাবে চাকুরী নেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৭ সালে মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের পরিচালনাধীন সাপ্তাহিক 'জাহানে নও'তে সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করেন। জনাব কিসমতী ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীতে রিসার্চ ফ্যালো এবং মাসিক 'পৃথিবী'র সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ১৭ই জানুয়ারী দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা প্রকাশিত হলে জনাব কিসমতী এসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসাবে এতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি দৈনিক সংগ্রামের সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট এডিটর। অবশ্য মাঝখানে '৭৯ সালে তিনি সৌদী দূতবাসেও কিছুদিন অনুবাদক হিসাবে কাজ করেন।